

ISSN 1813-0402

সাঁধে সাঁধে

৩০তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২০



কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal
Faculty of Arts
University of Rajshahi

সাঁধে সাঁধে

৩০তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২০



কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

৩০তম সংখ্যা □ ডিসেম্বর ২০২০



A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 30
December 2020

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 \$ 6

Contact Address
Chief Editor, *A Research Journal* (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque

Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Shamima Akter

Chairman
Department of Philosophy

Professor Mortuza Khaled

Chairman
Department of History

Professor Abdullah Al Mamun

Chairman
Department of English

Professor Sarker Sujit Kumar

Chairman
Department of Bangla

Professor Md. Fazlul Haque

Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Md. Nizam Uddin

Chairman
Department of Arabic

Professor Muhammad Mahbubur Rahman

Chairman
Department of Islamic Studies

Dr. Dino Bandhu Pal

Chairman
Department of Music

Professor SM Faruque Hossine

Chairman
Department of Theatre

Professor Md. Osman Goni

Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Juely Biswas

Chairman
Department of Sanskrit

Professor Md. Nasir Uddin

Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 30th volume of *A Research Journal*, Faculty of Arts is being published with as many as 28 research articles contributed by the faculty members of Philosophy, Bangla, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Music, Persian Language & Literature, Sanskrit and Urdu Departments. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the concerned officers of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque

Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. মজিবর রহমান	অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন রুমী	১
ড. সৈয়দ তৌফিক জুহুরী	শামসুর রাহমানের কবিতায় নগরভাবনা : প্রবণতা ও প্রান্ত	১৩
ড. পুরনজিত মহালদার	প্রবোধকুমার সান্যালের হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্য	২৫
ড. মো. ফজলুল হক	আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: এফএলএন এর ভূমিকা	৪৩
ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম	মগধকেন্দ্রিক রাজবংশের উত্থানপর্ব ও কালানুক্রমিক বিকাশ	৫৩
ড. মো. আমিরুল ইসলাম	বাংলার জনজীবনে মোগল শাসন ব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ	৬৫
এইচ. এম. মুহিবুল্লাহ	ড. তুহা হুসাইন-এর 'আল-আইয়ামে' মিসরের সমাজচিত্র	৭৫
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম	ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খতীব আত-তাবরীযী: হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান	৯৩
মুহা. আবুল ফুতুহ	আল-কুরআনে কসম: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	১০৫
Mohidul Islam	Terrorism: A Theoretical Analysis in The Light of Islam	১১৯
Dr. Md. Rafiqul Islam	<i>Ikhtilāf</i> (Disagreement) in Islamic Jurisprudence: An Analytical Study	১৩৩
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	আল-কুরআন তিলাওয়াতে মাখরাজ ও সিফাতের বিধানাবলী	১৫৩
ড. আবুল বাশার মোহাম্মাদ সরোয়ার আলম	মধ্যযুগে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম অবদান (৬২২-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ)	১৮৩
ড. মো. আব্দুল হান্নান	অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন : প্রেক্ষাপট ও দর্শন	১৯৯
মো. আশরাফুল ইসলাম	যাকাতের শর্তাবলী : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	২১৭
বজলুর রশীদ	ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের নীতিমালা ও উৎসাবলী	২৪৯
মুহাম্মাদ মুনাওয়ার হুসাইন	'জামি'উল মাসানীদ' গ্রন্থ সংকলন ও বিন্যাস পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা	২৭৭
ড. দীনবন্ধু পাল	বাদনশৈলীতে তবলা ঘরানার নান্দনিকতা	২৯৫
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	বাবা তাহের হামেদানির কাব্যে প্রেম	৩০৭
ড. মো. শফিউল্লাহ	পারস্য কবি নাযিরী নিশাপুরী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা	৩২৩
ড. সেরিনা সুলতানা	রাষ্ট্রের প্রকৃতি : সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব	৩৩৩
ড. জয়শ্রী দাষ	রামায়ণে পতিপ্রেমের আদর্শ প্রতিমূর্তি সীতা: একটি পর্যালোচনা	৩৪৫
ড. হোসনে আরা আরজু	কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দণ্ড দূত ও চরের ভূমিকা	৩৫৭
ড. মোহাম্মদ আলী		
ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম	জোশ মালিহাবাদীর কাব্যে বিপ্লবী চেতনা	৩৭১
ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল	উর্দু গদ্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি: একটি পর্যালোচনা	৩৮৩
ড. মো. রশিদুল আলম	উর্দু নাটকের উন্নয়নে হোসনী মিয়া জরীফ : একটি পর্যালোচনা	৩৯৭
ড. মো: নাসির উদ্দিন	আলতাফ হুসাইন হালীর কাব্যসাহিত্য : একটি পর্যালোচনা	৪০৭
ড. মো. আতাউর রহমান	ইকবালের দৃষ্টিতে নারী : একটি পর্যালোচনা	৪২৩

অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন রুমী

ড. মো. মজিবুর রহমান*

Abstract: By unity of Allah the sufis understand the one essence underlying all phenomena. There is nothing except Allah. Things are emanations from Allah and they are mirrors in which Divine attributes are reflected. But there is a conflict among the sufis regarding the relationship between the creator and the created world. For this reason we see deism, pantheism and panentheism in the theistic notion of Allah. Jalaluddin Rumi preached the doctrine of oneness of Allah throughout his life. He thought that Allah is permanent and eternal. The world is derived from His Will-power. Allah is infinite but the world is finite. He manifested himself through this finite world. All things of this universe are created and destructible. Only Allah is the immutable and the changeless. Rumi strongly advocates a kind of monotheism which may be called 'panentheism'.

বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা মানুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা তাকে বিশ্বের অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মানুষ বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, যার সাহায্যে সে নিজেকে পুনর্গঠিত ও পরিচালিত করতে পারে এবং জীবনের স্থিরীকৃত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। মানব-চিন্তা বিকাশের শুরু থেকেই শ্রষ্টাকে জানার আগ্রহ মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এবং ধর্ম ও দর্শনে বিভিন্নভাবে পরমসত্তার জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এক ধরনের মানুষ আছে, যারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ অনুভূতির দ্বারা শ্রষ্টাকে জানার চেষ্টা করে। তারা মরমি সাধক নামে পরিচিত। আর মুসলিম মরমি সাধকদের সূফী বলে, যারা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে সাধনার চরম লক্ষ্য আল্লাহর জ্ঞান অন্বেষণে যত্নবান থাকে। জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ইলমে মারেফতে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন একজন মরমি কবি ও সূফী দার্শনিক ছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ধর্মপাঠ, এবাদত ও ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার কাজে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'দিওয়ান-ই-শামস তাবরীজ', 'মসনবী', 'রুবাইয়াত', 'ফীহি মা ফীহি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় 'মসনবী' এমন একটি মহাকাব্য, যাকে কেউ কেউ ফার্সী ভাষায় কোরআন বলে আখ্যায়িত করেছেন।^১ তাঁর রচনাসমূহে শরীয়ত ও মারেফতের গুরুত্ব এবং গুণ্ড রহস্যের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তিনি কোরআন ও হাদিসের অভ্যন্তরীণ দিকের বিশদ ব্যাখ্যা, শরীয়ত, মারেফত ও হাকীকতের নিগূঢ় সম্পর্ক দৃঢ় করার উপায় এবং আত্মিক পরিপূর্ণতার মাধ্যমে নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল বর্ণনা করেছেন। এই লক্ষ্যে সঠিক পথ প্রদর্শক, অর্থাৎ একজন পীরের শরণাপন্ন হওয়া এবং তা গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। মোটকথা আত্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন ও আল্লাহতে আত্মনিয়োগের সহজ উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনাসহ সূফী দর্শনের মূলতত্ত্বসমূহ, যেমন- আত্মাতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, বিবর্তনবাদ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আদর্শ মানব, আল্লাহতত্ত্ব, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে রুমীর বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপনই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতবাদ

এই দৃশ্যমান জগতকে সাধারণ মানুষ প্রকৃত ও বাস্তব বলে মনে করে, এর অন্তরালে কোন পরমসত্তার উপস্থিতি সম্পর্কে ভাবার অবকাশ তাদের নেই। তবে সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে দার্শনিকরা পরমসত্তাকে

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জানার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং তাঁর স্বরূপ ও সংখ্যা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। ফলে পরমসত্তার সংখ্যা বিবেচনায় অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ নামে তিনটি মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। বহুত্ববাদ অনুসারে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে বহু সত্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং বহু সত্তার সংযোগের ফলেই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই দৃশ্যমান জগতে বস্তুর বিভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে যে, এই জগতের পেছনে বহু সত্তার উপস্থিতি রয়েছে। দ্বৈতবাদ অনুযায়ী বাহ্য জগতের পেছনে দুইটি সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। এই মতানুযায়ী জড় ও মন হচ্ছে বিশ্বের মূল উপাদান। জড় ও মন দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী সত্তা, এদের একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায় না। বিশ্বের সমস্ত বস্তু এই দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অদ্বৈতবাদ অনুসারে বিশ্বের আদিসত্তা দুই বা বহু নয়, এক আদিসত্তা হতে বিশ্বের সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে। বহুর মাঝে এক পরমসত্তার অন্বেষণই হচ্ছে অদ্বৈতবাদের মূল লক্ষ্য। বহুত্ববাদ জগৎ-সত্তার মধ্যে কোন ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে না, এটি কেবল জগতের বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আর দ্বৈতবাদ জড় ও মনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, যা দার্শনিকদের তৃপ্ত করতে পারে না। অদ্বৈতবাদ এসব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। পরমসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সক্ষম হয় এবং তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। ইসলাম দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ বিরোধী। ইসলামে আল্লাহর একত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনকিছুর উপাসনার নির্দেশ নেই। ইসলাম আল্লাহকে একক ও অপেক্ষ পরমসত্তা হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই পরিদৃশ্যমান জগতের সবকিছুকে বাস্তব বলে গণ্য করে। ইসলামী একত্বের ধারণা এক ধরনের সমন্বয় পদ্ধতির নির্দেশ করে, যেখানে অংশ থেকে সমগ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায়, তথা সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক নিবিড় একত্ব অনুভব করা যায়। সূফীবাদ সাধারণত অদ্বৈতবাদী মতবাদ হিসেবে পরিচিত। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের যৌক্তিক অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ হতে সূফী অদ্বৈতবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। সূফীবাদের মধ্যে পরাতাত্ত্বিক ও নৈতিক ধারণাসমূহ এতোটাই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, সূফীবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বললে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। নিকোলসনের মতে, সূফীবাদ সর্বেশ্বরবাদই হবে এমন বক্তব্য চরমভাবে সত্য নয়, কেননা এটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্রষ্টা দ্বারা অনুপ্রাণিত খাঁটি ব্যক্তিগত ধর্মের ইঙ্গিত বহন করে।^{১২} সুতরাং সূফী অদ্বৈতবাদকে যৌক্তিক অদ্বৈতবাদের সাথে এক করে দেখা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। সূফীরা আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস করেন, তবে এ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সাধারণ মুসলমানদের ধারণা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণ মুসলমানরা আল্লাহর একত্ব বলতে সারধর্ম, গুণ ও কার্যের দিক থেকে আল্লাহর কর্মপরতাকে বুঝে থাকে; কারণ আল্লাহ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টজীব থেকে পৃথক। অন্যদিকে সূফীরা আল্লাহর একত্ব বলতে বুঝেন সমস্ত ঘটনার অন্তর্নিহিত সারধর্মকে। এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির ফলেই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি ইচ্ছা করলে সমস্ত সৃষ্টবস্তুকে পূর্বের ন্যায় শূন্যে পরিণত করতে পারেন। অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা, তিনি ছাড়া অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাঁদের এই বক্তব্য পবিত্র কোরআন দ্বারা সমর্থিত। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে: “একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর সত্তা ছাড়া অস্তিত্বশীল সব কিছুই ধ্বংস হবে।”^{১৩} কোরআনে আরও বলা হয়েছে: “আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুই আল্লাহর আয়ত্তাধীন।”^{১৪} অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অস্তিত্বশীল আর কোন কিছু নেই। এই অতীন্দ্রিয় পরমসত্তা আল্লাহকে অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় না, কেবল গভীর ধ্যান, প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়।

ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। ইসলামে আল্লাহ কেবল এক ও অদ্বিতীয় সত্তা নন, স্বয়ম্ভূ ও স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। মুসলমানরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনাকে শিরকের শামিল গণ্য করে, যা মহাপাপ হিসেবে নিন্দনীয়। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র পরমসত্তা এবং তাঁর সমকক্ষ অন্য কোনকিছু নেই। তবে সূফীরা বিষয়টিকে কেবল বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হন। অবশ্য অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং একেশ্বরবাদের তিনটি

রূপের উৎপত্তি হয়, যথা- অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও সর্বধরেশ্বরবাদ। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে আল্লাহ অনন্ত সময় ধরে অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একটি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী শূন্য হতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়। এই মতানুযায়ী আল্লাহ জগতের বাইরে অবস্থান করেন এবং প্রয়োজনে জগতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। এখানে আল্লাহ ও জগতের মধ্যে কেবল বাহ্য সম্পর্ক রয়েছে, কোন আন্তর সম্পর্ক নেই। তবে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে জগতের বাইরে আছেন, এ কথা সঠিক নয়। কারণ জগতের সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আল্লাহর অসীম গুণের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটেছে, যা মানুষের অনুসরণীয়। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থের মধ্যদিয়ে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু সসীম চিন্তার বহির্ভূত হওয়ায় মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে জানতে পারে না। এছাড়াও আল্লাহকে জগতের অতিবর্তী হিসেবে স্বীকার করলে তাঁর সর্বব্যাপকত্ব ও সর্ববিদ্যমানতা অস্বীকৃত হয়। অন্যদিকে সর্বেশ্বরবাদ এই জগতের ঐক্য এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহর সর্বব্যাপকতার উপর গুরুত্বারোপ করে। এই মতানুযায়ী আল্লাহ জগতের সম্পূর্ণ অন্তর্বর্তী সত্তা এবং জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক অন্তর্ব্যাপী, বাহ্য নয়। এখানে আল্লাহ ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উভয়েই এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ নিরপেক্ষ জগতের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা হচ্ছে সবই আল্লাহ এবং আল্লাহই সব। এই মতবাদকেও সন্তোষজনক বলা যায় না। কেননা দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থ আল্লাহর অসীম গুণাবলীর আংশিক প্রকাশ হলেও তাঁর সারধর্ম মানব চিন্তার বহির্ভূত। আল্লাহ অসীম এবং জগৎ সসীম, ফলে সসীম প্রকৃতি তাঁর অসীম শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হতে পারে না। জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে তাঁর উপস্থিতি বিদ্যমান, কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ মনে করা যৌক্তিক নয়। তাছাড়া আল্লাহ স্রষ্টা এবং জগৎ সৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ এবং সৃষ্ট জগতকে এক ও অভিন্ন ভাবা ঠিক নয়, আল্লাহ নিরপেক্ষ জগতের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর সর্বধরেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ। এ মতানুযায়ী আল্লাহ জগতের ভিতরে এবং বাইরে উভয় স্থানেই অবস্থান করেন। সর্বধরেশ্বরবাদ অনুযায়ী অসীম আল্লাহ, সসীম জীব জগতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজেকে উপলব্ধি করেন। এই মতানুসারে সৃষ্টজগতের সকল বস্তুর উর্ধ্বে আল্লাহর সত্তা বর্তমান। এই মতবাদ আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ তথা এক ও বহুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। সর্বধরেশ্বরবাদ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা এবং আল্লাহর সাথে এর অনিবার্য ও আংশিক সম্পর্ক স্বীকার করে। একেশ্বরবাদের তিনটি রূপের মধ্যে সর্বধরেশ্বরবাদকে সন্তোষজনক মতবাদ বলা যায়।

রুমীর মত

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও চারিত্রিক পবিত্রতার মহান বৈশিষ্ট্য নিয়ে সূফীবাদের পথ চলা শুরু হয়। সূফী সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ এবং তাঁর সাথে মিলনই সূফীর অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে আল্লাহ ভীতির প্রাবল্য দেখা যায়। ফলে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা সব ধরনের অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকতেন এবং নৈতিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগী বৈরাগ্য জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহর একত্বের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ এবং অতিমাত্রায় আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপের জন্যই আস্তে আস্তে সেখান হতে সর্বেশ্বরবাদী মতের উৎপত্তি হয়। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর নির্ভর করায় তখন মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল এবং তার সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী সময়ের সূফীরা ভয়-ভীতির পরিবর্তে প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেন। সর্ব প্রথম ঐশী প্রেমের ধারণা যুক্ত করে সূফীবাদকে আরো সমৃদ্ধ করেন রাবেয়া বসরী। তিনি পরম প্রেমিক আল্লাহকে ভালবেসেছিলেন শুধুমাত্র তাঁকে পাওয়ার আশায়, বেহেশত লাভ বা দোজখের শাস্তি হতে মুক্তির জন্য নয়। তিনি আল্লাহকে বিচারক বা শাস্তি দাতা নয়, বরং প্রেমময় সত্তা মনে করেন। তাঁর মতে, প্রেমিক গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রেমময়ের সাথে একাত্ম ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় প্রেমিক কেবলমাত্র প্রেমময়ের অস্তিত্ব স্বীকার

করেন এবং অন্যান্য সবকিছুকে ধ্বংসশীল বা অলীক মনে করেন।^৬ নবম শতকে সূফীবাদে কিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়। সে সময়ের কতিপয় সূফী আল্লাহর সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা দেন তাতে সর্বশ্রবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে বায়েজিদ বোস্তামী ও মনসুর হাল্লাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বায়েজিদ বোস্তামীই প্রথম ফানাবাদ প্রচার করেন, পরবর্তীতে এর ব্যাপক প্রভাব সূফীবাদে লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রেমিক ও প্রেমময়ের অভিন্নতা দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন গভীর তন্ময় অবস্থায় ঐশী সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় এবং সাধক সকল বিষয়ের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে পরম সত্যে পরিণত হন। মনসুর হাল্লাজও মনে করেন সূফী সাধনার চূড়ান্ত স্তরে আল্লাহর সাথে একাত্ম অনুভব করলে সাধকের সমস্ত চিন্তা ও কার্য আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ গভীর তন্ময়াবস্থায় উপনীত হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ‘আনাল-হকু’ বা ‘আমিই পরমসত্য’। তাঁর এমন উক্তির কারণে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং নিজেকে আল্লাহ হিসেবে দাবী করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। অবশ্য নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করার পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল যে, আল্লাহর সাথে একাত্ম অনুভবের সময় সূফী এবং আল্লাহর মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না, ফলে ঐ অবস্থায় সূফীর পৃথক কোন বক্তব্যও থাকে না। তখন স্বয়ং আল্লাহ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলেন।^৭ সূফীবাদে ইবনুল আরাবীই সর্ব প্রথম অদ্বৈতবাদকে একটি দার্শনিক মতবাদ হিসেবে গড়ে তুলেন। তাঁর ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার মূল কথা ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ বা ‘অস্তিত্বের ঐক্য’ (Unity of Being)। পরমসত্তাকে তিনি সমস্ত অস্তিত্বের চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সকল সত্তা এক এবং একটি চরম একত্ব। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব ব্যক্তিসত্তা মূলতঃ একই সত্তা, একই সার্বিক দ্রব্য বা আল্লাহ। আল্লাহ একমাত্র পরমসত্তা। তাঁর সত্তাই সমস্ত সত্তার উৎস ও কারণ এবং সসীম সত্তাসমূহ পরমসত্তারই প্রকাশস্বরূপ। তিনি মনে করেন বুদ্ধিময় পরমসত্তা না থাকলে বাহ্য বস্তুর আচরণ সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভব হতো না, অন্যদিকে আল্লাহ অস্তিত্বশীল সত্তায় পরিব্যাপ্ত না হলে বিশ্বের কোন অস্তিত্ব থাকতো না।^৮ দ্রব্য হিসেবে পরমসত্তা পরিণামে এক এবং এর সত্তা (Being) অস্তিত্বশীল বস্তুর সমার্থক। সকল সত্তার উৎস এই পরমসত্তার অস্তিত্ব ও সারধর্মকে তিনি এক ও অভিন্ন বলেছেন। তিনি মনে করেন কেবলমাত্র একটি পরমসত্তাই অস্তিত্বশীল। পরম সারধর্মের দিক হতে দেখলে এটাকে এক ‘বাস্তব সত্তা’ এবং বাহ্যিক জগতের মধ্যে প্রকাশিত সত্তার দিক হতে দেখলে এটাকে ‘বহু’ বলা যায়। জগতের সারধর্মের দিক হতে বিচার করলে পরমসত্তা বা আল্লাহ একটি একত্ব, অথচ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে তাঁকে বহু বা বৈচিত্রপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সত্তার কোন চূড়ান্ত বৈচিত্র নেই।^৯ সসীম মনের সীমাবদ্ধতা ও সমগ্রকে সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মানবীয় অক্ষমতার কারণেই মানুষ সত্তার বহুত্ব লক্ষ্য করে। আল্লাহর সাথে জীব-জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় রুমী অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ও সর্বশ্রবাদের মধ্যে সমন্বয় করেন এবং ‘সর্বধরেশ্বরবাদ’ মতবাদ গ্রহণ করে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

জীবন ও জগতের নানান প্রশ্নের সমাধানে সূফীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, পরম বাস্তবসত্তা এবং আল্লাহ এক ও অভিন্ন। ইসলামে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। এই মূলমন্ত্রকে সূফীরা একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্ব নেই। এ বিষয়ে অন্যান্য সূফীদের সাথে রুমী একমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা ছাড়া বিশ্বজগতের অন্যান্য সকল সত্তার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের মতো। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “জগতের সবকিছু মাশুক (প্রেমাস্পদ) আর সমস্ত আশেক আবরণ, মাশুক জীবিত এবং আশেক মৃত।”^{১০} এখানে ‘সবকিছু মাশুক’ অর্থাৎ ‘সবকিছু আল্লাহ’ এবং ‘আশেক’ অর্থ সমগ্র সৃষ্টজগতকে বুঝানো হয়েছে। আর ‘আবরণ’ শব্দটি দ্বারা বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন দৃষ্ট বস্তুর সমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা প্রকৃত ও বাস্তব সত্তা আল্লাহকে উপলব্ধির পথে বাধা বা পর্দাস্বরূপ। পর্দার আড়ালে কোন কিছু থাকলে তা যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন দৃষ্ট বস্তুর সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি থাকার কারণে এর অন্তরালে থাকা বাস্তব

সত্তা নজরে পড়ে না। অথচ আল্লাহর সত্তা অনাদি, অনন্ত, অসীম ও চিরস্থায়ী। আর বাহ্য জগতের সৃষ্টবস্তুর সত্তা ক্ষণস্থায়ী, সসীম ও ধ্বংসশীল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সত্তা ব্যতীত পূর্ণ ও বাস্তব সত্তার অধিকারী অন্য কোন সত্তা নেই। এই বিষয়টিকেই সূফীরা বলেছেন ‘হামাউস্ত’ বা ‘সবকিছুই আল্লাহ’, তবে এখানে ‘সবকিছু’ এবং ‘আল্লাহ’ উভয়কে ছবছ এক ও অভিন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়নি; বরং ‘আল্লাহর’ সত্তাকেই কেবল পূর্ণ ও বাস্তব সত্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর ‘সবকিছু’ এর সত্তাকে অপূর্ণ সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা পূর্ণ সত্তার সামনে মোটেও বিবেচ্য নয়; অর্থাৎ পূর্ণ সত্তার তুলনায় এটি না থাকার সমতুল্য। ঠিক যেমন এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি সাগরে পড়লে সাগরের পানিতে তা বিলীন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বৃষ্টি বিন্দুর অস্তিত্ব থাকবে ঠিকই, কিন্তু সাগরের অঁথে পানির নিকট তা হবে খুবই নগণ্য। অনুরূপ বাহ্য জগতের বস্তুসমূহের সত্তা আছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর সত্তার সামনে তা একেবারেই না থাকার শামিল। এই কারণেই রুমী আল্লাহকে জীবিত, আর সৃষ্ট জগতকে মৃত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মৃতদেহ বা লাশেরও সত্তা আছে, কিন্তু জীবিতের সত্তার তুলনায় লাশের সত্তা ধর্তব্য নয়। কেননা লাশের সত্তা অপূর্ণ, আর জীবিতের সত্তা পূর্ণ। পূর্ণ সত্তার তুলনায় অপূর্ণ সত্তা নিতান্ত দুর্বল ও ক্ষীণ। সুতরাং এক আল্লাহর সত্তাই বাস্তব ও প্রকৃত সত্তা। এই মহান সত্তার জ্ঞান কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে লাভ করা যায়, সাধারণ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নয়। ফলে অধিকাংশ মানুষ তা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আসলে সৃষ্টির প্রতি একাত্মতা থাকলে সৃষ্টির সত্তার প্রতি পূর্ণ-মনঃসংযোগ করা কষ্টসাধ্য হয়। স্বীয় অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে উঠা সম্ভব হলে আল্লাহর একত্ব অনুভব করা যায়। মোটকথা নিবিড় মনোযোগ ও স্বীয় সত্তাকে ফানা করার মাধ্যমে অদ্বৈতবাদের স্বাদ গ্রহণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে রুমী বলেন: “যাবত তুমি বিষ ও মিসরী (অর্থাৎ, আধিক্যের জগৎ) হইতে অতিক্রম না করিবে, তাবৎ তৌহীদের বাগানের খোশবু তুমি পাইবে না।”^{১১} সৃষ্টজগতের যাবতীয় বস্তুকে বাহ্য দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক দেখা যায়, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সেগুলো বস্তুত একই। যেমন, পৃথক আকৃতির একশত আপেল হতে নিঃসৃত রসের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আবার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির দশটি মোমবাতির আলোর মধ্যে কোন ভাবেই পার্থক্য করা যাবে না এবং কোন্ বাতির আলো কতটুকু কিংবা কোন্টি কোন্ বাতির আলো তাও বুঝা যাবে না। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, বাহ্যিক আকৃতি কেবল একত্বের পরিপন্থি, যদিও সারমর্ম সকলেরই এক। রুমী এই বাহ্য আকৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে সারমর্মকে আঁকড়ে ধরে তা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন।^{১২} মানুষ আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে আকৃতির জগতের উর্ধ্বে উঠে বাস্তব সত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হলে উপলব্ধি করতে পারে যে, পূর্ণসত্তা কেবলমাত্র একটি। তখন সে প্রত্যেক বস্তুতে শুধু একত্বই দেখতে পায়। মোটকথা মারেফতপন্থি গভীর তন্ময় অবস্থায় আত্মবিলীনের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব অনুভব করতে পারেন। এরূপ অবস্থায় সাধকের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র একটি সত্তাই অনুভূত হয়, বাহ্য জগতের অন্যান্য সৃষ্ট সত্তার উপলব্ধি তাঁর থাকে না। দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর কিরণের সামনে জোনাকীর ঝিকিমিকি আলো যেমন নিশ্চেষ্ট ও বিলীন হয়ে যায়, অনুরূপ বাহ্য জগতের সৃষ্ট সত্তার অস্তিত্ব থাকলেও তা বাস্তব সত্তার সম্মুখে লীন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সত্তাই সর্বত্র বিদ্যমান ও অস্তিত্ববান। তিনি সমস্ত গুণাবলীতে অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ সর্বগুণে গুণান্বিত মহান সত্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। আর এটিই হচ্ছে অদ্বৈতবাদের সারমর্ম।

এক ও অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর গোজারী করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ মানুষই এই কর্তব্য পালনে বিরত থাকে। আল্লাহ গুণের দিক থেকে প্রকাশ্য এবং সারধর্মের দিক হতে অপ্রকাশ্য সত্তা। বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তিনি নিজেই প্রকাশ করলেও মানুষের মধ্যে অধিকরূপে প্রকাশ ও উপলব্ধি করেন। সৃষ্টজগতের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর কিঞ্চিৎ প্রকাশ পায়; কারণ জগৎ সসীম, আর সসীম জগতে তাঁর অসীম গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সম্ভব নয়। অন্যদিকে তাঁর সারধর্ম মানব জ্ঞানের অতীত। সসীম মানুষ অসীম

আল্লাহর সারধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তিনি সমগ্র সৃষ্টির মাঝে গোপনে অবস্থান করলেও পরকালে এতোটাই প্রকাশিত হবেন যে, তাঁর অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যাবে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে: “তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত।”^{১৩} সৃষ্টিজগতে যখন কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র আল্লাহ ছিলেন। আবার যখন বিচার দিনের পূর্বে কোন কিছুই থাকবেনা, তখনও একমাত্র তিনিই থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই। একক সত্তারূপে তিনি সৃষ্টিতে বিরাজমান এবং সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। সূফী সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হলে সাধক সৃষ্টির সবকিছুকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং সৃষ্টির মাঝে কেবল আল্লাহকেই অবলোকন করেন, আল্লাহ ব্যতীত তিনি অন্য কিছু দেখেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাঁর সন্তুষ্টিতে পরিণত হয়। এভাবে আত্মবিলীনের মাধ্যমে যিনি সব কিছুর মাঝে কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, তিনিই প্রকৃত তৌহিদধারী তত্ত্বজ্ঞানী। তবে সাধারণ মানুষের উপলব্ধিজনিত অক্ষমতার কারণে আল্লাহর জ্ঞানলাভের এই গোপন রহস্য তিনি সহসায় প্রকাশ করেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অদ্বৈতবাদের রহস্য উপলব্ধি করা বেশ কঠিন। ফলে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রুমী সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, এতে মানুষ তথা এই বিশ্বজগৎ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “বান্দীর মিহীন ও উচ্চ সুরের মধ্যে গোপন তথ্য নিহিত আছে, যদি উহা প্রকাশ করি বিশ্ব-জগৎ উলট-পালট হইয়া যাইবে।”^{১৪} এশুক সম্বন্ধীয় বাক্যলাপের মাধ্যমে তিনি অদ্বৈতবাদের গুপ্ত রহস্যাবলী অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যদিও মারেফতপন্থির সমস্ত কথা ও কার্যের একমাত্র সারমর্ম হচ্ছে অদ্বৈতবাদ বা একক সত্তার গূঢ় রহস্য। ‘আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, প্রকৃত ও বাস্তব সত্তা একমাত্র আল্লাহ’— এই বিষয়টি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হলেও এটি যেহেতু আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও হালের সাহায্যে উপলব্ধির বিষয়, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি শব্দ ও ভাষার দ্বারা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না। ফলে অধিকাংশ মানুষ এর দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে এবং সবকিছুকে কল্পনা ও খেয়াল মনে করে হালাল-হারামের ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান বর্জন করতে পারে। অথচ ইহজগতের সকল কাজের শৃঙ্খলা একমাত্র শরীয়তের উপর নির্ভরশীল। কাজেই শরীয়ত ত্যাগের ফলে মানব জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বিশ্বজগৎ অবশিষ্ট থাকা অর্থহীন হবে, কারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই এটি সৃষ্টি হয়েছে। তাই রুমী মনে করেন আল্লাহর একত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে কামেল পীরের শরণাপন্ন হয়ে আধ্যাত্মিক গুণ অর্জনের মাধ্যমে হৃদয়ে আল্লাহ-প্রেমের সঞ্চার ঘটাতে হবে। কেননা এশুকে এলাহীর বিস্ময়কর ঘটনাবলী কেবল তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেই জানা সম্ভব। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মারেফতপন্থির নিকট এক আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই অবলুপ্ত হয় এবং এক পবিত্র সত্তার উপলব্ধি সম্ভব হয়। বাহ্য জগতে বিভিন্ন আকৃতির মধ্যে একক সত্তার উপলব্ধিই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। এখানে দৃশ্যমান জগতের সত্তাকে স্বীকার করা হলেও তা প্রকৃত ও বাস্তব সত্তা নয়, প্রকৃত ও বাস্তব অস্তিত্বশীল সত্তা একমাত্র আল্লাহ।

আধ্যাত্মিক বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় রুমী দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত ও বাস্তব সত্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং অন্য সবকিছু তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। নিজেকে প্রকাশ করার বাসনায় আল্লাহ কোন এক বিশেষ সময়ে জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করেন। এই জীবন শক্তির বিবর্তন হতে অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি হয়। বিশ্বজগতের সর্বত্র জীবনের চিহ্ন বর্তমান এবং বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক চেতনাময় পরমসত্তা রয়েছে। বিশ্বজগতের বিবর্তন এক পরমসত্তার আত্মপ্রকাশ, আর জীবনের বিবর্তন পরম উৎসে প্রত্যাবর্তন মাত্র। রুমীর বিবর্তনবাদে জড়ের মধ্যদিয়ে জীবনের বিবর্তন শুরু হয় এবং এটি অস্তিত্বের নিম্নতর অবস্থা হতে উচ্চতর অবস্থায় ক্রমশ উন্নীত হতে হতে বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাসম্পন্ন মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। মূলত উন্নত জীবনলাভের প্রয়াসে জীবন অস্তিত্বের এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল প্রেরণা

শক্তি হচ্ছে প্রেম। এই শক্তি মানুষকে মৃত্যুর মাধ্যমে ফেরেশতার স্তরে উন্নীত করে এবং সবশেষে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

আমি অজৈব জগৎ হতে মৃত্যুবরণ করে উদ্ভিদরূপে আত্মপ্রকাশ করি, তারপর উদ্ভিদ জীবন ত্যাগ করে একটি প্রাণী হিসেবে জন্মলাভ করি। প্রাণীজগৎ হতে মৃত্যুর পর আমি মানব জীবন লাভ করি। সুতরাং আর এক মৃত্যুর মাধ্যমে উন্নত স্তরের জীবন লাভে আমি ভয় পাব কেন? পরবর্তীতে আমি মানব জগৎ হতে বিদায় নিয়ে ফেরেশতাদের ন্যায় উন্নত ডানায়ুক্ত জীবে পরিণত হবো। পুনরায় আমার ফেরেশতা জীবন ত্যাগ করে আমি কল্পনাভীত একটি জীবে পরিণত হবো। অতঃপর ঐশী বাণী মতে ‘আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করি’- এই শব্দ উচ্চারিত হলে আমি অনন্তিত্বে পরিণত হবো।^{১৫}

রুমী মনে করেন একটি মহাশক্তি সব কিছুকে উর্ধ্বে টেনে তুলছে। খনিজ পাথর নিজের সত্তা বিলীয়ে দিয়ে মাটিতে পরিণত হচ্ছে, বিভিন্ন শস্য বা উদ্ভিদের বীজ মাটিতে রোপন করলে তা মাটি হতে রস আহরণ করে উদ্ভিদে পরিণত হচ্ছে। এভাবে মাটি, পানি, বীজ সবকিছুই আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য শস্য, সবজি, ফল ইত্যাদিতে পরিণত হচ্ছে এবং সেগুলো ভক্ষণের ফলে মানুষের মধ্যে রক্ত ও শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। সবকিছুই আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হচ্ছে। অনুরূপভাবে মানুষও মৃত্যুর মাধ্যমে উচ্চতর অবস্থা ফেরেশতার স্তরে উন্নীত হবে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে: “আমিই প্রকৃত মালিক থাকব দুনিয়ার ও দুনিয়াবাসীদের এবং তারা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।”^{১৬} অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান। তিনি শূন্য হতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং মৃত্যু বা ধ্বংসের মধ্যদিয়ে সবকিছু তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই স্থায়ী, অন্য সবকিছুর ধ্বংস অনিবার্য। ফলে এই ধ্বংসশীল বস্তুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অবিনশ্বর ও চিরঞ্জীব সত্তা এক আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আর এটিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

আল্লাহর সারধর্ম মানব জ্ঞানের অতীত হলেও সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অসীম গুণাবলীর কিস্তি প্রকাশ ঘটে। সৃষ্টিসমূহের মধ্যে উজ্জ্বল চন্দের ন্যায় তাঁর বিকাশ। অথচ মানুষ তা দেখতে পায় না। রুমী মনে করেন যারা সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে উপলব্ধি না হওয়ার কারণ। আত্মা রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহর নৈকট্য উপলব্ধি করা যায় না। প্রবৃত্তির আকর্ষণ হতে আত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র রেখে আল্লাহর ধ্যানে গভীরভাবে মত্ত থাকলে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর গুণাবলী অবলোকন করা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “যাহার কুলবের দরজা উন্মুক্ত, সে প্রত্যেকটি রেণুর মধ্যে প্রকৃত সূর্য (আল্লাহ্ তা’আলার অস্তিত্ব ও গুণাবলী) দেখতে পায়।”^{১৭} একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। কোন ব্যক্তি তার দুইটি আংগুলের অগ্রভাগ দুই চোখের উপর চেপে রাখলে কিছুই দেখতে পাবে না। এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর সকল বস্তু অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষণ করতে না পারার কারণ হচ্ছে আংগুল দুইটির অগ্রভাগ, যা দুই চোখের উপর চেপে রাখা হয়েছে। এই আংগুলের অগ্রভাগ দুইটি হচ্ছে তার অশুভ নফস, যার প্রাবল্যের কারণে সে আধ্যাত্মিক বস্তুর দর্শন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং সঠিক এবাদত, ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র ও নির্মল করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে ইহকালীন জীবনেই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগতের বস্তুর দর্শন লাভ সম্ভব হয় এবং পরমাত্মার জ্ঞান উপলব্ধির মাধ্যমে পরম আনন্দ উপভোগ করা যায়। তবে স্বীয় সত্তার অনুভূতি, ব্যক্তিত্ব ও নিজের গুণ গরিমা দাবী করার আমিতে বন্দী থাকলে তৌহীদের স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে প্রবলরূপে ধারণ করলে স্বীয় সত্তার অনুভূতি লোপ পায় এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হয়। অর্থাৎ এক আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু অবলুপ্ত হলে পবিত্র সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রুমী বলেন: “যখন তোমার (আমিত্বের) ভেঙ্কিবাজি ও ইন্দ্রজাল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন (তোমার

দৃষ্টিগোচর হইবে যে) স্বয়ং সে-ই পানি, সে-ই সাকী, সে-ই (পানকারী) মাতাল। (অর্থাৎ) তিন (সত্তা) একাকার হইয়া গিয়াছে।”^{১৮} প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা, জগতের যাবতীয় বস্তু তাঁরই অন্তর্গত। সুতরাং কঠোর সাধনার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ঘটায় নিজেকে ঐশী গুণে গুণান্বিত করতে সক্ষম হলে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করা যায় এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর মাঝে স্থায়ী সত্তাকে বিলীন করতে পারলেই তাঁর একত্ব অনুভব করা যায়। আল্লাহতে বিলীন হওয়ার অর্থ তাঁর প্রেমে মশগুল হয়ে ফানার পর্যায়ে উপনীত হওয়া। এ প্রসঙ্গে রুমী বলেন: “আল্লাহ্ পাকের একত্ব আমলে আনয়নের পছা কি? (শোন) নিজেকে এক (আল্লাহ) এর সমীপে জ্বালাইয়া দেওয়া (ফানা করা)।”^{১৯} নিজেকে আল্লাহয় ফানা করা সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়। ফানার মর্যাদায় উপনীত ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর মাঝে এমনভাবে বিলুপ্ত করেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর নিজ অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পারেন না। বিষয়টি রুমী আগুন ও লোহার উপমা দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। একটি লৌহ খণ্ড আগুনে লাল হয়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেকে আগুন বলে দাবী করে। আগুনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও বাহ্যিক দিক দিয়ে এই দাবী একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু লৌহ খণ্ডটি আগ্নিরূপ ধারণ করলেও সত্তার বিবেচনায় তা লোহা, আগুন নয়। অনুরূপভাবে ফানা অবস্থায় আশেক আল্লাহর সাথে একাত্মতা অনুভব করলে, এক আল্লাহর সত্তা ব্যতীত তাঁর দৃষ্টিতে অন্যকিছু থাকে না। এমনকি তাঁর নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানও থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নিজেকে আল্লাহর সাথে অভিন্ন দাবী করেন। আল্লাহর বিভায় তাঁর অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত হয় মাত্র। অর্থাৎ ফানার পর্যায়ে উপনীত ব্যক্তি সৃষ্টির সবকিছুর অন্তরালে একমাত্র আল্লাহর একত্ব অনুভব করে থাকেন।

সূফীরা দিব্যজ্ঞানের অধিকারী। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য সূফীকে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় এবং সহ্য করতে হয় অনেক দুঃখ-কষ্ট। দিব্যজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আত্মাকে আলমে গায়েবের দিকে ধাবিত করতে পারলে আধ্যাত্মিক সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। আলমে গায়েব হচ্ছে ‘আলমে আরওয়াহ’ বা ‘রুহের জগৎ’। এটি বস্তুবিহীন ও সীমারেখাহীন জগৎ, যা সর্ব প্রথম সত্তাপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর এটিকে প্রকাশের জন্য ‘আলমে শাহাদত’ তথা দর্শনযোগ্য জগতের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়, যা বস্তু ও সীমারেখাবিশিষ্ট জগৎ। এই দুটি জগৎ সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মাধ্যম হিসেবে ‘আলমে মেসাল’ তথা ‘আলমে বরযখ’ সৃষ্টি করা হলো, যা উভয় জগতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এই জগৎ সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু বস্তুবিশিষ্ট নয়। রুমী মনে করেন আলমে মেসাল আলমে গায়েবের তুলনায় এবং আলমে শাহাদত আলমে মেসালের তুলনায় সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণতার ফলে আলমে মেসাল ও আলমে শাহাদত মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। কেননা এই সীমিত ও সংকীর্ণ জগতে অবস্থানকালে মানুষ কোন বস্তু বা ঘটনার তাৎপর্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে বস্তু ও সীমারেখাবিশিষ্ট জগতের উর্ধ্বে তথা আলমে গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে আত্মার উপলব্ধি পূর্ণ থাকে, ফলে পূর্ণতা অর্জনের দুঃখ তার থাকে না। সুতরাং আল্লাহর একত্বের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য ইন্দিয়গ্রাহ্য জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আলমে গায়েবের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “বাহ্যইন্দিয়ের অপর পাড়ে তওহীদ (উপলব্ধির) জগৎ। যদি তোমার এক আল্লাহ্ পাকই উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ দিকে অগ্রসর হও।”^{২০} বাহ্য জগতের সৃষ্টবস্তুর সৌন্দর্য পরমুখাপেক্ষী ও অস্থায়ী, আর আল্লাহর সৌন্দর্য অমুখাপেক্ষী ও চিরস্থায়ী। তিনি বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। কাজেই বাহ্য জগতের বস্তুসমূহের আকর্ষণ অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা এক আল্লাহর জ্ঞান আশ্রয়ে মনোযোগী হতে হবে। তবে শুধু বুদ্ধি বা যুক্তি-তর্ক দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। আল্লাহর জ্ঞান লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পছা হচ্ছে তাঁর এবাদত বন্দেগী করা। সঠিক এবাদত ও কঠোর সাধনার দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ সম্ভব হলে অন্তরে মারফতের নূর অর্জিত হয়, তখন অভ্যন্তরীণ অনুভূতির দ্বারা তাঁর একত্ব অনুভব করা যায়।

মূল্যায়ন

সূফীদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন, ফলে পৃথক পৃথক মতবাদের উদ্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে রুমী ‘সর্বধরেশ্বরবাদ’ মতবাদ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা এবং অন্য সবকিছু তাঁরই সত্তার উপর নির্ভরশীল—এই অর্থে তাঁর মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। তবে রুমী আল্লাহকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রেমময় সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন আল্লাহর নিকট মানুষ প্রার্থনা করে এবং বিপদে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে জীবিকা দান করেন, সম্মান দান করেন এবং সৎ পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ তিনি জগতের অন্তর্ব্যাপী শক্তি মাত্র। কাজেই তাঁর মতবাদকে সাধারণ অর্থে অদ্বৈতবাদ বলা যায় না। তবে এ কথাও ঠিক যে, যৌক্তিক অদ্বৈতবাদী দর্শনের ব্যক্তিত্বহীন আল্লাহর ধারণার সাথে সূফীদের আল্লাহর ধারণা অভিন্ন নয়। ফলে রুমীর মতবাদকে সাধারণ অর্থে অদ্বৈতবাদ বলা না গেলেও ‘সর্বধরেশ্বরবাদ’ অর্থে ইসলামী অদ্বৈতবাদ বলতে কোন বাধা নেই। এছাড়াও রুমী মনে করেন আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দ্বারা নিজেকে ঐশীপুণ্যে গুণান্বিত করে আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনে সক্ষম হলে আশেক স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান হারিয়ে আল্লাহর সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। এই অবস্থাকে ‘ফানা’ বলে। ‘ফানা’ অবস্থায় আশেক আল্লাহ ও তাঁর নিজ অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পারেন না, তখন তাঁর সকল কথা ও কার্য আল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এরূপ অবস্থায় আশেককে আল্লাহর সাথে অভিন্ন ভাবা ঠিক নয়, বরং আল্লাহর বিভাতে তাঁর অস্তিত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় মাত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে আশেক এবং আল্লাহর মধ্যে এক ধরনের দ্বৈততা থাকে, যদিও এই দ্বৈত অবস্থাকে বর্ণনা করা যায় না। কাজেই এই অর্থে রুমীর মতবাদকে সূফী অদ্বৈতবাদ বলা যায়। কিন্তু ‘ফানা’ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ‘ফানা’র বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আশেক ‘বাকা’য় পৌঁছালে আল্লাহ ও তাঁর নিজ অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য পুনরায় উপলব্ধি করেন। এই বিবেচনায় তাঁর মতবাদকে সূফী অদ্বৈতবাদ বলা যায় না। তাছাড়া সর্বেশ্বরবাদ বা যৌক্তিক অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী সমস্ত অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মূলসত্তা একটি এবং বিশ্বজগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক অন্তর্ব্যাপী। এই মতানুযায়ী সবই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সব। এই মতের সমর্থক স্পিনোজা জগৎ ও ঈশ্বরকে এক ও অভিন্ন আখ্যা দিয়ে ‘এক’ ও ‘বহু’র উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার যে যৌক্তিক সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঈশ্বরের যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রুমীর আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের তেমন কোন মিল পাওয়া যায় না। কাজেই তাঁর মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বললে, রুমীর মতবাদকে কোনভাবেই অদ্বৈতবাদ বলা যায় না। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য দর্শনের যৌক্তিক অদ্বৈতবাদের সাথে সূফী অদ্বৈতবাদের কোন সামঞ্জস্য নেই। পাশ্চাত্যের অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ সৃষ্ট বস্তুর বাইরে স্রষ্টার সত্তাকে অস্বীকার করেন এবং জগতকে অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ প্রকাশ মনে করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপী সত্তা, যেখানে বস্তু নেই সেখানে তিনিও নেই। কিন্তু রুমী আল্লাহকে জগতের অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ই মনে করেন। আল্লাহ অসীম এবং জগৎ সসীম, ফলে সসীম প্রকৃতি তাঁর অসীম শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হতে পারে না। বিশ্বজগৎ আল্লাহর শক্তির কিঞ্চিৎ প্রকাশ মাত্র। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং পরেও চিরদিন থাকবেন। কিন্তু জগৎ পূর্বেও ছিল না, পরেও চিরদিন থাকবে না। অর্থাৎ একটি চিরস্থায়ী, অন্যটি ধ্বংসশীল। কাজেই আল্লাহ ও জগতকে অভিন্ন ভাবা ঠিক নয়। আবার বিখ্যাত সূফী ইবনুল আরাবীর ‘ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ’ মতবাদে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও, এটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। তিনি মনে করেন এই দৃশ্যমান জগতে অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্বে বস্তুসমূহ আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে ধারণা হিসেবে অস্তিত্বশীল ছিল। যদিও মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি সম্ভব হয় না। বাহ্য জগতে মূর্ত হওয়ার পূর্বে সে বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান হয় না। বাস্তব ও ধারণাগত উভয় প্রকার অস্তিত্বকে সমর্থন করে তিনি বিশ্বজগতকে নীত্য ও অনিত্য, অস্তিত্বশীল ও অনস্তিত্বশীল বলেছেন। তাঁর অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষে শক্তিশালী ভিত্তি থাকলেও

এখানে ধর্মীয় চেতনার ঐক্য ও দার্শনিক চেতনার ঐক্যের সংমিশ্রণ ঘটায় এটি একটি দুর্জয় মতবাদে পরিণত হয়েছে, যা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা বেশ কষ্টসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শ্রষ্টা এবং জগৎ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট, তাই সৃষ্ট বস্তু কখনোই শ্রষ্টার সাথে অভিন্ন হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ কেবলমাত্র জগতের মধ্যেই সমাহিত নন, জগতের বহিঃস্থ সত্তাও বটে। জগতের সকল বস্তুতে তাঁর উপস্থিতি বিদ্যমান। তিনিই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা, তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই— এই অর্থে রুমীর মতবাদকে সূফী অদ্বৈতবাদ বলা যায়।

উপসংহার

সূফী জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মরমি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আল্লাহর সাথে একাত্মতা অনুভব করা। এই সম্মিলনের মাধ্যমেই সূফী আল্লাহর প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে মহামিলনের আনন্দ উপভোগ করেন। রুমী দার্শনিক চিন্তার দ্বারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় বিষয়াদির অর্থ ও তাৎপর্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং অবভাসের পর্দা উন্মোচন করে প্রকৃত ও বাস্তব সত্তা এক আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নয়, বরং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা সত্তার উপর তিনি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি একত্বের ধারণা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যেখানে জীবনের সকল বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়েছে এবং সমস্ত বিরোধ অতিক্রান্ত হয়েছে এক সৃষ্টিশীল একত্ব দ্বারা। তাঁর অদ্বৈতবাদে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ ও উপলব্ধি করেন। এই মতবাদ এক ও বহুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং অসীম ও সসীমের মধ্যে মিলন ঘটায়। এখানে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার স্বীকৃতি থাকায় তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে না। সক্রিয় জীবন যাপনের মাধ্যমে সৎ গুণ অর্জন করে আত্মিক উন্নতির চরম পর্যায়ে আদর্শ মানবত্বের স্তরে পৌঁছে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠন করে পরম ব্যক্তিত্বশালী সত্তা আল্লাহর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে মানব জীবন সার্থক করাই রুমীর দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর অদ্বৈতবাদে শ্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তু উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও এক মহান শ্রষ্টার সত্তার কাছে বাহ্যিক সত্তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই এই মতবাদকে বিশুদ্ধ ইসলামী অদ্বৈতবাদ বলা যায়। সূফীবাদ যৌক্তিক মতবাদ নয়, ফলে পরমসত্তার অনুসন্ধান যুক্তি-তর্কের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ঐশী প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। গভীর প্রেমের দ্বারা হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হলে অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। কাজেই সব ধরনের বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রুমীর এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে এবং এটি সূফী দর্শনকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ Syedur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Forth Edition, (Dacca: Mullik Brothers, 1970), p. 220.
- ^২ R.A. Nicholson, *The Idea of Personality in Sufism*, (Lahore (Pakistan): Sh. Muhammad Ashraf, 1964), Preface.
- ^৩ কোরআন, ২৮ : ৮৮।
- ^৪ কোরআন, ৪ : ১২৬।
- ^৫ Dr. Khalifa Abdul Hakim, *The Metaphysics of Rumi*, Fourth Impression, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1965), P.142.

-
- ৬ Ibid, P.143.
- ৭ ডক্টর আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, তৃতীয় মুদ্রণ, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ১৭৯।
- ৮ A.E. Affifi, *The Mystical Philosophy of Muhyid Din-Ibnul Arabi*, Reprinted, (New York: AMS Press, 1974), P. 2-3.
- ৯ Syedur, *Culture and Philosophy*, p. 199.
- ১০ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.), *মসনবী*, গৃহীত: মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.), *মসনবীয়ে রুমী*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লি:, ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ-৬), পৃ. ৪৩।
- ১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
- ১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।
- ১৩ কোরআন, ৫৭ : ৩।
- ১৪ আব্দুল মজীদ, *মসনবীয়ে রুমী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২।
- ১৫ Rumi, *Mathnawi*, vol. III, p. 1-3,5,6 in Hakim, *Metaphysics*, p. 37.
- ১৬ কোরআন, ১৯ : ৪০।
- ১৭ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.), *মসনবী*, গৃহীত: মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.), *মসনবীয়ে রুমী*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লি:, ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ-৩), পৃ. ১১৯।
- ১৮ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.), *মসনবী*, গৃহীত: মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.), *মসনবীয়ে রুমী*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লি:, ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ-৩), পৃ. ১৩৩।
- ১৯ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.), *মসনবী*, গৃহীত: মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.), *মসনবীয়ে রুমী*, চতুর্থ খণ্ড, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লি:, ২০১০, পুনর্মুদ্রণ-৫), পৃ. ২১।
- ২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

শামসুর রাহমানের কবিতায় নগরভাবনা : প্রবণতা ও প্রান্ত

ড. সৈয়দ তৌফিক জুহুরী*

Abstract: Visionary poet Shamsur Rahman, was a resident of old Dhaka, as a result, city, and civic life have been able to see very clearly. So, his most dominant theme in poetry is urbanity. He was also interested in the contemporary various events, thus, the war of independence, struggle, and post-war context of Bangladesh has also got predominance in his poems. The various disorders, isolation, decay, and despair of the civic middle class have also been established in his poetry in a unique style. In this present article, we have tried to find out the authenticity of the poems written by Shamsur Rahman on the subject of urbanity.

কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)-এর কবিতায় নগরজীবন চিত্রায়নের প্রেক্ষণবিন্দুতে স্থান পেয়েছে স্মৃতি-আচ্ছন্ন কল্পনার তীব্র-এষণা, সময়শ্রোতের ঔজ্জ্বল্য ও প্রবল স্বদেশবোধ। এর সূচনা ঘটেছে দেশবিভাগ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে, এমন ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে, যার দেহকাঠামো ঠিক তখনও পরিপক্ব হয়ে ওঠেনি। এর ফলে নিয়তিবদ্ধ এবং ঘটনাগহ্বরে পতিত মানুষের জীবনধারা থেকে সম্মিত প্রসঙ্গ ও প্রাকরণিক চিহ্নই ক্রমে উপমায়িত-রঞ্জিত-সজ্জিত হয়েছে কবিতার শব্দমালায়। কারণ, ‘আমাদের জীবনের কেন্দ্র এখন সরে এসেছে শহরে। শহর এখন আমাদের জীবনকে রূপায়িত করে, ধ্বংস করে, পরিপূর্ণ করে। শহরের মধ্যে, শহরের প্রাণের মধ্যে আমরা বাঁচি।’^১ সুতরাং উনিশশো সাতচল্লিশ-পরবর্তী ঢাকা শহরের জীবনযাত্রা বাস্তবিকপক্ষে কর্ম-কোলাহলমুখর, বিষন্ন-সৌন্দর্যের আকরভূমি-যেখানে মানুষ অস্তিত্বসংকটগ্রস্থ। এর ফলে আশৈশব ঢাকায় বেড়ে ওঠা কবি গ্রাম-বর্জন করে শহরমুখী হওয়া মানুষের কথা যেমন জানেন, ঠিক তেমনই জানেন নাগরিক বিবর্ণতা-ক্ষয়-বক্ষ্যাত্ত্বের প্রতিচ্ছবির কথাও। কবির স্পন্দ্যমান চিত্ত সর্বদা ঢাকা শহরের বাস্তবলোকে অন্তর্লীন থাকে, যার ফলে সঙ্গতভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় কবির ব্যক্তিরূপ আবিষ্কৃত হয় জীবনযাপনের দৈনন্দিনতায়। তাছাড়া আধুনিক কবিতায় যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি বহমান রয়েছে তাতে নগরচেতনা প্রধান মৌলপ্রবণতা এবং ইন্দ্রিয়সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মানুষই এর মূখ্য-নিয়ামক। সুতরাং পাশ্চাত্যের তুলনায় বাংলা কবিতায় এই অনুষ্ণ অনেকটা আরোপিত মনে হতে পারে, তবে শামসুর রাহমান সময়প্রবাহকে যে মানসিক সংযুক্তি দ্বারা সম্পন্নতা দিয়েছেন তা বাস্তবেরই প্রতিষেধ। তাতে কল্পনা ও ইন্দ্রিয়চেতনার প্রাধান্য রয়েছে বটে, তবে সমাজ-সময়ের প্রতি নিষ্ঠাবোধে ব্যর্থতা-বিচ্ছিন্নতা ও সংকট নিরসনের প্রত্যয়ও দৃশ্যমান রয়েছে। কারণ কবি ঈশ্বরগুণের মাধ্যমে নাগরিক জীবনপটের এক বিশেষ রূপায়ন আমরা লক্ষ্য করি, যেখানে সাধারণ সার্বজনীন আবেগ-প্রক্রিয়ার সাথে প্রচ্ছন্নভাবে কবির মানসিক সময়ানুভূতির ঘনিষ্ঠ বন্ধন নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এতে বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকের কবিতায় সংযুক্ত নাগরজীবন সংশ্লিষ্ট মৌলঅভিজ্ঞতার আদিগুণতা দৃশ্যমান নয়। সুতরাং কবিতাসৃষ্টি এবং তাতে নাগরিক নান্দনিক ক্রিয়ার প্রকাশে এই ত্রিশ-চল্লিশের দশক গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন পথ অন্বেষণের প্রত্যয়েও দীপ্ত। সেক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকে হলেও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে। তবে তাঁর ক্ষেত্রে কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল বড়ো কথা নয়, কারণ কবি-পরিচয় তিনি ইতোপূর্বে পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা প্রতিকায় একাধিক কবিতার প্রকাশের মাধ্যমে। বাংলা কবিতার মূলশ্রোতে এই স্বাচ্ছন্দ্য বিহার ক্রমে সম্পন্ন হয়ে উঠেছে পরিপার্শ্বের সাথে মানসিক সংযুক্তির মাধ্যমে এবং নগরজীবনের প্রতি বীতস্পৃহ বিচ্ছিন্নতাসূচকতায়। কবি এ-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘হায়,

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সেই পল্টনের মাঠ, আমার বহু স্মৃতিবিজড়িত মাঠ আর নেই, যে-মাঠে কৈশোরে কখনো নিস্তেজ রোদে বসে কখনো বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলা দেখতাম চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে, যে পল্টনের মাঠে বসে অথবা দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আর মওলানা ভাসানীর দীপ্তিমান, উদাত্ত বক্তৃতা শুনতাম কখনো কখনো, আজ আর নেই। আজকাল পাছপথে, জিরো পয়েন্টে, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে, প্রেসক্লাবের সামনে বক্তৃতা দেন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।^২ আসলে সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় দুটি ধারা দৃশ্যমান হয়— একটি পাকিস্তানপন্থি ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী ধারা এবং অন্যটি হাজার বছরের বাঙালি জাতিসত্তার উৎস, প্রত্নরূপ ও সংস্কৃতি-অনুপ্রাণিত প্রগতিশীল আধুনিক ধারা। অবশ্য এই দুই চেতনার মর্মমূলেই রয়েছে সমকালীন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আত্মসংযোগ ও ব্যক্তিচেতনা, নগরচেতনা, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, রোমান্টিক অনুভূতি-লালিত শব্দমালার ব্যবহার। আর পঞ্চাশের দশকে এসে তার সাথে সৌন্দর্যবোধ স্বদেশভাবনা, নারীপ্রতিমা, নিসর্গচেতনা প্রভৃতি অনুষ্ণ রূপবদ্ধ হয়; এর ফলে বাংলা কবিতা বের হয়ে আসে বৃহৎ জীবনে— আত্মকেন্দ্রিকতা বিসর্জিত হয়। কারণ নগর-প্রতিবেশ দ্বারা অধিগত গ্রামীণ জীবনের একদিকে রয়েছে প্রকৃতিজ জীবনাক্ষর কৃষ্টি, মিথ, মোটিফ, নদী-নারী-প্রকৃতি ইত্যাদি, অন্যদিকে ঠিক তেমনই রয়েছে হতাশা, দুঃখবোধ, নিঃসঙ্গতা, অবিশ্বাস, যৌনতা ইত্যাদি। যদিও বাংলা কবিতায় গ্রামীণ জীবন ও দেশজতায় প্রত্যাবর্তনের এক প্রকারের প্রবণতা রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করা যায়, তথাপি নাগরিকবোধের উন্মেষ ও উদ্বোধনী হাওয়ায় তাঁর কবিতাপট পরিবর্তিত হতে থাকে। আর নগরজীবনের বিবমিষার প্রাবল্যে নাগরিক মানুষগুলো রবীন্দ্র-কবিতায় নিষ্ঠুর, কর্কশ এবং নির্দয় হয়ে গড়ে ওঠে। কারণ নাগরিক ব্যক্তিমাট্রই নগরায়ণের শর্তে নিজস্ববৃত্তে বসবাস করেন, এ-যেন নগরায়ণের নিয়তি। আসলে ‘আধুনিক মানুষের নিয়তির আরেক নাম নগর; এ তার স্বেচ্ছানির্বাসনের স্থান; এ স্থান থেকে পলায়ন অসম্ভব, কেননা গ্রামীণ জীবনের সারল্য আজ অপসৃত; ফ্রমনগরায়ণ গ্রাস করেছে সমগ্র দেশ। অবশ্য এর আগে ফরাসি কবিতায়, বোদলেয়ার থেকে লাফর্গে, নগরের তুমুল উত্থান ঘটেছে ভালবাসায়, বেদনায়।’^৩ সুতরাং যে-অর্থে কোনো কবি নাগরিক চেতনার ধারক হয়ে ওঠেন, সে-অর্থে রবীন্দ্র-কাব্যালোক বিকশিত হয়নি। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি-কৃষি-বাণিজ্য-কারুণ্য ও শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছে প্রাণস্পন্দন। কাজী নজরুল ইসলাম যদিও প্রেম-প্রকৃতি-মানবতা ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সুরে ঝংকত হয়েছেন, তথাপি নাগরিকবোধে জারিত হননি। সেনাবাহিনীর বাঙালি-পল্টন থেকে ফিরে ১৯২১ সালে কলকাতায় বসবাস-সূত্রেও নাগরিক-অনুষ্ণ ব্যবহারের আত্মহ তেমন একটা দেখা যায়নি। এই দুই কবির জীবনগতির ছন্দে রোমান্টিক-প্রবলতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে এলিয়টের *ওয়েস্টল্যান্ড* কিংবা শার্ল বোদলেয়ারের *ফ্রেডজ কুসুম* কাব্যের প্রকৃতিজ জীবন হারিয়ে নাগরিক-নিসর্গে নিমজ্জিত হবার প্রত্যয় চিত্রিত হয়নি। এক্ষেত্রে ত্রিশের কবিতায় কৃত্রিম জীবনচিত্রের উদ্দীপকরূপে নগরায়ণ, বৃক্ষহীন প্রকৃতি, ক্রুদ্ধ-ক্লান্তি-বিচ্ছিন্নতা জর্জরিত জীবন হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়স্পর্শী। তাছাড়া নাগরিক মানুষ তো অস্তিত্ব-পরিচয়ের সংকটে আক্রান্ত, কারণ তা বিচত্র শ্রেণী-পেশা-জাতির মানুষের স্বভাবপ্রবণতার সংমিশ্র-আধার। সেহেতু রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতায় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের চিত্রলতা থাকলেও তা গ্রামীণ কবিতা নয়, আধুনিক নগর-মানুষের পরিভ্রমণ প্রবণতার পরিচয়বাহী।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাই আলো-আঁধারির ছায়াকায়ায় হেঁটেছেন, সঙ্গে থেকেছে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতে দেখার ভাবুক মন। অবচেতন স্তরে ঢেলে দেয়া বিচিত্র রেখাভঙ্গিতে ‘কি এক ইশারা যেন মনে রেখে’^৪ কবি হাঁটতে থাকেন ‘একা একা শহরের পথ থেকে পথে’^৫। তারপর যেন ক্ষণকাল থেমে দম নিয়ে বলেন ‘অনেক হেঁটেছি আমি’^৬ এবং বলেন ‘অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে’^৭। এরপর যা ঘটে তা কৌতুকদৃষ্টিতে ঘেরা। যার মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয় ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জানা এক নির্লিপ্ত-নিরপেক্ষ পরিব্রাজকের জীবনকথন। অর্থাৎ *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের ‘পথ হাঁটা’ কবিতায় এভাবে বিষ-প্রতিবিম্ব ‘একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা’^৮ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে হয়ে ওঠে যান্ত্রিক। এভাবে মানুষের অসহায়ত্বকে

কবিতায় নির্দেশের স্বর ও সুর আয়ত্ত্ব করেন বুদ্ধদেব বসুও, কলকাতার পাশাপাশি স্থান পায় ঢাকা শহরও। আর চল্লিশের দশকে নগরজীবনের অনুষ্ণের সাথে যুক্ত হয় সামাজিক দায়, এই মিথস্ক্রিয়া দেখা দেয় সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) প্রমুখের কবিতায়। অবশ্য সময় এখানে অনুঘটক, সুতরাং এই পর্বের কবিদের অবলম্বনে রয়েছে ব্যক্তিসত্তা, মানবতা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা, প্রেম-যৌবন-প্রকৃতি প্রভৃতি। একদিকে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতার বিপরীতে রোমান্টিক-প্রতিরোধ ও দ্রোহ, অন্যদিকে নগর-প্রতিবেশে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যাপিত-জীবন। আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে ঐকাত্ম্য স্থাপনের মাধ্যমে নান্দনিক গোষ্ঠীবদ্ধতা ও রাজনৈতি-সাংস্কৃতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অভিনব কাব্যপ্রত্যয় নির্মাণের প্রচেষ্টা। এভাবে ক্রমে সাতচল্লিশের দেশবিভাগ এবং পঞ্চাশের দশকে এসে পাকিস্তানি উপনিবেশ বলয়ের প্রভাবে বিষয়ভাবনার নবায়নকরণ ঘটে। আর ‘বহিলোকের নানা কৌণিক সংঘাতশীল সম্পর্কে আবদ্ধ কখনো রুদ্র, কখনো-বা বেদনাসক্ত নাগরিককবির ভাষা নিজেকে বাজায় করে জনপদের সামাজিক ভাষাস্বরে, একই সঙ্গে প্রাতিজনিক শব্দসত্তায়। বাংলা কবিতায় সমাজবাদ ও অন্তর্লৌকী মন্যবাদ-দুই-ই সমান্তরাল, কখনো একে অন্যের প্রতিস্পর্ষী। এক্ষেত্রে জীবনোৎকর্ষ ও শিল্পবুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন কাব্যভাষা তৈরির প্রয়াস রয়েছে হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আজীজুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখের মননশীল কবিতাকর্মে।^৯ ঢাকাকেন্দ্রিক এই কাব্য-সাহিত্যচর্চার আয়োজনে শামসুর রাহমান কবিতার চিত্রময়তাকে আরও বর্ণগভীর করে তোলেন, যা তুলনা ও শব্দানুষ্ণেও অভিনব। কথাকে চিত্ররূপ দেবার এই দক্ষতা তাঁর সহজাত, ব্যক্তিক অনুভব সেখানে উদ্দীপক। নগরজীবনের বর্ণনায় কবিতা তাই নান্দনিকতা হারায় না, তা রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহুবচিত্র অধঃক্ষেপে হয় জারিত। এর ফলে ঢাকা নগরকেন্দ্রিক যাপিত জীবন ও মধ্যবিত্ত চৈতন্য-বলয় ঘিরে বেড়ে ওঠা এই কবিচৈতন্য একদিকে যেমন হয়ে ওঠে বাস্তবতার ধারক, অন্যদিকে ঠিক তেমনই হয় স্বদেশ-সমকালের সঙ্গে ইতিহাসগতভাবে সংযুক্ত। ক্রমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট এবং সংকট থেকে সৃজনশীলতায় উত্তরণের পথপরিক্রমায় যে নগরমনস্কতার সূচনা ঘটে, সেই প্রেক্ষাপটে কবি শামসুর রাহমান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তার অন্যতম ধারক ও নিরন্তর সাধক হিসেবে।

স্বভাবে রোমান্টিক কল্পনাদর্শের কবি শামসুর রাহমান বাস্তবের সাথে প্রতীতি নির্মাণ করেছেন, যার ফলে ‘এ শহর’ কবিতায় শহরের বর্ণনা সীমাবদ্ধ বৃত্তে আবর্তিত নয়। সুতরাং কবির দৃষ্টিতে শহরের মানুষগুলো ‘তালিমারা জামা পরে নগ্ন পায়ে হাঁটে’ কিংবা ‘খোঁড়ায় ভীষণ’, আবার ‘রেস খেলে’, ‘তাড়ি গেলে হাঁড়ি হাঁড়ি’ প্রভৃতি সক্রিয় কর্মপন্থায়। এই জীবন বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে নেতিবাদী জীবন ভাবনায় হতাশ কবি বলেন, ‘ছায়ার গহবরে পা মেলে রগড় করে/ আত্মার উকুন বাছে, ঝাড়ে ছারপোকা’^{১০}। মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ বৃত্তে বন্দী থেকেও ঢাকার ‘আত্মার উকুন’ প্রত্যক্ষ করেন অবলীলায়, যেখানে অনুভবগুলো অশ্রুসিক্ত, বেদনাকাতর, দুঃখপূর্ণ। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় স্বভাবে অর্ন্তমুখী ও মৃদু হাস্যে উজ্জ্বল কবি রিক্ত-নিঃস্ব-বঞ্চিত শহরের চিত্রপট আঁকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. জীবনপ্রবাহ প্রসঙ্গে :

এ শহর জৈষ্ঠ্যে পুড়ে এবং শ্রাবণে ভিজে টানে
ঠেলাগাড়ি, রাত্রি এলে শরীরকে উৎসব করার
বাসনায় জ্বলে সাত তাড়াতাড়ি যায় বেশ্যালেয়ে।^{১১}

খ. চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে:

এ শহর সাদা হাসপাতালের ওয়ার্ডে কেবলি

এপাশ ওপাশ করে, এ শহর সিফিলিসে ভোগে^{১২}

গ. সাধারণ মানুষ প্রসঙ্গে:

এ শহর বেজায় প্রলাপ বকে, আওড়ায় শ্লোক,

গলা ছেড়ে গান গায়, ক্ষিপ্ত কারখানায়

ঝরায় মাথার ঘাম পায়ে।^{১৩}

এভাবে বাস্তব শহরের দৃশ্যপট কবিতার শব্দরূপে সঞ্চারণ করেছে স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, শেষপর্যন্ত কবিতার সমাপ্তি ঘটেছে অনুভূতি ও চিত্রময়তার সংযোগ ঘটিয়ে। এর ফলে যেন সমস্ত শহরটিই ‘লড়াই করে’ এক ‘বহুরূপী নেকড়ের সাথে’^{১৪}, যার আবরণ উন্মোচনে কবি প্রবলভাবে সচেতন ও প্রত্যয়দীপ্ত। তাছাড়া পুরোনো ঢাকায় বিদ্যুতের অনুপস্থিতি ও এক বাতিঅলার বাতি জ্বালানোর প্রসঙ্গে কবি একস্থানে জানিয়েছেন, ‘প্রায় রোজ সন্ধ্যে হবার আগে মনে পড়ে, সেই বাতিঅলার পথ চেয়ে থাকতাম তার বাতি জ্বালানোর খেলা দেখার জন্য। যদিও কোনও কারণে সে অনুপস্থিত থাকত, আমাদের গলির কপালে একরত্তি আলোও জ্বুত না।’^{১৫} তবে এ-বর্ণনা সেকলে ঢাকার, তবে সাধারণ উপমার অবয়বে তা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাঞ্জল এবং সুদৃঢ়। ‘আমার জন্মশহর, স্মৃতির শহর’ স্মৃতিকথায় কবি এ-প্রসঙ্গে বলেন:

ঢাকার চেহারা অনেকখানি পাল্টে গেছে। তবে পুরোনো ঢাকা, কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও, আগেকার মতোই আছে। কোনো কোনো মহল্লায় হাইরাইজ দালান হয়েছে বটে, তবে পুরোনো ঢাকার দৈন্য ঘোচেনি; বড় বড় বটগাছ নেই, আস্তাবল নেই, ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ে না বললেই চলে। আছে বাকরখানির হতশ্রী দোকান, তেহারির দোকান, অনুজ্জল চা-খানা। আবেদ কিংবা পিধুর পাউরুটির দোকানের মতো কোনো দোকান, আছে কিছু হাল আমলের কনফেকশনারি। মনে পড়ে, আমার ছেলেবেলায় কুলফি বিক্রি হতো বিকেলে আর সন্ধ্যাবেলা। একজন ঢ্যাঙা লোক মাথায় জলভর্তি কুলফি নিয়ে আসত আমাদের গলিতে। সেই লোকটির ‘চা-ই কুলফি বরফ’ আওয়াজ শুনলেই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠত।^{১৬}

প্রত্যক্ষ জগত থেকে মানুষের জীবনচক্র আবিষ্কার-লক্ষ্যে বাকরখানীর দোকান, তেহারির দোকান, চা-খানা, কুলফি বিক্রেতা ইত্যাদি অনুষ্ঙ্গ তুলে আনেন। এভাবে শহরের সঙ্গে মানব-জীবনপ্রবাহের সংযোগ স্থাপনের বিস্ময়কর ক্ষমতা ছড়িয়ে রয়েছে পঙ্ক্তিতে-পঙ্ক্তিতে। আবার স্মৃতির ধূসরপট থেকে ধ্বংসের কিনারে বসে (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থের ‘পুরোনো শহর’ কবিতায় তিনি জানিয়েছেন এক রুগ্ণ বালকের চোখে বিচিত্র আল্পনা ঐকে’ দেয়া ‘পুরোনো শহর’র কথা, যেখানে তিনি বহুদিন হলো যাননি। এই রুগ্ণ বালকটি কী কবি নিজেই? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় পুরোনো শহরের সাথে প্রাণচক্রের সূত্র নির্মাণের মাধ্যমে। কবির পীড়িত মনোবিশ্ব ঘিরে ‘পুরোনো গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে/শৈশব অভিমানে মুখ ভার করে থাকে’^{১৭}, আর এক মায়াময় স্মৃতিকার্যামো জুড়ে ‘বাতিঅলা দেয় হাতছানি, চলে যায় গায়ে বিষণ্ণতা মেখে’^{১৮}, তারপর ‘মধ্যরাত্রে আর্ত কণ্ঠে ডেকে যায় কৈশোর, যৌবন’^{১৯}। এভাবে সৃষ্টি করেন মনোলোকে বিম্বিত এক শহর-প্রতিবেশ, যেখানে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন ব্যথিত, আর্ত, বিস্ময়-বিস্বলবোধে জারিত সত্তায়। রঙ-রূপ-দৃশ্যপটে দেখা দেয় প্রগাঢ় তিমির-গভীরতা, তাই তো ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নৈঃসঙ্গ্যপট বেদনাবহ নিয়তির দিকে টেনে নেয়। সঙ্গতভাবেই সৈয়দ শামসুল হক একস্থানে জানিয়েছেন তাঁর ধারণার কথা, ‘শামসুর রাহমানের ‘নাগরিকত্ব’ এবং জসীম উদ্দীনের ‘পল্লীত্ব’— এ দুইই প্রমাণ বহন করে— আমাদের সমালোচকদের তো বটেই— সৃষ্টিশীল কবি সাহিত্যিক অনেকেই কিংবা তৎকালীন প্রধানদেরই— ইয়োরোপ-দাস্যতা ও আধুনিকতা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধারণার। বস্তুত, কবিতায় শামসুর রাহমান কী ও কতটা করেছেন, তা যেমন বাংলাদেশ নামে ভূখণ্ডের সমাজ ও রাজনীতির পটভূমিতে দেখতে হবে, তেমনি ইংরেজ শাসনের শতাব্দীগুলো নির্ণয় করে নিয়েই বিচারে নামতে হবে। সাহিত্য শুধু সুকুমার নির্মাণ নয়; সমষ্টির ও ব্যক্তির ভেতরে বিম্বিত ও ক্রিয়াশীল কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র, দেশ, সংস্কৃতি ও সময়েরই অনুভব ও অভিজ্ঞতার বয়ানই

হচ্ছে সাহিত্য।^{২০} অন্যদিকে পৃথিবীতটে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার সাথে সমাজ-রাষ্ট্র, দেশ, সংস্কৃতি এবং সময়ের অনুভব ও অভিজ্ঞতার সংযোগসূত্র থাকে। ‘স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে’ কবিতায় যে স্বর্গচিত্র বর্ণনা করেছেন কবি, সেখানে ‘বজ্রা ছড়ান ধরতাই বুলি’ এবং ‘রাজায়-রাজায় বাধে লড়াই’, এর ফলে স্বপ্ন-আশা-বাসনা বিনষ্ট হয় নশ্বর সময়ের ধূসরপটে। কিন্তু ঢাকা যে কবির মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র, তা ‘স্বর্গ তো নয়, আমার শহর/ দেখতে পেলাম চর্মচোখে’ পঙ্ক্তিতে প্রকাশিত হয়, কারণ শহর তো স্বর্গ নয়, তবে এই শহরেই বসবাস করেন তিনি। তাই তো এই কবিতায় সময় ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশের চিরাচরিত রূপকল্প হিসেবে যুক্ত হয়েছে ‘কফির গন্ধ’, ‘আঁধারের ফুটপাথ’, ‘কুষ্ঠরোগী’, ‘টোস্ট’, ‘কামের জ্বর’ ইত্যাদি শহরকেন্দ্রিক শব্দপ্রতিমা। তাছাড়া ‘স্তবকে-স্তবকে কবিতাটিতে আসে প্রতিবেশের চিত্রাবলী: কেউ মন্ত্রী হচ্ছে, বিখ্যাত হচ্ছে কেউ, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চলছে ফকনার-কামু-সার্জ বিষয়ক বিতর্ক, অন্ধ রাতে সঙ্গমমত্ত হচ্ছে ভিখারিণী আর কুষ্ঠরোগী, ড্রয়িংরুমে রবি ঠাকুর পিকাসো হানা দিচ্ছে, সব মিলে কবিতাটিতে পাওয়া যায় ঢাকাকেই। বিদ্রূপ-বালসিত বা প্রতিবেশ-নিয়ন্ত্রিত কবিতায়ই নয় শুধু, স্বপ্নসৌন্দর্যপ্রলুব্ধ কবিতায়ও শামসুর রাহমান খচিত করে দেন প্রতিবেশকে, কখনো ভেঙেচুরে কখনো পূর্ণাবয়বে।^{২১} এভাবে ‘স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে’ কবিতায় ‘ঢাকা’ নামক কথিত স্বর্গে দর্শকরূপী শামসুর রাহমান দৃষ্টিবিন্দুতে রোম্যান্টিকতার সাথে মননশীলতার সংযোগ ঘটিয়েছেন। তবে এই মননস্পর্শ আমরা দেখি হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাতেও, যদিও তিনি প্রধানত বিশাল জনপদের জীবনচেতনার আখ্যান ও সংগ্রামে চিত্র আঁকেন, তথাপি ‘নীড়-সর্বস্ব এক মানবী’ হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতেও ভাষাকে করেন আবেগদীপ্ত। যেই মানবীর অন্তস্তলে বহমান থাকে শহর-সংসার-সন্তান, বিশাল জনপদের জীবনচেতনাপটে এ-এক ক্ষুদ্র বিন্দু হলেও তা অবশ্যই জীবনোৎকর্ষ ও শিল্পবুদ্ধির সংযোগে ঘটমান এক নতুন কাব্যভাষা। স্বর্গরূপী ঢাকা যেমন শামসুর রাহমানের আশ্রয় এবং শিল্পকে জীবনান্বিত করার প্রচেষ্টার ভিন্ন মাত্রা, ঠিক একইভাবে ‘ভালোবাসার বাইরে’ কবিতাটিও পৌঁছে গেছে জীবনচেতনার অধিস্তরে। কবির উক্তি লক্ষ্য করি :

আমার অস্তিত্বের সীমা
নীড়-সর্বস্ব এক মানবীর সমান। বাইরে বেরিয়ে
কখন-ফিরি-র আইটাই আমার জীবনের ধুকপুক।
একজন বসে থাকে ঐ আমার শিকড়।
এতেই আমার ভাতকাপড়, দালানকোঠা, প্লেনে ওড়া,
পথঘাট। এতেই আমার অনুকম্প, এতেই আমার
সংগ্রাম। এতেই আমার সন্তান-সন্ততি, এর ওর জন্যে
কিছু রেখে যাওয়া।^{২২}

আবার ‘স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে’ কবিতাটি ‘ভালোবাসার বাইরে’ কবিতার মতো কেবল এক নীড়সর্বস্ব জীবনকে ধারণ করে না, ঢাকাকে কেন্দ্র করে মৌলবাদের উত্থানকেও চিহ্নিত করে। বিদ্রুত নীলিমা (১৯৬৭) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত এই চেতনা কবির উক্তিতেও উজ্জ্বল ছড়িয়েছে এভাবে :

মোল্লা-পুরুত এখনও রটায়
স্বর্গলোকের বিজ্ঞাপন।
ইনা মুনি তার নকশা আঁকেন,
ব্যাখা করেন বিজ্ঞজন ॥ ২৩

কিংবা ‘বামনের দেশে’ কবিতায় বুদ্ধি ও আবেগের আলোয় চিত্রিত হয় শহরের বামনস্বরূপ :

এ শহরের চতুর্দিকে ভিড়, চতুর্দিকে
বামনেরা জটলা পাকায়
এবং চাঁদরের নখ উপড়ে আনবে ভেবে তারা
গুটিয়ে জোব্বার হাতা এলাহী রগড় করে শেষে
থুতু ছুড়ে দেয়
আকাশের মুখে।^{২৪}

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-অর্জন বাঙালির জীবন থেকে শাসনের উদ্যত মারনাত্মক সরিয়ে নিলে সেখানে জমা হয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। নগরের বাসিন্দা হওয়ায় নাগরিক উচ্চকোলাহল, সমষ্টিলোকের শক্তিকল্প সম্পর্কে কবির জ্ঞান সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবহমান হয়। এর ফলে ঢাকাকেন্দ্রিক দৃষ্টিকটু মৌলবাদী উত্থান কবিকে নিরবলম্ব করে। তাই তো একস্থানে ভবিষ্যতের ঢাকা নিয়ে, স্মৃতিকাতর কবি উদাসী মনে প্রত্যয়ী উচ্চারণ করেন, ‘আমার প্রিয় শহর, জন্মশহর ঢাকা যেন কখনো পরজীবী, ক্ষমতালিপ্সু ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদীদের খপ্পরে না পড়ে। আমি চাই ঢাকা হোক আমার সুন্দর, স্বপ্নের শহর, মুক্তিচিন্তার শহর, শিল্প-সংস্কৃতির অব্যাহত বিকাশের শহর, সৃজনশীল, প্রগতিশীল মানুষের শহর।’^{২৫} তবে নশ্রভাবে বিনত এই কবি শেষতক নির্ভর ও নিশ্চিত হতে পারেননি, কারণ মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতা তাঁকেও তো ত্রুদ্ব করে তোলে, যখন ঘটে মৌলবাদীদের উত্থান। পত্রিকায়, গদ্যে ও কবিতায় যেমন মানুষকে সচেতন করেন প্রতিনিয়ত, ঠিক তেমনই বক্তৃত দিয়ে, রাজপথে নেমেও চলমান থাকেন প্রগতিপথে। তবে কবিতাই তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, সেজন্য প্রতিবাদের ভাষাকেও কবিতাগত করেন, উজ্জ্বল উপমা ও বিচিত্র অনুঘদে। এতে নাগরিক-বিকাশের সামাজিক দায়কেও এড়িয়ে যাওয়া কবির পক্ষে সম্ভব হয় না। ‘যখন অনেকেই মৌলবাদের বিরুদ্ধে দু’একটি বিবৃতি দিচ্ছেন কালেভদ্রে, বাকি সময় চুপ করে আছেন, অথবা মৃদু তিরস্কার করছেন মৌলবাদীদের, তখন শামসুর রাহমান জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। কবিতায় যখন যুদ্ধ বিস্তৃত হয় তখন এতটা বৈচিত্র্য থাকে না প্রকাশে, আমাদের মনে হতে পারে তিনি আবেগকে সামনে রাখতে চাইছেন না। সামাজিক বিষয়গুলি যখন আবেগের সঙ্গে প্রকাশিত হয়, তখন কবিতার শিল্প সবটা সামাল দিতে পারে না।’^{২৬} এভাবে কবিতা-হাতুড়ির আঘাতে জীবন-জড়তাকে ভেঙ্গেছেন কবি এবং পরবর্তীকালে এসব ঘটনাবলীতে আরও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা অন্যত্র দেখি, কবিত্বশক্তির যোজনায় ও স্থির অভিনিবেশে নগরের পতন-পচনকে আরও অধিক চিত্রিত করতে গিয়ে ‘বহিমান এক শহর’-এর চিত্র আঁকেন কবি, যেখানে কবির মাথাই যেন সেই শহর। বস্তুগ্রাহ্য দৃশ্যজগত হতে কবির মস্তকের অন্তরালিস্থ ‘এক শহর’ আরও অধিক স্বস্থ। সেখানে মানুষ বেঁচে আছে ‘বিজ্ঞাপন’, ‘রেডিওর গান’, ‘ভিথিরির চ্যাঁচামেচি’, ‘বেশ্যার বেহায়া অনুরাগ’ ইত্যাদি অনুঘদের আনুরাগে। রৌদ্র করোটিতে কাব্যগ্রন্থের ‘স্বগতভাষণ’ কবিতার এই অনুরণিত জীবনধারা আরও প্রস্ফুটিত হয়ে ধরা দেয় ‘মূতেরা’ কবিতায়। অর্থাৎ বন্দি শিবির থেকে কাব্যগ্রন্থের ‘মূতেরা’ কবিতায় প্রাসঙ্গিক দেশকাল দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে সময়-ইতিহাসের প্রশ্নে কবির অবস্থান হয় স্বস্থ। কবি যখন বলেন, ‘খাকির ছাউনি শহরের মোড়ে মোড়ে, / মৃত্যু চালায় সুনিপুণ হারপুন’^{২৭}, তখন ভাষাপ্রবাহে এক অতলান্ত-অনুভবকে ধারণ করা সম্ভব হয়। যে সক্রিয় পরিমণ্ডল-প্রতিবেশ এখানে সৃজিত হয়, তাতে ঘটে শোষণধর্মী রাষ্ট্রনীতির নগ্নরূপের উদ্ঘাটন। কারণ কবি বলেন, ‘ভীষণ ভাসছি ঘাতক চেউয়ের তোড়ে / কে জানে/ কখন বয়ে যাবে কার খুন’^{২৮} অর্থাৎ, এখানে মানবিক পরিবেশ সত্যরূপ প্রাণ পেয়েছে। এই বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকায় বসবাসরত কবির অনুভূতি নিম্নরূপ :

আমাদের বন্দিদশার ঢাকাকে আমার প্রায়ই মনে হতো কাম্যুর গ্লোব উপন্যাসের ওরান শহরের মতো।
যেন গ্লোব উপন্যাসের ওরান শহরের মতো। যেন গ্লোবের বীজাণু ছড়িয়ে পড়েছে ঢাকার অলিতে-
গলিতে। শহরটি চতুর্দিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—বেরোনোর কোনো পথ নেই। আমরা অনেকেই

তখন সেই ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঢাকা ছেড়ে গেলাম না বলে পাগলের মতো
চুল ছিঁড়েছি। দেরি হয়ে গেছে, বড় দেরি হয়ে গেছে। বেরোনোর পথ নেই আর।^{২৯}

আধুনিক শহরে ধস নেমেছে নৈতিকতায়, তাই তো দুর্নীতি-অনিয়মে, ঘুষখোর-মুনাফাখোরের গোপন কৌশলে, চোর-বাটপার-বখাটেদের উৎপাতে নাগরিকজীবন নিঃসহায়। কবি নগরজীবনের এই অশুভরূপটিও প্রভাসিত করেছেন কবিতায়। শহরে বিচিত্র শ্রেণি ও পেশার মানুষের বসবাস, যাদের অন্তরে নীতিবোধ রয়েছে, অথচ নৈতিক-প্রতিরোধে তারা দুর্বল। অন্যদিকে, নাগরিক ব্যক্তিচেতনাও একাকিত্বে, পাপবোধে, নিঃসঙ্গতায় নিঃসহায় এবং পরাধীনতায় কাতর ও বিচিহ্ন। *দুঃসময়ের মুখোমুখি* (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের ‘আক্রান্ত হয়ে’ কবিতায় সবুজাভ-জীবনচ্যুত তরুণের দল কীভাবে বিভ্রান্তির জটিল পাকৈ আবর্তিত হয় তার চিত্র এঁকেছেন। এতে বখাটেদের উৎপাত বাড়ে, তবে সংকট সত্ত্বেও কবি আপন অস্তিত্বের অণুপরমাণুতে ঘটান চেতনার জারণ-বিজারণ। ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে শোনাতে চান জীবনপাঠ, প্রকৃতিপাঠ, ইতিহাসপাঠ, সময়-সমাজ-সংস্কৃতিপাঠ, নিঃসহায় হয়েও দুঃসময়কে প্রতিরোধ করতে চান প্রবল শক্তিতে। জীবনপাঠ থেকে চর্চিত হয় ‘বুকে শ্যামলিমা শৈশবের নেবুতলা,/ নানা রঙের প্রজাপতি,/ হৈ হৈ মেলা’^{৩০}; প্রকৃতিপাঠ থেকে চর্চিত হয় ‘পাখির পেলব বাসা’, ‘শ্যাবণ-সন্ধ্যায় ভেজা করুণ শহর’^{৩১}; ইতিহাসপাঠ ঘটে উনিশ শো বয়াল্লিশ,/ তেতাল্লিশ,/ দুর্ভিক্ষের ছায়া’^{৩২} ইত্যাদি কবিতাংশের মাধ্যমে। কবি একস্থানে ‘হিরোশিমা’র নিদারণ লণ্ড-ভণ্ড ল্যান্ডস্কেপ,/ দ্বিখণ্ডিত বঙ্গ,/সংখ্যাহীন উদ্বাস্তর মুখ’^{৩৩} প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, ক্রন্দ-কদর্যতার মুখে শ্যামল-চেতন্যের আলোকরেখাবাহী অনুভূতি-পৃথিবীকেও উপস্থাপন করেন। শুধু তা-ই নয়, কবিতার সূচনায় বখাটে যুবকের দল রিভলবার বের করে কীভাবে তাদের অন্তর্গতেরা উন্মোচন করে, সে-সম্পর্কেও আমাদেরকে জানিয়েছেন :

‘কী আছে তোমার কাছে? বের করো চটপট’ বলে

ক’জন উঠতি গুপ্ত রাখলো রিভলবার বুকের ওপর^{৩৪}

কিন্তু কবি যখন সমস্যার মূলে প্রবেশ করেন এবং যুবকদের জীবনযন্ত্রণার পটরেখা করেন উন্মোচন, জটগুলো করেন চিহ্নিত- তখন তাদের মানসিক অসুস্থতা আরও প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়। শেষপর্যন্ত তারা কবির মুখে ‘থুতু’ ছিটিয়ে পালিয়ে যায় :

হঠাৎ ছিটিয়ে থুতু আমার একান্ত নির্বিকার মুখে ওরা

ধাঁ করে উধাও হলো বাঁ-বাঁ ঝোঁয়া ছেড়ে কালো জিপে।

আমার ভেতরে কিছু শব্দাবলি ম্যাজেশিয়ানের

তাসের মতন নেচে নেচে

কেবলি কবিতা হতে চায়। সটান নির্ভীক হেঁটে চলি পথ^{৩৫}

কবিতার ‘সটান নির্ভীক হেঁটে চলি পথ’-কবিতাংশে একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় দেখা যায়, যা সংকটের সমাধান ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছে। দেশ-কাল-সময়-সমাজের প্রেক্ষাপটে যাচাই করছে নগরকে, যে বিবেক-দর্শন প্রধানত একজন নাগরিক কবির অর্ন্তরূপ। তিনি এখানে আত্মতদন্তের মাধ্যমে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সাথে বোধ-বুদ্ধি-ব্যোধি মিশ্রণ ঘটিয়ে যেমন পথদ্রষ্ট যুবকদের পঙ্কিলতাকে অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনই তাদের শ্যাঠ্য-লাম্পট্য-জৈবিকতার ভেতর থেকে নিকৃষ্ট মানুষের চেতনার অপ্রচল রূপটিও উন্মোচন করেছেন- যা বিস্ময়করভাবে মানবিক ও মমত্বপূর্ণ। অর্থাৎ একদিকে এই জীবনচ্যুত তরুণ-যুবকদের দলটি যেমন কবির দৃষ্টিতে ‘ডালকুত্তা’, অন্যদিকে তাদের মনুষ্যত্বের কথা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও এড়িয়ে যান না। ‘চোরকুঠির বাসিন্দা’ কবিতায় মানবিক দিকটি আবিষ্কার হয় ভিসুয়ালাইজেশন-ধর্মী অভিঘাতে :

তীক্ষ্ণ ছোঁরা তার বড় শোনিতপিপাসু আর তার
 পিস্তল ধোঁয়ায় ঘনঘন।
 অথচ আবার সে-ও টববন্দি রজনীগন্ধার
 চোখে রাখে চোখ,
 কুকুর ছানার মুখে দেয় পেতে সুখে
 দুধের পান্ডর। ৩৬

সুতরাং, ‘নগরচেতনা’ শব্দটির অর্থ পাঁচ-তারকা হোটেল নয়, কিংবা সুসজ্জিত জীবনকে কবিতায় উপস্থাপন-প্রতিভা নয়। তা আসলে, নাগরিক অগ্নিদাহকে ধারণের বাস্তবমুখী প্রচেষ্টা, যেখানে নাগরিক উপকরণেরও অধিক প্রয়োজন নাগরিক মানসতার। যা উপর্যুক্ত কবিতার শাব্দিক নিরীক্ষায় এবং ‘টববন্দি রজনীগন্ধার’ চোখে চোখ রাখার মধ্য দিয়ে কবিচিন্তের স্বতঃস্ফূর্ত-স্পন্দনে চিত্রিত হয়েছে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা বোদলেয়ার-এর কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়, যখন তিনি আধুনিক শহরকে কবিতায় ধারণ করেন, অথচ তা অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন। টি এস এলিয়টও শহরকে ঐক্যেছেন শোকের বেদিমূলে শতছিন্নরূপে, তা বিষন্ন-বিচ্ছিন্ন, গোধূলিলিপ্ত, কালিমাখা ও অপরিচ্ছন্ন। সেই শহরে নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজপথের দিকে জানালা দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে নগরবাসী; অর্থাৎ, একঅর্থে গোধূলিছায়ায় লুপ্তচেতন এক রোগী যেন শূয়ে আছে শল্যবিদের টেবিলে। এ-কারণে তুমি নিঃশ্বাস তুমিই হৃৎস্পন্দন (১৯৯৬) কাব্যগ্রন্থের ‘তোমাকে ঘিরে আমার কোনো সাধ’ কবিতায় শহর ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে আগ্রহী কবি বলেন, ‘সম্রাসীদের বেলাগাম দাপট,/ ফাঁপা রাজনীতির করুণ পরিণতি/ আমাকে খুব ক্লান্ত করে,/ তখন ইচ্ছে হয়,/ তোমাকে নিয়ে চলে যাই আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে’ ৩৭। এইসমস্ত বাস্তবতা থেকে কবি যেমন নির্যাস গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনই জীবনের অন্ধ দুর্বিপাককেও চিত্রিত করেছেন। আর যেহেতু আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য সময়-সচেতনতা, সেহেতু পুরানো ঢাকা এবং তার বিবর্তশীল পটপ্রবাহ ও ক্রমে নতুন ঢাকার জন্মকথাও স্থান পেয়েছে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার প্রেক্ষণবিন্দুতে, কবিতায়। চিরায়ত, মৌলিক, মানবিক বিষয়সমূহ শব্দানুষঙ্গে ও প্রতীকে আবৃত হয়েছে অবিরত। আসলে ‘ঢাকা শহরের বিবর্তনের সাক্ষী তিনি; তাঁর মননের পরিবর্তনে আসে এই শহরের নানা বিপর্যয়, দুর্যোগ, চঞ্চলতা, উত্থান-পতন, অস্থিরতা, দু-দুটো স্বাধীনতার বাস্তবতা ও রূপক, এবং সর্বোপরি পুরোনো শহরের ব্যাখ্যার-অতীত রহস্যময় গন্ধ, যা শিল্পিত এবং বিশিষ্ট চিত্রকল্প হয়ে ধরা দেয় তাঁরই চোখে; যেখানে আমরা দ্বিতীয় অনুভূতির অভাবে কখনোই পৌঁছুতে পারিনি।’ ৩৮ আবার ‘রিরংসা’, ‘মিথ্যাচার’ ইত্যাদি অনুঘদ ‘সে আসুক’ কবিতায় নাগরিক জীবনের অন্ধকারপট উন্মোচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ নাগরিক মানুষ যেমন আত্মবিরুদ্ধ-আত্মবিচ্ছিন্ন, ঠিক তেমনই নৈঃসঙ্গকাতর এবং বিপন্নচিত্ত। তাই অন্ধকারে নিমজ্জিত কবির মনোভুবনে উচ্চারিত হয় :

কী করে বাঁচবে কেউ এভাবে এখানে,
 যেখানে মেধার দ্যুতি নেই, গুমরানি আছে, গান নেই; দশদিকে
 মুখের প্রলাপ শুধু, অবলুপ্ত জ্ঞানের প্রলেপ?
 যে শতকে ঘরে ঘরে রিরংসার নৃত্য অবিরাম,
 আস্তে হাত থেকে খসে যায়
 স্নিগ্ধতার উৎফুল্ল মুকুল,
 চোর ডাকাতের সঙ্গে এক দাড়িতেই ফাঁসি দেয় মহত্বকে
 অত্যন্ত কর্কশ দস্যু এবং সত্যের গলা বরাবর চেপে ধরে কদাকার হাতে

মিথ্যাচার। ৬

উপর্যুক্ত একান্ত অনুভবগুলো একদিকে যেমন অশ্রুসিক্ত, অন্যদিকে ঠিক তেমনই বেদনাস্পৃষ্ট। তাই তো যন্ত্রণাতীক্ষ প্রশ্ন, ‘কী করে বাঁচবে কেউ এভাবে এখানে (?)’, কারণ এই শহরে ‘মেধার দ্যুতি নেই’, মানুষের কণ্ঠে ‘গান নেই’- যা আছে তা কেবলই ‘মুখের প্রলাপ’, ‘অবলুপ্ত জ্ঞানের প্রলেপ’, আর দুঃখ-যাতনার ‘গুমরানি’। নর-নারীর মানবিক সম্পর্কে দেখা দিয়েছে ভাঙন, ‘ঘরে ঘরে রিরংসার নৃত্য অবিরাম’, তাই তো ‘ভালোবাসা দরজার বাইরে দাঁড়ানো’ রয়েছে। সুতরাং, এই শহর ‘চোর ডাকাতির সঙ্গে এক দাড়িতেই ফাঁসি দেয় মহত্বকে’, ‘সত্যের গলা বরাবর চেপে ধরে কদাকার হাতে’, পদে-পদে করে ‘মিথ্যাচার’। যদিও কবির জীবনপ্রবাহ বেদনাস্পৃষ্ট, তথাপি কণ্ঠে শুনতে পাই আত্মপ্রত্যয়। কারণ সমস্ত কবিতাই তিনি রচনা করেছে রিক্ত-নিঃস-বঞ্চিত নাগরিক জীবনযাপনের অন্ধকারপট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে। একজন সমালোচক তাঁর সমাজবদলের চেতনাময় নাগরিকবোধ সম্পর্কে জানিয়েছেন, ‘His most dominant theme, however, is urbanity. The atmosphere is urban, mind is urban, style and idiom are urban. Rural atmosphere is rarely met but wildlife is present in all its richness variety. The city he celebrates with its disorderly life around, a vertiginous city with its parks and stables, beggars and squalor. However, his themes and ideas have such a wide diversity that it will be difficult to pigeonhole them.’^{৪০} অর্থাৎ এভাবে নাগরিক জীবনযাপনের আড়ালে বহুমান রিক্ত-নিঃস-বঞ্চিত সময়শ্রোতকে অনুভবে-অভিজ্ঞানে ধারণ করেছেন, গড়ে তুলেছেন এক রহস্যময় সম্পর্কসূত্র। এই প্রচেষ্টা তাঁর কবিতার নান্দনিক সংবেদনকেও গড়ে তুলেছে এক অনন্য প্রতিভা-বিভায়। এর ফলে প্রয়োজনে পুরনো ঢাকার লোকমুখে ব্যবহৃত শব্দও সঞ্চিত হয়েছে কবিতায়, প্রতীক-চিত্রকল্প-ধ্বনিব্যঞ্জনার বিন্যাসে ক্রমে তা নাগরিক জীবনের অন্ধকার ছায়া-কাষাকে করেছে উন্মোচন। দৃষ্টান্তটি নিম্নরূপ :

হালায় আজকা নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপট্রির খান্‌কি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতে তামাম গতরে। পাও দুইটা কেমন
আলগা আলগা লগে, গাঢ়া আবরের সুনসান
আন্দরমহলে হাঁটে। মগর জমিনে বান্ধা পাও
আবে, কোন্‌ মাম্‌দির পো সামনে খাড়ায়? যা কিনার,
দেহস্‌ না হপায় রাস্তায় আমি নামছি, লৌড় দে;
না অইলে হোগায় লাখ্‌খি খাবি, চটকানা গালে।^{৪১}

উদ্ধৃত “এই মাতোয়ালা রাইত” কবিতার ‘হালায় আজকা নেশা করছি বহুত’-পঙ্‌ক্তিটি ঢাকা শহরের নেশাশ্রু মানুষের মনোজগতের এক অন্তঃপীড়িত ও দক্ষীভূত স্বভাবকে চিত্রিত করে। ঢাকাই কথ্যরীতি অনুসরণ করে রচিত এই কবিতায় নাগরিক নান্দনিক আইডিয়া জীবন-সংলগ্ন হয়, এর ফলে আবেগ-প্রাবল্য দৃষ্টি-শ্রুতি-স্মরণ ইন্দ্রিয় ঘিরে সঞ্চারিত হয়। আর এই সঞ্চারণ বাস্তব প্রেক্ষাপট দ্বারা নিবিড়ভাবে বিজড়িত, যার ফলে কবিতাংশের সাথে কবিতাংশের সংযোগসূত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াটি প্রাত্যহিক জীবনের গতিময়তায় স্পন্দিত হতে থাকে। কবি বুদ্ধদেব বসুও পুরোনো ঢাকার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, ‘আমার কানে অর্গ্যান আর বেহালার বাজনা, আমার নাকে বিড়ির ধোঁয়ার ঘন গন্ধ- যার উৎস আমার চার-আনা-মহলের প্রতিবেশীরা, ঢাকার চলতি ভাষায় যাদের বলা হয় ‘কুট্রি’-গাড়োয়ান, ফেরিওলা, বাকরখানিওলা, রাজমিস্ত্রি, এমনি সব।

তারা ইংরেজি অক্ষর চেনে না, জানে না কোথায় আফ্রিকা বা আমেরিকা, কিন্তু সবচেয়ে সহৃদয় আর সরব দর্শক তারাই-ঠিক বুঝে নেয় কোথায় কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে; সারাক্ষণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় ফিল্মেও লোকগুলোর দিকে, সময় বুঝে ‘আবে!মার্দিস!’ বলে চেষ্টা করে ওঠে...।’^{৪২} এভাবে নাগরিক জীবন নিষ্ফল-তারুণ্যে ও ক্ষয়িত পরিবেশে জর্জরিত। চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মড়ক-মহামারীর জীবাণু, নেশার করাল থাবা ডেকে আনছে নিরর্থক-মৃত্যু। জীবনের এরূপ মর্মান্তিক বস্তু-অভিজ্ঞতাকে কোনো কবিই পারেন না অস্বীকার করতে; তাই তো গুনি হৃদয়ের ধ্বনি (২০০১) কাব্যগ্রন্থের ‘পথ জাগে’ কবিতায় নিজেকে কল্পনা করেন জুয়াড়ি চরিত্রে, আর কবিতা-পঙ্ক্তিতে ঘোষণা করেন, ‘নিজের জীবন নিয়ে মেতেছি জুয়াড়ি বারবার;/ খোলামকুচির মতো দিনগুলি কীভাবে উড়িয়ে দিয়েছি, পইনি টের।/ আজ বসে আছি সহায়সম্মলহীন শ্রান্ত পথিকের মতো/ ভীষণ একাকী’^{৪৩}। সুতরাং নাগরিক জীবনে কোনো স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া অসম্ভব, কারণ এই নগর শোণিত-রক্ত-ঘামের বিনিময়ে মানুষের খাবার জোগায়, বেদনাঘন বিষণ্ণ সলিলে মানুষকে স্নান করায়। তাই তো ইতিহাস-সময়-ঐতিহ্যপটে চলমান বিপুল জীবন-শ্রোতস্বিনী থেকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো দৈনন্দিন অনুভব থেকে, কখনো ব্যক্তিত্বের অভিঘাতে, আবার নৈরাশ্যে বিপন্ন হয়ে, কবিতায় স্বাধীন-সুস্থ-স্বাভাবিক-প্রাণময় নাগরিক জীবনের স্বপ্ন-প্রত্যয় আঁকেন শামসুর রাহমান। নাগরিক জীবনের সাম্প্রতিকতাকে যেমন পরিণত করেন কবিতার অনুষঙ্গে, ঠিক তেমনই জীবনের অসঙ্গতিও তাকে আলোড়িত করে প্রবলভাবে। জীবনের স্বতন্ত্র প্রত্যাশা, ইতিহাসজ্ঞান ও বস্তুবিশ্বের প্রতিবেশচিত্তায় উদ্ভাসিত হয় নবকিরণ রূপসৌন্দর্য।

এভাবে নাগরিক জীবনের বিচিত্র প্রবণতা ধ্বনি-বর্ণ-শব্দে ও রঙ-রেখা-রূপ নির্মাণের ক্যানভাসপটে উন্মোচিত করেছে জীবনাভিজ্ঞতার নিত্য নতুন প্রান্ত। এর ফলে বস্তুমুখী চেতনার ধারক বিশ্বকবি, পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার শব্দানুশঙ্গ, মানবজীবনের নৈরাশ্যসূচক অভিরুচি, আন্দোলন-রক্তপাত-মৃত্যু, লোভ-ক্ষয়-পতন ইত্যাদি ঘিরে গড়ে উঠেছে এক প্রাণময় পটভূমি। যার ফলে কাব্যলোক যেমন পেয়েছে ক্রমবিস্তৃতি, ঠিক তেমনই জীবনের বিপর্যস্ত পটভূমিতে, শোষণের ক্ষয়বিস্তার বক্ষতটে, উদার মানবতাবাদী শব্দরূপ ও হৃদয়বেগের প্রাধান্যে সৃজিত হয়েছে আবেগ-আলোড়িত কবিতামালা। একদিকে মানবিক মূল্যবোধ, আর অন্যদিকে সামাজিক উত্তরণ-এই দুই মননপ্রয়ত্তে গড়ে উঠেছে শামসুর রাহমানের কবিতাচৈতন্য। সমাজ-সময়-ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রবাহের অনুকূলে কবিতায় নাগরিক অনুষঙ্গ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন। আর পাঠকের সাথে এই-সমস্ত বিচিত্র অনুষঙ্গ ও কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করেছেন সাবলীল শব্দরাজি। কখনো দুর্বোধ্য-অপরিচিত নগর-অনুষঙ্গ প্রকাশে ডুব দিয়েছেন সহজবোধ্য বাণীবিন্যাসে, আবার কখনো শব্দের জটিল সমাবেশে কবিতাপঙ্ক্তি পেয়েছে বিশেষ নান্দনিক বাতাবরণ। এভাবে দৈনন্দিনতা ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দীপ্ত নানামাত্রিক অনুষঙ্গে, কবিতার কলাকৌশলে তাঁর শিল্প-আত্মা পেয়েছে এক ব্যপ্ত নতুনত্ব ও চিন্ময় মুখশ্রী।

- ১ দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* (কলকাতা : নাভানা, ১৯৫৯) পৃ. ১৩৭
- ২ শামসুর রাহমান, 'আমার জন্মশহর, স্মৃতির শহর', *আমার ঢাকা* (প্রথমা : ঢাকা, ২০১৮) পৃ. ১৭
- ৩ খোন্দকার আশরাফ হোসেন, 'কবিতার শহর, কবিতার ঢাকা', *কবিতার অন্তর্যামী: আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : নান্দনিক, ২০১০) পৃ. ৭৫
- ৪ জীবনানন্দ দাশ, "পথ হাঁটা", 'বনলতা সেন', *জীবনানন্দ দাশের কবিতা : মূলানুগ পাঠ* (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৫) পৃ. ১০০
- ৫ তদেব
- ৬ তদেব
- ৭ তদেব
- ৮ তদেব
- ৯ বেগম আকতার কামাল, *শতাব্দী সন্ধির কবিতা : দিশা বিদিশা* (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০২০) পৃ. ৬৯
- ১০ শামসুর রাহমান, "এ শহর", 'নিজ বাসভূমে', *কবিতাসমগ্র-১* (ঢাকা : অনন্যা, ২য়. মু., ২০০৮) পৃ. ৩১৪
- ১১ তদেব, পৃ. ৩১৫
- ১২ তদেব
- ১৩ তদেব, পৃ. ৩১৪
- ১৪ তদেব, পৃ. ৩১৫
- ১৫ শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০০৪) পৃ. ১৭
- ১৬ শামসুর রাহমান, 'আমার জন্মশহর, স্মৃতির শহর', *আমার ঢাকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
- ১৭ শামসুর রাহমান, "পুরানো শহর", 'ধ্বংসের কিনারে বসে', *কবিতাসমগ্র-২* (ঢাকা : অনন্যা, ৩য়. মু., ২০১৪) পৃ. ৬৪৫-৬৪৬
- ১৮ তদেব, পৃ. ৬৪৬
- ১৯ তদেব
- ২০ সৈয়দ শামসুল হক, 'আমাদের মাহান সতীর্থ শামসুর রাহমান', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ* (শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০) পৃ. ১৮
- ২১ হুমায়ুন আজাদ, 'দু-চোখে দুর্গম শিখর : সমকালের সভাকবি', *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২য় সং., ১৯৯৬) পৃ. ৬৮
- ২২ হাসান হাফিজুর রহমান, 'ভালোবাসার বাইরে', *কাব্যসমগ্র* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০১) পৃ. ৩৩১
- ২৩ শামসুর রাহমান, "স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে", 'বিধ্বস্ত নীলিমা', *কবিতাসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪
- ২৪ শামসুর রাহমান, 'বামনের দেশে', *কবিতাসমগ্র-১*, 'বিধ্বস্ত নীলিমা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
- ২৫ শামসুর রাহমান, 'আমার জন্মশহর, স্মৃতির শহর', *আমার ঢাকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
- ২৬ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'পুনর্নির্মাণের আয়োজন : শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক কবিতা', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, (শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
- ২৭ শামসুর রাহমান, "মৃতেরা", 'বন্দি শিবির থেকে', *কবিতাসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০
- ২৮ তদেব
- ২৯ শামসুর রাহমান, 'যখন ভেঙে গেল কাঁটাতারের বেড়া', *আমার ঢাকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫
- ৩০ শামসুর রাহমান, "সাঁকো", 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', *কবিতাসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
- ৩১ তদেব
- ৩২ তদেব

-
- ৩৩ তদেব, পৃ. ৮৬
- ৩৪ শামসুর রাহমান, “আক্রান্ত হয়ে”, ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, একাদশ মু., ২০১৮) পৃ. ১১১
- ৩৫ তদেব
- ৩৬ শামসুর রাহমান, “চোরকুঠরির বাসিন্দা”, ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’, কবিতাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০
- ৩৭ শামসুর রাহমান, “তোমাকে ঘিরে আমার কোনো সাধ”, ‘তুমি নিঃশ্বাস তুমিই হৃৎস্পন্দন’, কবিতাসমগ্র-৩ (ঢাকা : অনন্যা, ৩য়. মু., ২০১৩) পৃ. ৭০২
- ৩৮ সিকদার আমিনুল হক, ‘শামসুর রাহমানের কবিতা’, শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ, (শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
- ৩৯ শামসুর রাহমান, “সে আসুক”, ‘সে এক পরবাসে’, কবিতাসমগ্র-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৭
- ৪০ Zakeria Shirazi, ‘Commemorating poet Shamsur Rahman’, শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ (প্রত্যয় জসীম সম্পা.) (ঢাকা : বাধন পাবলিকেশন্স, ২০০৯) পৃ. ২৩
- ৪১ শামসুর রাহমান, “এই মাতোয়ালা রাইত”, ‘এক ফোঁটা কেমন অনল’, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮
- ৪২ বুদ্ধদেব বসু, আমার ছেলেবেলা (কলকাতা : এম.সি.সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লি., ১৯৭৩) পৃ. ৮৯
- ৪৩ শামসুর রাহমান, “পথ জাগে”, ‘শুনি হৃদয়ের ধ্বনি’, কবিতাসমগ্র-৪ (ঢাকা : অনন্যা, ২য়. মু., ২০১৪) পৃ. ৪৩৪

প্রবোধকুমার সান্যালের হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্য

ড. পুরনজিত মহালদার*

Abstract: “The Kallol” (1923) was published in the 3rd decade of the last century. When the transference of Bangla Literature is introduced on the basis of the publication of “The Kallol”, Probodh Kumar Sannyal (1905-1983) experiences his debut as a fiction writer. Bohemian Probodh Kumar Sannyal obtains the seat of dignity as a travel writer in his contemporary age. Most of his writings are based on the story of walking journeys of the people. Travel fictions on the Himalayans are the best by him. However, along with how the journey fictions on the Himalayans comprise the walking journey of the polygonal realities of Indian socio-economic lives, artistic proprietorship is also illustrated in the article.

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-বিষয়ক কথা-নির্মাণে প্রবোধকুমার সান্যাল অগ্রগণ্য। যৌবন-জীবনের প্রথমভাগ থেকে শুরু করে প্রায় শেষাবধি (১৯২৩-১৯৭৯) অভিযাত্রিক প্রবোধকুমার ভারতের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণের তীব্র আকর্ষণে ছোট্টাছুটি করেছেন-তীব্র আগ্রহে ঘুরেছেন ভারতবর্ষের আঙিনা পেরিয়ে বহির্বিশ্বে। চলিষ্ণুতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন জীবনার্থ। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচিত সাহিত্যের বেশিরভাগ অংশ অবিচল ছুটে চলার বৈচিত্র্যকাহিনিতে ভরপুর। প্রবোধকুমার সান্যাল হিমালয়কেন্দ্রিক, হিমালয়-বহির্ভূত এবং বহির্ভারতীয় ভ্রমণ-সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু হিমালয়কে আবর্তন করেই রচনা করেছেন সিংহভাগ ভ্রমণকথা।

ভারতের উত্তরপ্রান্তে চিরসমুজ্জ্বল দেবতাত্মা হিমালয়ের শির সমুন্নত হয়ে আছে যুগ-যুগান্তর। চির উন্নত এই নগাধিরাজ হিমালয়ের আঙ্গানে ছুটে আসে পর্যটক-শিল্পী-সাধক। নানা শ্রেণি-পেশা-বর্ণ-গোত্রের মানুষের পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে আছে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। না জানাকে জানার আগ্রহ থেকে প্রায় দুর্গম হিমালয় জয়ের আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য পর্যটকের জীবনে নিয়ে এসেছে নতুন প্রেরণা, নতুন মাত্রা। অজানা পথ, দুর্লভ-শিখর, অন্ধকারময় গুহা, বিপদাচ্ছন্ন বনাঞ্চল, প্রাণসংশয়ী তুষারপাত সবই গৌণ প্রতিভাত হয়েছে হিমালয়-ভ্রমণের দুর্নিবার আকর্ষণে।^১ হিমালয়কে অন্তরে লালন করার এই বাসনাকথা উৎকীর্ণ হয়ে আছে সাহিত্যকথায়।

কেবল যে বাংলা সাহিত্যে তা নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সম্পদ দিনে দিনে পূর্ণতা পেয়েছে হিমালয়কে কেন্দ্র করে। হিমালয়কেন্দ্রিক এই সাহিত্যধারায় প্রবোধকুমার সান্যাল অনন্য। বোহেমিয়ান-যাযাবর প্রকৃতির সাহিত্যিক প্রবোধকুমার বার বার আকৃষ্ট হয়েছেন হিমালয়ের আকর্ষণে। ব্যক্তিজীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি পার করেছেন সুবিস্তৃত হিমালয়ের কোলে। তারই সূত্র ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার। সেই অসামান্য অভিজ্ঞতাজাত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত হয়েছে তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য। বিশেষ করে তাঁর হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যে।

প্রবোধকুমার সান্যাল হিমালয়কে কেন্দ্র করে লিখেছেন বেশকিছু গ্রন্থ। শুধু হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে *পাঞ্জাব সীমান্তের পথে* (১৩৩৯ব.), *মহাপ্রস্থানের পথে* (১৩৪০ব.), *দেবতাত্মা হিমালয়*, ১ম খণ্ড (১৩৬২ব.), *দেবতাত্মা হিমালয়*, ২য় খণ্ড (১৩৬৩ব.), *উত্তর হিমালয় চরিত* (১৩৭২ব.) এবং *গঙ্গোপথে*

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গঙ্গোত্রী (১৩৭৬ব.)। এছাড়া হিমালয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া লেখা গ্রন্থের মধ্যে আছে দেশ-দেশান্তর (১৩৪২ব.), ইতস্ততঃ (১৩৪৭ব.), ভ্রমণ ও কাহিনী (১৩৫০ব.), পায়ের দাগ (১৩৬৭ব.), ভ্রমণকাহিনী (১৩৭৭ব.)। হিমালয় ভ্রমণ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক পরিপূর্ণ ভ্রমণ-সাহিত্যের মধ্যে অরণ্যপথ (১৩৪৫ব.), নিত্যপথের যাত্রী (১৩৬৯ব.), দক্ষিণ ভারতের আঙিনায় (১৩৯১ব.) উল্লেখযোগ্য। আর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আংশিক ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে দেশ-দেশান্তর (১৩৪২ব.), পায়ের দাগ (১৩৬৭ব.), রত্নদ্বীপ শ্রীলঙ্কা (১৩৭৮ব.) বিদ্যমান। সেইসাথে রয়েছে তাঁর ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করে বহির্ভারতীয় ভ্রমণ-গ্রন্থ। তন্মধ্যে রাশিয়ার ডায়েরি (১৩৬৯ব.), পর্যটকের পত্র (১৩৮৪ব.) উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধকুমার সান্যাল বা অন্যান্য লেখকদের হিমালয়কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার পূর্বেও অন্যান্য ভাষায় বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষায় হিমালয়ের বিচিত্র রূপ অঙ্কিত হয়েছে। ঋক্বেদে সংহিতা অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন বিশ্বদেবতাগণের মধ্যে পর্বতরাজিকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যজ্ঞাদি সম্পন্ন করতে আহ্বান করা হতো পর্বতকে। ঋক্বেদে সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখি:

উষাসানজ বৃহতী সুপেশনা দ্যাবাক্ষমী বরুনো মিত্রো অর্ণমা
উদ্রংহবে মরুতে পর্বতা অপ আদিত্যান্দাবা পৃথিবী অপঃ সঃ॥^২

অথর্ববেদে সংহিতায় হিমালয়কে কল্যাণের কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃত শান্তি ত্রিযাদিতে নদী থেকে আনা জলকে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা শুদ্ধ কল্পনা করা হয়। হিমালয় থেকে আসা জল সুখের প্রতীক হয়ে উঠুক-তাই অথর্ববেদে সংহিতায় উল্লেখ আছে এভাবে:

শংতে আপো হৈমবতীঃ শমুতে সন্ত্যৎসাঃ।
শংতে মনিষাদা আপঃ শমুতে সন্ত্যবর্ষাঃ॥^৩

হিমালয়কে আবার সর্ব দেবতাদের সাধনা করার উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট জায়গা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের উর্বরভূমিরূপে আমরা হিমালয়কেই দেখতে পাই। ভারতবর্ষের সকল কল্যাণের মহাদেবতা দেবাদিদেব শিব পর্বতেই বাস করেন-হিমালয়েই তাঁর অধিষ্ঠান। তাই শ্বেতাস্থতর উপনিষদ-এ দেবাদিদেবকে উদ্দেশ্য করে তাঁর মঙ্গলময়, পুণ্য মূর্তি দিয়ে সকলকে কল্যাণের পথে ধাবিত করার প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে।^৪ শুধু শিব নন, পার্বতী যে কৃষ্ণামূর্তি ধারণ করে কালিকা নামে হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন তা মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে। এছাড়া হিমালয়কে পবিত্রজ্ঞানে তুল্য করে বরুণদেব যে নন্দাদেবীর পূজা করেছিলেন তার উল্লেখ আছে দেবীপুরাণ-এ। বাল্মীকির রামায়ণ-এ রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের সাথে নৌকায় গঙ্গা পারের সময় সরযু ও গঙ্গা সঙ্গমের কাছাকাছি জলরাশির তীব্র আওয়াজের কারণে জানতে চেয়েছিলেন তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা নির্মিত কৈলাস পর্বতে মানস সরোবরের উল্লেখ করেন। মূলত বিশ্বামিত্র কর্তৃক এই মানস সরোবরের বর্ণনা দেবতাত্মা হিমালয়কেই নির্দেশ করে। বিশ্বামিত্র রামকে বলেন:

কৈলাস পর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ॥^৫

মহাভারত-এর বনপর্বের উনচল্লিশ সংখ্যক অধ্যায়ে পাণ্ডবদের কৈলাসপর্বতের দিকে যাত্রা, বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে মন্দার-পর্বত যাত্রা, তিতাল্লিশ অধ্যায়ে গন্ধমাদন-পর্বতে গমন এবং পয়তাল্লিশতম অধ্যায়ে বদরিকাশ্রম দর্শনের কথা উল্লেখ আছে। উপর্যুক্ত স্থানগুলোকে মূলত তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য দিয়েই বর্ণিত। কারণ মহাভারত-এ ‘তীর্থযাত্রাপর্বাদ্যায় সম্পূর্ণ’^৬ যে অধ্যাত্ম জীবনভাবনা যুগ যুগ ধরে ভারতীয়

সমাজব্যবস্থার অদ্বিতীয় দর্শন ও পালনীয় পন্থা, সেই জীবন ব্যবস্থার অন্যতম ক্ষেত্র হিমালয়। সাহিত্যের উপলব্ধিতে হিমালয় সেই অসীম জীবনের তাৎপর্যই বহন করেছে।

মহাকবি কালিদাস ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তি। তিনি তাঁর *কুমারসম্ভবম্* কাব্যে উমার জন্মশীর্ষক প্রথম সর্গে প্রথম শ্লোক থেকে সতের শ্লোক অবধি শুধু হিমালয়ের বর্ণনাতেই ব্যাপ্ত থেকেছেন। প্রথম শ্লোকেই এক রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করে তিনি বলেন:

অন্ত্যন্তরসাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তেয়নিধিঃ বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইবমানদণ্ডঃ॥^৭

উপর্যুক্ত শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করে মুরারি মোহন সেন বলেন, ‘উত্তরদিকে হিমালয় পর্বতের স্থিতি; এই হিমালয় দেবতার প্রকৃতি সম্পন্ন। হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে—যেন পৃথিবীর বিস্তার নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড।’^৮ কালিদাস *মেঘদূতম্* কাব্যে রামগিরি থেকে কৈলাসশিখরী অলকার দীর্ঘপথের অতুলনীয় সৌন্দর্য বর্ণনায় বলেছেন:

এই কৈলাসের কোলেই অলকা। তুমি কামচারী, ইচ্ছামত যেখানে খুশি যেতে পারো—অলকা দেখে চিনতে পারবে না এমন নয়। অলকার পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে; তোমার মনে হবে কোন নায়িকা তার প্রণয়ীর কোলে শুয়ে আছে, তার সূক্ষ্মবস্ত্র বিশ্রুত হয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে কৈলাসের প্রাসাদগুলিতে মেঘ জমে—মেঘ থেকে বৃদ্ধদসহ বারিধারা ঝরে পড়ে। তোমার মনে হবে যেন কোন নায়িকার মুক্তাজাল খচিত অলকদাম।^৯

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও আজ অবধি হিমালয়ের বৈচিত্র্য নানাভাবে অঙ্কিত। মহাকবি কালিদাস প্রভাবিত হলেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে হিমালয়ের রূপ বর্ণনার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে হিমালয় সম্পর্কে বলেছেন:

অখিল পর্বত গুরু মধ্য আরোপিলা মেরু
মন্দার—প্রমুখ গিরিচয়
গন্ধমাদন মাল্যবান নীল শ্বেত শৃঙ্গবান
হেম হেমকূট হিমালয়।^{১০}

আঠারো শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর *শিবায়ন* (১৭১১) কাব্যে হিমালয়কে কালিদাসের মতোই নগাধিপতি ও দেবতাত্মা বলেই অভিহিত করেছেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য-এর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর হিমালয়কে সাধনা বা ধ্যানের উপযুক্ত স্থান বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে অসীম-অনন্ত জীবনের আশ্রয় হিমালয়। এটাকে তিনি হিমালয়ের ভাবরূপ হিসেবে দেখিয়েছেন, কোনো বস্তুরূপে নয়।^{১১} ভারতচন্দ্র পাঠমালা অধ্যায়ে বলেছেন:

শূন্যশির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান।
হিমালয় পর্বতে বসিলা করি ধ্যান।^{১২}

কবি কালিদাসের পথ ধরেই আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্যে হিমালয়ের ধ্যাননিমগ্ন চিত্রই তুলে ধরেছেন। এভাবে দিনে দিনে দেখার সঙ্গে প্রতীকভাবনা যুক্ত হয়েছে হিমালয়কে কেন্দ্র করে। কবি বলেছেন:

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রবেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন উর্দ্ধবাহু সদা শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী
যোগীকুলদ্যেয় যোগী।^{১৩}

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় চেতনার আলোকে রচনা করেন ‘মিলে সবে ভারত সন্তান’ গানটি। উপর্যুক্ত গানে তিনি বলেন, ‘কোন অদ্রি অদ্রভেদী হিমাদ্রি সন্তান’^{১৪}। এছাড়াও কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারসম্ভব কাব্যের অনুবাদে হিমালয়কে ‘দেবতাত্মা দেবধাম, অচলের অধিরাজ, মেদিনীর মানদণ্ড’ বলে অভিহিত করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর *সারদামঙ্গল* কাব্যে ‘প্রকৃতির মহান উদার সৃষ্টি’, ‘মহান মূর্তি’ বলেছেন হিমালয়কে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের উপসংহারে হিমালয়কে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের জ্ঞানলাভের স্থান বা সাধনপীঠ হিসেবে দেখিয়েছেন। রাজেন্দ্রমোহন বসুর *কাশ্মীর কুসুম*, দীনবন্ধু মিত্রের *সুরধনী কাব্য*, শরৎচন্দ্র দাসের *Indian Pandit in the Land Snow*, জগদীশচন্দ্র বসুর *ভাগীরথীর উৎস সন্ধান*, নবীনচন্দ্র সেনের *কুরুক্ষেত্র*, *প্রভাস*, *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত গ্রন্থ *গীতিকুঞ্জ*, হিমালয়কে নিয়ে রচিত *জলধর সেনের প্রবাসচিত্র*, *হিমালয়*, *পথিক*, *হিমাচলবঙ্গ*, *পুরাতন পঞ্জিকা*, *আংশিক*, *হিমাদ্রি*, *মহেন্দ্রনাথ দত্তের বদরীনারায়ণের পথে*, *মায়াবতীর পথে*, স্বামী রামানন্দ ভারতীর *হিমারণ্য*, স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের *তিব্বতের পথে হিমালয়*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *উৎসর্গ* কাব্যের আঠারো সংখ্যক কবিতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পথে বিপথে*, সত্যচরণ শাস্ত্রীর *কৈলাস যাত্রা*, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানসসরোবর*, সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের *মানস সরোবর ও কৈলাস*, কাজী নজরুল ইসলামের *গুলবাগিচা* সঙ্গীত গ্রন্থের ‘গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরি যমুনা ওই’ সঙ্গীতে হিমালয়কে ভারতমহিমার প্রতীক-প্রতিচ্ছবিরূপেই তুলে ধরেছেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোতে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি হিমালয়কেন্দ্রিক মানুষের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।^{১৫} হিমালয়কে কেন্দ্র করে এতসব রচনা থাকা সত্ত্বেও প্রবোধকুমার সান্যালের হিমালয়কেন্দ্রিক রচনাগুলো স্বাদে ও মেজাজে স্বতন্ত্র। নিম্নে প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণসাহিত্যের চারটি গ্রন্থে হিমালয় ও হিমালয়কেন্দ্রিক বৈচিত্রময় জীবন কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা একে একে দেখা যেতে পারে।

পাঞ্জাব-সীমান্তের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাওয়ালপিণ্ডির মারী অঞ্চলে কিছুদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। এই চাকরির কারণে তিনি জুন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১৯২৮ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর সেখানে অবস্থান করেন এবং অর্জন করেন সেখানকার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাজাত ফসল তাঁর হিমালয়কেন্দ্রিক প্রথম গ্রন্থ *পাঞ্জাব-সীমান্তের পথে*। সেনাবাহিনীর গাণনিক বিভাগে চাকরির কারণে তাঁর ছিল না সর্বত্র যাতায়াতের সুযোগ। কিন্তু ভ্রমণের দুর্বার নেশা এই বোহেমিয়ান সাহিত্যিককে কোনো কিছুই দমিয়ে রাখতে পারে না। তাই ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি হিমালয়ের অলিতে-গলিতে সময় কাটান; দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে বসে মগ্ন হন তার রূপ-সৌন্দর্যে। সেসব ঘটনাবলির গ্রন্থিত অবয়ব তাঁর এই প্রথম গ্রন্থটি। অবশ্য পরবর্তীতে এই গ্রন্থের যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দেবতাত্মা হিমালয়-এ*।

মহাপ্রস্থানের পথে

মহাপ্রস্থানের পথে প্রবোধকুমার সান্যালের তীর্থযাত্রার আত্ম-অভিজ্ঞতামূলক গ্রন্থ। এটাকে ভ্রমণ-উপন্যাসও বলা চলে। অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এ গ্রন্থের বিস্তৃত পটভূমি। নেপথ্যবিধান বা Flash back রীতিতে অর্থাৎ স্মৃতিলোকে পেছনে ফিরে গড়ে নেওয়া হয়েছে। গঠনগত বৈশিষ্ট্যে পিকারেস্ক উপন্যাস অনুযায়ী হওয়ায় *মহাপ্রস্থানের পথে*র কোনো বদ্ধ প্লট নেই, নেই কোনো জমাটবদ্ধ কাহিনি। এলোমেলো ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে গ্রন্থের কথক অর্থাৎ নায়ক। উত্তম পুরুষের কথনে বর্ণিত হয়েছে কথকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। বেশকিছু পথচলতি চরিত্রের মনোজাগতিক চেতনা আর মুগ্ধতায় আবিষ্ট করা প্রকৃতিবর্ণনা নিয়ে গঠিত এই গ্রন্থের শরীর। এক বিস্তৃত-ব্যাপক ভৌগোলিক পরিসীমায়

পূণ্য-লাভের প্রত্যাশায় অব্যাহত ছুটে চলা মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মহাপ্রস্থানের পথের শিল্পিত রূপাবয়ব।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রবোধকুমারের নিকট এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে তাঁর মনটা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে ওঠে এবং সেই সূত্রেই তিনি হঠাৎ কেদারবন্দী দর্শনে বের হয়ে পড়েন।^{১৬} এই ভ্রমণে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মতো রানীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সখ্য। ভ্রমণ শেষে রানী জিজ্ঞাসা করে, “ভ্রমণকাহিনী কি আপনি লিখবেন? কোন কাগজে?...যদি লিখি ‘ভারতবর্ষেই’ লিখব।”^{১৭} হিমালয় দর্শন থেকে ফিরে কাশীতে বসে একদিন সুধাংশুদাকে বেলা দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা সাত ঘণ্টা ধরে বলেন হিমালয় যাত্রার গল্প।^{১৮} সুধাংশুবাবু ভ্রমণের গল্প শুনে প্রবোধকুমারকে বলেন, ‘তুমি ঠিক যেভাবে আমাকে আগাগোড়া বললে ঠিক একইভাবে সবটা লিখে ফেলতে পারবে?’^{১৯} তাঁর কাছে লেখার এই অনুপ্রেরণা পেয়ে প্রবোধকুমার শুরু করেন লেখা। কলকাতায় বসে তিন কিস্তি এবং নেপালে গিয়ে দুই কিস্তি লেখেন এবং রচনাটি মোট পাঁচ কিস্তিতে মহাপ্রস্থানের পথে শিরোনামায় ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় মাঘ ১৩৩৯ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।^{২০} এছাড়া লেখক নিজেই মহাপ্রস্থানের পথে রচনা সম্পর্কে বলেন, ‘১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি কেদারবন্দী তীর্থযাত্রা করি এবং চারশো মাইলের কিছু বেশী আমাকে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা শেষ করতে হয়,—সেই পরিক্রমা ঋষিকেশ থেকে আরম্ভ এবং আলমোড়া জেলার রাণীক্ষেত নামক পার্বত্য শহরে তার শেষ। মোট আটত্রিশ দিনে এই যাত্রা শেষ হয়। এই কাহিনীটি নিয়েই লেখা হয়েছিল মহাপ্রস্থানের পথে’^{২১}।

মহাপ্রস্থানের পথের ‘উত্তর ভাষণে’ তরুণ প্রবোধকুমার সান্যালের আত্মস্বীকৃত চঞ্চল চিত্তলোকের ‘আত্মবিস্মৃত অস্থিরতার’ পরিচয় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। পরমার্থ লাভের প্রচণ্ড প্রত্যাশায় দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ চেতনার বহুকৌণিক ভাবধারা প্রবহমান এখানে। অন্তর্লোকের অফুরন্ত তাগিদে অপার্থিব সত্য-সুন্দরের অমেয় আকর্ষণে পরিব্রাজক দৃষ্টি ছুটে গেছে দুরান্তের পথে। অন্তহীন রহস্যের সন্ধান কথকের দ্বন্দ্বিক মত ও পথের সংশ্লিষ্ট হয়ে ‘যন্ত্রণাজর্জর তীর্থযাত্রীর আত্মহারা ভক্তিবিকলতা’র পাশাপাশি মাটির পৃথিবীর বাস্তবনিষ্ঠ জীবন-জীবিকার কলরবও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। অজস্র বিপত্তি, হতাশা, আত্মগ্লানি আর মৃত্যুর অবর্ণনীয় ভীতি-কোনকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি পূণ্যলাভের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে। অসংখ্য তীর্থস্থান, প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, আর পৌরাণিক ইতিহাসের অসামান্য মিশেলে মহাপ্রস্থানের পথে হয়ে উঠেছে শাস্বত শিল্পের অখণ্ড আঁধার। সূচনায় মহাপ্রস্থানের পথে খুব বেশি তরঙ্গায়িত নয়। একপ্রকার কাব্য ভণিতার আদলেই পাঠকের সামনে কথক বা লেখকের উপস্থিতি। সাদামাটা ভঙ্গিতে কাহিনীতে প্রবেশ। কোন চমক ছাড়াই দীর্ঘ তীর্থপথে পাঠককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরপর একে একে অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনা এবং তা বিভিন্ন কার্যকারণসূত্রে।

অগ্নিদাহের প্রথম বৈশাখে ‘দূরের ব্যাকুল বাঁশী’র মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বানে নগরজীবন জটিলতার বৃত্ত থেকে সঙ্গীহীন অন্তরাত্মা বেরিয়ে পড়ে হিমালয়ের পথে। নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের হিসেব-নিকেশ, গণ্ডিবদ্ধ জীবনের সংকীর্ণতার বাইরে পরমার্থের যে অমোঘ আহ্বান, তারই আকর্ষণে কাশী হয়ে হরিদ্বারের দিকে প্রথম যাত্রা। স্থান ও কালের ক্রমাণুবর্তিতায় গৃহবিবাগী, চাঞ্চল্যহীন, নির্বিবাদ ও নির্লিপ্ত তীর্থযাত্রীর অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে চরিত্রানুগ প্রেক্ষাপটে। ‘উপক্রমণিকায়’ প্রবোধকুমার সান্যাল তৈরি করেছেন কাহিনী বলার পটভূমি। কাদের নিয়ে কাহিনী আবর্তিত হবে, কী বলা হতে পারে, কীভাবে বলা হতে পারে তার সম্ভাব্যতা নিরূপিত হয়েছে এখানে। মূলত কথকই মুখ্য চরিত্র। তার দৃষ্টিকোণেই শুরু। একদিকে প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা, অন্যদিকে নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়া। তীর্থযাত্রী হিসেবে প্রথমত কথক ও অন্যান্য চরিত্রের কাহিনীতে প্রবেশ ঘটলেও ধীরে ধীরে নানা ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে সবাই। ফলে সরলরৈখিক গতির পরিবর্তে কাহিনীর চড়াই-উত্থাই লক্ষ্যণীয়।

ভগবতগীতায় বিশ্বাসী চেতনায় ‘সংসার মায়া, কর্মত্যাগেই মুক্তি, ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আত্মদান ছাড়া মানুষের গতি নেই, তুচ্ছ জীবন, মোক্ষলাভই পরম লক্ষ্য’^{২২} নিক্কাম ভাবনা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি ‘মনোরম নিভৃতি যোগাশ্রমের মধ্যেও মানুষের ছোটোখাটো কলহ-সংশয় ও বিদ্বেষ মাঝে মাঝে সংঘম ও তপস্যার আবরণ সরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়’^{২৩} —একথাও বাদ পড়েনি *মহাপ্রস্থানের পথে*’র মহাক্ষেত্রে। লেখক সচেতন মানসে স্মরণ করেছেন যে তিনি ভ্রমণকাহিনি বয়ন করেছেন, এবং এই সচেতনতার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছে এই শিল্পরূপ এবং *‘মহাপ্রস্থানের পথে’* প্রকাশিত হতেই প্রবোধকুমার বাংলা সাহিত্যের সাধকদের মধ্যে প্রথম সারিতে এসে আসন গ্রহণ করলেন। সামনে রইলেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র।^{২৪}

মূলত ‘উপক্রমণিকায়’ যাত্রা শুরু হলেও ‘যাত্রার’ মধ্য দিয়ে কাহিনির আনুষ্ঠানিক চলন বর্ণিত। পথের অধীন হয়ে পথের অমোঘ নির্দেশেই তীর্থযাত্রীর অবিরত পথচলায় একে একে সম্মুখবর্তী হয় সমস্যা ও সংকটের নানা চিত্র। দিন-তারিখের উল্লেখ ‘পদব্রজ’ যাত্রার কাঙ্ক্ষিত তীর্থস্থান বদরীনারায়ণ। কিন্তু চলার শুরুতেই আত্মদ্বন্দ্ব জর্জরিত কথক মন। সমাজ-সংসারের বাইরে এসে কথকের মনে হয়েছে: ‘আজ আমার সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু সে যে শুধু পরিচ্ছদ, শুধু বহিরাবরণ, দেশের কথা মনে হলেই যে এখনো দেহের লক্ষ লক্ষ স্নায়ু বন বন করে বেজে ওঠে।’^{২৫} তার অন্তরে বেজে ওঠে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি। দক্ষিণী, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, হিন্দি, মারোয়াড়ি, উড়িষ্যা, গুজরাটি, মারহাট্টির সাথে কথকের বাঙালি যাত্রীদল মিশে যায় একাকারে। সবার মধ্যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব। আবার যাত্রীর সাথে আছে সরল, ভদ্র, বিশ্বাসী কুলি। অর্থের প্রতি তাদের ‘মোহ আছে কিন্তু তার জন্য দুঃপ্রবৃত্তি নেই। তারা বিবাদ করবে কিন্তু প্রবঞ্চনা করবে না। তারা দরিদ্র বটে, কিন্তু দারিদ্র্য তাদের হৃদয়কে কলুষিত করেনি, বিভ্রাট, কিন্তু চিন্তহীন নয়।’^{২৬} উত্তরাখণ্ডের গঙ্গার তীরে এগিয়ে চলে পথ। গঙ্গা, অলকানন্দ, মন্দাকিনীর পাড়ে পাড়ে গাড়োয়ালবাসীর জীবন-জীবিকা, সমাজব্যবস্থা এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতের কুলি-কামিনীর নিরন্তর পরিশ্রমী জীবনের অলঙ্কৃত চিত্রল উপস্থাপনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনির ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রাতি প্লট।

কাহিনির অগ্রগতির সূত্র ধরিয়ে দিতে লেখক কখনো মাইলের হিসেব, কখনো দিনের হিসেব স্মরণ করেছেন। *মহাপ্রস্থানের পথে*তে ধারণ করা কালসীমা খুবই কম। ‘যাত্রা’ পর্বের ছাব্বিশ দিন এবং ‘পুনরাগমনের’ প্রায় দশদিন এই গ্রন্থের ব্যাপ্তিকাল। সময়ের হিসেবে লেখকের এই কৌশলের কারণেই পাঠক কাহিনির অজস্র তীর্থ, নদ-নদীর ভেঁড়ে খেঁই হারিয়ে ফেলে না। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই পথে পদব্রজে চতুর্থদিন প্রাতে ব্যাসঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা। দুর্গম, দুরারোহ, প্রস্তরসঙ্কুল বত্রিশ মাইল পথ হেঁটে নয়ার নদীর পুল পার হয়ে ব্যাসগঙ্গার চটিতে আশ্রয় গ্রহণ। ইতোমধ্যে পার হয়ে আসা নাইমুহানা, বিজনী, শোমাণু, কান্দি, বান্দর চটিতে বিশ্রামের সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন লেখক। অধিকাংশ চরিত্রের আবির্ভাব বিভিন্ন চটি অর্থাৎ বিশ্রাম-কেন্দ্রেই। শুধু তাই নয়, চরিত্রের সমূহ স্বরূপ উপস্থাপনায় লেখকও ব্যয় করেছেন বিস্তর ভাষা। বান্দর চটিতে বিশ্রামরত মধ্যভারতের বুরহানপুর জেলার সন্ন্যাসী যোগীর বেশধারী তীর্থযাত্রী পণ্ডিতজীর চরিত্র্য উদ্ঘাটনে লেখকের দীর্ঘ বয়ান: ‘লোকটির বয়স পয়তাল্লিশ থেকে পয়ষট্টির মধ্যে। রোগা ও দীর্ঘদেহ, কয়েকটা দাঁত নেই, চাতুর্য ও ভগবদ্ভক্তির সংমিশ্রিত দীপ্তিতে দুটো চোখ উজ্জ্বল, গলায় ছড়া চার-পাঁচ রত্নাক্ষের মালা, জপে বসে থলিটি খুলে ফোঁটা-চন্দন-তিলক সেবা করেন, মুখে বোল ছিল সীতার’^{২৭}। লেখকের এই বিস্তৃত বিবৃতিতে পণ্ডিতজী চরিত্র যেন ভেসে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। সেই সাথে আবার যখন ভাষা দিয়েছেন চরিত্রের মুখে তখন তারা হয়ে উঠেছে বিশ্বাস্য জীবন্ত। চার্লস মা যখন বলে ওঠে, ‘শুনচ, অ বা’ঠাউর, ভাদুর...যেদিন ছেলে হ’লো, কী বিষ্টি, তেমনি অন্ধকার, আমি বলি, আর বুঝি বিউতে পারে না’^{২৮} তখন চার্লস মায়ের চরিত্র যেন সব খোলস ছেড়েই বেরিয়ে আসে সামনে। আবার বামন বুড়ির সংলাপেও পাওয়া যায় তার অন্তর্গত চেতনার পূর্ণ স্বরূপ: ‘থাম্ থাম্, আ সর, অবাধ্য মাগি, ... ছুসনি আমাকে, ঐখানে সরে

বোস, ইতিজাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার জাতধর্ম আর কিছু রইল না। দেশে গিয়ে প্রাচিতির না করলে আর...’^{২৯}। বামন বুড়ি চরিত্র উদ্ঘাটনে তার সংলাপই যথেষ্ট হয়েছে। সূচনার পটভূমি চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় লেখক কোন রঙে, কী রসে, কেমন জীবন ধারণ করতে চেয়েছেন এই গ্রন্থের বিস্তৃত ক্যানভাসপটে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় একটির পর একটি তীর্থ, চটি বা বিশ্রামাগার, ক্ষুরধার নদী-শাখানদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পথের বাস্তবতা আর ব্যস্ততার মাঝে অসংখ্য চরিত্রের আবির্ভাব দৃশ্য প্রতীকী কার্যকারণ সম্পৃক্ত। স্থানিক পটভূমি, ঘটনা ও চরিত্রের নানাবিধ সমস্যার সংহত সমন্বয়ে কাহিনী যখন একটু একটু করে ওপরের দিকে অগ্রসর লেখক তখন আত্মদর্শন প্রচারে অতিমাত্রায় সরব। ফলে একটি সম্ভাব্য শীর্ষবিন্দুতে কাহিনীর উত্থান হয়ে উঠেছে বিলম্বিত। ব্রহ্মচারীর রহস্যঘেরা জীবন পরিক্রমা অনুধাবন শেষে লেখকের বক্তব্য:

পৃথিবীতে যে মানুষ সকলের চেয়ে সুখী বলে আমাদের ধারণা, তার যখন মৃত্যু ঘটে তখন আমরা সবাই তার আত্মার শান্তি-কামনা করি। মানুষ আসলে যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ পায়, এখানে যে তার শান্তি নেই, একথা মানুষ আপন অন্তরেই অনুভব করে। করে বলেই দেব দেবতার সৃষ্টি, স্বর্গের সৃষ্টি, পরলোকের সাত্ত্বনার সৃষ্টি, শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমস্ত ছাড়িয়েও মানুষের দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে। গভীরের মধ্যে সে খুঁজেছে একটি পরম সাত্ত্বনার বাণী। আশার আশ্রয় জীবনের চরম পরিণামের মধ্যে একটি সুদূর বেদনাকে সে নিরন্তর অনুভব করে।^{৩০}

দেবপ্রয়াগের বিশ্রামরত সময় শেষে পুনরায় বন্ধুর পথ। পরম প্রত্যাশার বদরীনারায়ণের স্পর্শ পেতে তীর্থযাত্রীর নিরন্তর অগ্রগতি ঠিক জীবনতীর্থের মতো। অসংখ্য চিত্রকল্পের প্রয়োগে কাহিনী এগিয়ে যায় সময় ও পথের ত্রমাসুসারে। ‘শুক্লা পঞ্চমীর জ্যোৎস্না কলাগাছের চওড়া পাতাগুলির’ ওপর যেমন ‘রূপোর পাতের মতো বলমল’ করে তেমনি কথকের হৃদয়পটেও শুদ্ধ শিল্পরচনার ‘গভীর অনুভূতির নির্মল আনন্দ’ খেলা করে। অন্তরের ভাবাবেগ আর শারীরিক ক্লান্তি, পীড়ন, অপারগতার সমারোহ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। খিদিরপুরের মাসি, মনসাতলার নির্মলা আর সত্তর বছর বয়স্কা চাকর মায়ের কাতোরোক্তি ও অনাহারী মুখ্যবের মাঝে অঘোরবাবুর অল্পবয়স্কা স্ত্রী রাধারাণীর স্নিগ্ধ হাসি এবং হিতকামনার প্রশান্তি-প্রবাহ চলেছে হাত ধরাধরি করে। বর্ণিত প্রকৃতি, তীর্থ-তীর্থপথ মানবাতীত নয়। লেখক মানুষকে উপেক্ষা করে তা করতেও চাননি। প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট বর্ণনার পরই আছে বিভিন্ন শ্রেণি-বিশেষের সরল-সাদামাটা জীবনচর্যার ছবি। সমস্যা ও সংকটের নানা চিত্র। সেই সাথে বিভিন্ন সুরে জীবনকে হরেক রকম রূপে ও রসে উপস্থাপনের শৈল্পিক দায়বদ্ধতা।

স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা ও জাতিবিচারের সকল ভেদরেখার বাইরে পণ্ডিতজী, পাগড়িপরা রামায়ার, পুণা আগতা মারহাট্টি বৃদ্ধা, গোপালদা, অমরা সিং, কুলি কালিচরণ ও তুলসি রাম, ব্রহ্মচারী, অঘোরবাবুর স্ত্রী ও শ্বশুড়ী, রুইদাস সুক্লল সবাই যেন আত্মার আত্মীয়। একই পরিবারের পরিব্রাজক। তীর্থযাত্রার পথ তাদের জীবনেরই নামাস্তর। ভীলগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল ভীলকেদার বা তুণ্ডপ্রয়াগ পার হয়ে শ্রীনগরের ঘটনায় লেখক একই সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের ওপর তীর্থগুরুদের জুলুম-চাতুরী এবং ভারতবর্ষব্যাপী সমসাময়িক আইন অমান্য আন্দোলনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। তবে মাঝে মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতির হাঙ্কা ও হঠাৎ উপস্থাপনা কাহিনীতে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ও প্রস্তুতিহীন বলে অনুমিত হয়। রাষ্ট্রীয় সমস্যার সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত চেয়ে ভক্তিসেবায় এসে লেখকের দৃষ্টিতে আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সনাতনী চতুর্বর্ণ প্রথার জাতিবিচার ও অস্পৃশ্যতার প্রাসঙ্গিক রূপ। বিংশ শতাব্দীতেও টিকে থাকা এই রূপ ভারতবর্ষের অন্য এক বাস্তবতা। হিন্দু-ধর্মের চতুর্বর্ণ বিভাজন প্রথা যে তখনও ভারতীয় জীবনের গভীরে শেকড় গেঁথে ছিল তা এই পর্বে স্পষ্ট। অঘোরবাবু ও বামন মার কলহে বামন মার সংলাপে উঠে এসেছে বর্ণপ্রথার ভয়ঙ্কর চিত্র: ‘কি পাপেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে মা, শুকনো কাপড়খানি আমার কোন আঁক্কেলে ছুঁয়ে দিলে? শূদ্রের বাড়াবাড়ি আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে বাছা’^{৩১}। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, তাঁর কারাবরণ, সন্তাসবাদী ধারার বিস্তার, ইংরেজের রুঢ় শাসন-শোষণের মাত্রা নির্ণয়ে লেখকের ব্যবহৃত দুই

একটি দৃশ্য বা সংলাপ কিংবা সনাতনী বর্ণপ্রথার অলঙ্ঘনীয় রূপাঙ্কণ প্রবোধকুমার সান্যালের যৌবনের উচ্ছ্বসিত রোমান্টিক ভাবাগেরই ফল। কখনো কখনো আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত কথক-মনে তীর্থযাত্রীদের মনে হয়েছে ‘পূণ্যলোভী তীর্থকীট’। এরপর কথকের সামনে উপস্থিত হয় নাটকীয় চমক। রাধারাণীর সহজ স্বীকারোক্তিমূলক বর্ণনায় লেখক: ‘মেয়ে ও মা মাঁথা হেট করলেন এবং তেমনি নতমস্তকেই অঘোরবাবুর স্ত্রী সজলকণ্ঠে বললেন, আমি তোমার বড় বোন, কিন্তু আমার মানসম্মত নেই, জাতধর্মও নেই। আমি...আমি বেশ্যা’^{৩২}। এই ঘটনার পর অস্থির মানসিকতার মধ্যে অন্ধকার রাতে মন্দাকিনী ও চন্দ্রার সঙ্গমস্থলে পথ হারানো কথকের সামনে হঠাৎ ‘কপাল কুণ্ডলার’ আবির্ভাবে ঘটে যায় অপার্থিব বিষয়ের আরও একটি নাটকীয় চমক।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দকে বিদায় দিয়ে মন্দাকিনীর পাড় ধরে কদারনাথের পথ ‘ভীষণ চড়াই, প্রাণঘাতী বিপদসঙ্কুল, পথে দুমূল্য খাদ্যবস্তু, তুষারের ঝটিকা, প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ’^{৩৩}। এর মাঝেই লেখক স্মরণ করে দেন প্রায় একশ কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করার হিসেব। আর পথচলার মাত্রিকতায় তাদের পথ যে মহাপ্রস্থানেরই তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পথচলার এই বহুমাত্রিকতায় পৌরাণিক কাহিনীর আদলে গড়ে ওঠা তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে লেখকের যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনা: ‘সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ দু’খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিল্পকলা, ধর্ম ও আচার, শাস্ত্র ও দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দু’খানি মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে যে গড়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ নেই।’^{৩৪} দুর্গম পথের অসহনীয় পীড়ন সহ্য করে দুর্লভ পূণ্য লাভের স্বপ্নে বিভোর অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মধ্যে কথকের আত্মদ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে প্রবল। কদারনাথের মন্দিরে এসে পরম নির্বাণলাভ সম্পর্কিত প্রসঙ্গে কথকের যে দোলাচল মনোবৃত্তি তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো গ্রন্থে। এখানে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। মন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে তার অস্ফুট আত্মজিজ্ঞাসা হয়েছে অন্তর প্রতিধ্বনিত। কথকের বর্ণনায়:

কী বলবো, কী প্রার্থনা জানবো? এই নির্বোধ প্রস্তর-স্তম্ভের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঙ্গালপনা প্রকাশ করবো-সে যে ভয়ানক ছেলেমানুষী। অথচ একজন পথশ্রান্ত সামান্য তীর্থযাত্রী, সেইটুকুই আমার শেষ পরিচয় নয়। আমি যে ক্ষুদ্র, আমি যে নগণ্য এই কথাই বা অনুভব করি কোন সর্কীয়তায়? আবেগ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস ও প্রেম দিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা এই যে মাটি আর পাথর, এর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে যদি ছোট করে ভাবতে না পারি সে কি নিতান্তই অহমিকা? দেবতার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে আমি আপন দেবতাকে অনুভব করি?^{৩৫}

গ্রন্থের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে আন্তিকতা-নাস্তিকতার এই দ্বন্দ্ব বা দোলাচল মনোপ্রবৃত্তির প্রবাহ বজায় থেকেছে গ্রন্থের সমাপ্তি অবধি। বস্তুত মহাজীবনের বৃহৎপরিসরে লেখক এবং অন্যান্য চরিত্রের আত্মোপলব্ধি এবং জীবনার্থের পরম তাৎপর্যের শিল্পিত রূপাঙ্কনই মহাপ্রস্থানের পথের অভীষ্ট প্রতিপাদ্য। বদরিকাশ্রমের পথ ধরতেই কথকের হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছে জীবনের রহস্যময় গতিতত্ত্ব আর আত্মা-পরমাত্মার মিলনস্বরূপ: ‘আমরা যেন চিরদিবসের তীর্থযাত্রী, চির-তীর্থপথিক। জন্মজন্মান্তর পার হয়ে চলেছি চির-সুন্দরের পদপ্রান্তে; যেমন চলেছিলেন একদিন শ্রীমতী শতবর্ষ বিরহ পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মাঞ্জলি দিতে। প্রেমের তপস্যাই এই, বেদনার মধ্যে তার রূপ, অন্তরে তার দুঃখলোক। যে চিরদুর্লভ, যার জন্য এই দুর্গম পথযাত্রা, এই পীড়ন, যার জন্য এই যন্ত্রণাজর্জর পথের প্রাণান্তকর তপস্যা সেই রূপাতীত রূপকে আমার চাই, সে আমার আশার পরিতৃপ্তি, সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া।’^{৩৬} কথকের এই আত্মগত অনুভব-উপলব্ধি সর্বজনীন আবেদনে সমুন্নত থেকেছে। জীবনের পাওয়া না পাওয়া, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র রূপ এবং স্নেহ-মমতা, প্রতারণা-পীড়ন, দৈন্য-অপমান কোনকিছুর মধ্যেই ব্যাহত হয় না, থেমে থাকে না পরিপূর্ণ আত্মজাগরণ আর আত্মোদ্ধারের অসীম উৎসাহে সামনের পথে এগিয়ে চলা। লেখকের ভাবনায় সামনের এই পথটাই মৃত্যুর পথ। সমস্ত আয়োজন, সব উপকরণ বিসর্জিত হয় ‘মৃত্যুর পদতলে।’ তাই বৈশাখী পূর্ণিমার শুক্লা চতুর্দশীর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আপাত অবিশ্বাসী কথকমনে উঁকি দেয় নিয়তির

অমোঘ পরিণতির সূত্র: ‘সবকিছুরই নিয়ন্তা নিয়তি, নিয়তির কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, আমাদের জীবন ও মরণ তারি কাছে বাঁধা। আমরা নিয়তির কাছে সাজানো পুতুল, তার ইচ্ছার ইঙ্গিতে নড়ে চড়ে বেড়াই, হাসি আর কাঁদি, বাঁচি আর মরি। আমাদের সকল কাজকর্মের পিছনে সে আছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, তার অঙ্গুলি-নির্দেশ মেনে নিতে হবে। আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নেই।’^{৩৭}

উখীমঠ ছেঁড়ে কাঁথা চটি এবং গোলিয়া বগড় পার হয়ে দোয়েড়া চটিতে বিশ্রাম, অতঃপর পৌখিবাসা, বানিয়াকুণ্ড, ভুলোকোনা, তুঙ্গনাথ হয়ে পাসরবাসা, গোপেশ্বর এবং চামোলি থেকে গরুড়গঙ্গার চটিতে এসে লেখক জানিয়েছেন বাইশ দিনের যাত্রা সমাপ্তির কথা। এই পর্বের লক্ষণীয় বিষয় গন্তব্যে পৌছানোর দ্রুত বর্ণনা। সেই সাথে পথের বর্ণনায় না গিয়ে এখানে তিনি সমাজনীতি, স্বল্প রাজনৈতিক আবহ, বাউল ও বোহেমিয়ান জীবনের স্বরূপ, জীবনসংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টির সমূহ ভূমিকা বা দায়বদ্ধতার বিস্তৃত বিশ্লেষণে মনোযোগী। দীর্ঘ বিরতির পর চার্লস মা, বামন বুড়ি, তুলসীরাম এবং গোপালদার স্বল্পস্থায়ী দেখাও মিলেছে এখানে। তবে মুখ্য হয়ে উঠেছে বদরীনাথে পা রাখার আকুলতা আর কাব্যময় ভাষার গতিশীলতা। সরাসরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও কবিতার ব্যবহারও করেছেন লেখক। কথকের প্রতীক্ষিত অন্তরাত্মা ছুটে চলেছে তারই আশায়, ‘যে তাঁর কণ্ঠে দেবে পরম বাণী, কানে আত্মপ্রকাশের মূলমন্ত্র, সৌন্দর্য সৃষ্টির উৎসমুখ দেবে খুলে, শক্তি ও সাহস-বিস্তৃত হৃদয়, অফুরন্ত প্রেম ও অকুপণ দাক্ষিণ্য, চোখে দেবে অনিবার্ণ স্বপ্নলোক, বুকে অনন্ত বহিস্কুধা’^{৩৮}। কথক, ব্রহ্মচারী, গোপালদা এবং অঘোরবাবুরা এক একটা সমাজপ্রতীক। মহাপ্রস্থানের পথে একটি পথ চলার শিল্প মাধ্যম এবং এর ভেতরের স্বপ্নদর্শী মানব ও মানবের চরিত্রগুলো নিয়ে কাহিনি নির্মাণের খেলায় মেতেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। সেখানে জীবন ও শিল্প এবং জীবিকার এক আশ্চর্য মিশ্রণে ভ্রমণ-সাহিত্যের রূপ নির্মাণ করেছিলেন সেদিনের ছাব্বিশ-সাতাশের প্রবোধকুমার সান্যাল। এই গ্রন্থে জীবন ও শিল্পের মাঝে কোন আড়াল নেই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘ভারতের অন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রবাদের মত হিমালয়ের মহিমার দ্বারা প্রবোধবাবুও আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং হিমালয়ের সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগকে তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এইখানে তিনি ভারতের সাহিত্য-ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারার পরিপোষণ করিয়াছেন’^{৩৯}।

‘পুণরাগমনের’ প্রায় অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসে পাওয়া যায় নাতনীর সম্যক পরিচয়, ‘নাতনীর নাম রাণী। -মা বাপ নেই, স্বামীর হলো অকাল মৃত্যু। ছেলেটি করতো সরকারী চাকরী। এখন আমার বাড়িতেই থাকে’^{৪০}। পাঁচ দিনের পরিচয়সূত্রে রাণীর সাথে কথকের ঘনিষ্ঠতা এবং রোমান্টিক ভাবাবেগের মধ্যেই ঘটেছে তার ক্রমবিকাশ। নিরানন্দের পথে পাওয়া যায় সহজ-সরল গতি। অন্তরে বেজেছে ‘পথের আনন্দ-বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়’ আর মহাকবির ‘যুদ্ধ দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব’ পঙ্ক্তির অমৃত মন্ত্র। মূলত একটি সূক্ষ্ম রোমান্টিসিজমের চিত্র আঁকাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেগে আর ভিন্ন বোধে তড়িত এই পর্বের প্লট ভাবনা। লেখকের বর্ণনায়: ‘অতীত তিরিশটি দিনের সঙ্গে এখনকার দিনগুলির আর মিল নেই, আবার উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি নূতন আলোয় ও নব অধ্যবসায়ে। জীবনের গতি এমনি। আবার সে পেয়েছে একটি নূতন বেগ। আজ ভাবছি চিন্তধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই, চিন্তালোকের কামনার কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতি নেই, নিজের আনন্দের পথ সে নিজেই নির্বাচন করে নেয়, সংস্কারের বাধায় সে আপন উৎসকে রুদ্ধ করতে রাজি নয়’^{৪১}। তেত্রিশতম দিনে এসে কাণ্ডিওয়ালা, তুলসী, কালীচরণ, তোতারাম ও প্রায় প্রথমাবধি তীর্থযাত্রী গোপালদার বিদায় শুধু চরিত্রের বিদায় নয় কাহিনির পরিণতিরও আভাস এনে দেয়। টুকরো টুকরো সান্নিধ্যে কথকের হৃদয়ে রাণীর প্রতি জেগে ওঠে অলঙ্কৃত আবেগ। কথকের ভাবনায়, ‘চলেছি পাশাপাশি। যেন স্বপ্নলোক থেকে দুটি পক্ষীরাজ আমাদের দু’জনকে নিয়ে নামছে নেমে আসছে শূন্যলোক পেরিয়ে’^{৪২}। ‘স্বর্গ’ থেকে বিদায়, এবং মর্তভূমির বিচিত্র জটিলতায় পদার্পণ।

প্রবোধকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিতে তারই ঘোষণা: ‘এই বইয়ে তোমার দৃষ্টি, তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথ চালিয়ে পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে’^{৪৩}। ‘পুণরাগমন’ পর্বে কথক ও রাণীর জীবনানুভবের দীর্ঘ সংলাপ, সমাজধর্ম ও চিন্তধর্মের শৃঙ্খলিত, সঙ্কুচিত, বন্ধিত বিষয়ের ভাষণ এবং আত্মবিকাশের অন্তরায় হেতু মানবের সমূহ পরাভবের যৌক্তিক উপস্থাপন লক্ষণীয়। মনুষ্যত্ব আর মানবতার সকল আবরণ খসে পড়ে মানুষ কেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে? হিংসা-হানাহানি, রক্তপাত আর সমাজবিপ্লবের সাথে কেনো জড়িয়ে পড়ে ধর্ম-নীতিপরায়ণপন্থী মানুষ-তার কারণ সন্ধানী কথকমন। কথকের জিজ্ঞাসাজর্জর হৃদয়: ‘কেন শাস্ত্রবাদ, প্রেম, দয়া, স্নেহ, স্বপ্ন, সৌন্দর্যবোধ, দেবত্বচেতনা-ইত্যাদি মহত্তর জীবনদর্শনের সমস্ত আদর্শবাদ চূর্ণ করে আত্মঘাতী মানুষ বারম্বার ছুটে যায় সর্বনাশা স্থূল বুদ্ধির পথে? কেনই বা আত্ম-সৃষ্ট হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ মত্ততা-এদের অতিক্রম করে মানুষ আবার ফিরে আসে আনন্দের মধ্যে? মানুষ কি চিররহস্যময় নয়?’^{৪৪}। এই রহস্যময় আঁধারেই রচিত মহাপ্রস্থানের পথের প্রায় সব চরিত্র। একদা খুন্সী আসামী, ব্রহ্মচারী, অঘোরবাবুর পতিতা স্ত্রী, পরিব্রাজক কথকের দ্বন্দ্বিক মতবাদ, তীর্থের ‘ভগবানকে’ স্বীকার না করা বিধবা চরিত্র রাণীর উপাসনের অপূর্ব লাভণ্য ও দীপ্তিময় অনিবচনীয় মাধুর্য রহস্যাবৃত হয়েই থেকেছে শেষাবধি। ইহকাল, পরকাল, পূর্বজন্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী।

তারপরও ইতিবাচক জীবনে বিশ্বাসী লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, জয়গান গেয়েছেন সত্য-সুন্দর মহৎ মানবতার। তাঁর মতে: ‘পৃথিবীতে এতো নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ ও সিনিসিজম মনের এত মালিন্য ও চরিত্রের এত অধঃপতন, সাহিত্যের সুলভ রোমান্টিসিজম ও সৌখিন কল্পনা, সত্য ও ন্যায়ের তথাকথিত আদর্শের প্রতি মানুষের এত অবিশ্বাস কিন্তু তৎসত্ত্বেও যা কিছু সদগুণ মানব চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তার মূল্য আমরা না দিয়ে থাকতে পারি না’^{৪৫}। প্রবোধকুমার সান্যালের লেখক প্রবণতার মৌল দিক সমাজ ও সমাজস্থিত মানুষকে পুরোপুরি তুলে ধরা। এই মানুষ হরেকরকম শ্রোতের ভেতর থেকেই বেছে নেওয়া। জটিল-কুটিল, উচ্চ-নিম্নশ্রেণির বর্ণ-বিশ্তের অসংখ্য চরিত্রের সমারোহ তাঁর রচনায়। এখানেও এর খুব বেশি ব্যতিক্রম হয়নি। লেখকের চিরায়ত আত্মজিজ্ঞাসার শৈল্পিক ধারাভাষ্য:

গল্প লিখি, উপন্যাস রচনা করি, কিন্তু তার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে মানব-জীবনের এই প্রশ্ন থেকে যায় জীবন কি সাহিত্যের চেয়ে বড় নয়? মানব-যাত্রী কি একদিন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায় তীর্থযাত্রা করবে না? মহত্তর জীবন, নিষ্পাপ প্রেম, অকলঙ্ক মনুষ্যত্ব, আনন্দময় মানস-সত্তা এরা কি সেই অপরূপ তীর্থপথের পাথেয় হয়ে উঠবে না?^{৪৬}

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বাইরের দৃশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কিন্তু পথের দুই ধারের প্রকৃতির যে উপাদান তা জীবনেরই প্রতিরূপ। ঠিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। প্রবোধকুমার সান্যালের প্রকৃতি কথা বলে ওঠে, রঙে রূপে রসে আমাদের রাঙিয়ে তোলে। মহাপ্রস্থানের পথে পড়তে পড়তে পাঠকও এক সময় হয়ে যায় তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাত্রাপথের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর যাত্রারত মানুষের অসংখ্য চারিত্র্য-দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে প্রত্যাশিত সামগ্রিক জীবন। মানুষ, প্রকৃতি আর কথকের অন্তরের সংযোগসাধনে লেখক সিদ্ধির সাক্ষর রেখেছেন। প্রথমে পথে নেমে প্রকৃতির সৌন্দর্যালোকে অবগাহন, এরপর ধীরে ধীরে অসংখ্য চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথন এবং তার মধ্য দিয়ে পরমস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কাহিনির সমাপ্তিতে এসে দুয়ের অনন্য সমন্বয়। মাধ্যম রানী। কাহিনি গ্রন্থন রীতিটি লক্ষ করার মতো। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্লট শিথিল, কাহিনি সংগতিহীন, ভাষা অতিমাত্রার কাব্যিক, এগুলোকে লেখক হিসেবে প্রবোধকুমার সান্যালের ব্যর্থতার স্মারক বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু মহাপ্রস্থানের পথে-তে এটাই প্রবোধকুমার সান্যালের স্বতন্ত্র শিল্প-কৌশল।

দেবতাত্মা হিমালয়

বাংলা সাহিত্যধারায় হিমালয়কেন্দ্রিক গ্রন্থ রচনায় পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যালের দুখণ্ডে প্রকাশিত *দেবতাত্মা হিমালয়* তৃতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থের রচনারীতিতে তিনি অনেক বেশি কৌশলী এবং অন্তর্ভাবনায় গভীর তাৎপর্যমুখি। হিমালয় ভ্রমণের তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখক প্রবোধকুমারের পূর্ব গ্রন্থ *মহাপ্রস্থানের পথে* থেকে এই গ্রন্থের বিষয়-ভাবনা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রবোধকুমারের বোহেমিয়ান শিল্পী মনন এই গ্রন্থে জাতীয়তাবোধ, স্বদেশভাবনা, লোকসংস্কৃতি মনস্কতা, ভাষা ব্যবহার, প্রকৃতিপ্রিয়তা, স্থাপত্যকলার নিগূড় বিশ্লেষণ এবং যথাযথ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রয়োগে শিল্পিত করে তুলেছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে এই গ্রন্থটি সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৯৫৪ খ্রি. থেকে ১৯৫৬ খ্রি. পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রথম ১৯৫৬ খ্রি. এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে *দেবতাত্মা হিমালয়*-এর দুই খণ্ড প্রকাশ করে। এরপর এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লিমিটেড প্রকাশনী গ্রন্থটির অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করে। আরও পরে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী দেবতাত্মা হিমালয়-এর দুটি খণ্ড প্রকাশ করে।^{৪৭}

প্রবোধকুমার সান্যালের বেশ কিছু গ্রন্থ ব্যক্তির পথ চলার কাহিনি নিয়ে রচিত। *দেবতাত্মা হিমালয়* তার মধ্যে অন্যতম। এই পথ দীর্ঘ ও বিস্তৃত। এক একটি পথধারা যেন জীবন-মৃত্যুর সমতুল্য। চরিত্রের চলিষ্ণুতাকে আশ্রয় করেই ছড়িয়ে পড়েছে গ্রন্থের বিষয়। সেই সাথে অঙ্কিত চরিত্রের অর্জিত বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ অবয়ব বা চিত্রল রূপ ধারিত হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংকট, তাঁর অন্তরের স্বপ্ন-আকাজক্ষার সামগ্রিক বোধ দ্বারা এর প্লট নিয়ন্ত্রিত। লেখক এখানে এমন একজন প্রতীকী মানব যার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজজীবনের একটি সমুন্নত গতি রূপ পেয়েছে। ‘কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান ছাড়াও হিমালয়ে শতসহস্র দেবমন্দির বিদ্যমান।’^{৪৮} ভূমিকাতে লেখকের এই বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, ভ্রমণ-কাহিনি হলেও এই গ্রন্থে সবকিছুর সমন্বয়ে লেখক হিমালয়ের একটি পরিপূর্ণ আবহ নির্মাণ করতে সচেষ্ট থেকেছেন। অসংখ্য প্রাচীন দেবমন্দির, মঠ দিয়ে আবৃত হিমালয়ে স্থানীয় জনমানব ছাড়াও সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী, যোগীপুরুষ, তীর্থযাত্রীর আনাগোণা সর্বক্ষণ। এসব মানুষকে প্রবোধকুমারের শৈল্পিক দৃষ্টি ধারণ করেছে পরম মমতায়। স্থান হিসেবে হিমালয় আর হিমালয়ে অবস্থানরত মানুষের সংস্কৃতিকে বাংলা সাহিত্যে প্রবোধকুমারই এমন বিশদভাবে তুলে আনতে পেরেছেন। কারণটা তাঁর ভাষ্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। পূর্বভাষণে তিনি বলেন: ‘তীর্থযাত্রাটা গোঁণ, হিমালয় পর্যটন হোলো মুখ্য। লক্ষ্যটা আনন্দের, উপলক্ষ্যটা তীর্থের।’^{৪৯}

পশ্চিম সীমান্তের হিমালয়, পাঞ্জাবের হিমালয়, ব্রহ্মপুরা ও গাড়োয়াল হিমালয়, তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বার, অমরনাথ, নেপাল, পশুপতিনাথ, স্বাস্থ্যনিবাস দেবাদুন, মুসৌরি, কালিম্পঙ ও শিমলার পরিচয় উঠে এসেছে প্রথম খণ্ডে। অন্যদিকে দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃতি আরো দীর্ঘ। হিমালয়ের আশপাশের রাজ্য কাশ্মীর, পীরপাঞ্জাল, তিব্বত, ভুটান-জম্মু, জ্বালামুখি ও হৃষিকেশ নামক তীর্থস্থান-উপত্যকা হিসেবে কাংড়া, কুলু, লাহুল, বিপাশা, হিমাচল, মাণ্ডি, কোটদ্বারের নাম-আর শরীর-মন ভাল করার স্থান হিসেবে রাণীক্ষেত, আলমোড়া, ডালহাউসি এবং নৈনিতালের বিশদ পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। এসব স্থানের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণীয় বর্ণনা পাঠককে আকৃষ্ট করে সমভাবে।

‘ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল’ শীর্ষক পর্বে গাড়োয়াল নামের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাঁড় করেছেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে গাড়োয়াল ও হিমালয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: ‘ত্রৈতাযুগ ও দ্বাপর যুগের দুটি বিরাট কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় এসে মিলেছে। সমগ্র ভারতে ছড়ানো রামায়ণ আর মহাভারত। হিমালয়ে এসে মিলেছে সেই দুই ধারা।’^{৫০} হিমালয়কেন্দ্রিক মানুষের নৃতাত্ত্বিক জীবনধারা উন্মোচনে ‘গুহাতীর্থ অমরনাথ’ পর্বে প্রবোধকুমার উল্লেখ করেন: ‘এরা পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য এবং সৌন্দর্য দিয়ে এদের

দেহমন তৈরী, উদার পর্বতমালায় থেকে এরা আপন স্বভাবে আহরণ করেছে।^{৫১} এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা তুলে ধরতে-হিমালয়ের প্রতি তাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশে আরো অনেক পরে দ্বিতীয় খণ্ডের ‘কাংড়া-বৈজনাথ’ পর্বে তিনি বলেন: ‘ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকে চেনে না’^{৫২}।

তুষার নদীর উৎস হিমবাহ এবং প্রাগৈতিহাসিক ক্যারাভানের অবস্থানতথ্য জানা যায় ‘পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় পর্ব’ থেকে। স্বর্গের অঙ্গরাদের স্নানের স্থান-সৌন্দর্যময় অমরাবতীর আলোকময় অসামান্য চিত্র এবং নীলকান্ত সরোবরের বিশদ বিবরণ আছে ‘গুহাতীর্থ অমরনাথ’-এ। জীবন যে হাসি-আনন্দমুখর হয়ে বিরাজ করে মানুষের কর্মময় ক্ষেত্রে তা কিন্নর দেশের মানব-মানবীর জীবনযাপনের রীতি-পদ্ধতি থেকে প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গ ‘হিমাচল-শিমলা- ও কিন্নর ক্ষেত্র’ পর্বে পাওয়া যায়। নেপাল ও পশুপতিনাথে গিয়ে প্রবোধকুমার সঞ্চয় করেন অন্যরকম অভিজ্ঞতা। সে বিষয়ে তিনি বলেন: ‘পশুপতিনাথে শিবরাত্রি উপলক্ষে মস্ত মেলা হয়।’^{৫৩} সতীশায়ার নামের পৌরাণিক কাহিনি, সম্রাট ললিতাদিত্যের স্থাপত্যকর্ম এবং নেপাল উপত্যকার জন্মবৃত্তান্তের অসামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা জানা যায় দ্বিতীয় খণ্ডের ‘কাশ্মীর ও পীরপাঞ্জাল’ পর্বে। অমরনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যোগীর অভিভূত হওয়া-যোগীর সমস্ত শরীর তুষারাবৃত হওয়া-ধীরে ধীরে তার প্রস্তুতভূত হয়ে যাওয়ার মতো কৌতূহলোদ্দীপক কিংবদন্তি বর্ণিত হয়েছে ‘হিমাচল রাজ্য মাণ্ডি’ পর্বে। এছাড়া কুলুর ‘দশহরা’, চম্পার ‘মানুর’, বাগেশ্বরে ‘মকর সংক্রান্তির মেলা’, রুদ্রপ্রয়াগের জিম করবেটের নামধারী মেলার অকৃত্রিম বর্ণনা, হিমালয়ের সাধারণ মানুষের ভাষা, কৃষ্টি, পোষাক-পরিচ্ছদ, দীব্যজীবনলাভ করতে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য মৌন সন্ন্যাসীর ধ্যানমগ্ন অবস্থা, লামাগণের কঠিন সাধনার দর্শনকথা উপস্থাপনে হিমালয়কেন্দ্রিক জনজীবনের সংস্কৃতিচিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।

দেবতাত্মা হিমালয় গ্রন্থে প্রবোধকুমার সান্যালের স্বদেশচেতনা প্রখর হয়ে ধরা পড়েছে। হিমালয়ের মূল সীমানা, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্তন, রাষ্ট্র-সমাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি উঠে এসেছে ইতিহাসের নিরিখে। কাশ্মীর, দেবাদুন, ব্রহ্মপুরা, ক্ষুদ্রভূটানের ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন নিবিড় যত্নে। স্বদেশপ্রেমে আবেগেতাড়িত হয়ে অন্তরে ব্যথা বোধ করেছেন বৃহত্তর ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়। তাঁর ভাষ্যানুযায়ী তিব্বত, গান্ধার, কন্ডোজ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ এক এক করে ভারতবর্ষের হাতছাড়া হয়ে গেছে-যা লেখকের বেদনা উদ্বেককারী বিষয়। তাই দেশ ও দেশের মানুষের মহিমা কীর্তন করে লেখক জানান:

এই মহাহিমবন্তের শাখাপ্রশাখার আরম্ভ ব্রহ্মদেশ থেকে চীন-তিব্বত সীমানা এবং সেখান থেকে আসাম বাঙ্গলা নেপাল হয়ে কুমায়ুন পাঞ্জাব হিন্দুকুশ ও আফগানিস্থান হয়ে মধ্য প্রাচ্যের প্রান্তে চলে গেছে। ...সমগ্র হিমালয় তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। ...কোনও ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে সমগ্র মহাদেশ প্রসারিত এই গিরিশ্রেণীর আগাগোড়া পরিভ্রমণ করা সম্ভব নয়। ...সমগ্র পশ্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ এটি ঐতিহাসিক সত্য।^{৫৪}

এই গ্রন্থে লেখকের স্বদেশপ্রেম উন্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি ভারতের প্রাণপ্রবাহিনী গঙ্গা নদীর অপরিসীম গুরুত্ব উঠে এসেছে। গঙ্গাকে আবর্তন করে গড়ে ওঠা পৌরাণিক কাহিনি, ভারতীয় ভক্তিবাদ ও দর্শন এবং প্রবোধকুমারের বৈজ্ঞানিক চেতনার সংক্ষেপ ধারণা পাওয়া যায়। বহুল প্রচলিত তত্ত্ব ও তথ্যানুযায়ী দেবতাদের সনির্বন্ধ আকৃতিতে দেবাদিদেব শিব তাঁর জটিল জটোরশির মধ্যে স্বর্গবিতাড়িত সুরধনুকে ধারণ করেন-যা গঙ্গার উৎস বা উৎপত্তি সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনি।^{৫৫} লেখক নিজস্ব দার্শনিক-বোধতাড়িত হয়ে কিছুটা কাল্পনিক আবহে বলেন:

গোমুখের উত্তরভাগে তুষারচূড়ালির পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে ভুল হবে না। ...ভারতসংস্কৃতির প্রথম মন্ত্র হলো-গঙ্গার তটে। ...গঙ্গা মানে মর্ত্যগামিনী-যিনি গতিশীলা। গতি মানেই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু। ...মন্দির নয়, দেবতা নয়, তীর্থ পরিক্রমা। ...সেখানেই তোমার শেষ পুণ্যলাভ ঘটবে গঙ্গাজলদানে। এই গাঙ্গেয় সভ্যতার বিশালতা ও বৈচিত্র্য ভারতকে সর্বকালজয়ী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।^{৫৬}

হিমালয়কেন্দ্রিক জনজীবনের জীবিকা, স্বভাব, সংস্কৃতি ও বিশেষ বিশেষ সম্পদায়ের কাজের ধরন, আচার-আচরণ সমন্ধে প্রবোধকুমার আলোকপাত করেছেন। চাষ-বাস, পোশাক-আশাক, নারী-পুরুষের কাজের বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য, দাম্পত্য সম্পর্ক, আতিথ্যতা, সবই ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন লেখক। এসব বিষয়ে তিনি জানান:

বহরের মধ্যে আট নয় মাস পাহাড়ী শহরগুলিতে মোট বয়, পথে পথে রাত্রি কাটায়। ... ওরা মানুষ হয়ে জন্মায়, কুলী হয়ে মরে। ...ছেলোরা বড় হতে পারলে চোখ পড়ে পল্টনের দপ্তরে, মেয়েরা বয়স্থা হলে 'কেটি' হয়ে যাবার কামনা করে রাজসংসারে। ওদের প্রধান জীবিকা হলো পরের জন্য খাটা। ...মাঝে মাঝে কাশ্মীরী মেয়েরা সামনে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইছে। ...একটি মাত্র মোটা পোশাক ওদের সম্বল, সেটি জলে ভেজালে কোনোমতেই ওদের চলবে না। ...বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি আঁচড়ায়, বরনা কাছাকাছি পেলে সেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে, -তারপর শস্য ফলায়।^{৫৭}

এসব কথার দ্বারা হিমালয়ের আশেপাশের জীবন ও সমাজচিত্র উঠে এসেছে প্রাণবন্ত হয়ে। পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের আচরণের মধ্যে সত্যতা, ন্যায়, সত্য আছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। তারা পর্যটকদের সাথে কোনোরূপ বিমাতাসুলভ আচরণে লিপ্ত হয় না। নারীদের সিঁদুর পরিহিত শোভা বাঙালি নারীর মতোই। ঘর নির্মাণ করে সবাই প্রায় একই রকমভাবে। তাতে থাকে শিল্পের ছোঁয়া। হিমালয়ের সর্বত্র পর্যবেক্ষণ করে তিনি জানান:

বিরোধ কোথাও নেই। সংসার যাত্রা নিরীহ। মানুষের মুখে কোনো উত্তেজনা দেখিনে, ছুটেছে না কেউ, তাল ঠুকছে না কোনো প্রতিযোগী, কর্মব্যস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিন্যকে দাঁড়াতে দেয় না। ... গ্রামের নর-নারী অতি সদাশয় ও অতিথিবৎসল। ...বাঙালী মেয়ের স্বভাব ছুঁয়ে রয়েছে ওদের সর্বত্র। ...একটি বাড়ির সুন্দর কাঠের কারুকার্য-সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে।^{৫৮}

কাশ্মীরের ভাষাকে লেখক কাশ্মীরি 'বোলি' বলে অভিহিত করেছেন। এবং আমাদের ভাষার মতো তাঁর রয়েছে বংশানুগত শ্রেণিবিন্যাস। প্রবোধকুমারের মতে এই কাশ্মীরি 'বোলির উৎপত্তি হলো সংস্কৃত থেকে। এর সঙ্গে হিন্দি আর উর্দু দুই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফার্সি।'^{৫৯} অবশ্য পরবর্তীতে রচনাবলি প্রকাশের সময় তিনি এই ভাষার উৎপত্তি নিয়ে আবার ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি লিপি এবং ভাষার মধ্যে মিল রাখতে পারেন নি। হিমালয়কেন্দ্রিক মানুষের সমূহ জীবনব্যবস্থা উল্লেখ থাকলেও এই গ্রন্থের প্রধান উপস্থাপ্য হিমালয়ের সৌন্দর্যচিত্র। হিমালয়কে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতার স্মারক বলেই বিবেচনা করেছেন। তাঁর নিকট হিমালয় বিশ্বায়ের অনুভূতি। হিমালয়ের বিপুল বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে তাই তিনি বলেন:

হিমালয় তার আপন স্বকীয়তা ও স্বভাবের বৈচিত্র্যে আমার কাছে পরম বিস্ময়জনক বিষয়বস্তু। ... আমার দৃষ্টি ছিল হিমালয়ের সামগ্রিক চেহারাটার দিকে। এর আনুপূর্বিক বিশালতাকে আমার মনের মধ্যে ধারণ করবো,-এই ছিল লক্ষ্য। ...হিমালয় কখনো ধূসর, উষর, কখনো বর্বর, কখনো বা রক্ষ। কখনো সে রূপলোচন, কখনো বা নিমীলিত নেত্র। তাকে কখনো দেখলে জ্বালা করে চোখ, কখনো চোখ দুটো মধুর তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনো সে হিংস্র শার্দূলে ভয়াল ভল্লকে অথবা উন্মত্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনো সে গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখরিত।^{৬০}

হিমালয়ের কোলঘেষা এসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন দেবতা-ঋষি-মানুষকে যুগ যুগ ধরে বিমোহিত করে আসছে তেমনি হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মন্দির ও দেব-দেউলগুলোর বিচিত্র শিল্প-স্থাপত্য আকৃষ্ট করে সমগ্র মানব জাতিকে। মাণ্ডির স্থাপত্য বিষয়ে তিনি বলেন: 'এ একেবারে নতুন, এর জাতি গোত্র সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। পৃথিবীর কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আত্ম-নিবেদন নেই; আনন্দ এবং সৌন্দর্যবোধের দিকে বৃহত্তর মানবতাকে অনুপ্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপত্য এবং

ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই; মহাজনতার আনন্দ এবং উদ্দীপনার জন্য তারা উৎসর্গিত।^{১৫} হিমালয় লেখককে নতুন করে ভাবায়। হিমালয়ের রূপ বর্ণনায় তিনি তাই বার বার রোমান্টিক কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে যান। লেখক অনুভব করেন তাঁর নতুন সত্তার জন্ম। দীর্ঘদিন হিমালয়ের কোলে অবস্থান করে লেখকের অভিমত এমন: ‘পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যে-পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়, সে হলো মুষ্টিভিক্ষার ঝুলি,—উপুড় করলেই তার শেষ হয়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা দেখেছি পায়ে-হাঁটা পথের দুই প্রান্তে—সেই তো পরম দর্শন, দরিদ্র দিনশ্রমিকের ঘরে বিদুরের অন্তর্গ্রহণকালে চারিদিকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেই তো পরমজ্ঞান।’^{১৬} এ বক্তব্য প্রবোধকুমার সান্যালের দার্শনিক মতবাদের উৎকৃষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। সব মিলিয়ে হিমালয় ভ্রমণ এবং হিমালয়কেন্দ্রিক জীবন ও বাস্তবতার যথার্থ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রবোধকুমার সান্যাল পাঠকের সাথে হিমালয়ের এক নিবিড় সান্নিধ্য সৃষ্টিতে সফলকাম হয়ে ওঠেন। সে বিচারে ভ্রমণগ্রন্থ হিসেবে *দেবতাত্মা হিমালয়* সার্থক।

উত্তর হিমালয় চরিত

পরিব্রাজকের পুরোধা সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের হিমালয়কেন্দ্রিক চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থ *উত্তর হিমালয় চরিত*। উত্তর হিমালয় চরিত-এর বিষয়বিন্যাস এবং পর্যটক হিসেবে প্রবোধকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বগ্রন্থ *দেবতাত্মা হিমালয়* থেকে খুব বেশি আলাদা না হলেও উপস্থাপনরীতিতে এই গ্রন্থ খানিকটা স্বতন্ত্র ধাচের। অব্যবহিত পূর্বগ্রন্থে হিমালয়ের অতুলনীয় নিসর্গ-সৌন্দর্যের কোলে আশ্রিত মানবগোষ্ঠীর জীবন-বৈচিত্র্য এবং চলতি পথে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনধারা লেখককে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। কিন্তু *উত্তর হিমালয় চরিত*তে লেখকের পরিণত বয়সের অর্থাৎ ষাট বছর বয়সের প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে পূর্বের সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টি, আবেগ-কল্পনা এবং দর্শনভাবনার উপস্থাপন তেমন করে নেই। এখানে এসে প্রবোধকুমারের মনন কিছুটা বিশ্লেষণী ও তথ্যসন্ধানী হয়ে উঠেছে।^{১৭} গ্রন্থটি হিমালয় সম্পর্কিত প্রমাণতথ্যে ভরপুর—সেইসাথে পরিব্রাজকের ব্যক্তিগত ও বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ।

এই গ্রন্থে লেখকের ভ্রমণ-অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য, পরিবেশগত বিবরণ, সমাজরূপ, লোকসংস্কৃতি ও ভাষা-ব্যবহারের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এ বিষয়সমূহকে ধারণ করতে গ্রন্থটিকে তিনি পঁচিশটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। পর্বগুলোর শিরোনাম দেখেই বোঝা যায় এর বিষয়বিন্যাস। বিষয়সূচিতে আছে সোলেমান-শিউয়ালিক-পীরপাঞ্জাব, সরস্বতী-শারদাস্থান, হিন্দুকুশ-হুনজা-গিলগিটকারাকোরাম, চিত্রল-পামীর-চিলাশ-বালতিস্তান, উত্তর কাশ্মীর, দেকশাহী-সোনামার্গ-বলতান-জোখিলা, দ্রাস-পুরিক-কার্গিল, লাদাখ-ফতুলা-লাসাউরু-খালাৎসে, খালাৎসে-সামপোল-রুপসু, রুপসু-লিকির বাজগো-নীমু-ফিয়াং-পিতুক, লেহ, আখাসাই ও আকসাই চিন, হেমিস গুমফা, লাদাখ রণাঙ্গনের পরিবেশ, লাদাখের পরিশিষ্ট, আধুনিক কাশ্মীর, শ্রীনগরের পরিবেশ, কাশ্মীরী মুসলিম শেখ আবদুল্লাহ, কাশ্মীর কাহিনি, হিন্দু-কাশ্মীরের শেষ অধ্যায়, কাশ্মীরে ইসলামের প্রথম পত্তন, আধুনিক শ্রীনগর ও ডা. করণ সিং, জম্মু-লাহুল-স্পিতি, কুলু-কাংড়া-পাঞ্জাব-চণ্ডীগড় এবং বুশাহর-রামপুর-মোহাসু হিমাচল রাজ্য। উপর্যুক্ত বিষয় নির্বাচন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের বৃহত্তর লেখনি চিন্তা। দীর্ঘ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে তিনি এসব অঞ্চলের জীবনকে ভাষারূপ দিয়েছেন শৈল্পিক আঁচড়ে।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এক ইংরেজ কর্মচারী উইলিয়াম মুরক্রফট-এর লেখা থেকে প্রবোধকুমার এই গ্রন্থে লাদাখ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা চিহ্নিত করেছেন এভাবে:

Ladakh is bounded on the north-east by the mountains (Kun-Lun) which divide it from the Chinese province of Khotan, and on the east and south-east by Radokh and Chanthan, dependencies of Lssa on the south by the British province of Bushahir and by the hill states of Kulu and Chamba.^{১৮}

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রবোধকুমার এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশ ও জাতির উৎপত্তি ও সীমারেখার সন্ধান করেছেন। সপ্তম শতকে চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ ভারতবর্ষে আসেন এবং তিনি কাশ্মীরের পুরো ইতিহাস রচনা করেন। মধ্যযুগে উত্তর হিমালয়ে হিন্দু রাজাদের অমানবিক শাসন-শোষণ সমন্ধে তিনি জানান: ‘প্রজাপীড়ন, জনশোষণ, দুর্নীতি, বর্ণবিদ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, স্বৈচ্ছাচার এবং সর্বব্যাপী অরাজকতা—এগুলি যুগ-যুগান্তকালের উত্তর হিমালয়ের হিন্দু নরপতিগণের ইতিহাস’^{৬৬}। যিশুখ্রিস্ট যে হিমালয় ভ্রমণে আসেন এবং ত্রুশবিন্দু হওয়ার পর তিনি কাশ্মীরে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এ বিষয়ে প্রবোধকুমার জানান: ‘শ্রীনগরের নিকটবর্তী খানা-ইয়ারি নামক একটি অঞ্চলে অদ্যাবধি যীশুখ্রিস্টের সমাধিমন্দির দেখা যায়’^{৬৭}। পাখতুনদের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদে লেখক বলেন: “সেকালে গান্ধারের অধিবাসীগণকে বলা হতো ‘পাকতাইক’ এবং এর থেকেই পাখতুনদের উৎপত্তি”^{৬৮}। ব্রিটিশদের ভারতশাসন, তাদের ভোগ-লালসা এবং তাদের দূরভিসন্ধি নিয়ে লেখক বেশ সচেতনভাবেই জানান: ‘গিলগিট’ এজেন্সিতে ইংরেজ বসেছিল শুধু কাশ্মীরকে পাহারা দেবার জন্য নয়, ভারত সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রেখে নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করার জন্য’^{৬৯}। এরকম করে তিনি উখীমঠ, দেবীশারদাস্থান, গঙ্গাবল্লভদসহ বিভিন্ন স্থানের পৌরাণিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

প্রবোধকুমার ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি হিমালয়ের গ্রাম্য জনপদের বিচিত্র সমাজরূপ ও লোকসংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহমত পোষণ করে আমরাও বলতে পারি কোনো অঞ্চলকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে সবার আগে সে অঞ্চলের সমাজ ও লোকসংস্কৃতি সমন্ধে জ্ঞান থাকা জরুরি। হিমালয়ের বিভিন্ন লোকজীবনের মধ্যে বুন্জি, গিলগিট, চিত্রল, ইয়াসিন ও টিলাস অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনচেতা। তারা যাযাবর শ্রেণির মানুষ—এরা ‘দর্দ’ নামে পরিচয় বহন করে। ‘সমাজ-ব্যবস্থা, পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা, নৈতিক মান-এসব দায় এদের কম’^{৭০}। বালতিস্থানের মানুষেরা ‘ভোউ’ বলে পরিচিত। ‘ভোউরা মানুষ হয়ে জন্মায় এবং পশুর জীবন যাপন করে মরে’^{৭১}। লাদাখ অঞ্চলের প্রায় সবাই বৌদ্ধ। তাদের জীবন-ব্যবস্থায় অধ্যাত্ম-ভাবনা ও নিজস্ব দর্শনচর্চা প্রধান। সেখানকার নারীরা বহু পুরুষ বরণ করে। ‘লাদাখের সাধারণ মেয়ের মাথায় থাকে টুপি, পিঠে থাকে ভেড়ার লোমওয়ালা গোটা একটা ছাল। এসবই শরীরের উত্তাপ রক্ষার উপায় মাত্র। এরা ভেড়া-ছাগল পোষে আর একই সঙ্গে বাস করে। দরিদ্রের কোনো দ্বিতীয় পরিচ্ছদ নেই’^{৭২}। আবার অন্যদিকে লেহ শহরের বৈচিত্র্য বড়ই ভিন্ন। সেখানে ধর্মভিত্তিক জাতিত্বের মিশ্রণরূপ লক্ষণীয়। ‘একই পরিবারে বৌদ্ধ মুসলমান ও খ্রিস্টানের দেখা পাওয়া বিচিত্র নয়’^{৭৩}। এখানকার নারীরা বহুগামিনী হলেও ‘জমির ফলন এবং অর্থোৎপাদন—এদুয়ের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীধর্ম সংযুক্ত’^{৭৪}। আবার ভিন্নরূপও দেখা যায় কাংড়ার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। এখানকার চাঘী-গাদি-নাথাকোটিয়াও বাটেরাস সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণদের ‘পুরুষেরা অতি ভদ্র এবং নিরীহ। ওদের মেয়েরা যেমন সচ্চরিত্রা, তেমনি নম্র ও মধুর প্রকৃতির’^{৭৫}। কুলুর সাড়াজাগানো ‘দশহারা’ উৎসবে মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মোরগ, মাছ ও কাঁকড়া বলিদানের ব্যবস্থা আছে। তাদের নারীরা বহুগামী এবং পরিবার মাতৃশাসিত। কিন্নরের অন্যতম মেলা ‘ফুলেচ’—যে মেলায় মৃত আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ফুল উৎসর্গ করা হয়। উত্তর বালতিস্তান মূলত মুসলিম অধ্যুষিত। প্রবোধকুমারের মতে তাদের ভাষা ‘মিশ্রিত তুর্কি, দার্দু এবং পাহাড়ি, কিন্তু কান পেতে তাদের কথা শুনলে আরবী-পারসিক ফোড়নের ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায়’^{৭৬}। এই গ্রন্থে লেখক সহজ-সরল ভাষায় বিভিন্ন তথ্যের ও তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন যা নীরস ও বৈচিত্র্যহীন না হয়ে আলোকচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যে কারণে উত্তর হিমালয় চরিত পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

প্রবোধকুমারের হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্য থেকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর হিমালয় ভ্রমণের উদ্দেশ্য। শ্বেতশুভ্র হিমালয়ের অকৃত্রিম রূপ ও অসামান্য সৌন্দর্য অবগাহনে লেখকের চেতনাজগতে সৃষ্টি হয় নতুন

উপলব্ধি ও ভিন্ন বোধ। এছাড়াও তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে উঠে এসেছে হিমালয়কেন্দ্রিক অঞ্চলের মানুষ, তাদের জীবন-জীবিকা, লোকসংস্কৃতি আর প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা। প্রবোধকুমার সান্যালের অধ্যাত্মভাবনা, ইতিহাসচেতনা আর আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতার যথাযথ প্রয়োগে তাঁর রচিত ভ্রমণ-সাহিত্যে দেশপ্রেম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবনা, পরিভ্রমণের স্বতঃস্ফূর্ততা উঠে আসার পাশাপাশি হিমালয়কেন্দ্রিক জনজীবনে প্রচলিত পৌরাণিক ঘটনাবলিও মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর রচিত ভ্রমণ-সাহিত্য পাঠে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর পূর্বে রচিত হিমালয়কেন্দ্রিক সাহিত্যের তুলনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র পরিলক্ষিত।

তথ্যনির্দেশ

- ১ অজিতকুমার ভট্টাচার্য, *প্রবোধকুমার সান্যাল: জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১৬ব.), পৃ. ৫০
- ২ *ঋকবেদ সংহিতা*, ২য় খণ্ড, ১০ম কাণ্ড, ৩৬ সুক্ত, ১ ঋক (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৮৩ব.), পৃ. ৪৮৯
- ৩ *অথর্ববেদ সংহিতা*, ১৯ কাণ্ড, ১ অনুবাদক, ২ সুক্ত, ১ ঋক, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৮৫ব.), পৃ. ৫০৫
- ৪ *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৩য় অধ্যায়, ৫ সুক্ত, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ৩৭৩
- ৫ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কৈলাস ও মানস সরোবর*, ১ম সং. (কলকাতা: ১৩৮৪ব.), পৃ. ভূমিকাংশ দ্র.
- ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ অনু., *মহাভারত*, ২য় সং. (কলকাতা: স্বাক্ষরতা প্রকা., ১৩৮৩ব.), পৃ. ২৫৩
- ৭ *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ২য় খণ্ড-(কালিদাস), প্রধান উপদেষ্টা গৌরীনাথ শাস্ত্রী (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮), পৃ. ৩২১
- ৮ তদেব, পৃ. ২৫১
- ৯ তদেব, পৃ. ২২
- ১০ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, সুকুমার সেন সম্পা. (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী, ১৩৮২ব.), পৃ. ৮
- ১১ অজিতকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
- ১২ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, *অন্নদামঙ্গল কাব্য*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পা., ৩য় সং. (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৯ব.), পৃ. ৩০
- ১৩ মধুসূদন দত্ত, *তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য*, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পা. (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৫), পৃ. ১
- ১৪ *সংগীত সংরক্ষণ গ্রন্থমালা*, ১ম খণ্ড, স্বদেশ সংগীত, শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস সং. ও সম্পা. (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৮৪ব.), পৃ. ৬
- ১৫ অজিতকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
- ১৬ প্রবোধকুমার সান্যাল, 'আমার জীবন আমার ভ্রমণ', *দেশ: সাহিত্য সংখ্যা* (কলকাতা: ১৩৯০ ব.), পৃ. ৭১
- ১৭ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, সপ্তদশ মু., (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২), পৃ. ২০৬
- ১৮ প্রবোধকুমার সান্যাল, 'আমার জীবন আমার ভ্রমণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
- ১৯ প্রবোধকুমার সান্যাল, *বনস্পতির বৈঠক* (কলকাতা: ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৫৯
- ২০ প্রবোধকুমার সান্যাল, 'আমার জীবন আমার ভ্রমণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
- ২১ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, নিবেদন অংশ
- ২২ তদেব, পৃ. ৫
- ২৩ তদেব, পৃ. ২

-
- ২৪ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার দেখা প্রবোধকুমার', *কথাসাহিত্য*, (কলকাতা: শ্রাবণ, ১৩৬২ ব.), পৃ. ৮২৩
- ২৫ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
- ২৬ তদেব, পৃ. ১৪
- ২৭ তদেব, পৃ. ১৬
- ২৮ তদেব
- ২৯ তদেব
- ৩০ তদেব, পৃ. ২১
- ৩১ তদেব, পৃ. ৩৯
- ৩২ তদেব, পৃ. ৪৯
- ৩৩ তদেব, পৃ. ৫৩
- ৩৪ তদেব, পৃ. ৫৭
- ৩৫ তদেব, পৃ. ৬৬
- ৩৬ তদেব, পৃ. ৭০
- ৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
- ৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
- ৩৯ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'মহাপ্রস্থানের পথে', *কথাসাহিত্য* (কলকাতা: শ্রাবণ, ১৩৬২ ব.), পৃ. ৭৫৪
- ৪০ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
- ৪১ তদেব, পৃ. ১১৪
- ৪২ তদেব, পৃ. ১২১
- ৪৩ প্রবোধকুমার সান্যাল, *বনস্পতির বৈঠক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
- ৪৪ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
- ৪৫ তদেব, পৃ. ১২৭
- ৪৬ তদেব, পৃ. ১৫০
- ৪৭ অজিতকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
- ৪৮ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ৫ম সং. (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব., ১৩৬৩ ব.), পূর্বভাষণ, পৃ. ১
- ৪৯ তদেব
- ৫০ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ১ম খণ্ড ৫ম সং. (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব., ১৩৬৩ ব.), পূর্বভাষণ, পৃ. ৯
- ৫১ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
- ৫২ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ২য় খণ্ড, ৫ম সং. (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব., ১৩৬৩ ব.), পৃ. ৮০
- ৫৩ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
- ৫৪ তদেব, পৃ. ১৯
- ৫৫ অজিতকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
- ৫৬ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১৩
- ৫৭ তদেব, পৃ. ১০-১৩, ৮২-১০৩
- ৫৮ তদেব, পৃ. ১০৩-১১৮
- ৫৯ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
- ৬০ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৬

উ তদেব, পৃ. ১৫৩

ঊ প্রবোধকুমার সান্যাল, *দেবতাত্ত্বা হিমালয়*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

ঋ অজিতকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

ঔ প্রবোধকুমার সান্যাল, 'দেবতাত্ত্বা হিমালয়', *প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব., ১৩৮৬ব.), পৃ. ১১০

৫ তদেব, পৃ. ৩১৪

৬ তদেব, পৃ. ১৯৮

৭ তদেব, পৃ. ২৫১

৮ তদেব, পৃ. ৩৭

৯ তদেব, পৃ. ৬০

১০ তদেব, পৃ. ৬২

১১ তদেব, পৃ. ১৫৯

১২ তদেব, পৃ. ১৬০

১৩ তদেব, পৃ. ১৬১

১৪ তদেব, পৃ. ৩৩১

১৫ তদেব, পৃ. ৭৫

আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: এফএলএন এর ভূমিকা

ড. মো. ফজলুল হক*

Abstract: Algerian Nationalism has been formed by Algerian-French contrasts; stiffnesses between the French, the Berber and the Arabic language and culture; socialist as well as Islamic ideologies; and gendered symbols of Nationhood—and continues to evolve in the present manifestations taking place in Algeria. Algerian nationalism developed out of the efforts of a groups of Algerians who had gained access to French education and earned their living in the French sector. Often called assimilationists, they pursued gradualist, reformist tactics, spurned illegal actions, and were prepared to consider permanent union with France if the rights of Frenchmen could be extended to native Algerians. This group was roughly organized under the name Young Algerians and included Khaled Ben Hachemi who later became the first premier of the Provisional Government of the Algerian Republic. A new generation of Muslim emerged in Algeria at the time of World War I and grew to maturity during the 1920s and 1930s. Few wealthy Muslim families also had managed to insinuate themselves into the colonial system in the 1890s, established their perception to shape Algeria. However, the contribution of National Liberation Front (FLN) in the movement of Algerian Nationalism has been described in this paper.

ভূমিকা

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জাতীয়তাবাদের ধারণা এক হলেও সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা পৃথক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মিসরে উত্থিত প্রভাবশালী প্যান-আরববাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্যান-জাতীয়তাবাদ এবং আরব জাতীয়তাবাদ উভয়েরই এক রূপ ছিল। এই অঞ্চলে খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের উপস্থিতি আরও সীমিত, তবে লেবাননে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ইহুদিবাদ ধর্মীয় ও ইহুদি জাতীয়তাবাদের একরূপ প্রায় পুরোপুরি ইসরায়েল রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। National Liberation Front (FLN) স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হয়।^১ জনগণের দ্বারা সমর্থিত এফএলএন আলজেরিয়ানদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। Movement for the Triumph of Democratic Liberties প্রতিষ্ঠাতা সদ্যঅবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতীয়তাবাদী আহমেদ বেন মেসারি হাদজ আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৯৫৪-১৯৬২) এফএলএন প্রতিষ্ঠিত করেন। আহমেদ বেন মেসারি হাদজ সাধারণত মেসারি হাদজ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। ফরাসি উপনিবেশ থেকে তাঁর জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি নিবেদিত ছিলেন। তাঁকে প্রায়শই আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদের পিতা বলা হয়।^২ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। বিকল্প হিসেবে Algerian National Movement (MNA) তৈরি করা হয়। বিশ্লেষকদের মতে ফরাসিদের অর্থায়নে আঞ্চলিকভাবে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এফএলএন এর প্রচেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে লড়াই করার জন্য এমএনএ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের যুক্তি ছিল এফএলএন একমাত্র আলজেরিয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধি ছিল না।^৩ তিনি ফ্রান্সে আলজেরীয় প্রবাসীদের মধ্যে অতীতে সমর্থন পেয়েছিলেন এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষের মধ্যেও তাঁর সমর্থক ছিল। এফএলএন এর সশস্ত্র শাখা, আর্মি ডিলিবারেশন নেশনাল (এএলএন) যুদ্ধের প্রথম দিকে

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলজেরিয়ার ক্ষুদ্র সশস্ত্র দলগুলোকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল। এমএনএ এবং এফএলএন তথাকথিত ক্যাম্পে যুদ্ধে ফরাসী মাটিতে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় শতশত হতাহতের ঘটনা ঘটে। ক্রমান্বয়ে এফএলএন রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ প্রেক্ষিতে আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: এফএলএন-এর ভূমিকা শিরোনামে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণত ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রবন্ধটি রচিত।

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট [National Liberation Front, (FLN)]

ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট^৪ আলজেরিয়ার একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল। আলজেরিয়ান যুদ্ধের সময় (১৯৫৪-১৯৬২) ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এফএলএন) আলজেরিয়ার একমাত্র আইনগতভাবে বৈধ রাজনৈতিক দল। অপর রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আইনিকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।^৫ ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত অব্যাহত যুদ্ধের পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইভিয়ান চুক্তির^৬ মাধ্যমে ফ্রান্সের কাছ থেকে আলজেরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। আলজেরিয়ান গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্পেশাল অর্গানাইজেশন, আধা-সামরিক বাহিনীর জাতীয় মুক্তি সেনার বিজয়ী সদস্যগণ এফএলএন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইভিয়ান চুক্তি বাতিল করে আলজেরিয়াকে একদলীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে দাঙ্গা ও আলজেরিয়ান গৃহযুদ্ধের পরে (১৯৯১-২০০২) ইসলামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে এফএলএন ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়ান আইন সভা নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

উপনিবেশিক যুগে আলজেরিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের পর থেকে ক্রমবর্ধমান উপনিবেশবাদ বিরোধী আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রেক্ষাপটে এফএলএন এর পটভূমি সৃষ্টি হয়। আলজেরিয়ান শিক্ষাবিদ, ইসলামী সংস্কারক এবং আলজেরীয় মুসলিম ওলামা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আবদেলহামিদ বেন বদিসকে (৪ ডিসেম্বর ১৮৮৯-১৬ এপ্রিল ১৯৪০) গৃহবন্দি করা হয় এবং মার্শাল পেন্টের সরকার আলজেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি এবং আলজেরিয়ান পিপলস পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।^৭ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক ব্যস্ততা এবং তার আদর্শিক প্রচারকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের ধারণা ধীরে ধীরে পশ্চিমা মিত্রদের পক্ষে চলে যায়। আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মূল অনুভূতি ছিল ইউরোপের বিজয়কে দেশের স্বাধীনতা প্রচারের জন্য প্রতিফলিত করা। এরই প্রেক্ষিতে ফরহাত আকাস আলজেরিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে ইশতেহার জারি করেন।^৮ এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মেসালিহাদী Movement for the Triumph of Democratic Liberties (MTDL) নামে নতুন একটি পার্টি প্রতিষ্ঠিত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।^৯

জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী থাকলেও আলজেরিয়ান অ্যাসেমব্লির দ্বৈত নির্বাচনী কলেজ পদ্ধতিতে ফরাসী বসতি স্থাপনকারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান সংখ্যক (৬০ জন) প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়।^{১০} ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে এমটিডিএল এর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আরও সীমাবদ্ধ করা হয়। ফলস্বরূপ, আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীরা বিশেষভাবে সামরিক শক্তির পস্থা অবলম্বন করতে থাকে। এ এমটিডিএল একটি আধা-সামরিক উপাদান হিসেবে এবং আলজেরিয়ার রাজনীতিতে আহমেদ বেন বেগ্লা, হোচিন আট আহমেদ এবং মোহাম্মেদ বৌদিফ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

পরবর্তীতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আহমেদ বেন বেগ্লাকে গ্রেফতার করা হয়। এমতাবস্থায় সাময়িকভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে হস্তান্তরিত করে কিন্তু এই সংস্থার জঙ্গিদের দ্বারা Revolutionary

Committee of Unity and Action (CRUA) নামে একটি নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে এই দলে মোস্তেফা বেন বুলেদ, লার্বি বেন মহিদি, রাবাহ বিটাট, মোহাম্মদ বৌদিয়াফ এবং মুরাদ দিদুছে সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যের নেতৃত্ব দেয়। আগস্টে ক্রিম বেলক্যাসেম এবং গ্রীষ্মের পরে হোচিন আইট আহমেদ, আহমেদ বেন বেত্তা ও মোহাম্মদ খিদার এদের সাথে যোগদান করে।

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১১} এ দলটি প্রতিষ্ঠার পেছনে সিআরইউএ'র যথেষ্ট অবদান আছে। কারণ সিআরইউ এবং এমটিডিএল পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর এফএলএন আলজেরিয়ান যুদ্ধ শুরু করে।^{১২} ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি মুরাদ দিদুছেকে হত্যা করা হয়, লার্বি বেন মহিদি এবং রাবাহ বিটাট উভয়ই ফরাসিদের হাতে বন্দী হয়। আবনে রামদানকে এফএলএন-এর আলজিয়াস অভিযানের নিয়ন্ত্রণ নিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। আবনে রামদান একজন আলজেরীয় সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তিনি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠনে মূল ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রভাব এতটাই দুর্দান্ত ছিল যে তিনি বিপ্লবের স্থপতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন দক্ষ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।^{১৩} ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আলজেরিয়ার প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগঠন এফএলএন-এ যোগদান করে। তাছাড়া ছোট সংগঠনগুলো সহযোগিতা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রধান জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এফএলএন এর বাইরে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলটি হলো মেসালিহাদজের আলজেরিয়ান জাতীয় আন্দোলন (এমএনএ)। এই সময়ে এফএলএন অস্থায়ী সরকারে পাঁচ সদস্যের কার্যনির্বাহী ও আইন সভা নিয়ে গঠিত হয়। ওসমানীয় যুগের প্রশাসনিক সীমানা অনুসরণ করে আঞ্চলিকভাবে আলজেরিয়াকে ছয়টি wilayas সংগঠিত করে।^{১৪}

যুদ্ধের সময় এফএলএন এর সশস্ত্র শাখাকে বলা হয় জাতীয় মুক্তি সেনা (এএলএন)। এটি ফ্রান্স ও এমএনএ-এর সাথে আলজেরিয়ার লড়াই করে গেরিলা ইউনিটগুলোতে বিভক্ত ছিল। এই ইউনিটগুলো প্রতিবেশী সীমান্তবর্তী দেশ বিশেষত মরক্কোর এবং তিউনিসিয়া ভিত্তিক ছিল এবং এএলএন বাহিনী অনুপ্রবেশ করে সীমান্ত পেরিয়ে অস্ত্র সরবরাহ চালিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রামীণ গেরিলা বাহিনীর তুলনামূলক কম পদক্ষেপ নেয়। এই ইউনিটগুলো পরবর্তীকালে এফএলএন-এর নির্বাসিত সরকার Provisional Government of the Algerian Republic (GPRA)-এর রাজনৈতিক ক্যাডারগুলোর শক্তিশালী বিরোধী হিসেবে সেনা কমান্ডার কর্নেল হৌরি বোমেডিনের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় এবং তারা শেষ পর্যন্ত আলজেরিয়ার রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৬,০০০ আলজেরীয় বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৩,০০০ জনেরও বেশি নিখোঁজের জন্য এফএলএনকে দায়ী করা হয়।^{১৫} ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ যুদ্ধ বিরতির পরে এফএলএন ৬০০,০০০ থেকে ৭০০,০০০ গণহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হয়।^{১৬} ফরাসি সেনাবাহিনীতে চাকরি করা মুসলিম আলজেরিয়ানদের প্রত্যাশন করতে ফরাসি সরকার অস্বীকার করে।^{১৭}

স্বাধীনতা এবং একদলীয় রাষ্ট্র

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত স্বাধীনতায়ুদ্ধ অব্যাহত ছিল। ফরাসী সরকার শেষ পর্যন্ত এফএলএন-এর সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। একই বছর জুলাইয়ে আলজেরীয় জনগণ ফ্রান্সের সাথে গণভোটে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন করে উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা সমর্থন করে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অনুসরণ করে এবং এফএলএন দেশের নিয়ন্ত্রণ দখল করে। এমএনএ এবং কমিউনিস্ট সংগঠনের মতো রাজনৈতিক বিরোধিতা নিষিদ্ধ ছিল এবং আলজেরিয়াকে একদলীয় রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করা হয়। এফএলএন আলজেরিয়ার একমাত্র আইনীগতভাবে শাসক দলে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার পরপরই দলটি তীব্র অভ্যন্তরীণ শক্তির লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। রাজনৈতিক নেতারা দুটি মহাশিবিরে বিভক্ত ছিল। সীমান্ত সেনাবাহিনী দ্বারা সহায়তা পাওয়া উগ্র আহমেদ বেন বেগ্লা'র গঠিত একটি পলিটিক্যালব্যুরো সাবেক প্রবাসী সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয় এবং বোমাদিউনের সেনাবাহিনী দ্রুত প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে বেন বেগ্লাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে। একক শক্তিশালী রাজনৈতিকদল হিসেবে সাবেক এএলএন থাকলেও এর প্রধান নির্বাসন থেকে অনেকাংশে বিদ্রোহ ছড়ানোর চেষ্টা করলেও সংগঠিত হতে পারেনি বরং আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী গেরিলা এবং অন্যান্যদের দ্বারা কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বামেলাডিন এবং বেন বেগ্লার মধ্যে উত্তেজনা একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। বেন বেগ্লা কর্নেলের নিকটতম সহযোগী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদেলআজিজ বোতেফ্লিকাকে^{১৮} (Abdelaziz Bouteflika) বহিস্কার করেন। পরিসংখ্যানবাদী-সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ বিরোধী বোমাদিউন ডিক্রি জারী করে বিপ্লবী শাসনের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবস্থা বজায় রেখে তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এফএলএনকে ব্যবহার করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বোমাদিউন দলীয় নেতৃত্বের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন, এই সময় সেনাবাহিনীর পরবর্তী প্রার্থী কর্নেল চাদলি বেনজেনীদের নেতৃত্বে দলটি পুনর্গঠিত হয়। এফএলএন কেন্দ্রীয় কমিটিতে সামরিক বাহিনীর ভাল প্রতিনিধিত্ব থাকায় দেশের সত্যিকারের শাসনের ফলে অসং উপার্জনকারী এবং দুষ্কৃতিকারীরা ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে। ১৯৮০-এর দশকে এফএলএন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে মুক্তবাজার সংস্কার করলে বোমাদিউনএর ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়।

বহুদলীয় যুগ

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপক বিক্ষোভ ও দাঙ্গার কারণে দেশকে বড় রাজনৈতিক সংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়। এমতাবস্থায় সংবিধান সংশোধন করে বহুদলীয় ব্যবস্থার অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে এফএলএনকে পরাজিত করে Islamist Islamic Salvation Front (ISF) এর অর্ধশতাব্দিক স্থানীয় কাউন্সিলর বিজয় অর্জন করে। এফএলএন মোট ভোটের এক চতুর্থাংশ ভোট পেয়ে কিছু সংখ্যক কাউন্সিলের আসন লাভ করে। পরের বছর সংসদীয় নির্বাচনে আইএসএফ ২৩১টি আসনের মধ্যে ১৮৮ আসন পেয়ে বিস্ময়কর জয়লাভ করে। এফএলএন কেবল মাত্র ১৫টি আসনে জয়লাভ করে সমাজতান্ত্রিক বাহিনী ফ্রন্টের পিছনে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে। ইতোমধ্যে দুর্বল এফএলএন সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে আলজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। আলজেরিয়া বেশ কয়েক বছর ধরে সরাসরি সামরিক শাসনের অধীনে থাকে। যুদ্ধের প্রথমদিকে দলটি সরকারের বিরোধী ছিল, বিশেষত ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে Sant' Egidio Platform এ স্বাক্ষর করায় সামরিক প্রতিষ্ঠানের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি গঠিত সান্টেজিদিও প্ল্যাটফর্মটি ছিল বেশিরভাগ আরজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসানের পক্ষের লোক দ্বারা তৈরী। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীর আইন সভা বাতিল করার ফলে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও চরমপন্থা উস্কে দেয়া Islamic Salvation Front (FIS) একটি ইসলামপন্থী দল প্রতিষ্ঠার আশা করে। রোমের জিডিও ক্যাথলিক সম্প্রদায় এদরে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে। এই সমপ্রদায় ইতোপূর্বে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের রোম শান্তি চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে মোজাম্বিকের গৃহযুদ্ধের অবসান করেছিল। এই প্ল্যাটফর্মে এফআইএস, এফএলএন এবং এফএফএস (সমাজতান্ত্রিক বাহিনী ফ্রন্ট) প্রতিনিধিদের উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তিনটি দল সম্মিলিতভাবে ৮০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় লাভ করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা, সংগ্রাম এবং নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে সমর্থন করে। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হওয়ার পরে এফএলএন প্রথমে তার

অবস্থানে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের সংসদ নির্বাচনে এটি তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৪% ভোটগ্রহণ করে ২৩১টি আসনের মধ্যে ৬৯টিতে জয়লাভ করে। পরবর্তীতে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ৩৮৯টি আসনের মধ্যে ১৯৯টি আসনে জয়লাভ করে বিজয় অর্জন করে।^{১৯} ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দল থেকে আলী বেনফ্লিসকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়। তিনি নির্বাচনে আবদেলআজিজ বোতেফ্লিকার সাথে দ্বিতীয় হন, তবে নির্বাচনে মাত্র ৬.৪% ভোট কাস্ট হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে এফএলএন রাষ্ট্রপতি জোট গঠনের জন্য National Rally for Democracy (RND) এবং Movement of Society for Peace (MSP) এর সাথে সমঝোতা করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের সংসদ নির্বাচনে পূর্বের অবস্থানহ্রাস পেয়ে এফএলএন ১৬৩টি আসনে জয়লাভ করে। এফএলএন-এর আবদেলআজিজ বেলখাদেম প্রধানমন্ত্রী হন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আবদেলআজিজ বোতেফ্লিকা এফএলএন এর প্রার্থী হিসেবে ৯০% ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন।^{২০}

২০১২ খ্রিস্টাব্দে এমএসপি প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যালায়েন্স ত্যাগ করে Green Algeria Alliance জোটে যোগদান করে। তা সত্ত্বেও ২০১২ খ্রিস্টাব্দের সংসদ নির্বাচনে ৪৬২টির মধ্যে ২০৮টি আসন লাভ করে এফএলএন বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বোতেফ্লিকা এফএলএন প্রার্থী হিসেবে ৮২% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রবীণ এবং অসুস্থ বুতেফ্লিকা ব্যাপকভাবে সর্বাধিক জনপ্রিয় একজন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রায়শই আলজেরিয়ার কাছে তিনি ‘ছায়াময়’ জেনারেল এবং গোয়েন্দা অফিসারদের সম্মিলিতভাবে প্রেরণার উৎস হিসেবে le pouvoir (শক্তি) নামে পরিচিতি লাভ করেন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ইকোনমিস্টের লেখায় “এ সময় আলজেরিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হলেন মোহাম্মেদ মেদিনী (Mohamed Medienne), যিনি তৌফিক নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। প্রায় দুই দশক ধরে তিনি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন”।^{২১} ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের সংসদ নির্বাচনে এফএলএন ৪৬২টি আসনের মধ্যে ১৬৪টি আসনে জয়লাভ করে, ৪৪টি আসন হাত ছাড়া হয়ে যায়। আরএনডি ১০০টি আসন লাভ করে সফলতার পরিচয় দেয়।^{২২}

ইহুদি আলজেরিয়া সম্পর্ক

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া উপনিবেশিক যুগে আলজেরিয়ার ইহুদিদের ফরাসি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।^{২৩} ফরাসিরা মুসলমানদেরকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে। আলজেরিয়ার ইহুদিদেরকে ফরাসি-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যস্থতা হিসাবে দেখা হয়, তবে মুসলমানদের পক্ষে নাগরিকত্বের অভাব দুই দশকের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।^{২৪} আলজেরিয়ান যুদ্ধের সময় ইহুদিরা অনুভব করে তারা হয় আলজেরিয়ান না হয় স্বাধীনতার জন্য এফএলএন এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। যারা ফরাসী ছিল তারা আলজেরিয়াকে উপনিবেশ হিসেবে রাখতে ফরাসিদের সাথে লড়াই করে। আলজেরিয়ান যুদ্ধের শুরুতে এফএলএন ইহুদিদের তাদের সাথে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল আলজেরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করলে ইহুদিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এফএলএন এবং তাদের সমর্থকদের হতাশার জন্য আলজেরিয়ার বেশিরভাগ ইহুদি ফরাসি সরকারের পক্ষে ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন আলজেরিয়ার ইহুদিরা অনুভব করতে শুরু করে, এফএলএন কেবল আলজেরিয়ায় বসবাসকারী ফরাসী লোকদের নয়, ইহুদিদের লক্ষ্য করছে। এর ফলে এই অঞ্চলে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।^{২৫} যুদ্ধের পরে আলজেরিয়ার নাগরিকত্ব কেবলমাত্র সেই মুসলমানদের মধ্যেই প্রসারিত হয়েছিল যাদের এফএলএন ফরাসী সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সময় পিতামহ ও পিতামহীরা মুসলিম ছিল।^{২৬} আলজেরিয়ান ইহুদিদের আর আলজেরিয়ান হিসেবে বিবেচনা করা হতো না, তবে তারা এখনও ফরাসী নাগরিকত্ব ধরে রেখেছে। তাদের ফরাসী নাগরিকত্বের কারণে আলজেরিয়ার বেশিরভাগ ইহুদী ফ্রান্সে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে। কিছু সংখ্যক ইহুদি ইসরায়েল চলে যায়। অল্প কিছু সংখ্যক ইহুদী এফএলএন-এর শাসনে আলজেরিয়ায় থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

এফএলএন এর লক্ষ্য ও আদর্শ

এফএলএন এর আদর্শ মূলত আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদ এবং বৃহত্তর আরব জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে প্যান-আরব সংহতি বজায় রাখাকে বোঝায়। এফএলএন মূলত রাজনৈতিক ও আইনসিদ্ধ তিনটি উৎসকে আকর্ষণ করে। প্রথমত: জাতীয়তাবাদ, আলজেরিয়ার বৈপ্লবিকযুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, দ্বিতীয়ত: সমাজতন্ত্র, স্বাধীনভাবে শোষণবিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকা; তৃতীয়ত: ইসলাম, জাতীয় চেতনার মূলভিত্তি হিসেবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ইসলামী চেতনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা। এটি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র এবং আদর্শিক ধারার সমন্বয়ে গঠিত "ফ্রন্ট" হিসাবে এক শাস্ত্রীয় আলজেরিয়ান রাষ্ট্রের ধারণা ধীরে ধীরে নিজেকে প্রসারিত করে। এফএলএন আলজেরিয়ার মুক্তির দিকে যেমন মনোনিবেশ করেছিল তেমনি স্বাধীনতার সময় একটি পৃথক দলীয় আদর্শের বিকাশ ঘটিয়েছিল। পরবর্তীতে আলজেরিয়ার প্রায় ৫০% বার্বার ভাষাভাষি আলজেরিয়ানের তীব্র বিরোধিতার কারণে স্বাধীনতার পরপরই আন্দোলনের বিভাজন ঘটে। হোসিনআইট আহমেদ (HocineAït Ahmed) বার্বারবাদী এবং গণতন্ত্রপন্থী Socialist Forces Front (FFS) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উপনিবেশবাদবিরোধী ও ইসলামবাদ

সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এফএলএন গঠন পরবর্তীকালে ইসলামী আন্দোলনের সময় সরকারিভাবে উপনিবেশবাদ বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হয়।^{২৭} সংবিধানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনটি বিভাগীয় কাউন্সিলে ফরাসী বসতি স্থাপনকারীরা ৮০% সদস্যপদ লাভ করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে পৌরসভা পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত মহানগরীতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলিম জনসংখ্যার ৫% ভোট প্রদানের সুযোগ দিয়েছিল, এ সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে ২৫% বৃদ্ধি করা হয়।^{২৮} সুতরাং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, যা আলজেরিয়ার বিদেশী নীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসাবে বহাল থাকে।

বিভিন্ন সময়কালে সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কারণে আলজেরিয়ার রাজনীতিতে ইসলাম ধর্ম তার আধিপত্য বজায় রেখেছে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মোকরানী বিদ্রোহের অপমানজনক ব্যর্থতা সমাজে ইসলামপন্থী অনুভূতিকে সহজ করেছিল, কারণ জনগণ সাধারণত ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামকে দীর্ঘস্থায়ী এবং কখনও অদৃশ্য হওয়া প্রতীকী বিরোধী হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লিবিয়ায় ইতালিয়ান আত্মসন মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিচয় জোরদার করে। এ দুটি ঘটনা একত্রে ইসলামী সংস্কৃতিকে উপনিবেশবাদের বিরোধী বক্তব্যকে একীভূত করে।^{২৯}

জামাল আল-দীন আল-আফগানি (১৮৩৮-১৮৯৭), মোহাম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫) এবং রশিদ রিদা (১৮৬৫-১৯৩৫) এর মত ধর্মীয় পণ্ডিতদের নেতৃত্বে ইসলামী উপদেশ লক্ষণীয়ভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাবকে রাজনৈতিকভাবে সুদৃঢ় করে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে প্রতিহত করা এবং শরিয়্যাভিত্তিক একটি ইসলামী দেশ প্রতিষ্ঠা করাই আলজেরিয়ান উলামাদের মূল লক্ষ্য ছিল।^{৩০} এই আন্দোলনটি নাস্তিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির বিস্তৃত ধারণার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আলজেরিয়ান যুদ্ধের সময় ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হিসেবে কাজ করে। তবুও স্বাধীনতার পরে দলটি বাস্তবে ইসলামের একটি আধুনিকতাবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আলজেরিয়ান সমাজের সামাজিক রূপান্তর, নারী মুক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি সমর্থন করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল ছাদলি বেভজেদিদ (Col.ChadliBendjedid) ক্ষমতায় আসার আগে, বিগত ২০ বছরে ইসলামী আন্দোলন সফলভাবে সরকার কর্তৃক তদারকি ও পরাধীন হয়ে পড়েছিল, তবে ইরানি বিপ্লবের চেতনা পুনরায় আন্দোলনকে চাঙ্গা করে এবং রাষ্ট্রকে আরও বড় হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পর ১৯৬৫-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্নেল হুয়ারি বৌমেদিনি (Col.HouariBoumédiène) অধীনে দলীয়-শাসন ব্যবস্থার জন্য বৈধতা দেওয়ার কারণ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবুও ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করায় তিনি আলজেরীদের নিকট প্রসংশিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরী আহমেদ বেন বেল্লা (১৯৬৫-১৯৭৮) শাসন ব্যবস্থায় ইসলামের প্রতি আরও অনুরাগি ছিলেন, যদিও তিনি একজন ইসলামী কর্মীর চেয়ে আরবজাতীয়তাবাদী হিসাবে বেশি বিবেচিত হতেন। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ অবধি, বেভজেদিদ ক্রমবর্ধমান ইসলামপন্থীদের বিরোধীতা প্রশমিত করার প্রয়াসে ধর্মীয় রক্ষণশীল আইন পুনরায় চালু করেছিলেন। আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে দলের অবস্থান আলজেরীয় ইসলামকে প্রধান প্রভাব হিসাবে দাবি করার মতই অব্যাহত থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অহিংস ইসলামপন্থী দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে এবং তাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রেও ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (এফআইএস) এবং অন্যান্য ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর উগ্র-মৌলবাদী ধর্মীয় শিক্ষার তীব্র নিন্দা করেছে।

এফএলএন ও সামাজতন্ত্র

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ওয়ার্নিয়ার আইন প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোর একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ, যা পৃথকভাবে সম্প্রদায় ভিত্তিতে জমিবিক্রি করার অনুমতি দিয়ে আলজেরিয়ার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক শক্তি, শ্রেণী কাঠামোর অবসান এবং পরবর্তীতে এফএলএন-এর জনপ্রিয়তা হ্রাস করার জন্য সমাজতান্ত্রিক এজেন্ডার মূল লক্ষ ছিল।^{১৬} উল্লেখ্য ওয়ার্নিয়ার আইন প্রণেতা আগস্ট হুবার্ট ওয়ার্নিয়ার (Auguste Hubert Warnier) ছিলেন একজন ফরাসি মেডিকেল চিকিৎসক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ। পেশাগত দায়িত্ব পালনে তিনি বেশিরভাগ সময় আলজেরিয়াতে কাটিয়েছেন। প্রথমে তিনি একজন সেন্ট-সাইমনীয় ছিলেন এবং স্থানীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল বার্বারদের শরীরে জার্মানিক রক্ত, যা রোমান এবং খ্রিস্টান উৎস থেকে উদ্ভূত, তাই সহজেই ফরাসি সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রথমদিকে আরব অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। পরে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন যে আদিবাসিরা আলজেরিয়ার এক সময়ের উর্বর পরিবেশকে ধ্বংস করে ফরাসি উপনিবেশের প্রবক্তা হয়ে ওঠে এবং নেপোলিয়নের আরব কিংডম নীতির বিরোধিতা করে। ওয়ার্নিয়ার শেষ বছরগুলোতে আলজেরিয়ার জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি এমন একটি আইনের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন যা উনিবেশবাদীদের কাছে জমি বাজেয়াপ্ত বা জোরপূর্বক বিক্রয়ের অনুমতি দেয়। তার এই নীতিটিই ওয়ার্নিয়ার আইন নামে খ্যাত। এফএলএন আহমেদ বেন বেল্লার সময়কালে জঙ্গিবাদী সমাজতন্ত্রকে প্রতিফলিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকের মুক্তির জন্য একটি নতুন সমাজ উদ্ভাবন করার বিষয় বিবেচনা করেন।^{১৭}

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এফএলএন মতাদর্শগত বিতর্কমূলক এবং বিতর্কিত বিষয়গুলো পরিহার করে চলতে থাকে। বৈশ্বিক পটভূমি, কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট, স্নায়ুযুদ্ধ ইত্যাদির কারণে আলজেরিয়া তৃতীয় বিশ্বে আদর্শিক সংঘাতের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত হয়। বেন বেল্লা এবং বোমেডিয়ার নেতৃত্বে এফএলএনের মতাদর্শগুলো দেশীয় ইসলামিক চাপের পাশাপাশি মূলত অর্থনৈতিক সংস্কার, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং স্বীকৃতি লাভের জন্য দেশের মৌলিক চাহিদা দ্বারা রূপান্তরিত হয়।^{১৮}

আলজেরীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মারাত্মক অর্থনৈতিক পরিণতির মুখোমুখি হয়ে ৮০০০ গ্রাম এবং কয়েক মিলিয়ন একর জমি ধ্বংস হয়।^{১৯} এই ক্ষেত্রে এফএলএন লেনিনবাদী ও কর্পোরেট কাঠামোর মাধ্যমে

সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় বেন বেত্তা শিল্প ও কৃষিজাত ব্যবসায় প্রবেশকারী মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অটোজেশন চালু করেন। আহমেদ বেন বেত্তা এবং এফএলএন-এর সমর্থকরা ধর্ম এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রকে সংহত করার জন্য একটি জনপ্রিয় বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়ে এফএলএন দলটিকে পুনর্গঠিত করা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের একটি লক্ষ্য ছিল।^{৩৫}

আলজেরিয়ার ওলামা এবং অন্যান্য ঘরোয়া রক্ষণশীলদের দ্বারা চ্যালেঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে বেন বেত্তার ইসলামবাদ-বুঁকি নীতির তীব্রতা নিয়ে সমালোচনা করে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখে এফএলএন তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনের নীতিগুলোকে বজায় রাখে। সমাজতন্ত্রবিরোধী এবং সাম্যবাদবিরোধীরা পরবর্তীতে এফএলএনের মতাদর্শগত পরিবর্তনকে বৌমাদিনের বামপন্থী এজেভার প্রতি কয়েদ আহমেদের বিরোধিতা দ্বারা চিত্রিত করে। ফলে ধনী ভূমি মালিকদের ক্ষতি হলেও ধর্মাবলম্বীরা ভূমিতে নিজেদের অধিকার রক্ষা করেছিল এবং ইসলামী আন্দোলনকে ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্নেল ছাদলি বেভজিদিদের নেতৃত্বাধীন সরকার সমষ্টিগত মতাদর্শের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিল কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বেভজিদিদ এবং তার উপদেষ্টা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।^{৩৬} একবিংশ শতাব্দীতে এফএলএন সমাজতান্ত্রিক অলঙ্কারিক বক্তব্য থেকে দূরে সরে আসে এবং সর্বাধিক জনপ্রিয়তা এবং জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রহসর হয়।

এফএলএন ও সাম্যবাদ

সংগঠনটি প্রথমে সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল, কিন্তু আরব সমাজতন্ত্রের ধারায় এটি বুঝতে পেরেছিল এবং গৌড়া মার্কসবাদের বিরোধিতা করেছিল। আলজেরীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বকে সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, এমনকি পার্টির শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকটি মতাদর্শকে মার্কসীয় বিশ্লেষণ দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করা হয়েছিল। মার্কসবাদী পরিভাষাটি সাধারণত ফ্রান্সের সাথে বিরোধের ক্ষেত্রে দলীয় মৌলনীতির দ্বারা পুনরায় ব্যাখ্যা করা হয়। উপনিবেশকে অর্থনৈতিক শোষক-অত্যাচারী এবং জাতীয় শত্রু হিসেবে ফরাসিপন্থী অভিজাতদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এফএলএন বাস্তববাদী কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছু সাম্যবাদী নেতাকর্মীকে তার পদে অন্তর্ভুক্ত করেছিল কিন্তু যুদ্ধের পরে এফএলএন থেকে আলাদাভাবে সংগঠিত করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এরপরে এফএলএন দ্রুত মস্কোপন্থী আলজেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (পিসিএ) নিষিদ্ধ করে। এর পরেই এফএলএন-এর অধীনে স্বতন্ত্র আলজেরিয়া একদলীয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরবর্তীতে অনেক কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন পর্যায়ে এই সরকারে সহযোগিতা করে। বেন বেত্তা এবং বোমেডিন ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে Socialist Vanguard Party (PAGS) এফএলএনের সাথে সহযোগিতা ও কৌশলগতভাবে পরামর্শ করে এফএলএনকে দেশের একমাত্র বৈধ দল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।^{৩৭}

উপসংহার

উপনিবেশবাদের অবসানের পরে আলজেরিয়ার ইতিহাসের কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। ১৯৯০-৯৬ খ্রিস্টাব্দে এফএলএন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিকভাবে একটি আদর্শিক রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আলজেরিয়ার রাজনীতি সংবিধানের আধা-রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের কাঠামোয় সংঘটিত হয়। যার মাধ্যমে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব ফপালন করবেন। নির্বাহী ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়। আইন সভার ক্ষমতা সরকার এবং সংসদের দুই কক্ষ পিপলস ন্যাশনাল এসেমবলি এবং নেশনস কাউন্সিল উভয়ের হাতে ন্যস্ত। ফ্রান্সের কাছ থেকে আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী

যুদ্ধের উত্তরাধিকার হলো একটি শক্তিশালী সামরিক ও সুরক্ষা যন্ত্রপাতি। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে ক্ষমতাসীন এফএলএন ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে রাজনৈতিক বক্তৃতা, প্রতিবাদ ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন বয়কট করে। আলজেরিয়াকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের দেশ, যেখানে সামরিক বাহিনী এবং নির্বাচিত নাগরিকদের একটি নির্বাচিত গোষ্ঠী। আলজেরিয়ানদের কাছে “le pouvoir” নামে পরিচিত।

আলজেরিয়ার মুক্তিদাতা হিসেবে এ দলের ভূমিকা নিখুঁত ভিত্তি হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এফএলএন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদেলআজিজ বোতেফ্লিকাকে (প্রেসিডেন্ট ২৭ এপ্রিল ১৯৯৯ থেকে ২ এপ্রিল ২০১৯) সম্মানসূচক চেয়ারম্যান করা হয়। আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী ও ইসলামী ঐতিহ্যের ঐতিহ্যবাহী জনগণের ব্যাখ্যাগুলোকে ধারাবাহিক রক্ষণশীলতার সাথে মিশ্রিত করে এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাজার অর্থনীতির সংস্কারের পক্ষে সমর্থন দেয়। যেহেতু রাষ্ট্র কাঠামো একদলীয় সিস্টেমে পরিচালিত। ১৯৮৮-১৯৯০ এফএলএন বহুদলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যায় এবং এই সময়কালের আগে এটি আলজেরিয়ান জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংস্থা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৪-৫ ফেব্রুয়ারী এফএলএনকে Socialist International (SI) এর বসন্ত কংগ্রেসে পরামর্শদাতা সদস্য হিসেবে এসআই মনোনীত করে।^{৩৮} সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (এসআই) রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এটি বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, সামাজিক-গণতান্ত্রিক এবং শ্রমিক রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য সংগঠন নিয়ে গঠিত। হাঁসি বা হীরক আন্দোলন নামে পরিচিত আলজেরিয়ায় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে এসআইকে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকের স্থান থেকে সরানো হয়।

তথ্যনির্দেশ

- ^১. *Europa World Year Book* 2014, p. 565.
- ^২. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Ahmed Messali Hadj." *Encyclopædia Britannica*. January 01, 2019.
- ^৩. S. N. Millar, "Arab Victory: Lessons from the Algerian War (1954–62)", *British Army Review*, No. 145, Autumn 2008, p. 49.
- ^৪. ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে আরবিতে বলা হয় **جبهة التحرير الوطني** (যাভাতু এল-তাডারি এল-ওয়ানানী) এবং ফরাসিতে National Liberation Front (NLF).
- ^৫. *Europa World Year Book*, 2014, p. 565.
- ^৬. *The French Wikipedia*, no. 331, May 2008, p. 96.
- ^৭. M. Evans, *Algeria : Anger of the Dispossessed* (London: Yale University Press. 2007), p. 49
- ^৮. *Ibid*, p. 50
- ^৯. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Ahmed Messali Hadj." *Encyclopædia Britannica*. January 01, 2019. Accessed April 22, 2019. <https://www.britannica.com/biography/Ahmed-Messali-Hadj#ref31818>.
- ^{১০}. William, Spencer, "Freedom and Unity in Algeria." *World Affairs* 121, no. 2, 1958, pp. 35-37.
- ^{১১}. "The Multi-Party System in Algeria" (PDF), Yale University. Retrieved 7 May 2016.

-
- ^{১২}. Frank Tachau, *Political parties of the Middle East and North Africa* (Greenwood Press, 1994), p. 31.
- ^{১৩}. *Ibid.*
- ^{১৪}. *Ibid.*, p. 31.
- ^{১৫}. *The French Wikipedia*, no. 331, May 2008, p. 96.
- ^{১৬}. Alistair Horne, *A Savage War of Peace: Algeria 1954–1962*, 1977.
- ^{১৭}. *Ibid.*
- ^{১৮}. অ্যাবেলাজিজ বোতেফ্লিকা প্রেসিডেন্ট ২৭ এপ্রিল ১৯৯৯ থেকে ২ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। “Introduction ::Algeria”, Archived from the original on 30 September 2012.
- ^{১৯}. “Still Waiting for Real Democracy”. *The Economist*. 12 May 2012.
- ^{২০}. *Ibid.*
- ^{২১}. *Ibid.*,
- ^{২২}. “Algeria president paving way for succession”. *news.yahoo.com*. Retrieved 2020-09-05.
- ^{২৩}. “The Jews of Algeria, The Spectator Archive”, *The Spectator Archive*, Retrieved 2018-04-15.
- ^{২৪}. *Ibid.*
- ^{২৫}. “Algerian Jews During the French-Algerian War Dissertation Reviews”. *dissertationreviews.org*. Retrieved 2018-04-15.
- ^{২৬}. *Algerian Nationality Code*, Law no. 63-69 of Mar. 27, 1963, section 34.
- ^{২৭}. M. Evans, *op.cit.*, p. 27.
- ^{২৮}. *Ibid.*, p. 33.
- ^{২৯}. *Ibid.*, p. 41.
- ^{৩০}. *Ibid.*, p. 43.
- ^{৩১}. *Ibid.*, p. 34.
- ^{৩২}. *Ibid.*, p. 75.
- ^{৩৩}. Jeffrey James, Byrne, “Our Own Special Brand of Socialism: Algeria and the Contest of Modernities in the 1960s.” *Diplomatic History* 33, no. 3, June 2009, pp. 428-432.
- ^{৩৪}. Işıksal, Hüseyin. “The Paradox of Economic Liberalisation and Democratisation Measures in Algeria.” *Alternatives: Turkish Journal Of International Relations*, January 7, 2005. p. 207.
- ^{৩৫}. M. Evans, *op.cit.*, p. p. 71.
- ^{৩৬}. “Political Dynamics of Algeria - Welcome to the CIA Web Site.” Accessed April 22, 2019.
- ^{৩৭}. *Ibid.*
- ^{৩৮}. Decisions of the Council Socialist International Archived16-12- 2013 at the Wayback Machine.

মগধকেন্দ্রিক রাজবংশের উত্থানপর্ব ও কালানুক্রমিক বিকাশ

ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম*

Abstract: The emergence and evolution of the dynasties in Magadha is still a mysterious and contradictions-ridden era in Indian history but, at the sametime, holds some key elements and aspects for the evaluation and interpretation of Ancient India. Even before the fifth century, this empire evolved as huge but unique structure of administrative, military and judicial systems. The foundation of this gigantic structure was the local village administrative bodies and the overall system had a marvelous capacity to accommodate diverse values, ideas and religious practices. This paper focuses on the political and cultural evolutions of this period and demonstrates how our understanding of the socio-political and cultural aspects of Magadha Empire is fundamental to the evaluation of our national and Sub-Continental history.

মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানপর্ব সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস রয়েছে। বিশেষত মহামতি বুদ্ধ ও তাঁর সময়কালের সাথে সম্পর্কিত অনুশাসন (ষষ্ঠ-পঞ্চম খ্রিস্টপূর্ব), জৈন এবং পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণিক উৎসের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বহুবিধ তথ্য পাই। এছাড়া চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দের রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং বিদেশী পর্যটকদের ধর্মনিরপেক্ষ রচনাসমূহও এক্ষেত্রে সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচিত। আর তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রাচীন উৎস তথা শিলালিপি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উৎস। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সুনির্দিষ্ট বা একক কোন রাজনৈতিক সত্তা ছিল না। ভারতের প্রতিটি অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে। উন্নত মানবিক গুণাবলির পাশাপাশি কৃষির সহজলভ্যতা আর ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্য ছিল বহির্ভারতীয়দের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তবে ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের নাম ও সীমানা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে, মগধ তার ব্যতিক্রম নয়।^১ প্রাচীনকাল হতে ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাজন পর্যন্ত কতবার যে ভারতীয় রাষ্ট্র-সীমায় পরিবর্তন এসেছে, তা নির্ণয় করা দুরূহ। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের আগে পূর্বাপর-সংলগ্ন তথ্য-সম্বলিত উপাদান অপ্রতুল হলেও বহু পূর্ব থেকে উত্তর-ভারতে, বিশেষত মগধ সন্নিহিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে, সুবিস্তৃত রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মতবাদ, জটিল অথচ সুসংবদ্ধ, বিভাগ-উপবিভাগ, কর্মচারীবহুল রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে উঠে এবং মৌর্যধিকার কালে বা তারও পূর্বে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রই শক-কুশান আমলের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও আদর্শ এবং রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রভাবে গুপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রে ও রাষ্ট্রীয় বিন্যাসে বিবর্তিত হয়। মৌর্য রাষ্ট্রবিন্যাস উত্তর-ভারতীয় আর্য সমাজ-বিন্যাসেরই আংশিক রূপ বলে মনে করা হয়।^২

মগধ একটি প্রাচীন ভারতীয় জনপদ ও রাজ্য যার প্রতিনিধিত্ব করছে দক্ষিণ বিহারের আধুনিক পাটনা, গয়া এবং সাহাবাদ। ভারতের ইতিহাসে এর গুরুত্ব উপলব্ধি ও সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে তখনই যখন বিবেচনায় আনা হবে যে এটি কেবল বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের আবাস ছিল না, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি ভারতীয় সাম্রাজ্যের— (মৌর্য এবং গুপ্ত) কেন্দ্রবিন্দুও ছিল। ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধের গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।^৩ তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলোর সূতিকাগার এই মগধ ক্রমশই শক্তিশালী ও সম্প্রসারণশীল রাজ্যরূপে গড়ে উঠে। ফলে মগধকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতে প্রথম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয় বলে অনুমিত হয়। মহাভারতের সময় হতে যে আর্যাবর্তের উল্লেখ দেখা যায় তার পূর্বভাগ এক সময় মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল।^৪ এই বৃহৎ ভূ-ভাগ

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পরস্পরের সান্নিধ্যহেতু এবং যুগে যুগে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসনাধীন থাকায় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতায় সান্নিধ্যলাভ করেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রের বাসুদেব, অঙ্গরাজ কর্ণ, প্রাগজ্যোতিষপুরের নরক ও ভগদত্ত এবং বঙ্গাধিপতি চিত্রসেন, সমুদ্রসেনসহ এই ভূ-ভাগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

গঙ্গার দক্ষিণস্থ বিহারের অংশ ছিল মগধ রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, রাষ্ট্রী, গণ্ডক, শোণসহ বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর প্রবাহ এবং অপরাপর অনেক নদ-নদীর সাথে সংযুক্তির দ্বারা মগধ নানাভাবে ঋদ্ধ হয়েছে। সুদূর অতীতকাল থেকেই এগুলো মগধের সাথে অন্যান্য অঞ্চল তথা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষা, পণ্য পরিবহন, পানি সরবরাহ, নিয়মিত বৃষ্টিপাত ও পলিমাটির প্রভাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ফলে কৃষি-অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। মগধ রাজ্য প্রাথমিকভাবে বিহারের পাটনা, গয়া এবং বাঙলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। মগধের প্রথম রাজধানী রাজগৃহ প্রাথমিকভাবে গিরিব্রজ (Girivrija) নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে অধিকতর সমৃদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করে। কথিত আছে যে, বিম্বিসার ছিলেন মগধের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা। গ্রিক ঐতিহাসিকগণ মগধ সাম্রাজ্যকে গঙ্গারিডি^৫ এবং প্রাসিয়ই নামে অভিহিত করেছেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পূর্বভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত মগধ সাম্রাজ্য পূর্বে করতোয়া-ভাগীরথী তীর হতে পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই একথা অনুমান করা সম্ভব যে, বাঙলার পশ্চিমাঞ্চল নন্দ বংশের রাজত্বকাল হতেই মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।^৬

ভারতের মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাটি পুরু, তদুপরি প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নিবিড় আর সুবিস্তীর্ণ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এর সুবাদে সেখানে অসংখ্য হাতির বিচরণ থাকায় প্রশিক্ষিত হাতিকে তারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি জঙ্গলের পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য গাছ গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত বিধায় বসতি স্থাপন, ঘোড়াগাড়ী (Carts), রথ (Chariots) তৈরী (দুই চাকার) ইত্যাদি খুব সহজসাধ্য ছিল। শুধু কৃষি বা বনজ সম্পদেই নয়, খনিজ সম্পদেও মগধ উন্নত ছিল। তাই মগধের সক্ষমতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এর খনিজ সম্পদ। প্রচুর পরিমাণে লোহার সরবরাহের পাশাপাশি ছিল তামা ব্যবহারের উপাদান। লোহা গলানোর কৌশল আয়ত্ত্ব হবার পর যুদ্ধসামগ্রী তৈরী, জঙ্গল পরিষ্কার ও চাষাবাদসহ প্রাত্যহিক জীবনে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। মগধের বিশাল সেনাবাহিনী লৌহ নির্মিত যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করতো। লোহার সহজলভ্যতার কারণে লাঙ্গলে লোহার ফলা ব্যবহার করে কৃষিজমিতে গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব ছিল। ফলস্বরূপ নগর সম্প্রসারিত হয় এবং গুরুত্ব ও পরিচিতি বৃদ্ধি পায়।^৭ বিহার ও বাংলার বেশীরভাগ অঞ্চলসহ বৃজি বা ভাজ্জি রাষ্ট্রসংঘ (Vajji confederation)^৮ এবং অঙ্গ, পর্যায়ক্রমে ওড়িশ্যা এবং উত্তর প্রদেশের প্রায় সমগ্র পূর্বাংশ বিজয় ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মগধ সম্প্রসারিত হয়। ফলে মগধের অভ্যুত্থানে লোহার ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

ভারতের রাজনীতিতে মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানের পেছনে এর ভৌগোলিক অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। মগধের রাজত্ব সম্প্রসারিত হবার পূর্বে দক্ষিণ বিহারের আধুনিক পাটনা, জাহানাবাদ, নালন্দা, ঔরঙ্গাবাদ, নওয়াদা ও গয়া জেলা এবং পূর্বদিকে বাঙলার কিছু অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা মগধকে ঘিরে রেখে প্রকৃতি এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে অকৃপণ হয়েছে। উত্তর দিকে গঙ্গা, পূর্বে চম্পা নদী, দক্ষিণে বিন্দ্র্য পর্বতমালা এবং পশ্চিমে শোণ নদী দ্বারা মগধ পরিবেষ্টিত তথা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত ছিল। মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ শহরকে বেষ্টিত করে আছে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈতক্য নামের পাঁচটি পাহাড়। ফলে শহরটি প্রায় দুর্ভেদ্য এবং এর অবরোধ বা পতন ছিল দুঃসাধ্যপ্রায়। এই সুরক্ষিত প্রাকৃতিক পরিবেশ মগধের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ। এর তিন দিকে নদী (গঙ্গা, শোণ এবং চম্পা) থাকায় শত্রুদের জন্য তা প্রাকৃতিক প্রতিরোধ

হিসেবে কাজ করে। মগধের পরবর্তী রাজধানী পাটলীপুত্র কৌশলগতভাবে রাজগীরের মতই দুর্ভেদ্য এবং গঙ্গা ও শোণ নদীর মিলিত শ্রোতধারার নিকটবর্তী অবস্থিত। পাটলীপুত্র শহর থেকে গঙ্গার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা অধিকতর সহজ ছিল। এই ভৌগোলিক সুবিধা মগধকে তার প্রতিবেশীদের উপর আগ্রাসী হতে সাহায্য করায় এর অগম্যতা ছিল অপ্রতিরোধ্য।

মগধের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম মূল কারণ তার অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এবং ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি, কারণ সেখানে সম্পদ সৃষ্টি করে তার যথাযথ ব্যবহার করা হত। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ, খনি খনন এবং সেনাবাহিনীর জন্য সহজলভ্য ছিল। শূদ্র এবং অনার্যরা কৃষির জন্য বন পরিস্কার করে উদ্বৃত্ত জমি পুনর্ব্যবহার্য করে তুলত। ৪র্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মগধের জমি প্রতি বছর একাধিক ফসল যোগান দিত। মগধ সাম্রাজ্যের জনগণ এই উর্বর ও সম্পদে পরিপূর্ণ ভূমির জন্য সমৃদ্ধিশালী এবং সরকার সয়ংক্রিয়ভাবে ধনী ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে।^{১৬}

অর্থনৈতিক বহুমুখীতা মগধের বিকাশকে আরো ত্বরান্বিত করে। মগধের হৃদস্থল দিয়ে প্রবাহিত এবং উত্তর ভারতের সাথে যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত অনুকূল গঙ্গার উপর প্রভুত্ব বজার রাখার মাধ্যমে মগধ উত্তর ভারতের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। বিম্বিসার অঙ্গ রাজ্য দখল করার ফলে এর সমৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান ও সুবিখ্যাত নদীবন্দর চম্পা মগধ সাম্রাজ্যের বর্ধিতাংশে পরিণত হয়। যেখান থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ দক্ষিণ ভারত, সিংহলসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও বন্দরে ছড়িয়ে পরতো। চম্পা অধিগ্রহণের পর মগধ এই ঋদ্ধ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। পূর্ব এবং পশ্চিমের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী মূল ভূখণ্ডে অবস্থান বিধায় স্থল ও জলপথে এই অঞ্চলের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। খুব সহজেই দুটি অংশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। গঙ্গার মাধ্যমে মগধ উত্তর-ভারতের সাথে যেমন সংযুক্ত, তেমনি কাশি, বারানসী, প্রয়াগ অথবা এলাহাবাদের সাথেও একইভাবে সম্পৃক্ত। গঙ্গা-যমুনার সংযোগস্থল হয়ে যমুনা নদীর পথ ধরে খুব সহজেই মগধের বাণিজ্যবহর দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যেত। মগধের নিম্নাঞ্চলে গঙ্গা দিয়ে উন্মুক্ত সাগরে পৌঁছা যেত এবং শোণ ও চম্পার প্রবাহ ছিল রাজ্যের সীমান্ত বরাবর।

চম্পা বিজয়ের পর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত গাঙ্গেয় উপত্যকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মগধ গঙ্গার অপর অংশে তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। বস্তুত গঙ্গার দক্ষিণাংশ মগধের কর্তৃত্বে চলে আসায় যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশ ছিল। বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু কোসল পদানত করেন, ফলে আরও একটি বিখ্যাত নদীবন্দর ও বাণিজ্যস্থান অর্থাৎ কাশি মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কাশির উপর প্রভুত্ব মগধকে কোসল রাজ্য তথা উত্তরাঞ্চলে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়। মগধ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল গঙ্গার উত্তরাঞ্চলের বৈশালী এবং লিচ্ছবি রাজ্যগুলোর দিকেও। এই অঞ্চলের উর্বর ভূমি মগধ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। বৈশালী এবং লিচ্ছবি দেশগুলোর বিজয় মগধকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করে। গাঙ্গেয় উপত্যকার সমস্ত ভীতি দূর করার পর মগধ তার নিজস্ব ও ক্রমবর্ধমান শক্তির উপর নির্ভর করে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়।^{১৭}

বৃহত্তর মগধ অঞ্চলের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস ছিল। গোড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিধিনিষেধের কঠোরতা এখানে শিথিল হয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ব্যাপক প্রসারে জনমানস অনেকটা পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারমুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ এখানে সচ্ছন্দে ব্রাত্যের সাথে মিশে। শূদ্রকন্যা রাজ-অন্তপুরে প্রবেশাধিকার পায়। বৈশ্য ও যবন আপন যোগ্যতায় উচ্চপদ লাভ করে। নাপিতপুত্র নিজ বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করে। ব্রাহ্মণ সানন্দে ক্ষত্রিয় গুরু শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মগধের এই উদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তার রাজনৈতিক

দৃষ্টিকোণকে সহজেই প্রসারিত করেছে, তাকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হতে প্রেরণা জোগায় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।^{১১}

মগধ সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি সমগ্র ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সেই সামরিক শক্তির অন্যতম উৎস ছিল তার সুশিক্ষিত হস্তিবাহিনী। যুদ্ধের সময় শত্রু শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টির কাজে এই হস্তিবাহিনীর কোনও জুড়ি ছিল না। ফলে মগধ আক্রমণ করা ছিল কষ্টসাধ্য। এই সামরিক শক্তির কারণেই আলেকজান্ডারের বাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হতে ভয় পেয়েছিল। ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অনেক পূর্বেই ভারতের ইতিহাসে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী মগধ রাজ্যের উত্থান হয়েছিল বলে বৈদিক রচনা থেকে জানা যায়। ষোড়শ মহাজনপদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য রাষ্ট্রের জমি, দাস ও সম্পদ লুণ্ঠন বা অধিকার করে নেয়ার উদ্দেশ্যে এসব রাষ্ট্র বা মহাজনপদের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত। ফলে অনেক রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যেত, আবার কিছু রাষ্ট্র ক্ষমতাবান হয়ে উঠত। এই বিরোধগুলোকে কেন্দ্র করেই কালক্রমে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে মগধ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সুযোগ্য নেতৃত্ব মগধের অভ্যুত্থানে অন্যতম সহায়ক ছিল। বিম্বিসার থেকে শুরু করে শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ পর্যন্ত মগধের সব রাজাই উজ্জল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন; বিশেষ করে বিম্বিসার, অজাতশত্রু, শিশুনাগ, মহাপদ্ম নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোক নিঃসন্দেহে পরাক্রান্ত নরপতি, সুদক্ষ প্রশাসক এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। রাজ্যস্থাপন বা বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার মত গুণাবলি যথেষ্ট পরিমাণে তাদের ছিল। তা ছাড়াও মগধের অভ্যুত্থান ও বিকাশে দুজন সুযোগ্য রাজনীতিজ্ঞ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের একজন বর্ষাকার, যিনি অজাতশত্রুর মন্ত্রী ছিলেন। অন্যজন চাণক্য বা কোটিল্য।^{১২} মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানপূর্বে অর্থাৎ মৌর্যাদিকারের পূর্বে মোটামুটি তিনটি রাজবংশ ও নিম্নোক্ত শাসকবর্গের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

হর্য্যক সাম্রাজ্য বা বিম্বিসার রাজবংশ (Haryanka Empire or Bimbisara dynasty) ৬৮৪-৪১৩ খ্রি.পূ.:

মগধের প্রাথমিক শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য অস্পষ্ট এবং অপ্রতুল। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং পুরাণের আলোকে হর্য্যক^{১৩} রাজবংশ প্রায় ২০০ বছর (৬০০-৪১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মগধ শাসনকরেছিল বলে ধারণা করা হয়। মহাভারতের বর্ণনা মতে, বৃহদ্রথ মগধের প্রথম শাসক। হর্য্যক রাজবংশের রাজা বিম্বিসার তার সক্রিয় সম্প্রসারণবাদ নীতির দ্বারা অঙ্গ জয় করেন। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী মগধের রাজা জরাসন্ধ একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন এবং সমগ্র আর্যাবর্তসহ দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ জয় করেছিলেন। ইতিহাস-পূর্ব যুগে তিনি ছিলেন আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বা রাজচক্রবর্তী। পৌণ্ড্রের বাসুদেব, প্রাগজ্যোতিষপুরের নরক ও চেদীর শিশুপাল তার সামন্ত-রাজা ছিলেন। বায়ুপুরাণ অনুযায়ী তার উত্তরসূরিগণ আরো ১০০০ বছর শাসন করেন। যদিও এগুলোর প্রামাণিক তথ্য বা ঐতিহাসিক কোন দলিল পাওয়া যায় না। পুরাণের বর্ণনানুযায়ী মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৃহদ্রথের পুত্র এবং আধা-পৌরাণিক রাজা জরাসন্ধ। যিনি সমসাময়িককালের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী রাজা।^{১৪} তার সাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রিত হত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যগুলোর জোটের মাধ্যমে। জরাসন্ধের মূল সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে শক্তিশালী জোট ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে চেদীর সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণে ছিল অপর মিত্র বিদর্ভ, পূর্বে অঙ্গ ও বঙ্গ জোট এবং আরো পূর্বে ছিল পরাক্রমশালী মিত্রভাবাপন্ন রাষ্ট্র প্রাগজ্যোতিষপুর (আধুনিক আসাম), যার সীমান্ত সম্প্রসারিত ছিল চীন পর্যন্ত। জরাসন্ধ এই বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন তার ঠাকুর বা অধিরাজগণ কর্তৃক।

বিম্বিসার:

৫৪৩ মতান্তরে ৫৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভট্টিয় পুত্র^{১৫} বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৫৪৩-৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মোট ৫২ বছর রাজত্ব করেন। তার সময় রাজগৃহ (বর্তমান রাজগীর) ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। বিম্বিসারের শাসনামল হতে মগধ রাজ্য বিকশিত হতে থাকে এবং বিখ্যাত ও বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, আধুনিক জার্মান জাতির ইতিহাসে প্রুশিয়ার যে স্থান, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মগধের সেই স্থান। বিম্বিসার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। অনেকেই মনে করেন যে, রাজা বিম্বিসার ছিলেন মগধের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা। তার সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে মগধের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান শুরু হয়। তিনি অঙ্গ রাজ্য দখল করেছিলেন এবং বারাণসীতে সর্বপ্রথম মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এটি ছিল হর্যাক্ষ রাজবংশ। বিম্বিসার ‘শ্রেণিক’ বা ‘সেনিয়’^{১৬} নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাবংশ ও দীপবংশ সাক্ষ্য দেয় যে, বিম্বিসারের পিতা মৃত্যুর পূর্বেই তার পুত্রকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তখন বিম্বিসারের বয়স ছিল মাত্র ১৫ (পনের) বছর। যতদূর জানা যায়, রাজা বিম্বিসার নতুন করে আর কোন রাজ্য জয় না করে, মগধ ও অঙ্গে নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করেন।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মগধের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য বিম্বিসার চেষ্টার ক্রটি করেননি। সেক্ষেত্রে তিনি প্রধানত দুটি নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমত, বিভিন্ন রাজপরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজার সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ, রাজ্য জয়ের চেয়ে রাজ্য সংরক্ষণের উপর তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির জনকরূপে বিম্বিসার ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। রাজা বিম্বিসার যেসব রাজপরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তিতে কোসল রাজপরিবার ছিল তুলনাহীন। তিনি কোসলরাজ মহাকোসলের কন্যা ও প্রসেনজিতের বোন কোসলাদেবীকে বিয়ে করে কাশীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যৌতুক হিসেবে লাভ করেন। সেখান থেকে বছরে এক লক্ষ কার্ষাপণ^{১৭} (কৃষিজাত, ক্ষেত্রজ) মুদ্রার রাজস্ব আদায় হত। চোটক ছিলেন একজন লিচ্ছবি নেতা। তার কন্যা চেল্লনাকেও বিম্বিসার বিয়ে করেন। বিম্বিসার বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবীর সাথেও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। তার আর এক পত্নী খেমা মদ্র বা মধ্য পাঞ্জাবের রাজকন্যা ছিলেন বলে জানা যায়। বিম্বিসারের ৫০০ (পাঁচশত) উপপত্নীর উল্লেখ (মহাবংশ) থাকলেও এই সংখ্যা সম্ভবত অতিরঞ্জিত। তবে বৈশালীর বিখ্যাত বারাক্ষনা আম্রপালী^{১৮} বিম্বিসারের উপপত্নী ছিলেন। অন্য যে রাজাগণের সাথে বিম্বিসার সৌহার্দ স্থাপন করেছিলেন, অবন্তিরাজ প্রদ্যোত তাদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধারের রাজা পুষ্করসারী বিম্বিসারের নিকট তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন এবং বোরক রাজ্যের রাজা রুদ্রায়ণের সঙ্গেও তার সখ্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজ্যটি সম্ভবত বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত ছিল।

অজাতশত্রু (৪৯৩-৪৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে):

আনুমানিক ৪৯৩ মতান্তরে ৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনের অধিকারী হন। তার সিংহাসনারোহণ পদ্ধতি নিন্দনীয় হলেও একজন পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ রাজা হিসেবে তিনি সুবিদিত। যোগ্যতার কারণেই পিতা বিম্বিসারের রাজত্বকালে অজাতশত্রু অঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কোন কোন সূত্র মতে, ৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অজাতশত্রু তার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন দখল করেন এবং ৪৯১-৪৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর রাজত্ব করেন।^{১৯}

কাশী অধিকারে আসার পর অজাতশত্রু গঙ্গার অপর প্রান্তে রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্র তথা গণরাজ্য দখল করতে সক্ষম হন। এটি তার রাজত্বের সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কথিত আছে যে, অজাতশত্রু তার দু'ধরনের অস্ত্র (গুলতি ও আচ্ছাদনযুক্ত রথ) দ্বারা সহজেই সব যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করেন। রাজা অজাতশত্রুর সাথে লিচ্ছবিদের বিরোধের কারণ সম্পর্কে ভিন্নমত থাকলেও এই সংঘর্ষের একটি বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক কারণ থাকাও অযৌক্তিক নয়। লিচ্ছবি রাজ্য ছিল গঙ্গার উত্তর প্রান্তে, ফলে জলবাণিজ্যের উপর মগধের একচ্ছত্র আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তা অধিগ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু ভীষণভাবে ঐক্যবদ্ধ লিচ্ছবিদের পরাস্ত করা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ তারা ছিলেন বৃজি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য বিধায় বিদেহ, জ্ঞাতক রাজ্যসহ বৃজি গণরাজ্য লিচ্ছবিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।^{২০} অজাতশত্রু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, লিচ্ছবিদের সাথে এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে এবং রাজগৃহ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থল পাটলিগ্রামকে তিনি উপযুক্ত মনে করে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই পাটলিগ্রামই পরবর্তীকালে পাটলীপুত্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ষাকার ও সুনীধ নামে বিশ্বস্ত দুই মন্ত্রী উপর দুর্গ নির্মাণের ভার পড়ে। তাছাড়া লিচ্ছবিদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন তথা আরো একটি কাজের দায়িত্ব মন্ত্রী দুজকে দেয়া হল। আনুমানিক ৪৮৪-৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অন্তত ১৬ (ষোল) বছর ধরে লিচ্ছবিদের সাথে অজাতশত্রুর সংঘর্ষ চলেছিল।^{২১} গঙ্গা অতিক্রম করে যুদ্ধ করার জন্য তিনি পাটলীপুত্র নগরীতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে অজাতশত্রু দুটি নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। একটি গুলতি (catapult) বা মহাশীলাকন্টক এবং অপরটি ঝুলন্ত দণ্ডসহ আচ্ছাদিত যুদ্ধ-রথ (covered chariot with swinging mace) বা রথমুখল যা আধুনিক কালের ট্যাঙ্কের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মহাশীলাকন্টক হতে শত্রুসৈন্য লক্ষ করে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ্ত হত। রথমুখল ছিল তীক্ষ্ণ ফলাসজ্জিত এক চলমান যান। যুদ্ধক্ষেত্রে রথমুখল চালনা করে এর তীক্ষ্ণ ফলার আঘাতে শত্রুসৈন্য ব্যাপকভাবে ক্ষতবিক্ষত হত। বিধ্বংসী এই অস্ত্র দুটো মগধের সামরিক শক্তিকে আরো দুর্বল করে তোলে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শুধু বৈশালী নয়, বৃজি রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্য গণরাজ্যগুলোও মগধের অধিকারভুক্ত হয়। অবন্তীরাজ^{২২} প্রদ্যোত কর্তৃক রাজগৃহ আক্রমণের আশঙ্কায় অজাতশত্রু রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুরক্ষিত করেন বলে কথিত আছে। পাটলীপুত্র বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করে এবং অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর রাজধানীতে পরিণত হয়। পুরাণে মগধের পরবর্তী রাজারূপে দর্শকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা একবাক্যে উদয়ভদ্র বা উদয়ীকে অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারী বলেছেন।

উদয়ী:

আনুমানিক ৪৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ী মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়ী তার রাজত্বের চতুর্থ বছর মতান্তরে ৪৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মগধের রাজধানী রাজগৃহ থেকে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রাম বা পাটলীপুত্রে (বর্তমান পাটনা) নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাবংশ ও দীপবংশ অনুযায়ী তিনি ১৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তার সময় থেকেই মগধ আরও শক্তিশালী ও বিস্তীর্ণ রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠে। উদয়ীর পরে কে মগধের রাজা হন, তা বলা কঠিন। পুরাণে নন্দিবর্ধন ও মহানন্দ নামে মগধের দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়। মহাবংশ ও দীপবংশে মগধের পরবর্তী রাজারূপে অনুরুদ্ধ, মুণ্ড ও নাগদাসকের উল্লেখ আছে। তবে উদয়ী পরবর্তী বিম্বিসার বংশীয় শাসকেরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের যোগ্যতা বা বীরত্ব কিছুই ছিল না। রাজাদের ব্যবহারে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে ঐ রাজবংশকে বিতাড়িত করে এবং অমাত্যগণের সহযোগিতায় শিশুনাগ (দ্বিতীয়) মগধের সিংহাসন দখল করেন।

শিশুনাগ রাজবংশ (Shishunaga dynasty) ৪১৩-৩৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ:

যতদূর জানা যায়- নন্দ রাজবংশের পূর্বসূরী ছিল শিশুনাগ রাজবংশ, যার প্রতিষ্ঠাতা শিশুনাগ তার পূর্ববর্তী হর্যাক্ষ রাজবংশের শাসক নাগাদাসাকা-র অমাত্য বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং একটি জনপ্রিয় রাজদ্রোহের পর ৪১৩ মতান্তরে ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন বলে ধারণা করা হয়।^{২৩} পুরাণ অনুযায়ী, এটি ছিল মগধের ইতিহাসে ২য় শাসক বংশ এবং বৃহদ্রথ প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক রাজবংশের পদানুবর্তী। শিশুনাগ রাজপদ গ্রহণ করেই তিনি পাটলিপুত্রের পরিবর্তে পুনরায় রাজগৃহকে মগধের রাজধানী এবং বৈশালী শহরকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী করেন। কারণ যদিও সুস্পষ্ট নয়, তবে সর্বনাশা বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া অথবা অধিকতর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার বিষয়টি শিশুনাগকে রাজধানী পরিবর্তনে উৎসাহিত করেছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে রাজগৃহের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, বৈশালীর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত শিশুনাগ রাজ্যে মগধের একমাত্র রাজধানীর মর্যাদা পায় বৈশালী।

শিশুনাগের রাজত্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবন্তী রাজ্য জয় করা। উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে অবন্তী একমাত্র রাজ্য যা মগধের প্রায় সমকক্ষ ছিল। অবন্তীরাজ প্রদ্যোত বিম্বিসার ও অজাতশত্রুকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন এবং একবার তিনি মগধ জয়ের সংকল্পও করেছিলেন বলে জানা যায়। পরাক্রমশালী প্রদ্যোতের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ দেখা দিলে- সেই সুযোগে শিশুনাগ অবন্তী রাজ্যটি জয় করেন। অবন্তী অধিকারভুক্ত হওয়ায় দক্ষিণে মগধ রাজ্য মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কোসল ও বৎস^{২৪} রাজ্য দুটিও সম্ভবত এই সময় মগধের অধিকারে আসে।

কাকবর্ণ-কালশোক:

শিশুনাগের পর তার এক পুত্র মগধে রাজত্ব করেন। মগধের এই রাজাকে পুরাণে কাকবর্ণ এবং দীপবংশ ও মহাবংশে কালশোক বলা হয়েছে। কাকবর্ণ ও কালশোক যে একই ব্যক্তি, প্রায় সব ঐতিহাসিক তা স্বীকার করেন। কাকবর্ণ বা কালশোকের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুটি। এক, তার পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাস্থবির যশ সে অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। দুই, মগধের রাজধানী বৈশালী থেকে পুনরায় পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়। কাকবর্ণ বা কালশোকের শেষ জীবন সুখের হয়নি। গ্রিক বিবরণে প্রকাশ, রানি ও নাপিতের ষড়যন্ত্রে রাজা নিহত হন। যে রাজদ্রোহীর হাতে কালশোক এবং তার পুত্ররা নিহত হন, তিনি নন্দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম। আনুমানিক ৩৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (মতান্তরে ৩৪৫ খ্রি.পূ) শিশুনাগ রাজবংশের পতন হয়।

নন্দ রাজবংশ:

নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত নাম কি, সে প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে। পুরাণে তার নাম মহাপদ্ম বা মহাপদ্মপতি। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবোধিবংশ তাকে উগ্রসেন বলেছে। প্রাচীন গ্রিক লেখকগণ মহাপদ্মের এক উত্তরাধিকারীকে এগ্রাম্মেস বা জ্যান্ড্রামেস (Agrammes বা Xandrames) নামে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত সংস্কৃত পদ উগ্রসৈন্য থেকে গ্রিক নাম এগ্রাম্মেস নিস্পন্ন হয়েছে। উগ্রসৈন্য পদের অর্থ উগ্রসেনের পুত্র বা বংশধর। অনুমিত হয় যে, মহাপদ্ম ‘উগ্রসেন’ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।^{২৫} তবে মহাপদ্মের বিশ্বাসযোগ্য উত্থান কাহিনী অবিস্মৃত।

কৌশল বা বাহুবল, যে উপায়েই মহাপদ্ম মগধের সিংহাসন দখল করুন না কেন, তার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাছাড়া পুরাণে তাকে একরটি^{২৬} বা একগুচ্ছ রাজা আখ্যা দেয়া হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, আনুমানিক ৩৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাপদ্ম মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আনুমানিক

৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যু হয়। জরাসন্ধ যেখানে একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন এবং সমস্ত আর্যাবর্ত, এমনকি দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ বিজয় করেছিলেন; উত্তরকালে মহাপদ্ম নন্দ সেখানে এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, যার বৈভব ও সমৃদ্ধি দেখে তৎকালে পাশ্চাত্য জগতের সর্বপ্রধান জাতি থ্রিকগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।^{২৭}

মহাপদ্মের উত্তরাধিকারীগণ:

আনুমানিক ৩৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাপদ্ম নন্দ (উগ্রসেন) শিশুনাগের পুত্র কাকবর্গকে (কাল্যাক) হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নন্দ শৈব (হিন্দু) ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ৩৬২-৩৩৪ খ্রি.পূর্বাব্দে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল। তিনি অসাধারণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর ছাড়া উত্তর ভারতের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ২৮ (আটাশ) বছর রাজত্ব করার পর পুত্রদের জন্য বিস্তীর্ণ রাজ্য, প্রচুর ধনসম্পদ, বিরাট সেনাবাহিনী রেখে মহাপদ্ম নন্দ মারা যান। নন্দের ৮ (আট) ছেলে মোট ১২ (বার) বছর রাজত্ব করেন।

মহাপদ্মের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র শেষজন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ সূত্রের ধননন্দ,^{২৮} প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যের এথাম্মেস বা জ্যাম্ব্রামেস প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পূর্বে গঙ্গা এবং পশ্চিমে বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে তার বিস্তৃত রাজ্য এবং সুবিশাল সেনাবাহিনী ছিল। তার সৈন্যদলে ছিল দুই লক্ষ পদাতিক ও বিশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য। উপরন্তু চার ঘোড়ায় টানা দুই হাজার রথ এবং তিন হাজার রণহস্তি। ডায়োডোরাস এবং প্লুটার্ক নামের দুজন প্রাচীন ইউরোপীয় লেখক, নন্দ রাজার সামরিক শক্তি সম্পর্কে প্রায় একই রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। তবে তারা লিখেছেন, নন্দ রাজার রণহস্তির সংখ্যা যথাক্রমে চার এবং ছয় হাজার ছিল। আজ এ তথ্য সুবিদিত যে, সমবেত প্রাচ্য-গঙ্গারাক্ষত্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তার প্রভূত ধনরত্ন পরিপূর্ণ রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্ডারের শিবিরে পৌঁছেছিল। তিনি যে বিপাশা পার হয়ে পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হয়ে ব্যাবিলনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তার মূলে অন্য কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও অগ্রাহ্য করার মত নয়।^{২৯} কিন্তু সামরিক শক্তিতে বলবান হলেও নন্দরাজ প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি। দরিদ্র প্রজাদের উপর করভার চাপিয়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন। কথাসরিৎসাগর থেকে জানা যায়, সংগৃহীত অর্থ নন্দ রাজা গঙ্গা নদীর বুকে লুকিয়ে রাখতেন। অর্থের প্রতি রাজার অত্যধিক আসক্তি, গঙ্গাবক্ষে অর্থ লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও আছে। তবে এসব গ্রন্থাদিতে নন্দ অপশাসনের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তা হয়তো অতিরঞ্জিত।

সম্রাট আলেকজান্ডার নন্দ রাজ্য আক্রমণ না করলেও এর আয়ু দ্রুত ফুরিয়ে আসে। অর্থনৈতিক জোর-জুলুমের কারণে নন্দরা জনপ্রিয়তা হারায় এবং সে কারণে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহে চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ নন্দ সম্রাটকে পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার ভারত ত্যাগের সাথে সাথে এ দেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এক অতুষ্কল নক্ষত্রের উদয় হয়। তিনি ষড়ৈশ্বর্যের^{৩০} অধিকারী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্ত ভারত থেকে শুধু বিদেশীদেরই বিতাড়িত করেন নাই, নন্দরাজকে উচ্ছেদ করে পাটলিপুত্রের সিংহাসনও অধিকার করেন। যদিও কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে নন্দ রাজাদের উচ্ছেদের কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। তবে চাণক্য বা কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক, না পরবর্তী, সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। তবে অধিকাংশের মতে, নন্দ রাজত্বের অবসানকল্পে চন্দ্রগুপ্তের মূখ্য ভূমিকা ছিল। সম্ভবত ৩২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তার কিছু পর নন্দ রাজত্বের অবসান হয়।

ভারতের ইতিহাসে নন্দ রাজবংশের গুরুত্ব অপরিসীম। বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও শিশুনাগ মগধকে কেন্দ্র করে যে সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, নন্দ রাজারা তার বাস্তব রূপ দেন। পূর্বে বাঙলা থেকে পশ্চিমে বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের সাম্রাজ্য। অনেকেই মনে করেন যে, ভারতে প্রথম সাম্রাজ্য নির্মাণের কৃতিত্ব তাদেরই। তারা সাম্রাজ্যের স্বার্থে রাজকোষে অর্থাগমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা প্রধানত জমির খাজনা থেকে সংগৃহীত হত। ফসল ভাল হলে নিয়মিত ও সুচারুরূপে খাজনা আদায় সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তারা যেমন খাল খনন করেছিলেন, তেমনি জলসেচেরও ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য তারা প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মগধের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে তারা প্রমাণ করলেন যে, যোগ্যতা থাকলে অব্রাহ্মণ-অক্ষত্রিয়রাও রাজপদ অলঙ্কৃত করতে পারেন। নন্দদের অভ্যুত্থান শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের উপরও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল।

পুরাণে মহাপদ্ম নন্দকে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংহারকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পঞ্চগল, বারাগসী, কলিঙ্গসহ অনেক রাজ্য দখল করে তার সাম্রাজ্যকে বিক্ষিপ্ত পর্বতমালার দক্ষিণে-দক্ষিণাত্য মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। মনে করা হয় যে, নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ নীচু জাতের মানুষ ছিলেন। পঞ্চম ও চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মগধ শাসন করে নন্দ রাজবংশ। শিশুনাগ বংশের শেষ রাজা মহানন্দীনের অবৈধ সন্তান মহাপদ্ম নন্দ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের পরাজিত করে বিক্ষিপ্ত পর্বতমালা পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হন বলে কথিত আছে। বিধায়, তাকে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বলেও অনেকে মনে করেন। মহাপদ্ম নন্দ তার সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) পদাতিক, ২০,০০০ (বিশ হাজার) অশ্বরোহী, ২,০০০ (দুই হাজার) রথ এবং ৩,০০০ (তিন হাজার) হস্তীবিশিষ্ট এক সুবিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তৎকালীন বাস্তবতার আলোকে এই সংখ্যা অতিরঞ্জন মনে হয়। তবে আলেকজান্ডারের জীবনী লেখক প্লুটার্কের মতে, এই সেনাবাহিনী ছিল আরো বিশাল। তার বর্ণনানুসারে, বিতস্তা নদীর যুদ্ধের সময় নন্দ সাম্রাজ্যের ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) পদাতিক, ৮০,০০০ (আশি হাজার) অশ্বরোহী, ৮,০০০ (আট হাজার) রথারোহী এবং ৬,০০০ (ছয় হাজার) যুদ্ধহস্তী ছিল।^{৩১} ধননন্দ এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন বলে জানা যায়।

সামগ্রিকভাবে একটি ভূখন্ড বা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক ইতিহাস বোধগম্য করতে হলে সে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের আলাদা আলাদা ইতিহাস রচনা করা আবশ্যিক। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস পুনর্গঠন ব্যতিরেকে কোন জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব। কারণ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতীয় ইতিহাস। বিচিত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে যেকোন দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড একই সময় ও পদ্ধতিতে বিকশিত হয় না। তাই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলি অবশ্যই বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বহুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চায় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিষয়াবলির উপর সুগভীর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন রয়েছে। সর্বভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাই মগধের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সুতরাং, বর্তমানকালে মৌর্য-পূর্ববর্তী ভারত ও বাঙলার ইতিহাস রচনা এবং পঠন-পাঠনে মগধকেন্দ্রিক রাজবংশসমূহের উত্থান ও বিকাশ বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

১. অথর্ববেদে প্রথম মগধের জনসাধারণের কথা নজরে আসে, যেখানে তাদেরকে অঙ্গ, গান্ধার এবং মুয়াভাতের (Angas, Gandharis and Mujavats) পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরোত্তর রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে কালক্রমে ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তিরূপে মগধের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এবং দুটি বৃহত্তম ভারতীয় সাম্রাজ্য-মৌর্য এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিকাশে মগধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যেগুলোর উৎপত্তিও সেখানেই। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে*, আদিপর্ব: প্রথম খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০৬), পৃ. ১৭৪-৮০, ২০০; <https://www.wisdomlib.org/definition/magadha> (25.08.2020; 10.23 pm).
২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাংগালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৩১৬-৩১৭; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাং পাব্লিশার্স, ১৯৯৮), পৃ. ২-৩।
৩. ধারণা করা হয় যে, ৩২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, মতান্তরে ১৪০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে একটি অঞ্চলের কর্তৃত্বের অধিকারী বা দাস মালিকেরা রাষ্ট্র গঠন করে। সেসব রাষ্ট্রের আয়তন ছিল স্বল্প কিন্তু প্রায়সই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। রাজা যতটুকু ভূমি দখলে রাখতে সক্ষম হতেন সেটুকুই তার রাজ্য বলে বিবেচিত হত। এভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা জনপদ গড়ে উঠেছিল। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৮০; হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালী ও বাংলাদেশ (০-২০১০)*, (ঢাকা: হাসিনা প্রকাশনা, ২০১২), পৃ. ৬৫-৬৬।
৪. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৪; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৫; দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত), প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৫।
৫. ইতিহাসে গঙ্গারিডি এখনও অনালোচিত। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-উপাখ্যানে উপেক্ষিত গঙ্গারিডি ভাস্বর হয়ে রয়েছে কার্তিয়াস, দিওদোরাস, প্লুতার্ক প্রমুখ গ্রীক লেখকের ইতিবৃত্তে, স্ট্রাবো ও টলেমির ভূগোলবৃত্তান্তে, আর ভারতের মহাকাব্যে। *ঐ*, পৃ. ভূমিকা (১৩); এ কে এম শাহনাওয়াজ, মাসউদ ইমরান, *মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১১), পৃ. ২৮; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬-১৭।
৬. *ঐ*, পৃ. ১৬; সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), (চট্টগ্রাম: দীপঙ্কর কানুনগো, ১৯৯৪), পৃ. ৩৬।
৭. দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২, ২৪, ২৮, ২০০।
৮. ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই বৃজি রাষ্ট্রসংঘ টিকে ছিল। এর বিস্তৃতি ছিল গঙ্গার উত্তর প্রান্ত (বিহার) থেকে নেপালের দক্ষিণে তরাই অঞ্চল এবং গণ্ডক (Gandak) ও কোশী (Kosi) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। বৃজি অঞ্চলে আটটি জাতি-গোষ্ঠী সমসূত্রে গাঁথা ছিল। লিচ্ছবিগণ ছিলেন বৃজির সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি। ফলে বহু ঐতিহাসিক বৃজি এবং লিচ্ছবিকে সমার্থক অর্থে উল্লেখ করেছেন, এমনকি এটি বিদেহ (Videha) এবং তীরভুক্তি (Tirabhukti) হিসেবেও চিহ্নিত বা উল্লিখিত হয়েছে। বিশিষ্ট বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে “people’s council of Vajji” বা ‘বৃজি গণপরিষদ’ (Vajji gana parishad) নামে বৃজিতে জনগণের একটি পরিষদ ছিল যারা খন্ডা (Khanda) থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হতেন এবং তাদের বলা হত ‘গণ-মুখ্য’ (gana mukhya)। গণ-মুখ্যদের নেতাকে বলা হত ‘গণ-প্রমুখ্য’ (ganapramukhya?) যিনি বর্তমান কালের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। বৈশালী ছিল লিচ্ছবিদের রাজধানী। <https://www.ensyklopedia.com/vajji-vrijji-maha-jana-pada-and-licchavi-clan-600-bc/>, date & time: 03.07.17; 16:05.
৯. মো. জাহাঙ্গীর আলম, *মগধ উত্তর ভারত ও বাংলার প্রাচীন ইতিহাস*, ভূমিকাপর্ব, (রাজশাহী: চিহ্ন প্রকাশনা, ২০১৮), পৃ. ২০।
১০. মেগাস্থিনিসের বিবরণ হতে সম্ভবত স্ট্রাবো এই তথ্য আহরণ করেছিলেন যে, ভাগীরথী-গঙ্গার উজান বেয়ে সাগরমুখের বন্দর হতে বাণিজ্যতরীগুলো প্রাচ্য ও গঙ্গারাত্তির তদানীন্তন রাজধানী পাটলীপুত্র পর্যন্ত যাতায়াত করত। প্লিনিও এই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উল্লেখ করেছেন। ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমির তথ্যানুযায়ী, তাম্রলিপি হতে যাত্রা করে জাহাজগুলো সোজা এসে ওড়িশ্যা দেশের পলৌরা (Paloura) বন্দরে এবং সেখান থেকে সরাসরি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যেত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপগুলোতে। নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯, ৯৬-৯৮; দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০০; মোহাম্মদ কাসেম, *ফিনিসিয়া থেকে ফিলিপাইন* (ঢাকা: সাহিত্যমালা, ১৯৯০), পৃ. ১২৩।

১১. ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বেই এখানে বেশীরভাগ নগরায়ন হয়েছে বলে অনুমিত হয়। মগধ এমন একটি স্থান, যেখানে ভারতের শক্তিশালী ধর্মগুলো বিকশিত হয়েছে। এই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এখানকার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দুধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-পুনর্জন্ম এবং কর্মের প্রতিফল। *ঐ*, পৃ. ২০১; জুলফিকার মতিন, *বাঙালী মুসলমান ও তার মন* (রাজশাহী: চিহ্ন উজানের প্রকাশনা, ২০১৭), পৃ. ২৫।
১২. দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩।
১৩. বিম্বিসার যে বংশের সন্তান, সেই বংশের নাম হর্যঙ্ক। বিম্বিসারের কোন পূর্বপুরুষের নাম হর্যঙ্ক হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। হরিবংশ ও বায়ু-পুরাণে হর্যঙ্ক নামে এক অঙ্গরাজ্যের উল্লেখ আছে। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭, ২০০-২০১।
১৪. আর্যাবর্তের পূর্বাংশের প্রায় সব রাজাই কৃষকের বিরোধী ছিলেন, এজন্য কৃষক-সমাপ্রিত নব ব্রাহ্মণসমাজের কাছে তারা রাক্ষস ও দানব বলে অভিহিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা কৃষকে কেন্দ্রস্থানীয় করে উত্তর-পশ্চিমে যে নতুন হিন্দু-সমাজ গঠন করছিলেন- পূর্বাংশের সার্বভৌম রাজাগণ তার ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন। তবে কৃষকবিদ্বেষীদের পতাকাতলে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম পুষ্টিলাভ করলেও ধর্মদুটি এখানে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বিস্তারিত: দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২, ২৬-২৮, ৪১-৪৫, ৪৭-৫২, ১৫০।
১৫. বিম্বিসারের পিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দ্বীপবংশে তাকে বোধিস বলা হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থে তার নাম দেয়া হয়েছে ভাতিয় বা ভটিয় বলে। তিব্বতি গ্রন্থে তার নাম মহাপদ্ম। পুরাণে তাকে হেমজিৎ, ক্ষেমজিৎ, ক্ষেত্রোজা ও ক্ষত্রোজা বলা হয়েছে। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০২, ২১০।
১৬. তার এই উপনামের কারণ সুস্পষ্ট নয়। অনেকে সেনাপতি অর্থে ‘শ্রেণিক’ পদটির ব্যাখ্যা করেছেন আবার কারো মতে, বিম্বিসার এক স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন বলেই তার এই নামকরণ। শ্রেণি বা শ্রেণী বলতে বণিক সংগঠন বা গিন্ড বোঝায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, বণিক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলেই তাকে ‘শ্রেণিক’ বলা হত, এমন মতও কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু *সিদ্ধান্তবারিধি*, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড, কায়স্থ কাণ্ডের প্রথমাংশ)* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ৫৪; দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১-২০২, ১৯৪, ২০২, ২১৬, ৩০১, ৩৩৪-৩৩৫, ৩৮৪।
১৭. প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘কার্ষাপণ’ নামে সোনা, রূপা ও তামার তৈরী তিন ধরনের মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে যে হাজার হাজার ছাপমারা বা অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা এই ‘কার্ষাপণ’। এই মুদ্রাগুলো অতি আদিম এক পদ্ধতিতে তৈরী হত। প্রথমদিকে কার্ষাপণ মুদ্রা হয়তো কাশী, কোসল, মগধ অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল, পরে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বণিক সমাজই হয়ত প্রথম মুদ্রা চালু করে, কিন্তু পরে মুদ্রার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পতঞ্জলির লেখায় কার্ষাপণ মুদ্রার বহুল প্রচলনের কথা জানা যায়। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৪, ২০২, ২১৬, ৩০১, ৩৩৪-৩৩৫, ৩৮৪।
১৮. বুদ্ধের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন মগধের রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, রাজবৈদ্য জীবক, শ্রাবস্তীর বণিক অনাথপিণ্ড, বৈশালীর বারবণিতা অশ্বপালী এবং শ্রাবস্তীর গৃহবধূ বিশাখা। *ঐ*, পৃ. ২০২-২০৩।
১৯. কোন কোন সূত্র মতে রাজা বিম্বিসার ৫৪৩-৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য শাসন করেন। বিম্বিসারকে বন্দি করার পর অজাতশত্রু তাকে হত্যা করবেন বুঝতে পেরে পিতা বিম্বিসার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বা প্রজা-বিদ্রোহের কথা ভেবে প্রাণোৎসর্গের পথ বেছে নেন কারণ হত্যার দায় যেন পুত্রের ঘাড়ে না পড়ে। অজাতশত্রু যে তার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করেছিলেন, সে সম্পর্কে বহু প্রবাদ ও উপাখ্যান বৌদ্ধজগতে প্রচলিত আছে। এমন কথাও প্রচলিত আছে যে, ‘রোমে নেরোবংশ যেমন মাতৃহন্তাবংশ তেমনি ভারতে পিতৃহন্তাবংশ হল বিম্বিসার বংশ’। কথিত আছে যে, অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বৎসর ৮০ বছর বয়সে বুদ্ধের মৃত্যু তথা পরিনির্বাণ বা মহাপরিনির্বাণ ঘটে। *ঐ*, পৃ. ১৪৩, ১৫১, ২০৩, ২১০; দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৪।
২০. বৃজি রাষ্ট্রসংঘের রাজধানী বৈশালী। আবার লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানীও বৃজি। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৯।
২১. শোনা যায় যে, অজাতশত্রুর সাথে লিচ্ছবিদের সংঘর্ষ চলাকালিন বুদ্ধ বৈশালীতে এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিষ্য আনন্দ। প্রিয় শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, যতদিন লিচ্ছবিরা এক থাকবেন, ততোদিন তারা নিরাপদ। বর্ষাকার ও

- সুনীধ অতি নিপুণভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। পাটলিগ্রামে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী হল। লিচ্ছবিদের শক্তির উৎস যে ঐক্য, তাতে ফটল ধরল। ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়। ঐ, পৃ. ২০৪-২০৫।
২২. মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী ও বিদিশা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অবন্তী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রাজধানী উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী ছাড়া এ রাজ্যে বিদিশা, মহিস্মতি ও দশার্ণ নামে আরো কয়েকটি বিখ্যাত শহর ছিল। ঐ, পৃ. ১৭৭।
২৩. অন্য একটি সূত্র মতে, ৬৪২ খ্রি.পূর্বাব্দে শিশুনাগের মগধের সিংহাসনারোহণ। তিনি প্রথমে কাশ্মিরের রাজা ছিলেন। মগধ জয় করে পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করেন। সম্ভবত এটি স্বতন্ত্র একটি রাজবংশ, যা একই নামে পরিচিত ছিল। ঐ, ২০৬, ২১০; হারুন-অর-রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
২৪. বর্তমানকালের ফৈজাবাদ-অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে কোসল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। উত্তরে নেপাল থেকে দক্ষিণে সর্পিকা বা সাই নদী এবং পূর্বে সদানীরা বা গণ্ডক হতে পশ্চিমে গোমতী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই রাজ্য। অন্যদিকে বর্তমান এলাহাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন বৎস রাজ্য অবস্থিত ছিল। কৌশম্বী ছিল এর রাজধানী। এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোসাম গ্রাম প্রাচীন কৌশম্বীর স্মৃতি বহন করছে। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৬, ২০৬।
২৫. গ্রীক লেখকগণ মহাপদ্মকে লম্পট, কুচক্রী রূপে বর্ণনা করেছেন। রানির যোগসাজেসে মগধের রাজা ও তার পুত্রদের হত্যা করে তিনি সিংহাসন দখল করেন বলে তাদের মত। কিন্তু মহাবংশটিকায় মহাপদ্মকে এক দস্যু সর্দারের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, গ্রামের পর গ্রাম ও শহর জয় করে তিনি ক্রমশ শক্তিশালী হন। শেষে রাজাকে হত্যা করে তিনি মগধের সিংহাসন দখল করেন। অর্থাৎ ষড়যন্ত্র করে নয়, বাহুবলে মহাপদ্ম মগধের সিংহাসন অধিকার করেন, বৌদ্ধ গ্রন্থখানি থেকে এরূপ ধারণাই জন্মায়। ঐ, পৃ. ২০৭; নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫।
২৬. ঋগ্বেদে এক এক জনগোষ্ঠীর পরিচালককে প্রায়ই রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনো তাকে ‘বিশপতি’, ‘গণপতি’ বা ‘জ্যেষ্ঠ’ও বলা হয়েছে। গোষ্ঠীপতিকে কখনও কখনও ‘সম্রাট’, ‘অধিরাজ’ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ আবার ‘বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা’ অর্থাৎ ‘বিশ্বভুবনের কর্তা’ নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সম্রাট, স্বরাট, বিরাট, ভোজ ইত্যাদি রাজকীয় অভিধা আছে। বৈদিকোত্তর যুগে বৃহদায়তন রাজ্যের অধিপতিরা এসব অভিধা ধারণ করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উক্তি থেকে জানা যায়, পূর্ব দেশের রাজাদের ‘সম্রাট’ বলা হত, দক্ষিণের রাজারা ‘ভোজ’ নামে পরিচিত ছিলেন, উত্তরের রাজাদের ‘বিরাট’ আখ্যা দেয়া হত, মধ্যদেশের নৃপতিরা রাজা বলে অভিহিত হতেন। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩, ১৩০।
২৭. দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
২৮. মহাপদ্মের কনিষ্ঠ পুত্র ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে খুব পছন্দ করতেন বিধায় ধননন্দ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তবে কথিত আছে যে, নন্দবংশীয় রাজারা উৎপীড়ন করে অর্থ আদায় করতেন বলে প্রজাদের কাছে অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিলেন। তারই পরিণতিতে সম্ভবত ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক ধননন্দ উৎখাত, নন্দবংশ ধ্বংস এবং মগধে মৌর্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হারুন-অর-রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
২৯. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।
৩০. প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য— একত্রে এই ছয়টি গুণ। প্রাচ্যরাষ্ট্রের সম্রাট নন্দের সম্মিলিত শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে আলেকজান্ডার ভারত অধিকারের স্বপ্ন ত্যাগ করে ফিরে যান। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় বাংলার হাতি ছিল সর্বসেরা। এখানেই এক সময় হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায় প্রাচ্য ও গঙ্গারাজ্য হাতির জন্য বিখ্যাত ছিল। বিস্তারিত- আলী ইমাম, *বাঙলা নামে দেশ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯৫), পৃ. ১৮ ও ২০; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

বাংলার জনজীবনে মোগল শাসন ব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ

ড. মো. আমিরুল ইসলাম*

Abstract: The prosperous and bountiful rule of the Mughals was most significant foresightedness in the life of Bengali people. As a result of Mughal conquest of Bengal, no doubt, lost its independence and further scope for its national development, but its loss was more than compensated. The Mughal rule conferred on Bengal the benefits of an enlightened and orderly government. Under their enlightened administration the people of Bengal enjoyed an unbroken peace for about a century and half. The influence of Mughal rule appears to have penetrated all aspects of polity, society and culture. This paper throws light on this aspect of the history of Bengal under the Mughals.

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পর থেকে মোগল সাম্রাজ্যের সুবা হিসেবে দিল্লী কর্তৃক নিয়োজিত সুবাদারদের মাধ্যমে বাংলা শাসিত হতে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব নামমাত্র ছিল। এ সময় মোগলদের শাসন রাজধানী রাজমহল ও এর আশেপাশের কয়েকটি থানায় এবং কয়েকটি সুরক্ষিত ঘাঁটি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতে মোগল অধিকার ও কর্তৃত্ব সন্তোষজনকভাবে স্থিতিশীল হলে সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্বের ২৪ তম বর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ সালে সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১২টি সুবায় বিভক্ত করেন।^১ এর ফলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ বা সুবা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তবে বাংলায় কার্যকর অভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য মোগলদের আরও প্রায় আড়াই দশক অপেক্ষা করতে হয়। সুবাদার ইসলাম খান তাঁর শাসনামলে (১৬০৮-১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় পরিপূর্ণভাবে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিতকরণের মধ্যদিয়ে বাংলায় সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলী খানের অধীনে বাংলা কার্যত স্বাধীন হয়ে গেলেও সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটিভাবে মোগল আমলের শাসন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল।

বাংলায় শান্তিপূর্ণ মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তা বাঙ্গালী জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুদীর্ঘ সময়ের যুদ্ধ বিগ্রহের অবসানে মোগলরা এদেশে যে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে তার সুফল এদেশের আপামর জনগণ পেতে আরম্ভ করে। কিন্তু সমগ্র মোগল শাসনামলে কখনো কখনো এদেশে বিভিন্ন দস্যু-তরুরা জনজীবনে বিভিন্নকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার এবং অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে পশ্চিম বাংলায় মারাঠা আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে দস্যুতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, রাহাজানী, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার জনজীবনে মূর্তিমান আতঙ্করূপে আবির্ভূত হয়। জনজীবনের এ অপরিসীম দুঃখ দুর্দশায় বাংলার মোগল শাসকরা বিচলিত ছিলেন। বাংলায় নিযুক্ত মোগল শাসকগণ তাঁদের সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে এ সকল দস্যু তরুরদের হাত থেকে এদেশবাসীকে রক্ষা করেন। এছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষ দশক এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকব্যাপী কিছু কিছু হিন্দু জমিদার বিদ্রোহ করে বাংলায় মোগল শাসনকে কিছুটা বিব্রত করে। এতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষিপ্রজা ও সাধারণ জনগণ কিছুটা অত্যাচারিত হলেও মোগলদের সুদৃঢ় পদক্ষেপের কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এ ধরনের রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা করেই মোগলরা বাংলায় রাষ্ট্রগঠন ও শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠুরূপ প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মোগল শাসন বাংলার অধিবাসীদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রায় পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনের মধ্যে তুর্ক-আফগান সুলতানগণ প্রায় তিন'শ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত বাংলার শাসন পরিচালনা করেন এবং মোগল শাসনের সময়কাল ছিল তাদের অর্ধেকেরও কম। তবুও এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে সুলতানী আমলের চেয়ে মোগল আমলের প্রভাব অধিকতর ছিল। মোগলদের সুশৃঙ্খল ও জ্ঞানদীপ্ত শাসনের ফলে সুবা বাংলা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। মোগল পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে বেশ কয়েকজন প্রতিভা সম্পন্ন শাসকের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের ব্যক্তিত্বের জৌলুস ও শাসন ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের ন্যায় বাংলার জনসাধারণেরও চিত্ত জয় করেছিল। এ প্রদেশে সমগ্র মোগল শাসনামলে যে সমস্ত সুবাদার, দীওয়ান, বখশী, কাজী, সদর, ফৌজদার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই উন্নতমানের যোগ্যতা, দক্ষতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও পরিমার্জিত রুচির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।^২

বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী আমলে বাংলার সুলতানগণ প্রায় সকলেই বহিরাগত হলেও তাঁরা এদেশেই বসতি স্থাপন করেন এবং এদেশেই থেকে যান। কিন্তু মোগল আমলে (১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) এক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এসময় মোগল প্রশাসনের সকল উচ্চপদে, শুধু সেনাবাহিনী বা বিচার বিভাগই নয়, রাজস্ব ও হিসাব বিভাগ এমনকি সেনা ও নৌবাহিনীর সরবরাহ ও সাচিবিক দপ্তরেও আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে আমন্ত্রিত লোকবল দ্বারা পূরণ করা হতো। এ সমস্ত লোক বাংলায় বসতি গড়েনি; তাঁরা সুবাদার পরিবর্তনের সাথে সাথে এদেশে আসতো আবার ফেরৎ যেত।^৩ মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলের পূর্বে বাংলার প্রশাসনিক পদগুলোতে স্থানীয়দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌণ। এ সময় সুবার দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছে মোগল সামরিক অভিজাত সদস্যরা। প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে বাঙ্গালীদের দূরে রাখা স্থানীয় জনগণের মধ্যে মোগল শাসনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম দেয়। অবশ্য বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমল আরম্ভ হলে এ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটে। এ সময় নবাবরা তাদের আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয়দের প্রশাসনে নিয়োগ দিতে আরম্ভ করে। এমনকি এ সময় অনেক হিন্দু বাঙ্গালীকে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের উদারনীতি গ্রহণ করেন সম্রাট আকবর এবং তাঁর পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ। সম্রাট আকবরের ছেচল্লিশ জন উচ্চ পদস্থ বেসামরিক কর্মচারীর মধ্যে নয় জন ছিলেন হিন্দু।^৪ সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সাম্রাজ্যের তিনটি সুবার দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনজন হিন্দু কর্মচারীর উপর। মহারাজা মানসিংহ, রাজা কল্যাণসিংহ এবং বিক্রমজিৎ যথাক্রমে বাংলা, বিহার এবং গুজরাটের সুবাদার ছিলেন।^৫ সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের একান্ন জন এবং আওরঙ্গজেবের একশ ষাট জন উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিল।^৬ কিন্তু ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে মুর্শিদকুলী খানের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র সুবাদারী আমলে প্রায় একত্রিশ জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। এর মধ্যে রাজা মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন একমাত্র হিন্দু সুবাদার। প্রদেশে প্রায় সমান সংখ্যক দীওয়ান এবং বখশি নিযুক্ত হলেও একমাত্র জওহরমল ছাড়া অন্য সকলেই ছিল মুসলমান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে শাহজাদা শাহজাহান বাংলা অধিকার করলে সম্রাটের দীওয়ান মীর্জা মালিকের পরিবর্তে রায় জওহরমল দাসকে তিনি দীওয়ান নিযুক্ত করেন।^৭

একইভাবে সুবাদারদের শাসনামলে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যান্য উচ্চপদেও হিন্দুদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। হিন্দুদের সাধারণত সুবাদার, দীওয়ান, বখশি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সংস্থাপনায় নিযুক্ত করা হতো। সুবাদার ফতেহজঙ্গের গৃহসংস্থায় জওহরমল দাস ব্যক্তিগত সহকারী ও দীওয়ান ছিলেন।^৮ রামদাস কাসিম খানের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং রায় কাশীদাস ছিলেন কুলিজ খানের দীওয়ান।^৯ গোলাপ দাস ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গের সৈন্য বিভাগে চাকরি করতেন।^{১০}

ইসলাম খানের সময়ে রায় ভাওয়াল দাস বাংলার সেনা বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন।^{১১} গোলন্দাজ ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ মীর্জা নাথানের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে বল ভদ্র, বৈকুণ্ঠ নাথ দাস, বদরী দাস, মাধব দাস, শ্যামদাস প্রমুখের নাম বাহারীস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়।^{১২} রাজা টোডরমলের পৌত্র এবং দোহারের পুত্র জগদেবসহ আরো কয়েকজন হিন্দু মনসবদার বাংলায় মোগলদের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন।^{১৩} অর্থাৎ খুবই সীমিত সংখ্যক হিন্দু এসময়ে বাংলার প্রশাসনে নিয়োগ লাভের সুযোগ পায়।

মুর্শিদকুলী খানের প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনে অভিজাত হিন্দুদের প্রাধান্য। প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তিনি রাজস্ব ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক হিন্দু কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। অসংখ্য মুসলমান জমিদারকে বাদ দিয়ে তাদের পদে তিনি হিন্দু মুৎসুদ্দীদের নিয়োগ দেন। শুধু দীওয়ানী বিভাগেই নয়, মুর্শিদকুলী খান সামরিক বাহিনীতেও অনেক হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সময়ে ভূপাত রায়, দর্প নারায়ণ, রঘুনন্দন, কিল্লের সেন, আলম চাঁদ, লাহারমল, দিলপাত সিং হাজারী প্রমুখ হিন্দু ব্যক্তিবর্গ দীওয়ান ও প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন ছিলেন।^{১৪} নবাব সুজাউদ্দীনও তাঁর শ্বশুরের নীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর শাসনামলে আলম চাঁদ, যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ, নন্দলাল এবং অন্যরা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন।^{১৫} নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে সরকারিভাবে হিন্দু অভিজাততন্ত্র আরো সমৃদ্ধ হয়। জানকী রাম, তৎপুত্র দুর্লভ রাম, রাম নারায়ণ, কীর্তিচাঁদ, উমিচাঁদ, বীরবল্লভ, রামরাম সিংহ, গোকুলচাঁদ প্রমুখ ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী।^{১৬} তিনি জানকী রাম ও রাম নারায়ণকে যথাক্রমে বিহারের দীওয়ান ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দেন। দুর্লভ রামকে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্নর এবং রাজবল্লভকে জাহাঙ্গীরনগরের দীওয়ান নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। শ্যাম সুন্দর ছিলেন নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর বখশী ও রামরাম সিংহ ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান।^{১৭} সিরাজউদ্দৌলা তাঁর মাতামহের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি মোহনলালকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী এবং জানকী রামকে দীওয়ান হিসেবে নিয়োগ দেন।^{১৮} রায়দুর্লভ, রায়নারায়ণ, রাজবল্লভ প্রমুখ তাদের পূর্বতন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। মানিকচাঁদ ও নন্দকুমারকে যথাক্রমে কলকাতা ও হুগলির ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়া নবাবের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন মীরমদন। প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল; এদেশের বৃহত্তর হিন্দু জনগণের সন্তুষ্টি ও তাদের মেধা এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগানো। সর্বোপরি মুসলমান কর্মচারীদের তুলনায় তারা বেশী অনুগত থাকতো। এভাবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে প্রতিফলিত অমুসলিমদের (হিন্দু) প্রতি মুসলিম শাসকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একদিকে যেমন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে তেমনি সমাজ জীবনেও ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানদের সৌহার্দ ও সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এ সুফল গ্রহণ করতে বাংলার হিন্দু সমাজও দ্বিধা করেনি।^{১৯}

মোগল আমলে বাংলার সুবাদারগণ তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীন হওয়ায় বাংলার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়। অর্থনৈতিক জীবনে সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির সব অবস্থা তখন বাংলায় বিদ্যমান ছিল। এদেশের উর্বর ভূমি কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুকূলে ছিল যা এদেশকে কৃষি নির্ভর দেশ হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বাংলার মোগল শাসকগণ বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক সেচ ব্যবস্থার উপযোগী করে খাল খনন ও কৃষি ঋণ প্রদানের কথা জানা যায়।^{২০} বাংলার কৃষিজাত সম্পদ ছিল বিচিত্র ও অফুরান্ত। মোগল আমলেও প্রচুর শস্য উৎপাদনের ফলে বাংলার জনগণ স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতো। উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে রপ্তানি হতো। সতের শতকের সব বিদেশী পর্যটকই এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আঠারো শতকেও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির এধারা অব্যাহত থাকে।^{২১}

মোগল আমলে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষ করে সুতিবস্ত্র ও রেশমের উৎপাদন চরম উন্নতি লাভ করেছিল। স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য মোগল আমলে বাংলায় কৃষির উন্নতির সাথে সাথে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয় এবং দেশ ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। কোন কোন ঐতিহাসিক এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলায় মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা এখানকার তৈরিকৃত পণ্যসমূহের উৎপাদন বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে। এ প্রবৃদ্ধি পর্যায়ক্রমে বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারণে সহায়ক ছিল।

প্রাক মুসলিম আমলে এমনকি সুলতানী আমলেও এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সীমিত। এম.এ. রহিমের মতে, তখন এদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল মাত্র পার্শ্ববর্তী কয়েকটি প্রদেশের সাথে এবং ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাথে। মোগলদের বাংলা বিজয়ের ফলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের পর্যাপ্ত বাড়তি সামগ্রীর জন্য সমগ্র ভারতের বাজার উন্মুক্ত হয় এবং এর সাথে যোগ হয় পশ্চিম এশিয়া, মধ্য ইউরোপ এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার বিরাট বাজার।^{২২} মোগলদের মুক্তদ্বার নীতি ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আসতে অনুপ্রাণিত করে। মোগল পূর্ব আমলে ইউরোপীয় বণিক শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র পর্তুগিজরা এদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে এসেছিল। কিন্তু মোগল শাসনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ আমলে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ডেনিশ ও জার্মান ব্যবসায়ীগণ বাংলার অপার বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে এদেশে আসে এবং স্বাধীনভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মোগলদের গৃহীত নীতির ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায় একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট প্রাক ব্রিটিশ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বলেন, তখন বাংলা ছিল সচ্ছল, ব্যয় বেশী ছিল না, স্বাধীন রাজ্য পরিচালনার ব্যয় ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এদেশের মানুষ কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে সুখী। তাঁরা প্রাচুর্য ও শান্তিতে জীবন যাপন করতো।^{২৩}

তবে বৈদেশিক বাণিজ্য বাংলাকে প্রভূত সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল একথা যেমন ঠিক; তেমনি বিদেশী ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক সুবিধা দান এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাবও ফেলেছিল। মোগলদের উদার নীতি গ্রহণের ফলে ইউরোপ থেকে আগত বিভিন্ন বণিক শ্রেণী ধীরে ধীরে এদেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে দিয়ে বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের বাণিজ্যের উপর মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়টি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ফলশ্রুতিতে এ সকল বণিক শ্রেণী বাণিজ্য বহির্ভূত ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হলেও একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পর্তুগিজরা এদেশে বাণিজ্যের পাশাপাশি দস্যুতার মাধ্যমে যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা বাংলার জনজীবনে বিভীষিকা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। সম্রাট শাহজাহান পর্তুগিজদের সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের কারণে ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার সুবাদার কাশিম খানকে পর্তুগিজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। কাশিম খান ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের আক্রমণ করে তাদের প্রধান ঘাঁটি হুগলি দখল করে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন। তবে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সম্রাট শাহজাহান এক বছরের মধ্যেই তাদের পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।^{২৪} সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েও ইংরেজরা তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তিনি পুনরায় বাংলায় তাদের বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করতে বাধ্য হন।^{২৫}

কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে মোগল আমলে বাংলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী হলেও স্বাধীন সুলতানী আমলের ন্যায় এদেশের সকল সম্পদ এদেশে থাকেনি। কেননা মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বঙ্গ কেন্দ্র শাসিত একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে বাংলার

রাজস্বলব্ধ অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার ফিদাই খানের (১৬২৭-১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সুবাদারগণ রাজস্ব হিসেবে বাংলা থেকে সম্রাটদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করতেন, কখনো নগদ অর্থ প্রেরণ করেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু ফিদাই খান সর্বপ্রথম বাংলার রাজস্ব স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং সম্রাটপত্নী নূরজাহানকে পাঁচ লক্ষ, মোট দশ লক্ষ টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।^{২৬} অতঃপর বাংলার সুবাদার এবং নবাবেরা দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ নগদ অর্থসহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখেন। বাংলা থেকে সুবাদার শায়েস্তা খান বিপুল পরিমাণ অর্থ দিল্লীতে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খান একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ অর্থ বাংলা থেকে প্রেরণ করেন অন্যদিকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সন্তুষ্টির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা নগদসহ চার লক্ষ টাকা মূল্যের মনি মানিক্য প্রেরণ করেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শায়েস্তা খান বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে প্রেরণ করতে থাকেন।^{২৭}

বাংলার অন্যান্য সুবাদারগণও দিল্লীতে কম অর্থ প্রেরণ করেননি কিংবা ব্যক্তিগত খাতে তাঁদের সঞ্চয়ের পরিমাণও কম ছিল না। মুর্শিদকুলী খান বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে প্রতিবছর প্রায় এককোটি টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করতেন। শুজাউদ্দীনও প্রতিবছর সম্রাটকে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা করে প্রেরণ করতেন। তাঁর বার বছরের নবাবী আমলে তিনি দিল্লীতে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা প্রেরণ করেন। মুর্শিদকুলী খানের পূর্বে আজিম-উস-শানও তাঁর নয় বছরের সুবাদারী আমলে প্রায় আট কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন।^{২৮} এরূপ শোষণ আর মুদ্রা পাঁচার ফলেই জনজীবনে দেখা দেয় তীব্র মুদ্রা সংকট। যার ফলে সমসাময়িককালে দ্রব্যমূল্য এরূপ কল্পনাতীত সস্তা ছিল।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশেই নির্ভর করে নিরাপদ ও উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উপর। মোগল আমলে সুবা বাংলার সর্বত্রই রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। শাসকগোষ্ঠী দস্যু তস্করদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সড়ক পথের বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করেছিল। ফলে জোরালো অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার প্রধান প্রধান শহরগুলো, যেমন মুর্শিদাবাদ, হুগলি, ঢাকা, পাটনা ও কলকাতার সাথে পূর্বে নেপাল ও ভূটান, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূম, পালমৌ ও ছোট নাগপুর এবং পশ্চিমে বেনারস ও গাজিপুর সড়ক পথে সংযুক্ত ছিল। এছাড়া উত্তর-পশ্চিমে বিহারের বেতিয়া, উত্তর-পূর্বে সিলেট, জয়ন্তিয়া ও খাসপুর এবং দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম ও রাজঘাটের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।^{২৯} বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কেবলমাত্র একটি প্রধান কর্ম কেন্দ্রের সাথেই সুবার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রকে সংযুক্ত করেছিল তা নয়। প্রতিটি জেলার মধ্যেই অনেকগুলো রাস্তা জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলায় যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল নদীপথ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা ও খাল দিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সহজে যাতায়াত করা যেত। বাংলার সব অঞ্চলের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মধ্যদিয়ে বহু সংখ্যক শাখা নদী, নালা, খাড়ি প্রবাহিত হতো এবং তাতে সহজে যোগাযোগ সম্ভব হতো। এতে সময় কম লাগতো এবং তুলানামূলক ভাবে নিরাপত্তাও ছিল। মোগল সুবাদারগণ বিশেষ করে নবাবী আমলের নবাবগণ নদীপথেও বণিক ও সাধারণ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতেন। ফলে বাংলার অভ্যন্তরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতেও বণিক ও পর্যটকরা সহজে যাতায়াত করতে পারতো। অষ্টাদশ শতকে আগত বিদেশী পর্যটকগণ বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন।^{৩০}

সুলতানী আমলের তুলনায় মোগল আমলে বাংলায় খাদ্য দ্রব্যের সহজলভ্যতা ও সস্তা হওয়ার ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বাংলার মোগল শাসকদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। সম্ভবত এর মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাসাধারণের কল্যাণ, সুখ ও সুবিধা। সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়ে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ঢাকা ত্যাগের পূর্বে ঢাকা দুর্গের পশ্চিম তোরণদ্বার বন্ধ করে দেবার আদেশ দেন এবং তাতে লিপিবদ্ধ করে দেন, ভবিষ্যতে যে সুবাদারের শাসনামলে খাদ্য শস্যের দাম এরূপ সস্তা হবে তিনিই কেবলমাত্র এ দ্বার খুলতে পারবেন।^{৩৬} অবশ্য শায়েস্তা খানের সময়ে দ্রব্যমূল্য এরূপ সস্তা হওয়ার পেছনে কেউ কেউ যুক্তি প্রদান করেন যে তাঁর সময়ে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হতো। এছাড়াও তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। ফলে দেশে অর্থের সংকট দেখা দেয়াই খাদ্য দ্রব্যসহ সকল দ্রব্যের দাম কমে যায়।

যাহোক শায়েস্তা খান কর্তৃক বন্ধকৃত তোরণদ্বার দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। নবাব সুজাউদ্দীন খানের সময়ে চালের দাম আবার টাকায় আট মণে নেমে আসলে তিনি ঢাকা দুর্গের পশ্চিমদিকের বন্ধ তোরণদ্বার খুলে দেন। প্রজাদের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে নজর রাখতেন বলে কখনো খাদ্য সংকট দেখা দিলে বাংলার মোগল শাসকগণ দেশের স্বার্থে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করে দিতেন।

বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর মোগল শাসনের প্রভাব অনেকটাই স্পষ্ট। স্বাধীন সুলতানদের সময়ে দিল্লী বা অন্যান্য মুসলিম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সীমিত। মোগলরা ষোল শতকে তাদের বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যের সাথে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর ফলে উত্তর ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বন্ধীপটির দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদের অবসান ঘটে। বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের স্থায়ী ও সুশাসিত সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত হওয়ার পর উত্তর ভারত থেকে অনেক জ্ঞানীশুণী ও সংস্কৃতিমনা মুসলমানরা এখানে এসে স্থায়ী বসতি গড়েছেন। মোগল অফিসার ও সেনাপতিগণও এ যোগাযোগ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কেবলমাত্র উত্তর ভারত নয়-মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং বহিঃবিশ্বের সাথে বাংলার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বিদেশী ভাবধারা বাংলায় পূর্বের তুলনায় অধিক মাত্রায় প্রবেশ করে।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিয়া প্রভাবের উৎপত্তি এ প্রদেশের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের একটি লক্ষণীয় বিষয়। মোগল-পূর্বযুগে বাংলায় পারসিক ও শিয়া সম্প্রদায়ের লোক তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কিন্তু মোগল আমলে এদেশের শিয়া মুসলমানদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। পারস্য থেকে শিক্ষিত শিয়া পণ্ডিত, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কারিগরেরা বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। সুবাদার শাহ শুজার সময়ে বাংলায় বেশ কিছু শিয়া মুসলমানের আগমন ঘটে এবং তাঁরা রাজমহল ও ঢাকার সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুর্শিদাবাদের নিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিয়াদের আগমন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুহাররমসহ বেশ কিছু শিয়া উৎসব বাংলার জনজীবনে প্রবেশ করে।^{৩৭} তবে বাংলার সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায় কখনোই তাদের প্রতি বা তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাংলায় মুসলিম সমাজের প্রসারের ক্ষেত্রে মোগল শাসনামল বিশেষ করে নবাবী আমল উল্লেখযোগ্য। সুলতানী আমলে স্থানীয় লোকজন যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি এমনটি নয়। তবে মোগল আমলে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেউ ইসলামের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার কেউ সরকারি সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করে। সূফী সাধক, ফকির, দরবেশের প্রাধান্য সুলতানী আমলে থাকলেও মোগল আমলে তাঁরা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানত তাঁদের প্রভাবেই বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উন্নত ধর্মভাব এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাংলার মোগল শাসনামল একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁরা বাংলার জনগণের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সুলতানদের পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে অধীনস্তদের নিজস্ব রীতি অনুসরণ করতে দেয়া হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে মোগল সরকার নিরপেক্ষ থাকে এবং কোন ধর্মের প্রতি অগ্রাধিকার না দেখিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত ভূমি বরাদ্দ ও অন্যান্য সুবিধা বহাল রাখে। রিচার্ড এম ইউনাইটেডের মতে, অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামকে সমর্থন দানের জন্য স্থানীয় মোল্লা ও সূফীদের চাপ থাকা সত্ত্বেও বাংলার মোগল শাসকগণ ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেন।^{৩৩}

সংক্ষেপে বলা যায়, পারস্পারিক গ্রহণ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকগণ এমন একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন যাতে সব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সংঘর্ষ ব্যতীত একত্রে বসবাস করতে পারতো। রাজনৈতিক কারণ ছাড়া এ পর্যায়ে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে কোন সংঘাত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন।

মোগল সম্রাটগণ প্রজাবৎসল উন্নতমনা ও উদার প্রকৃতির শাসক ছিলেন। বাংলায় নিযুক্ত মোগল সুবাদার, দীওয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীরা সুশাসক, প্রজাবৎসল ও শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিলেন। তাঁদের সাথে বহু কবি, পন্ডিত ও শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি শ্রেণী পেশার অনেক শিক্ষিত লোক বাংলায় আসেন। তাঁদের প্রভাবে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজীবনের সূত্রপাত হয়। মোগল সুবাদারগণ ও তাঁদের আমীর ওমরাহগণ সকলেই শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিক্ষার উন্নতি করা যেহেতু রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল, তাই বাংলার নবাবগণ রাষ্ট্রের অর্থ দিয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তৎসঙ্গে ওমরাহগণও নিজ ব্যয়ে শিক্ষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রায় প্রত্যেক মসজিদের সাথে একটি মক্তব থাকতো এবং সেখানে প্রতিবেশী ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতো। সাথে সাথে শহর ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ও চালু ছিল।^{৩৪} শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মোগল শাসনের এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। প্রাথমিক স্তরে মহিলাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হতো, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বাড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হতো।^{৩৫} মোগলদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল সরকারি কার্যে ফার্সী ভাষা বাধ্যতামূলক করেন। ফার্সী সরকারি ভাষা হওয়ায় এদেশের জনগণ এমনকি হিন্দুরাও এ ভাষা শিখে রাজপদের যোগ্যতা অর্জন করতো। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে ফার্সী ভাষা। এ সময় থেকে বাংলায় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে। ফার্সী ভাষা প্রশাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ার ফলে বাংলার বুদ্ধি বৃদ্ধির বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল - এমন ধারণা পুরোপুরি সত্য বলে মনে হয় না। কেননা মোগল আমলে বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি হয়। যদিও তখন সুলতানী আমলের মতো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না তবুও দেশে অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে যা ভাষার উন্নয়নের কার্যে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলা, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো এবং পারস্যের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারার সংস্পর্শে আসে। অসংখ্য ইরানী, তুর্কী কর্মচারী, সূফী সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী বাংলায় আসতে থাকে। ফলে চিন্তাধারার উন্নতির সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।^{৩৬} এছাড়া ফার্সী শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারের ফলে তা বাংলা ভাষাকে প্রভাবান্বিত করে। সমৃদ্ধশালী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও শব্দ সম্ভার দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হয়।

বাংলায় শিল্প ও স্থাপত্যও মোগল পদ্ধতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মোগল আমলে নির্মিত বাংলার স্থাপত্য শিল্পে এখানকার ভৌগোলিক ও পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো এবং স্থানীয় আদর্শ ও আচার আচরণের উপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিল। মোগল রীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে বাংলার অট্টালিকার আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়, যেমন প্রশস্ত প্রবেশদ্বার, টেরাকোটাসজ্জিত দেয়ালের পরিবর্তে চুন ও বালির প্লাস্টারকৃত দেয়াল, কারুকার্যমণ্ডিত খিলান, বিশেষত চৌকোনাকৃত সুঁচালো খিলান, একটি, তিনটি বা ততোধিক গুম্বুজ। এসব বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক, ধর্মীয় ও লোকায়িত অট্টালিকা এবং সমাধিতে পরিস্ফুট হয়েছিল। এগুলো মোগলরা দিল্লীর মোগল স্থাপত্যরীতির অংশ হিসেবে বাংলায় প্রবর্তন করেছিল।^{৭৭} পরবর্তীকালে এর দ্বারা স্থানীয় স্থাপত্যরীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ঢাকা, রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ এ তিনটি রাজধানী শহরসহ সমগ্র বাংলাতেই মোগল স্থাপত্যরীতির অসংখ্য ইমারতাদি পাওয়া যায়।

মোগল আমলে বাংলার জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনও মোগল সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল।^{৭৮} সমাজের অভিজাত ও বিদ্বান শ্রেণী মোগলদের খাদ্যাভাস ও রন্ধন প্রণালী অবলীলায় আয়ত্ত্ব করে। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জমিদারগণ মোগলদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা তথা, তাদের আচার-আচরণ, উৎসব, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে মোগলদের অনুসরণ করতো। তাদের মহিলাও পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও সাজসজ্জার ব্যাপারে মোগল মহিলাদের অনুকরণ করতো।^{৭৯} অনুরূপভাবে মোগলদের সঙ্গীত সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। এ দেশের অধিকাংশ তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হয় মোগল আমলে। আরব পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বহু নৃত্যরীতি প্রথম চালু হয় মোগল রাজদরবারে এবং এর পরপরই তা ছড়িয়ে পড়ে অভিজাত শ্রেণীর রংমহলে (সঙ্গিত বা নৃত্যের স্থান)। মোগল অভিজাতদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অপরিহার্য দিক ছিল বাঁদজী বা পেশাজীবী নৃত্য শিল্পীদের নাচ। যা বাংলার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মোগলগণ বহুবিধ সামাজিক শিষ্টাচার ও আচার-আচরণ চালু করে যা বর্তমানেও বাংলার মুসলিম সমাজে বিশেষ করে অভিজাত মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত।

মোগলদের সুশাসনে বাংলার জনসাধারণ প্রায় দেড় শ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বাংলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ জীবন, সংস্কৃতি, প্রশাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্য, পোষাক, খাদ্যাভাস তথা জীবনের সর্বত্রই মোগল শাসনের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলায় সুশৃঙ্খল ও স্থায়ী মোগল শাসন এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা আনেকাংশেই পরিবর্তন করে দেয়- যার প্রভাব এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত যে স্বাধীনচেতা মনোভাবের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি এ সময়ে তা অনেকটাই শ্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসনমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মোগল সম্রাটগণ কতৃক নিযুক্ত বাংলার সুবাদার ও নবাবগণও তাদের যোগ্যতাও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। সর্বোপরি রাজনৈতিক সংহতির কারণে মোগল আমলে দীর্ঘকাল বাংলায় শান্তি বজায় ছিল, যার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ Abu-L-Fazl, *The Akbarnama*, Trns, into English by Beveridge. Vol. III, (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 1993), P. 412-413.
- ^২ এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. পাঁচ (ভূমিকা)।
- ^৩ এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর রশিদ সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৪।
- ^৪ মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ২১৩।
- ^৫ Sri Ram Sharma, *The Religious Policy of the Mughal Emperors* (London : Asia Pub., 1962), pp. 70-71.
- ^৬ *Ibid.*, pp. 124-28.
- ^৭ মিজা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, খালেকদাদ চৌধুরী অনু. (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৪). পৃ. ৬২১-৬২২।
- ^৮ তদেব।
- ^৯ তদেব, পৃ. ৪৩৪-৪৩৩।
- ^{১০} তদেব, পৃ. ৬০৯।
- ^{১১} তদেব, পৃ. ১৪০।
- ^{১২} তদেব, পৃ. ৩২২, ১৩০, ৪২৭, ৩২১, ৪৬৬।
- ^{১৩} তদেব, পৃ. ৩১৪।
- ^{১৪} *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩*, পৃ. ৫৫।
- ^{১৫} তদেব।
- ^{১৬} Jadunath Sarkar (ed.), *The History of Bengal, Vol. II* (Dacca : The University of Dacca, 2006), p. 454.
- ^{১৭} *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩*, পৃ. ৫৫।
- ^{১৮} ইউসুফ আরী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনু. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১৭২।
- ^{১৯} এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মো. আমিরুল ইসলাম, “বাংলার মুসলিম প্রশাসনের হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থান: প্রেক্ষিত মোগল আমল” ইসসিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল, সংখ্যা ২১, ১৪২০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর, ২০১৯, পৃ. ৫৭-৬৮।
- ^{২০} আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ১৬৬।
- ^{২১} বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক* (ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ৫৬-৭২।
- ^{২২} এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. দশ (ভূমিকা)।
- ^{২৩} N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal, Vol. II* (Calcutta : University of Calcutta, 1968), p. 230.
- ^{২৪} ইমতিয়াজ আহমদ, *বাংলায় পর্তুগিজদের ইতিহাস* (রাজশাহী : ইউরেকা বুকস্, ২০০৯), পৃ. ১৩১।
- ^{২৫} এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. দশ (ভূমিকা)।
- ^{২৬} Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal, Vol.II*, p. 314.
- ^{২৭} গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রী রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৪৪।

-
- ২৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)* (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পাব্লিশার্স প্রায়ভেট লিমিটেড, ১৯৯৮), পৃ. ২১৭।
- ২৯ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ২য় খণ্ড (অর্থনৈতিক)* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২৬-২৭।
- ৩০ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, পৃ. ১৮-২০।
- ৩১ Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal, Vol. II*, p. 387.
- ৩২ এম.এ.রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. সাত (ভূমিকা)।
- ৩৩ Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760* (Delhi : Oxford University Press, 1997), p. 178.
- ৩৪ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, “মুঘল রাজত্বের শেষভাগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা”, *ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ*, চতুর্বিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃ. ৭৬।
- ৩৫ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক)* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৬৫।
- ৩৬ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড*, পৃ. ৬৬।
- ৩৭ তদেব, পৃ. ৭০।
- ৩৮ Tapan Ray Chaudhuri, *Bengal Under Akbar and Jahangir* (Delhi : Munshiram Manoharlal, 1969), p. 177.
- ৩৯ এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. সাত (ভূমিকা)।

ড. তুহা হুসাইন-এর ‘আল-আইয়ামে’ মিসরের সমাজচিত্র

এইচ. এম. মুহিবুল্লাহ*

Abstract: Dr. Taha Hussain was the best educationalist, education reformer, one of the highest literature of Modern Arabian World, analyst, journalist, science critic, idealist and overall one of the leading turner of Modern Arabian Literature. He was born in an Egyptian small village named Keelu in a middle class family on 14 November 1889, he was born. He was an ambidexter of Arabian literature. He has walked thoroughly every branches and tertiary of Arabian literature, such as: Essays, poems, stories, short stories, dramas etc. Pervading of fifty years from the beginning of third decade to till eighth decade of twentieth century, he had been on the top of the Egyptian intellectuals. Dr. Taha Hussain achieved special competencies in analyzing and portraying the pictures of real and historical essences of Egyptian social life. He was so successful in portraying the variegated social and historical essences of ancient Egypt. The nature of family life, economic condition, standard of living, marriages, dowries, social decadents, trade and commerce, jurisdiction, historical essences etc of the then Egypt have been depicted so beautifully in his book Al-Ayyam. In the discussible essay, the social and historical essences of Egypt that time mentioned in the book of Al-Ayyam have been introduced.

ভূমিকা

মিসর যখন নানা প্রকার কুসংস্কারে নিপতিত, বৈদেশিক শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, ঠিক তখনই আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ড. তুহা হুসাইন মিসরের কীলু নামক এক ছোট পল্লীতে মধ্যবিত্ত এক কৃষক পরিবারে ১৬ই রবীউল আউওয়াল ১৩০৪ হি. মোতাবেক ১৪ই নভেম্বর ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ড. তুহা হুসাইন ছিলেন সেরা শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক, আধুনিক আরব বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক, গবেষক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানধর্মী সমালোচক ও চিন্তাবিদ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক। প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পসহ আরবী সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখায় তাঁর সমান পদচারণা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে শুরু করে অষ্টম দশক পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর ব্যাপী তিনি মিসরীয় বুদ্ধিজীবীদের শিরোমণি ছিলেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রচলিত ধারা পাণ্টে দিয়ে আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনে তাঁর অবদান অপরিসীম। ড. তুহা হুসাইন মিসরীয় সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্র এবং ঐতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণ ও চিত্রায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি তাঁর লিখিত "الأيام" [কালপ্রবাহ] নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে মিসরের সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন। সেকালের মিসরের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যময় উপাদানগুলো চিত্রায়নে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচিত আল-আইয়াম গ্রন্থে তৎকালীন মিসরের পারিবারিক জীবনপ্রকৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবন যাত্রার মান, পরিণয় ও যৌতুকপ্রথা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা এবং সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আল-আইয়াম গ্রন্থে উল্লিখিত তৎকালীন মিসরের সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদান উপস্থাপিত হলো।

* এম.ফিল. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচরমা

ড. তুহা হুসাইন নীল নদের উত্তর উপকূলীয় ছোট শহর ‘মাগাগা’ এর নিকটবর্তী ‘কীলু’ নামক গ্রামের এক কৃষক পরিবারে ১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।^১ তাঁর পিতার নাম হুসাইন ‘আলী সালামাহ্’ এবং মায়ের নাম রুকাইয়াহ। তাঁর পিতা হুসাইন ‘আলী চিনির কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। মোট সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল তের। তুহা হুসাইন তাদের মধ্যে সপ্তম ও নিজ মাতার সন্তানদের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন।^২ তাঁদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি থাকায় ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য।^৩ এমন কি গৃহ শিক্ষকের নিয়মিত অর্থ প্রদান করাও সম্ভব ছিলনা। তাঁর শিক্ষক তাঁকে বলেন:

ولكن الذنب ليس عليك ولا علي، وإنما هو على أبيك؛ فلو أنه أعطاني أجري يوم ختمت القرآن لبارك الله له في حفظك، ولكنه منعني حقي فمحا الله القرآن من صدرك.

[তোমার কুরআন ভুলে যাওয়ার অপরাধ তোমারও নয়, আমারও নয়, বরং এ অপরাধ তোমার পিতার। তোমার কুরআন খতমের দিন তিনি যদি আমার পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিতেন তবে আল্লাহ তোমার মুখস্তশক্তিতে বরকত দান করতেন। কিন্তু তিনি নিয়মিত আমার পারিশ্রমিক দেননি তাই আল্লাহ তা‘আলা কুরআন তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন।]^৪

ভুল চিকিৎসা ও অস্বস্তির কারণে তিন বছর বয়সে চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে তুহা হুসাইনের দৃষ্টি হারিয়ে যায়।^৫ দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এর বিনিময়ে প্রখর স্মরণশক্তি ও অফুরন্ত প্রতিভা দান করেন। যার ফলে তিনি মিসরের অসংখ্য জ্ঞান পিপাসুর হৃদয়ে শিক্ষার জ্যোতি ছড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। জ্ঞানার্জনের প্রতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। অজানাকে জানার জন্য শত-সহস্র বাধার প্রাচীর অতিক্রম করতে তিনি কুষ্ঠাবোধ করতেন না। তুহা হুসাইনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল গ্রামের মজবে। প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী তুহা হুসাইন মাত্র নয় বছর বয়সে পবিত্র আল-কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন।^৬ এ সময় তিনি আল-কুরআন ছাড়াও বহু গান, শোকগাঁথা, গল্প, দোয়া-কালাম ও অসংখ্য মরমী কবিতাসহ আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক বইসমূহ আয়ত্ত্ব করেন। তাঁর মেধা ও প্রতিভা সকলকে মুগ্ধ করে ফলে, মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি ‘শায়খ’ উপাধিতে ভূষিত হন।^৭ এমনকি মজবের পাঠ্যসূচী সম্পন্ন করে ১৯০২ সালে মাত্র তের বছর বয়সে তিনি মিসরের ঐতিহ্যবাহী আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে^৮ ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। আল-আযহারে অধ্যয়নকালে তিনি কুরআন, হাদীস ছাড়াও ফিকহ, উসুলে ফিকহ, ইলমুল মানতিক [যুক্তিবিদ্যা], বালাগাত [অলংকার শাস্ত্র], ‘ইলমুল কালাম, নাহ [বাক্য গঠন রীতি], দর্শন ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন।^৯ সে সময়ে তিনি শায়খ সায়েদ ‘আলী আল-মারসাফী [মৃ.১৩৪৯/১৯৩১খ্রি.]-এর কাছে সাহিত্যের গ্রন্থ তথা মুবাররাদ [৮২৬-৮৯৮খ্রি.]-এর "الكامل", আবু ‘আলী আল-কালী [৯০১-৯৬৭খ্রি.]-এর "الأمل", আবু তাম্মাম [৭৮৮-৮৪৫খ্রি.]-এর "ديوان الحماسة" পাঠ করেন। এ অধ্যাপকের পাঠদান পদ্ধতিতে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হন। এমনকি এ অধ্যাপকই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছেন।^{১০} অনুরূপভাবে মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Nallino^{১১} এর শিক্ষা পদ্ধতি ও চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করে। তাঁদের উভয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি "تجديد ذكرى أبي العلاء" ও "في الأدب الجاهلي" গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদ আলোচনা করেছেন।^{১২} তুহা হুসাইন বলেন, “তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতির মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।” অধ্যাপক আল-মারসাফী বসরা, কুফা ও বাগদাদে প্রাচীনপন্থী সমালোচক ও ভাষাবিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পাঠদান ও জ্ঞান বিতরণ করতেন। আর Nallino প্রাচ্যবিদ সামালোচক ও সাহিত্যিকদের ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী জ্ঞান বিতরণ করতেন। আরবী সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করতে হলে উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক।^{১৩} আল-আযহারে অধ্যয়নকালে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। মুফতী মুহাম্মাদ ‘আবদুহ কুরআনের ব্যাখ্যা আধুনিক পদ্ধতিতে করতেন। আর অধ্যাপক আল-মারসাফী সনাতন পদ্ধতিতে সাহিত্য

পাঠদান করতেন। তারা উভয়ে আল-আযহারের শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করতেন। কাসিম আমীন নারী স্বাধীনতার কথা বলতেন।^{১৪} তুহা হুসাইন বলেন: “তবে আমরা মুফতি মুহাম্মাদ ‘আব্দুহ-এর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকল্পারমূলক পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থক ছিলাম। তাঁর দু’টি ক্লাসে তুহা হুসাইনের যোগাদন করার সুযোগ হয়।^{১৫} তাঁর কাছে মুবাররাদ এর “الكامل” গ্রন্থটি পড়ার সময় হাজ্জাজের বিতর্কিত নিম্নোক্ত বাক্যটি তুমুল আলোচিত হয়।

”مما كفرت الفقهاء به الحجاج قوله والناس يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. إنما يطوفون برمة وأعواد“

[ফকীহগণ যে কথার কারণে হাজ্জাজকে কাফির বলেছেন- (তা হল): “মানুষেরা নবী (সা.)-এর কবর ও মিম্বার ঘিয়ারতের জন্য যে গমন করে, তারা মূলত: কাষ্ঠখণ্ড ও বিলীন ধ্বংসাবশেষ ঘিয়ারত করার জন্য গমন করে।] ১৬

তুহা হুসাইনের মতে হাজ্জাজের এ বক্তব্য রাসূল (সা.)-এর শানে শিষ্টাচার বিরোধী ও বেয়াদবী নিশ্চয়ই কিন্তু, এ বক্তব্যের কারণে হাজ্জাজকে ফকীহগণ যে কাফির ফতোয়া দিয়েছেন তা সঠিক নয়।^{১৭}

তুহা হুসাইনের এ মন্তব্য আযহারের শায়খ সালীম আল-বিশরী এর নিকট পৌঁছে গেলে তাদের থেকে প্রতিবাদের বিষয়টি জানতে পেরে তিনি অনুভব করলেন যে, মুক্তমনে এখানে সাহিত্য চর্চা সম্ভব নয়।^{১৮} তাই তিনি ১৯০৮ সালে মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।^{১৯} এখানে তিনি মিসরীয় ও ইউরোপীয় বিদ্বানদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি “تجدید ذکری أبي العلاء” [আবুল ‘আলার স্মরণে] শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৪ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।^{২০}

ড. তুহা হুসাইন ফ্রান্স হতে ফিরে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর এ কর্মজীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পত্রিকা সম্পাদনা এবং রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী হিসেবে। প্রথমে তিনি প্রাচীন রোম ও প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের শিক্ষক হন।^{২১} শিক্ষক হয়ে প্রথমত তিনি ছাত্রদের গ্রীক সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা দিতেন ফলে তাঁর মিসরীয়দের প্রাচীন সভ্যতা জানার সুযোগ হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে নিয়োজিত থাকেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডীনসহ বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছিলেন।^{২২} ড. তুহা হুসাইন তিন বছর শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং দুই বছর সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫০ সালে মিসর সরকার তাঁকে শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং ‘পাশা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও তিনি সামাজিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।

তুহা হুসাইন কে আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত করা হয়। কেননা তিনিই ক্লাসিকধর্মী আরবী গদ্যরীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে আরবী গদ্য রীতিতে নতুন ধারা সূচনা করেন।^{২৩} তিনি আরবী সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান চর্চার সংকীর্ণ পরিধি হতে বের হয়ে মুক্ত মনে ব্যাপক অঙ্গনে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেন।^{২৪} কবিতার সংখ্যা কম হলেও তা ব্যতীত আরবী সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর পদচারণা ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল “تجدید ذکری أبي العلاء” গ্রন্থ রচনা থেকে। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত থাকে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০টি, তাঁর নিজস্ব রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টি, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৫টি, তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পর্যালোচনামূলক বইয়ের সংখ্যা ১১১টি, সাময়িকীতে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা ৮টি, প্রবন্ধের সংখ্যা ৯৮৩টি, তাঁর পূর্ণ কর্মের উপর ইংরেজি ভাষায় রচিত বই ৪টি এবং কর্মের অংশবিশেষের উপর ইংরেজিতে লিখিত বই ১৯টি ও ইংরেজি প্রবন্ধ ৫৩টি।^{২৫} ইতোমধ্যে তাঁর বহু গ্রন্থ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য

ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তুহা হুসাইনের "الوعد الحق" গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে প্রথম অনূদিত হয়। ২৬ প্রখ্যাত এ সাহিত্যিক ২৮ অক্টোবর ১৯৭৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

الایام (কালপ্রবাহ) গ্রন্থ পরিচয়

ড. তুহা হুসাইনের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আল-আইয়াম। তিন খণ্ডের এ গ্রন্থটি কায়রো থেকে যথাক্রমে ১৯২৯ খ্রি., ১৯৪০ খ্রি. এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে বৈরুত হতে "مذكرات طه حسين" নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে লেখকের বাল্যকাল, দ্বিতীয় খণ্ডে যৌবনে পদার্পণ এবং তৃতীয় খণ্ডে প্রবাস জীবনসহ নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে। এটি ড. তুহা হুসাইনের আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ হলেও গ্রন্থের কোথাও সরাসরি নিজের পরিচয় দিয়ে বর্ণনা দেননি। গ্রন্থটিতে তিনি নিজেকে কখনো "صاحبنا" অথবা "الفتی" কিংবা তৃতীয় পুরুষের ভূমিকায় রেখেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি তৎকালীন মিসরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক জীবন পরিক্রমা, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন, ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও লোক-কাহিনী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গি আরবী সাহিত্য জগতের অমূল্য এক সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর ভাষার প্রাঞ্জলতা আরবী ভাষার পাঠকদেরকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। আল-আইয়ামে মজবুথেকে শুরু করে আল-আযহার ও মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্রময় জীবনের প্রতিটি বিষয়ের স্মৃতি এতোটাই সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন যা, যে কোন পাঠককে অভিভূত করে তোলে। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে তৎকালীন মিসরের সমাজ, ধর্ম, বানিজ্য ও বিশেষ করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমসহ নানাবিধ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে।

‘আল-আইয়াম’-এ মিসরের সমাজচিত্র

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নীল নদের দেশ মিসর। পিরামিড, মমি আর প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিসর উত্তর আফ্রিকার একটি সমৃদ্ধ মুসলিম প্রধান দেশ। এটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকে এখানে রোমান, গ্রীক ও মুসলিম সভ্যতাসহ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। ১৭৯৮ সালের মার্চ মাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক মিসর আক্রমণ ও বিজয়ের মাধ্যমে এখানে ইউরোপীয় সভ্যতা অনুপ্রবেশ করে। পরবর্তীকালে মিসর বিভিন্ন শাসক কর্তৃক শাসিত হওয়ায় এখানকার সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় ব্যাপক প্রভাবিত এবং বৈচিত্রময় হয়। এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, মিসরের মত পৃথিবীর আর কোন দেশের এরকম লব্ধপ্রতিষ্ঠ, জটিল এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস নেই।^{২৭}

মিসরের সমাজব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং সামাজিক অবস্থানকে সবসময় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হত। মিসরের জনগণ প্রধানত দু’টি নগরী তথা কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়া কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। গ্রামীণ ও শহুরে উভয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে মিসরের জনগণ। তাই মিসরীয় সমাজে একই সাথে প্রাচীন ও আধুনিকতা উভয়টির সন্নিবেশ ঘটেছে। ড. তুহা হুসাইন এ পরিবেশের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। তাই তাঁর আত্মজীবনী আল-আইয়ামে তৎকালীন মিসরের সামাজিক বিভিন্ন চিত্র তথা পারিবারিক জীবন প্রকৃতি, গ্রামীণ পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন-যাত্রার মান, বিবাহ ও যৌতুক প্রথা, সামাজিক অবক্ষয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা, মিসরীয় মানস প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। নিম্নে আল-আইয়ামে বর্ণিত তৎকালীন মিসরের সামাজিক বিভিন্ন উপাদান উপস্থাপিত হলো:

১. পারিবারিক জীবন প্রকৃতি

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই পরিবার দু'টি ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূন্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সমসাময়িক কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্য তা-ই ছিল একমাত্র উপায়।^{২৮} তৎকালীন মিসরের সমাজে কোন কোন সদস্যের কদর ছিল বেশি। আবার কেউ অনাদরে ও অবহেলায় বড় হত। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকত। আর গৃহকর্ত্রী বিশাল সংসারের সার্বিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকত। তার পক্ষে সকলের পরিপূর্ণ যত্ন নেয়া সম্ভব ছিল না। ড. তুহা হুসাইনের 'আল-আইয়ামে' এ বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিমায় বিধৃত হয়েছে:

والأطفال في القرى ومدن الأقاليم معرضون لهذا النوع من الإهمال، ولا سيما إذا كانت الأسرة كثيرة العدد وربة البيت كثيرة العمل.

[গ্রাম ও প্রাদেশিক শহরের শিশুরা এই অবহেলা ও অবজ্ঞায় কিছু মনে করত না। বিশেষ করে পরিবারে লোক সংখ্যা যদি অনেক বেশি থাকত এবং গৃহকর্ত্রীর কাজের চাপ অনেক বেশি থাকত।]^{২৯}

সেকালের মিসরের ধনী, গরীব তথা সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের পরিবারে বসবাস ছিল। কোন কোন স্বচ্ছল শ্রেণীর মানুষ ছিল অত্যন্ত কৃপণ। আবার কোন কোন ধনী অপচয় করত, অধিক বিলাসী জীবন-যাপন করত। আবার কোন কোন পরিবারকে বাহ্যিকভাবে অনেক স্বচ্ছল মনে হত, পরিবারের সদস্যদের বেশ-ভূষা ও চাল-চলনে প্রাচুর্যতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হত, কিন্তু বাস্তবে তারা ছিল অভাবী। তুহা হুসাইন বলেন:

ذلك لأن زيارة الشيخ كانت ثقيلة على هذه الأسرة التي تعيش من سعة، ولكنها كانت فقيرة على كل حال.

[এটা এজন্য যে, নিশ্চয় শায়খের আগমন এই পরিবারের উপর একটা বোঝা ছিল, যে পরিবার জীবন-যাপন করত স্বচ্ছলভাবে, কিন্তু সবসময় অভাবগ্রস্ত ছিল।]^{৩০}

সেকালের মিসরের গ্রামীণ জীবনে ছিল পুরুষতান্ত্রিক পরিবার। পুরুষ যেভাবে চাইতেন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেভাবে পরিচালিত হত। কে কোথায় পড়বে, কে কোন পেশায় কাজ করবে তা বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিই নির্ধারণ করে দিতেন। কখনো ছেলে-মেয়েদের কঠোর শাসন করতেন, আবার প্রয়োজনে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন, রঙ-তামাশা করতেন। তুহা হুসাইন আল-কুরআন ভুলে যাওয়ার কারণে তাঁর পিতা তাঁকে তিরস্কার ও ভৎসনা করে। এতে ভীষণভাবে মন খারাপ করে পিতার সামনে যাওয়া বন্ধ করে দিলে পিতা তাকে স্বাভাবিক করার জন্য কৌতুক করে সবার সামনে বলেন: أحفظت القرآن [তুমি না কুরআন মুখস্ত করেছো?]^{৩১} এভাবেই সেকালের মিসরের গ্রামীণ সমাজে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে পারিবারিক জীবন পরিচালিত হত।

তৎকালীন মিসরে গ্রাম্য মানুষের মাঝে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সুসম্পর্ক বজায় ছিল। সবাই একসাথে বসে পরিবারব্যবস্থা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে উঠতেন। প্রভাতে, বিকেলে ও সন্ধ্যা বেলায় গ্রাম্য দোকানে জড়ো হওয়া সাধারণ মানুষের মাঝে এসব আলোচনা জমে উঠতো।

প্রভাতলগ্ন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নবীন-প্রবীণের কোলাহলে সরব থাকত চায়ের দোকানগুলো। অপরিচিতরাও স্ব-উদ্যোগে शामिल হয়ে যেতেন সেখানে। দোকানগুলোতে ব্যক্তিগত বিষয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ গঠনমূলক আলোচনা সৃষ্টি হত। বিশেষতঃ আছর ও মাগরিবের নামাজের পরে এরকম মানুষের সমাগম ঘটত। এসব আলোচনা ছিল বক্তৃতা বিহীন, সহজ, বোধগম্য ও সাবলিল। ড. তুহা হুসাইন তাঁর আল-আইয়ামে বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

فجلس هناك مستمعا لما كان يقوله المشترون من الرجال والمشتريات من النساء من هذه الأحاديث الريفية الساذجة التي تمتع باختلافها وطرافتها وسذاجتها أيضا .

[সে সেখানে বসে সেই সমস্ত ক্রেতা নারী-পুরুষের কথা-বার্তা শ্রবণ করত, সেই সমস্ত গ্রাম্য কথা, যেগুলো ছিল সরল ও সোজা। আর এর সরলতা ও বিচিত্রতার কারণে সেগুলো শুনতে মজা লাগত।]^{৩২}

গ্রামের এসব আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করত নানা বয়স ও শ্রেণী পেশার মানুষ। তারা একত্র হয়ে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলত ও হাসি-ঠাট্টা করত। এর মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন গল্প-কাহিনী, নসিহত, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী সম্বলিত নানা ধরনের বই পড়ত। আর তাকে ঘিরে অন্যান্যরা জড়ো হয়ে সে সব কাহিনী শ্রবণ করত।

২. গ্রামীণ ও শহুরে জীবন প্রকৃতি

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন মিসরীয় সমাজব্যবস্থার গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পার্থক্য স্পষ্ট ছিল। সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবনের সাথে শহরের জীবনের পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। গ্রামের আনন্দ-ফুর্তি ছিল অত্যন্ত নির্মল ও পাপমুক্ত। তাদের খাবার ছিল ভেজাল মুক্ত, চর্বিমুক্ত, সতেজ ও সাধারণ। সমাজের মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল ছিল, একে অপরের সুখে-দুঃখে কাছে ছুটে আসত। পক্ষান্তরে শহরের আনন্দ-ফুর্তি কৃত্রিম ছিল। তাদের অধিকাংশ খাবার ছিল কৃত্রিমতা ও চর্বিযুক্ত। পারস্পরিক সম্পর্ক সম্প্রীতি ছিল নড়বড়ে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিচিতিও তেমন সুদৃঢ় ছিল না।

শহুরে ও গ্রামীণ মানুষের শারীরিক গঠনেও পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ছিল হালকা-পাতলা গঠনের। সারাদিন তারা মাঠে ময়দানে কাজ করত, কারণ তারা ছিল অত্যধিক পরিশ্রমী। পক্ষান্তরে শহরের মানুষের পরিশ্রম কম থাকায় তাদের শরীর ছিল ভারী ও মোটা গঠনের। বিশেষতঃ শহরের নারীদের শরীর ছিল চর্বিযুক্ত ও মোটা। ড. তুহা হুসাইন তাঁর আল-আইয়ামে সে দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন:

وإنما المرأة كل المرأة من ضخمت حتى اكتظمت أعضاؤها بالشحم واللحم، وكان يشبهها بالوسائد حيناً وبالشحايا حيناً آخر.

[নারীদের দৈহিক কাঠামো এতোটাই স্থূল ছিল যেন গোশত এবং চর্বি মিশে একাকার হয়ে যেত, কখনো নারীকে বালিশ আবার কখনো তোশকের মত মনে হতো।]

৩. অর্থনৈতিক অবস্থা

তৎকালীন মিসরের গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। যে কারণে গ্রাম্য মানুষরা অনেক হিসাব করে খরচ করত। তাদের পারিবারিক টানাপোড়েনের

মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হত। তবে কেউ কেউ ছিল অনেক সম্পদশালী। এ শ্রেণির মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী। অর্থের প্রাচুর্য ও ব্যবসায়িক কারণে তারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতেন। এভাবে তাদের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। খরচের দিক থেকেও তারা ছিলেন বেহিসাবী। ড. তুহা হুসাইনের ভাষায়:

وكان أهل الفتاة أغنياء، ولكنهم من المحدثين. وكان أبوه حماراً، ثم أصبح تاجراً مثيراً، وكان ينفق على أهله من غير حساب، ويسبغ عليهم سعة غريبة من العيش.

[যুবতীটির পরিবার ছিল ধনী, কিন্তু তারা ছিল নতুন ধনী। তার পিতা ছিল গাঁধা দিয়ে পণ্য বহনকারী। এরপর ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। সে পরিবারের জন্য বেহিসাবে ব্যয় করত। আর পরিবারের সদস্যদের অটেল জীবনোপকরণ দিত।] ৩৩

সে সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। তবে সে সময়ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চেকের মাধ্যমেও সমাজের উঁচু শ্রেণির লোকজন লেন-দেন করতেন। তুহা হুসাইনের পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের পুরস্কার স্বরূপ আমীর উলবী পাশা তাঁকে একটি চেকের মাধ্যমে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আল-আইয়ামে বলা হয়েছে:

ثم أقبل على الفتى فدى في يده ورقة تصيب جبينه لها عرقاً. فلما أصبح عرف أنها كانت الشيك الذي دعي إلى العشاء ليتسلمه.

[এরপর তিনি ছেলেটির কাছে আসলেন, তার হাতের মধ্যে একটি কাগজ দিলেন, যে জন্য তার কপালে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। অতঃপর যখন সকাল হল, তখন সে জানতে পারল যে, এটা সেই চেক যেটা গ্রহণ করার জন্য তাকে রাতের খাবারে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।] ৩৪

৪. জীবন যাত্রার মান

ড. তুহা হুসাইনের সময় মিসরে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া প্রায় সবার অবস্থা নিম্নমানের ছিল। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক এবং অন্যান্য পেশাজীবী সবাইকেই অত্যন্ত সাধারণমানের জীবন-যাপন করতে হত এবং সাধারণমানের খাদ্য গ্রহণ করতে হত। বিশেষ করে বেশিরভাগ ছাত্রদের অল্প খরচে ভরণপোষণ চালাতে হত। এ জন্য তুহা হুসাইন যখন ফ্রান্সে গমন করেন সেখানের জীবন-যাত্রার মান দেখে মিসরের দুরাবস্থার কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন:

وقد تهيأ له ما أراد من ذلك في غير تكلف ولا عناء. كانت الحياة الفرنسية في تلك الأيام هينة ميسرة، تتيج لفتيين أجنيين مثله ومثل أخيه أن يعيشا بهذا المرتب الضئيل عيشة راضية حين تقاس إلى ما كانا يلقيان في مصر من قسوة الحياة وشظفها.

[ফ্রান্সে যা পেরেন তা দিয়ে কোন কষ্ট ব্যতীতই যা চাইতেন তা করা তাঁর জন্য সম্ভব ছিল। সেই সময় ফ্রান্সে জীবন-যাত্রা খুব সহজ ছিল। এই সামান্য ভাতা দিয়ে তাঁর এবং নিজের ভাইয়ের মত দুইজন যুবক মিসরের জটিল ও কষ্টকর জীবনের তুলনায় সন্তোষজনক জীবন-যাপন করতে পারতেন।] ৩৫

এদিকে তৎকালীন মিসরে খাদ্য-দ্রব্যের দাম নিতান্তই সস্তা ছিল। এমনকি ছোট মানের একটা মুদ্রা দিয়েও এমন খাবার ক্রয় করা যেত, যা দিয়ে একজন পেট ভরে খেতে পারত। তৎকালীন মিসরের সবচেয়ে ছোট মুদ্রার নাম ছিল 'মালীম'। ৩৬ এ রকম সামান্য অর্থ দিয়েও একজন লোক পেট ভরে খাওয়ার মত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতে পারত। এমনকি অর্ধেক 'মালীম' দিয়েও দুই প্যাকেট 'কারাছ' ৩৭ ক্রয় করা যেত। তুহা হুসাইন বলেন:

وقد اشترياً بنصف ملهم حزمة أو حزمتين من كراث.

[তারা দুইজন অর্ধেক 'মালীম' দিয়ে এক প্যাকেট বা দুই প্যাকেট সবজি ক্রয় করল।] ৩৮

৫. শিক্ষাব্যবস্থা

ড. তুহা হুসাইনের আল-আইয়ামে মিসরের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনায় আল-আযহার, মিসর বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রামের মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। মিসরে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে যার নামটি বারবার সামনে আসে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ‘আলী পাশা। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মিসর আক্রমণের মাধ্যমে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিসরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগালেও মুহাম্মাদ ‘আলী পাশা তাঁর শাসনামলে (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাঁর প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনার জন্য সর্বপ্রথম সরকারীভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।^{৮০} মুহাম্মাদ ‘আলী পাশা থেকে শুরু করে ইসমাইল পাশার শাসনামলে (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) মিসরে সরকারী স্কুলের পাশাপাশি বিদেশী মিশনারী ও কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়তে শুরু করে।

বিদেশী মিশনারী স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় মিসরে অবস্থানরত বিদেশীদের সুবিধার জন্য, ফলে মিসরীয় জনগণ তা থেকে আশানুরূপ উপকার লাভ করতে পারে নি। উল্টো মুহাম্মাদ ‘আলী পাশার সময় যে সকল সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্রথম আব্বাসের শাসনামলে (১৮৪৯-১৮৫৬ খ্রি.) বন্ধ হয়ে যায়। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও শুধুমাত্র আল-আযহার তার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়। সরকারী স্কুলগুলো বন্ধ হলে পূর্বের ন্যায় গ্রামের মক্তবগুলো শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথম আব্বাসের শাসনামলের পরে ইসমাইল পাশার আমলে (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) পুরাতন স্কুলগুলো পুনরায় চালু করা হয়। এ কারণে কেউ কেউ ইসমাইল পাশাকে মিসরের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পথিকৃৎ বলে থাকেন। মিসরের সুলতান হুসাইন কামিলের সাথে কিছু ছাত্র সাক্ষাত করতে গেলে তাদেরকেও তিনি ইসমাইল পাশার অবদানের কথা শোনান। তুহা হুসাইন সাক্ষাতের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন:

وَأَدْخَلُوا عَلَى السُّلْطَانِ، فَلَقِيَهُمْ لِقَاءً حَسَنًا، وَالْقَى عَلَى الْفَتَى سُؤَالَ لَمْ يَعْرِفْ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ. سَأَلَهُ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ شَأْنَ التَّعْلِيمِ فِي مِصْرَ؟ فَوَجَّهَ الْفَتَى وَلَمْ يَرْجِعْ جَوَابًا. قَالَ السُّلْطَانُ وَهُوَ يَضْرِبُ عَلَى كَتِفِهِ وَيَنْطِقُ فِي لَهْجَةٍ تَرْكِيَّةٍ: جَنَّةُ مَكَانِ إِسْمَاعِيلَ بَاشَا.

[তারা সুলতানের দরবারে প্রবেশ করল। সুলতান তাদের সাথে সুন্দরভাবে সাক্ষাত করলেন এবং ছেলটির কাছে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, সে জানত না কিভাবে তার জবাব দিবে। (সুলতান) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: মিসরে সর্বপ্রথম শিক্ষার মানোন্নয়ন করেন কে? ছেলটি কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকল। সুলতান তাঁর কাঁধে হাত রেখে তুর্কী আঞ্চলিক ভাষায় বললেন: জান্নাতের অধিবাসী ইসমাইল পাশা।]^{৮০}

নানা বাধা অতিক্রম করে এভাবে মিসরের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে এগুতে থাকে। ১৯২২ সালের পরে মুহাম্মাদ ‘আবদুহ, তুহা হুসাইন ও হুসাইন হাইকাল প্রমুখের হাত ধরে মিসরের শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। আল আইয়ামে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী মিসরের শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রটিই বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে। তুহা হুসাইন গ্রামের মক্তব, আল আযহার ও মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে তাঁর আলোচনার অধিকাংশ জুড়েই এর স্মৃতি বিরাজ করছে। আল-আযহারে পড়া যে কোন ছাত্রের মর্যাদা অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন ছিল। এমনকি আযহারে পড়ুয়া কোন ছাত্র বাড়িতে আসার এক মাস আগে থেকেই এলাকার মানুষ তাকে নিয়ে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে যেত। আল আইয়ামের বর্ণনায় বলা হয়েছে:

أَلَمْ يَكُونُوا جَمِيعًا يَتَحَدَّثُونَ بَعْدَ عُدَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ بِشَهْرٍ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَقْبَلُوا إِلَيْهِ فَرَحِينَ مَبْتَهَجِينَ مُتَلَطِّفِينَ.

[তারা কি তার ফেরার এক মাস পূর্ব থেকেই তার সম্পর্কে আলোচনা করত না? এমনকি যখন সে আসত তখন তারা খুশি ও আনন্দচিহ্নে, ভদ্রভাবে তার কাছে আসত, স্বাগত জানাত।]^{৮১}

৬. পরিণয়ে আবদ্ধ নীতি

পরিণয় বা বিবাহ হচ্ছে একটি সামাজিক সেতু বন্ধনের মাধ্যম এবং মানব সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর স্বরূপ থেকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিভেদে বিবাহের সংজ্ঞার তারতম্য থাকলেও সাধারণভাবে বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও শারিরীক সুসম্পর্কটি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া বিবাহ সাধারণত কোন পরিবার, রাষ্ট্র, কোন সংস্থা, কোন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, কোন আদিবাসী গোষ্ঠী, কোন স্থানীয় সম্প্রদায় অথবা দলগত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হতে পারে।

পৃথিবীতে সংস্কৃতি, গোত্র, ধর্ম, দেশ এবং সামাজিক শ্রেণিভেদে বিবাহপ্রথা ও উৎসব রীতিতে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সেকালে মিসরে শহরের বিয়েগুলো ব্যাপক আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হত। বিয়ের এক সপ্তাহ আগেই এ আনন্দ-ফুর্তি শুরু হয়ে যেত। এমনকি অনেক বিয়েতে নারীরা তবলা, ঢাক-টোলসহ বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনা পরিবেশন করত। বিশেষ করে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনে সংশ্লিষ্ট আবাসিক ভবন ছেড়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গান-বাদ্যের শব্দ ইথারে ইথারে ছড়িয়ে যেত। তাই ভিন্ন এলাকার লোকজনও গান-বাজনা শুনতে বিয়ে বাড়িতে জড়ো হত।^{৪২} তৎকালীন মিসরীয় নব দম্পতিদের মাঝে মধুচন্দ্রিমার প্রচলন ছিল। বিবাহকালীন সময়ে কিছু দিনের জন্য সকল কাজকর্ম থেকে অবকাশ নিতেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে আনন্দ-ফুর্তিতে বিয়ের প্রথম কিছুদিন কাটিয়ে দিত। তারা জীবনের নানাবিধ কাজকর্ম ও সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তে কিছুটা সময় অতিবাহিত করত। তুহা হুসাইন বিয়ের পর এই মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের সুযোগ না পাওয়ায় আফসোস করে বলেন:

ولم ينفق الفتى وصاحبه صيفها ذاك فيما تعود الفتيان المحبون أن ينفقوا فيه أيام حبهم الأولى من تلك الحياة الهائلة الناعمة التي تخلص من الشقة وتتخفف من الجهد وتفرغ لرضا النفوس وغبطة القلوب والذهاب مع الخيال الهائم في كل مذهب.

[ছেলেটি ও তাঁর সঙ্গিনী সেই গ্রীষ্মটা সেইভাবে কাটান নি যেভাবে প্রেমিক যুবক-যুবতীরা তাদের সুখী প্রেমময় জীবনের ভালবাসার প্রথম দিনগুলো ব্যয় করতে অভ্যস্ত। যে দিনগুলো কষ্ট থেকে মুক্ত করে, পরিশ্রমকে লাঘব করে, অন্তরের প্রশান্তি ও হৃদয়ে আনন্দের দোলা দেয়, এবং প্রেমের কল্পনার সাথে প্রত্যেককে নিজস্ব মতামত প্রদানের অবসর করে দেয়।]^{৪৩}

৭. যৌতুকপ্রথা

বিবাহের সাথে যৌতুক প্রথা তৎকালীন মিসরীয় সমাজে বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা হচ্ছে যৌতুক প্রথা। এ প্রথায় কণেপক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা ও দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকন দিতে হত। সে সময়ের কৃষি নির্ভর মিসরের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যৌতুকের প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি মিটাতে গিয়ে অনেক পরিবারকে ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হত। সে সময়ে বিয়ের ক্ষেত্রে শহুরে অভ্যস্ত আধুনিক পরিবারের মেয়েদেরকে প্রাধান্য দেয়া হত। আর সম্পদের লালসায় অনেকে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিত্তশালী ও আধুনিক মেয়েদেরকে বিয়ে করত। এমনকি অনেকে বিয়ে করে ঘর জামাই আদরে থাকত। শশুর বাড়িতে থেকে শশুরের সম্পদ অবলীলায় ভোগ করত। আল-আইয়ামের ভাষায়:

طمح إلى أن يتخذ لنفسه زوجا من أهل القاهرة، ويصهر إلى أسرة متحضرة متأنقة، فطلق إمرأته.

[আর সে আকাঙ্ক্ষা করল যে, সে নিজের জন্য কায়রোর অধিবাসীদের থেকে একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে। আর সে সভ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবারে শশুর বানাবে। এ কারণে সে আগের স্ত্রীকে তালাক দিল।]^{৪৪}

৮. তৎকালীন মিসরীয় সমাজের বাণিজ্যনীতি

ড. তুহা হুসাইন-এর সমকালীন মিসর ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক উন্নত ছিল। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বহিঃজগতের সাথেও মিসরের মানুষ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্যান্য আরব ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে বহু লোক মিসরে আসত। কারণ মিসর অনেক নদ-নদী ও সমুদ্রের দেশ। সে সময় সমুদ্র বা নদী পথেই বেশিরভাগ ব্যবসা পরিচালিত হত। এদের মধ্য থেকে অনেকে মিসরে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। এখানে বিয়ে করে নতুনভাবে সংসার গড়ে তোলে। ‘আল-আইয়াম’ এ মজবুতের পর্যবেক্ষকের পরিচয়ের মধ্যে অভিবাসী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে:

وكان شاباً طويلاً نحيفاً أسود فاحماً، أبوه سوداني، وأمه مولدة.

[সে ছিল চিকন, লম্বা ও কালো যুবক। তার পিতা ছিল সুদানী এবং মাতা খাঁটি আরব ছিল না]^{৪৫}

এছাড়া হিন্দুস্থানের সাথেও মিসরের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। সমুদ্রপথে এ ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালিত হত। হিন্দুস্থান থেকে বহু জিনিস মিসরে আমদানি করা হত। বিশেষ করে কাশমিরী শাল মিসরে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানান পোশাকের সাথে কাশমিরী শালেরও খুব কদর ছিল। ‘আল-আইয়াম’ এর ভাষায়:

وألقي على كتفيه شالا من الكشمير.

[সে তার দুই কাঁধে কাশমিরী শাল ফেলে রাখত]^{৪৬}

তৎকালীন মিসরের শ্রমিকরা বিভিন্ন শিল্প-কারখানা বা অন্য কোন জায়গায় নানা ধরনের কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। আর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন মাল ক্রয় করে তা বিক্রি করত। এর মধ্যে অনেকে ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অনেকে ছিল ফেরিওয়ালা। তারা তাদের পণ্য নিয়ে কায়রোর বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে লোকজনের কাছে বিক্রি করত। তাদের অনেকের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অনেকে সকালে উঠে বিক্রির জন্য মাল তৈরী করত। এরপর সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তুহা হুসাইন তাঁর বোর্ডিং-এ বসবাসরত এমনি একজন ফেরিওয়ালার কথা উল্লেখ করেছেন যে সকালে উঠে মিষ্টি বানাতো, এরপর সেগুলো নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে মানুষের কাছে বিক্রি করত। আর রাতে সেই অর্থ দিয়ে পরিবারের জন্য খাবার কিনে আনত। সে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরী করত। তুহা হুসাইন বলেন:

وكان يحمل في الشتاء هذا اللون من ألوان الحلوى الذي يسمى "غزل البنات"، وكان يحمل في الصيف هذا اللون الآخر من ألوان الحلوى الذي كان يسمى مرة "جبلاتي" ومرة "دندرة".

[সে শীতকালে এক প্রকার মিষ্টি বহন করত, যাকে বলা হত ‘গয়লুল বানাত’। আর গ্রীষ্মকালে অন্যপ্রকার মিষ্টান্ন বহন করত, যাকে কখনো কখনো ‘জিলাতী’ আবার কখনো বা ‘দানদারামাহ’ বলা হত।]^{৪৭}

৯. আইন ও বিচারব্যবস্থা

তৎকালীন মিসরে মিসরীয় নাগরিকদের বিচারব্যবস্থা ছিল শরীয়াতভিত্তিক। এই শরীয় আদালতের কাযী নিয়োগ করা হত শরীয়তী জ্ঞানের ভিত্তিতে। বিশেষ করে ‘আযহার’-এর আলেমদেরকে এ ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া হত।^{৪৮} কাযীর পদ ছিল খুব উচ্চস্তরের সরকারি চাকুরি। আদালতও ছিল খুব ভাব-গাভীরপূর্ণ। কাযী

বসতেন গালিচায় মোড়া ও গদিয়ুক্ত সুউচ্চ আসনে। আদালতের দরজায় সারাক্ষণ দুইজন গ্রহরী দণ্ডায়মান থাকত। তাদেরকে লোকজন 'আর-রসুল' বলে সম্বোধন করত। তুহা হুসাইন বলেন:

ويسميهما الناس هذا الاسم البديع، الذي لم يكن يخلو من هيبه : "الرسول".

[তাদেরকে এই চমৎকার নামে ডাকতো, যে নামটা ভীতিমুক্ত ছিলনা: (নামটি হল) 'আর রসুল']^{৪৯}

এছাড়া বিচারকের একজন লেখক থাকতেন। যিনি বিচারিক বিভিন্ন বিষয় লিখতেন। তিনিও শায়খ হিসেবে গণ্য হতেন। তিনিও শরয়ী জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তি হতেন। এভাবেই ড. তুহা হুসাইন তাঁর ভাষার সাবলীলতা, বিশুদ্ধতা ও স্বতন্ত্রধর্মী প্রয়োগের কৌশল দ্বারা তৎকালীন মিসরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১০. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সে সময় মিসরের উল্লেখযোগ্য খাবারের মধ্যে রুটি, পিঠা, খেজুর, পুদিনা শাক, ইক্ষু, মিছরী, চিনির তৈরী বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য, চীনাবাদাম ইত্যাদি ছিল অন্যতম। তবে এসবের মধ্যে মিসরীয়রা চিনির তৈরী বিভিন্ন মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার খুবই পছন্দ করত। বিশেষ করে রুটি খেতে তারা মিষ্টান্ন জাতীয় খাদ্য-উপকরণ ব্যবহার করত। কিছু পনির, কিছু হালুয়া একসাথে মিশ্রিত করে তা রুটির সাথে খাওয়া হত। মিসরে রোমীয় পনির ছিল খুব প্রসিদ্ধ ও সকলের পছন্দের। তাছাড়া রুটি খাবার জন্য তাতে মধু মিশ্রিত করা হত। দুই ধরনের মধু পাওয়া যেত, একটি ছিল খাঁটি মধু, যাকে 'আসাল আবইয়াদ' বা 'সাদা মধু' বলা হত। এটি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হত। আর অন্যটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম খাঁটি, যাকে 'আসাল আসওয়াদ' বা 'কালো মধু' বলা হত। দুই ধরনের মধুর উল্লেখ করে তুহা হুসাইন বলেন:

وإن كانت اللبيلة أو التين قد أسرفا عليهما في نقدهما فلم يبق لهما منه إلا ربع القرش،
اشترى بما بقي لهما شينا من الطحينة ثم صبا عليها شينا من عسى أسود أو أبيض.

[বালীলাহ ও তুমন ক্রিনতেই তাদের বেশি অর্থ খরচ হয়ে যেত, এ জন্য তাদের কাছে আর এক ক্রিশ এর এক-চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকত। এই অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তারা কিছু হালুয়া ক্রয় করত, এরপর তাতে কিছু কালো মধু বা কিছু সাদা মধু মিশ্রিত করত।]

১১. যিকিরের মজলিশ

সেকালের মিসরের গ্রামীণ সাধারণ মানুষ স্বাধিকালীন যিকিরের মজলিশের আয়োজন করত। তৎকালীন মিসরীয় সূফীবাদ ও তাঁদের অনুসারীদের প্রভাবে মাঝে মাঝে যিকিরের অনুষ্ঠান উদযাপিত হত। মাগরীবের নামাজ এবং খাবার পরিবেশন করে এশার নামাজান্তে যিকির শুরু হত। দলবদ্ধভাবে একই সুরে কখনো উচ্চ আওয়াজে আবার কখনো মৃদু কণ্ঠে যিকির করত। যিকিরের মাঝে একজন সুরেলা কণ্ঠে জোরে জোরে আবৃত্তি করতেন, এরপর বাকীরা এক সাথে তাঁকে অনুসরণ করত। যিকিরের সম্মিলিত আওয়াজ আশ-পাশ প্রকম্পিত করে তুলতো। ড. তুহা হুসাইন এ প্রসঙ্গে বলেন:

ونصب المجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حلقة الذكر، يذكرون الله قاعدين ساكنين، ثم تتحرك رءوسهم وترتفع أصواتهم قليلا.

[মূলত (সেকালে) মজলিশের আয়োজন বলতে যিকিরের বৈঠকে মানুষের একত্রিত হওয়াকে বোঝানো হতো। তাঁরা সেখানে নীরবে একত্রিভাবে আল্লাহর যিকির করতেন। অতঃপর তাঁরা তাদের মাথা নাড়াতেন এবং আস্তে আস্তে আওয়াজ উঁচু করতেন।]

তৎকালীন মিসরের গ্রামীণ পরিবেশে কবিতার আসরের বেশ প্রভাব ছিল। কবিগণ তাদের অনুপম কথামালা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার, ব্যতিক্রমী বাচনভঙ্গি, উচ্চমানের শব্দচয়নের দ্বারা কবিতা আবৃত্তি করতেন। আল-আইয়ামের ভাষায়:

فإذا صلوا العصر اجتمعوا إلى واحد منهم يتلو عليهم قصص الغزوات والفتوح،
وأخبار عنتره والظاهر بيبرس، وأخبار الأنبياء والنسك والصالحين.

[যখন তাঁরা আসরের নামাজ শেষ করতেন তখন তাঁরা একজনের নিকট উপস্থিত হতেন যিনি তাদের নিকট যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজয় কাহিনী, নবী, সন্ন্যাসী ও সৎকর্মশীলদের ঘটনা ও সংবাদ শুনিতে তাদের মুগ্ধ করতেন।] ৫০

وكان صاحبنا أسعد الناس بالاستماع إلى أخواته وهن يتغنين.

[আমাদের গল্পের নায়ক যেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান যিনি বোনদের কাছ থেকে গান শ্রবণ করতেন। (অর্থাৎ কবির বোনেরা যখন গান পরিবেশন করতেন তখন তিনি তাদের পাশে বসে গান শুনতেন।) ৫১

১২. মিসরের সামাজিক অবক্ষয়

সাধারণ ভাষায় সামাজিক মূল্যবোধ তথা সততা, কর্তব্য পরায়ণতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, উদারতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যাবসায়, নান্দনিক সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম, কল্যাণবোধ, পারস্পরিক মমতাবোধ ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী লোপ পাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়াকেই বলে সামাজিক অবক্ষয়। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র অবক্ষয়ের ছাপ বিদ্যমান। নৈতিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। অশান্তি ও অস্থিরতা বাড়ছে পুরো বিশ্ব জুড়ে। ফলে পারিবারিক কলহ, অবাধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, কুরচিপূর্ণ সমকামী ও বহুকামিতার মতো পশুসুলভ যৌন আচরণ সমাজকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে। তৎকালীন মিসরীয় সামাজিক সুদ, ঘুষ, চুরি, মাদকাসক্তিসহ নানান সামাজিক অবক্ষয়মূলক কাজ বিদ্যমান ছিল। শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত এসব অনৈতিকতা বিরাজমান ছিল। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ঘুষের লেন-দেন হত। সামাজিক অবক্ষয়ের কয়েকটি চিত্র নিম্নে বর্ণনা করা হল।

ক. মদ্যপ সমাজ: যে সমাজের লোকেরা মদ কিংবা কোন নেশায় জড়িয়ে যায় সে সমাজের লোকদের উন্নতি অকল্পনীয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন মিসরের সাধারণ লোক থেকে শুরু করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও প্রকাশ্যে ছাত্রদের সামনেই ধুমপান করত। তারা এগুলো খরিদ করার সময় প্রকাশ্যে কিছু না বলে ক্ষীণ আওয়াজে কী যেন বলতেই তাদের চাহিদা পূরণ করা হতো। তাদের নেশার বিষয়টি আল-আইয়ামে বর্ণিত হয়েছে:

وربما باع لبعضهم حين يتقدم الليل أشياء لم تكن تسمى ولم تكن توكّل، وإنما كان
يتحدث المتحدثون عنها همسا ويتنافسون فيها تنافسا شديدا.

[আর সম্ভবত তাদের কারো কারো জন্য রাতের বেলা এমন সব জিনিস বিক্রি করা হত, যেগুলোর কোন নাম বলা হত না এবং সেগুলো খাওয়া হত না। বরং মানুষেরা এ সম্পর্কে ফিস ফিস করত এবং এটি পাওয়ার জন্য খুব কামনা করত।] ৫২

তৎকালীন মিসরে মদ্যপান করা অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে শহরে বড় বড় অনুষ্ঠানে মদ পরিবেশন করা হত। এই সমস্যা কিছু কিছু আলেমদের মধ্যেও ছিল। কোন কোন আলেম নিজেরা এরকম অনুষ্ঠানে যোগদান করলে সকলের সাথে নিজেরাও মদ পান করতেন। আবার কেহ কেহ ছিলেন নিজেরা পান না করলেও পানকারীদের বিপক্ষে কথা বলতেন না। তৎকালীন মিসরের শাসনকর্তা খিদ্দীভ-এর

আহাভাজন শায়খ রশীদ রিদা কর্তৃক আয়োজিত এমন একটা অনুষ্ঠানে মদ পরিশেনের কথা উল্লেখ করে তুহা হুসাইন বলেন:

وفي ذات يوم أقام الشيخ رشيد رضا وأصحابه حفلا بهذه المدرسة، واجتمعوا حول مائدة العشاء في فندق من فنادق القاهرة يقال له فندق "سافوي". ونشرت بعض الصحف أنباء زعمت فيها أن أكواب الشمبانيا أديرت حول هذه المائدة.

[একদিন শায়খ রশীদ রিদা এবং তাঁর অনুসারীরা এই মাদরাসায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। তাঁরা রাতের খাবারের জন্য কায়রোর হোটেলগুলোর মধ্যে 'সাফাবী' নামক একটি হোটেলে একত্রিত হলেন। কিছু কিছু পত্রিকা এই দাবী করে খবর প্রকাশ করল যে, শ্যাম্পেনের [মদ] পেয়ালা এই খাবার আয়োজনে পরিবেশন করা হয়েছে।] ৫৩

খ. চুরি ও ছিনতাই: কথায় আছে যে, অভাব মানুষের স্বভাব নষ্ট করে দেয়। মিসরের তৎকালীন লোকদের স্বভাব সেভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্বের কারণে মানুষ চৌর্যবৃত্তির দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। চুরি নামক এ ব্যাধি গ্রাম ছাড়িয়ে একপর্যায়ে শহরে এসেও হানা দেয়। সে সময় যে সকল আসবাব বেশি চুরি হত তন্মধ্যে জুতা চুরির ঘটনা ছিল অত্যধিক। মসজিদ, মক্তব এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নানা সময় জুতা চুরির ঘটনা শোনা যেত। মসজিদে আগত মুসল্লীদের নিজেদের জুতা সংরক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হত। মসজিদের পাশাপাশি আল-আযহারের মত একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপকহারে জুতা চুরি হত। এর বর্ণনায় ড. তুহা হুসাইন বলেন:

وما أكثر ما كانت تسرق النعال في الأزهر! وما أكثر ما كانت تلصق على جدران الأزهر من حول الصحن أوراق يعلن فيها أصحابها أن نعالهم قد ضاعت، وأن من ظفر بها فردها إلى صاحبها في مكان كذا، ورواق كذا، فله الأجر والثواب.

[আর আল-আযহারে কত জুতাই না চুরি হত! এবং আল-আযহার প্রাঙ্গণের দেয়ালের গায়ে কত কাগজ মারা হত! তাতে তার লেখক ঘোষণা দিত যে, তাদের জুতা হারিয়ে গেছে। যে এটা পেয়েছে সে যেন তা তার মালিকের কাছে ফেরত দেয়, অমুক জায়গায়, অমুক বারান্দায়। তাহলে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার ও সাওয়াব।] ৫৪

গ. মিথ্যা কসম ও দ্বিমুখী নীতি: মিথ্যা সর্বদা মানুষকে অন্যায়ের পথে ধাবিত করে এ কথা চির সত্য। একথা জানার পরেও মিসরের লোকেরা সমাজে নিজের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করত। ৫৫ বলা যায় যে, এ কসম করার বিষয়টি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ ভয়াবহ ব্যাধির পাশাপাশি তাদের মধ্যে আরও একটি ব্যাধির প্রচলন ছিল, তা হল: কারো নৈকট্য লাভের আশায় তার কাছে গিয়ে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় বইয়ে দেয়া। এর ফলে মানুষের মধ্যে দ্বিমুখী নীতির বীজ বপন করা হয় এবং অন্যের অকল্যাণ কামনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে শুরু করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। এমন একটা দৃষ্টান্তের বিবরণ তুহা হুসাইন এভাবে দিয়েছেন:

وهؤلاء الصبيان يتحدثون إليه، فيشتمون له الفقيه والعريف، ويغرونه بشتهمما، حتى إذا ظفروا منه بذلك، تقربوا به إلى الرجلين، وابتغوا به إليهما الوسيلة.

[এই বালকেরা তার সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করত, তার কাছে পর্যবেক্ষক ও শিক্ষকের গাল-মন্দ করত এবং তাকেও শিক্ষক ও পর্যবেক্ষককে গাল-মন্দ করার জন্য উৎসাহিত করত। যখন তারা এ কাজে সফল হত তখন সেটা দিয়ে শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকের নৈকট্য লাভ করতে চাইত, আর এটাকে তারা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত।] ৫৬

ঘ. পরশ্রীকাতরতা: অন্যের সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংস করে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনা-বসানাকেই বলা হয় হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যকে যে নেয়ামত দান করেছেন তাকে হিংসা করা এবং উক্ত নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা। ইসলামসহ পৃথিবীর সব ধর্ম পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের স্থলে সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। সেকালের সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। পরস্পরে আত্মহীনতা সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে আলেম সমাজের মাঝে। তাঁরা পরস্পরকে অবিশ্বাস ও অপছন্দ করত। এই হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা মক্তব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবখানে বিরাজমান ছিল। এর সাথে মিশে ছিল চাটুকারিতা ও তোষামোদী। ‘আল-আইয়াম’ এ নিম্নের বক্তব্যে এর চিত্র দেখা যায়:

وكان العريف يبغض سيدنا بغضا شديدا ويزدرية، ولكنه يسانعه. وكان سيدنا يكره العريف كرها عنيفا ويحتقره، ولكنه يتملقه.

[পর্যবেক্ষক আমাদের সাইয়্যিদকে খুবই অপছন্দ করত এবং তাঁকে ঘৃণা করত, বাহ্যিকভাবে তাঁকে মিষ্টি কথায় ভুলাতো। আর আমাদের সাইয়্যিদ পর্যবেক্ষককে খুবই অপছন্দ করতেন। এবং তাকে হয়ে জ্ঞান করতেন, কিন্তু বাহ্যিকভাবে তার চাটুকারিতা করতেন।] ৫৭

একবার আল আযহারে পড়ুয়া তুহা হুসাইনের ভাই নিজ গ্রামে আসলে তাঁকে জুম'আর নামাযে খুতবাহ দেয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু গ্রাম্য এক ব্যক্তি নানা যুক্তি পেশ করে এই প্রস্তাবে বাধা দেন। আযহারী ছাত্রটি খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠতে গেলে তখনই ঐ শায়খ মিম্বরের কাছে এসে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন:

إن هذا الشاب حديث السن، وما ينبغي له أن يصعد المنبر، ولا أن يخطب، ولا أن يصلي بالناس وفيهم الشيوخ وأصحاب الأسنان. ولئن خليت بينه وبين المنبر والصلاة لأنصرفن. ومن كان منكم حريصا على ألا تبطل صلاته فليتبني.

[নিশ্চয় এই যুবক অল্প বয়সী। তার মিম্বরে ওঠা ঠিক হবে না, খুতবাহ দেয়াও উচিত হবে না, আর মানুষের মধ্যে শায়খ ও বয়স্ক লোক থাকতে তার নামায পড়ানোও উচিত হবে না। তাকে যদি মিম্বরে উঠতে ও নামায পড়তে দেয়া হয় তাহলে আমি অবশ্যই চলে যাব। আপনাদের মধ্যে যিনি তার নামায বাতিল করতে চান না, তিনি আমাকে অনুসরণ করুন।] ৫৮

এ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের একপর্যায়ে মসজিদের নির্ধারিত ইমাম খুতবা দিয়ে নামাজ পড়ালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতার ঘৃণ্য ছোবল এভাবেই সাধারণ জনগণ থেকে ছাড়িয়ে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে।

উপসংহার

ড. তুহা হুসাইন আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে একজন খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি উনিশ শতকে মিসরের এমন একটি সমাজব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন, যে সমাজ ছিল নানা প্রকার কুসংস্কারে নিপতিত, বৈদেশিক শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত, ব্যক্তি স্বাভাব্য ও বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অবহেলিত। এ লাম্বিত, উৎপীড়িত দিশেহারা জাতিকে পথ নির্দেশনার জন্যই ছিল তাঁর সকল সাহিত্যকর্ম। তাঁর ক্ষুরধার লিখনীতে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির সুপ্তপ্রাণে বিপ্লবের জোয়ার এসেছিল। এটা স্পষ্ট যে, “আল-আইয়াম” ড. তুহা হুসাইন এর সবচেয়ে জনপ্রিয় তথ্যসমৃদ্ধ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এতে তিনি তৎকালীন মিসরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক চিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মিসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ড. তুহা হুসাইন তাঁর আল-আইয়ামে মিসরের

পারিবারিক জীবন-প্রকৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান, ব্যবসা-বানিজ্য এবং সামাজিক অবক্ষয় সম্পূর্ণ মুক্ত চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়ে ও হৃদয়গ্রাহী বাচনভঙ্গি দ্বারা তুলে ধরে সাহিত্যঙ্গনে তাঁর শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছেন। ড. তুহা হুসাইন অন্ধ ছিলেন কিন্তু, অন্তর্দৃষ্টির আলোকে যে জগৎ তিনি অবলোকন করেছেন সেই জগত স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার জগত। এই জগতের হাসি আনন্দ ফুঁটে উঠেছে তাঁর রচনাবলীতে। তাঁর অবদান আধুনিক আরবী মননশীল রচনায় এক নবদিগন্তের সূচনা করে। আলোচ্য প্রবন্ধে আল-আইয়ামের আলোকে উপস্থাপিত মিসরের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ যে কোন পাঠককে মিসরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করবে।

তথ্যনির্দেশ

- ১ ড. খালিদ আল কারকী, *তুহা হুসাইন রিওয়াইয়ান* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ১৭।
- ২ তুহা হুসাইন, *আল-আইয়াম*, ১ম খণ্ড, ৫২তম সংস্করণ (কায়রো: দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৪খ্রি.), পৃ. ১৭; শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবীল 'আরাবী*, পৃ. ২৭৭; ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাসর ওয়াশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবিয়াল হাদীস* (মদ্রাজ: দারুল হাফিয়া, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ২৩৩।
- ৩ ফারুক আহমদ, *তুহা হুসাইন ও তাঁর সাহিত্য-দর্শন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৩৫।
- ৪ তুহা হুসাইন, *আল-আইয়াম*, ১ম খণ্ড, (কায়রো: মুআসাসাত হানদাভী লিততা'লীম ওয়াছ ছাফাহ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৩।
- ৫ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।
- ৬ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।
- ৭ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৪৪।
- ৮ *جامع الأزهر*: মিসরের ফাতিমী খিলাফতকালে মিসর বিজয়ী সেনাপতি *الصفلي جوهر* ৯৭১ সালে আল-আযহার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে এটি একটি মসজিদ ছিল অতপর শী'আদের ধর্মীয় বিষয় এখানে শিক্ষা দেয়া হত। এর পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ও পাঠদান করা হত। এরপর সালাহ উদ্দীন ফাতিমীদের উপর ১১৭১ সালে বিজয় লাভ করেন এবং সেখানে সুন্নী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আল-আযহার পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। কুরআন, হাদীস, তাফসীর, তাওহীদ, ফিকহ, 'ইলমে কালাম, উসূলে ফিকহ, বালাগাত, মানতিক, হিকমত, নাছ-সরফ, জ্যামিতি, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হত। পরবর্তীতে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদ আন-নাসিরের আমলে আল-আযহারে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। দ্র: হাসান আয যাইয়াত, *তারীখুল আদাবীল 'আরাবী*, (কায়রো: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৪২১-৪২৩; জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবীল লুগাতিল 'আরাবিয়াহ* (বৈরুত: দারুল মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ১৬-১৮; হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (মক্কা: ১৯৭৯খ্রি.), পৃ. ৯০৫-৯০৬।
- ৯ তুহা হুসাইন, *আল-আইয়াম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ), পৃ. ১৭।
- ১০ ফারুক আহমদ, *তুহা হুসাইন ও তাঁর সাহিত্য-দর্শন*, পৃ. ৩৫।
- ১১ Nallino was invited by King Fuad I of Egypt to teach at the Egyptian Khedive University. Amongst his pupils there was Taha Husayn, who would go on to become Minister of the Interiors. Nallino eventually returned to Italy to take up the position of ordinary professor at the University 'La Sapienza' of Rome, where, in 1921, he had founded the Istituto per l'Oriente, which published the magazine Oriente Moderno. Wikipedia, the free encyclopedia, Accessed 15 Aug 2020.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alfonso_Nallino
- ১২ তুহা হুসাইন, *তাজদীদু যিকরা আবীল 'আলা* (কায়রো: মুআসসাসাতু হানদাভী লিততা'লীমি ওয়াছ ছাক্বাফাহ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯,৮৯।
- ১৩ ড. তুহা হুসাইন, *ফীল আদাবিল জাহিলী* (কায়রো: দারু মা'আরিফ, ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ৭; *তাজদীদু যিকরা আবীল 'আলা*, পৃ. ৫-১৪।
- ১৪ শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৭৮।
- ১৫ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাসর ওয়াশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবিয়িল হাদীস*, পৃ. ২৩৮।
- ১৬ *আল-আইয়াম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।
- ১৭ *তদেব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮।
- ১৮ *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩; ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাসর ওয়াশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবিয়িল হাদীস*, পৃ. ২৩৪।
- ১৯ *আ'লামুন নাসর ওয়াশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবিয়িল হাদীস*, পৃ. ২৩৪; শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৭৮।
- ২০ *আল-আইয়াম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১।
- ২১ শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৭৯; ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাসর ওয়াশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবিয়িল হাদীস*, পৃ. ২৩৭।
- ২২ ড. তুহা হুসাইন ১৯২৮ সালে মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সর্ব প্রথম ডীন নিযুক্ত হন। তারপর কিছু দিনের জন্য চাকুরি অব্যাহতি দিয়ে ১৯৩৬ সালে তিন বছরের জন্য পুনরায় কলা অনুষদের ডীন নিযুক্ত হন। বাদশাহ ফারুকের প্রতিষ্ঠিত আলজাজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪২ সালে তিনি প্রথম উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনায় অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। Chchia pierre, *Taha Husayn, His place in the Egyptian Literary Renaissance* (London, 1956), p.61; আহমদ হায়কাল, *আল-আদব আল-কিসাসী আল-মসরাহী ফী মিসর* (কায়রো: দারু ফিকর, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ১৩৯; শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৮১; আব্দুর রহমান, *ইলা তুহা হোসায়ন ফী 'ঈদে মীলাদিহ* (কায়রো: ১৯৬২খ্রি.), পৃ. ১৪-১৬।
- ২৩ জামালুদ্দীন আল-আলুসী, *তুহা হুসাইন বাইনা আনসারিহি ওয়া খুসুমিহ* (বাগদাদ: ১৯৭৩খ্রি.), পৃ. ৮৫।
- ২৪ ড. হমদী আল-সকুত, *আ'লাম আল-আদব আল-মু'আসির ফী মিসর* (কায়রো: ১৯৭৫খ্রি.), পৃ. ২১।
- ২৫ *তদেব*।
- ২৬ মুহাম্মাদ সিকন্দার মোমতাহী, *জামা' আতুল মোমেনীন* (ঢাকা: তরফদার বিপণী, ১৯৭৬খ্রি.), পৃ. ১২।
- ২৭ Robert O. Collins & Robert L. Tignor, *Egypt and the Sudan* (New Jersey: Engle-Wood Cliffs, 1967), p. 20
- ২৮ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ৩২-৩৪।
- ২৯ *আল-আইয়াম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।
- ৩০ *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
- ৩১ *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
- ৩২ *তদেব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩।
- ৩৩ *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।
- ৩৪ *তদেব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩।
- ৩৫ *তদেব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬।
- ৩৬ এক মালীম সমান এক পাউন্ডের এক হাজার ভাগের একভাগ। এটিই তৎকালীন মিসরের সবচেয়ে ছোট মুদ্রা ছিল।
- ৩৭ কারাছ এক ধরনের পেয়াজ জাতীয় সবজির নাম। মিসরে এ খাবারটি বেশ জনপ্রিয় ছিল।

৩৮ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।

৩৯ P.J. Vatikiotis, The history of Egypt from Muhammad Ali to Sadat (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980), 2nd edi. p. 433.

৪০ আল-আইয়াম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬-২৯৭।

৪১ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।

৪২ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫।

৪৩ তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৪৪ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

৪৫ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

৪৬ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

৪৭ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

৪৮ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

৪৯ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৫০ তুহা হুসাইন, আল-আইয়াম (কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, ২০১৮), ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৫১ তদেব, পৃ. ২৩।

৫২ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯।

৫৩ তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫।

৫৪ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

৫৫ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

৫৬ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

৫৭ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

৫৮ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।

ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খতীব আত-তাবরীযী: হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান

ড. মো. জাহিদুল ইসলাম*

Abstract: Waliuddin Muhammad Al-Khatib Al-Tabrizi was an eminent scholar of Hadith, Wellknown biographer of Hadith narrators and renowned orator. He was born in the city of Tabriz of present Azerbaijan. His writings and teachings in various branches have enriched holistic Islamic knowledge. Although he wrote books on various subjects, his scholarly contribution, research and compilation of books on Hadith literature have brought him worldwide recognition. Specially, *Al-Ikmal fi asmair rijal* and *Mishkatul Masabih* have brought to the pinnacle of fame. In the book of *Al Ikmal*, he briefly mentioned the biography of Prophet (sm.) and reviewed the biographies of more than five hundred companions, Tabi'i and Tab Tabi'i on the basis of their honor and the priority of narrating Hadith. He has included a total of 6275 hadiths under 26 chapters in his collection of hadiths called *Mishkatul Masabih*. The chapters and sub-chapters of this book have been arranged keeping in view the importance of different branches of Islamic Shariah. Therefore, from the beginning till today, this book has been able to gain wide popularity in the heart of readers and the field of knowledge and researchs. At present, these book is included in the curriculum of various educational institutions, colleges, madrasas and universities in our country. Therefore, in this article, an attempt has been made to briefly review the short life of Waliuddin Muhammad Khatib At-Tabrizi and his outstanding contribution to the Hadith literature.

ভূমিকা

ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় মূল উৎস হাদীছ অভিজ্ঞানের বিপুলতা নিরূপণে যে সকল মনীষী অক্লান্ত সাধনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিজরী অষ্টম শতকের ক্ষণজন্মা জ্ঞানতাপস ওয়ালীউদ্দীন আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরীযী। ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহভীরু ও কোমল চরিত্রের অধিকারী খতীব আত-তাবরীযী ছিলেন একাধারে হাফিয, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও প্রখ্যাত বাগ্মী। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য থাকলেও হাদীছ ও রিজালশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অবদান ইসলামী জ্ঞানকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রণীত *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত কিতাব হিসেবে সকল সমাজে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিতাবখানির বিষয় সজ্জায়ন, এর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ বিন্যাস অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ ও যথার্থ হয়েছে। গ্রন্থখানির মূল্যায়নসহ সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, হাদীছ চর্চা ও গবেষণায় খতীব আত-তাবরীযী ব্যাপক অবদান রেখেছেন যা মূল্যায়ন হওয়া দরকার। তাই অত্র প্রবন্ধে খতীব আত-তাবরীযীর বর্ণাঢ্য জীবন অতি সংক্ষেপে এবং হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান ও সাধনা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পরিচিতি

তাঁর নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবু ‘আব্দিল্লাহ। উপাধি ওয়ালীউদ্দীন, মহিউস সুন্নাহ এবং আল-খতীব। আর নিসবতী নাম আল-‘উমরী এবং আত-তাবরীযী। রিজাল শাস্ত্রবিদ, ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর পূর্ণ নাম হলো- মহিউস সুন্নাহ ওয়ালীউদ্দীন আবু ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-খতীব আল-‘উমরী আত-তাবরীযী। তাঁর পিতার নাম ‘আব্দিল্লাহ। এছাড়া তার উর্ধ্বতন বংশ পরম্পরা সম্পর্কে তেমন

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জানা যায় না। তবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তার বংশধারা হয়রত ‘উমার রা. এর সাথে সম্পৃক্ত।^১ তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর মৃত্যু সাল থেকে অনুমিত হয় যে, আল-খতীব আত-তাবরীযী হিজরী সপ্তম শতকের শেষ দশক এবং অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ সময়কালে জীবনানতিপাত করেন। তাঁর এই জীবনকাল থেকে অনুমান করা যায় যে, হিজরী ৭ম শতকের শেষদিকে তথা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষদিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু সাল সম্পর্কিত কারও কারও বর্ণনায় এও অনুমিত হয় যে, তিনি হিজরী অষ্টম তথা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, ‘ইলম অর্জন, জ্ঞান বিতরণ, গ্রন্থ রচনা, ইসলামী জ্ঞানাকাশে অসামান্য অবদান ইত্যাদি হিজরী অষ্টম শতকের প্রথমার্ধেই সংঘটিত হয়েছে।^২

বর্তমান আজারবাইজান, তৎকালীন পারস্যের উত্তর পশ্চিমে পলিমাটি সমৃদ্ধ একটি সমতল ভূমির পূর্বকোণে তাবরীয শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বৃহত্তর রাশিয়া ও বৃহত্তর পারস্যের সংযোগস্থলে শহরটির অবস্থান হওয়ার কারণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব বরাবরই অত্যধিক। ইতিহাসের পালাবদলে তাবরীয শহর সবসময়ই আলোচিত ও অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।^৩ মুহাম্মাদ খতীব আত-তাবরীযীর জীবনকালের প্রথমার্ধে মোগল ঈলখানী বংশ (৬৬১ হি.-৭৩৬ হি.) এবং শেষার্ধে জালাইরী ও চোবানী বংশ (৭৩৬ হি.-৭৭৬ হি.) তাবরীয শাসন করেন।^৪

খতীব আত-তাবরীযীর শৈশব-কৈশোর, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানার্জন ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য কোন ঐতিহাসিক বা রিজাল শাস্ত্রবিদ উল্লেখ করেননি। তবে জ্ঞানাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর লেখনী, গ্রন্থ প্রণয়নসহ ‘ইলমী জগতে তাঁর সরব উপস্থিতি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তিনি সুন্দর পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান ও যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইসলামী জ্ঞান জগতে তাঁর অবদান বিশ্বের বড় বড় ইসলামী পণ্ডিতদের কাতারে তাঁকে शामिल করেছে।

মুহাম্মাদ ইবন ‘আদিল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরীযী ‘ইলমে হাদীছের যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গবেষক, রিজাল শাস্ত্রবিদ, বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও তৎকালীন ‘আলিমকুল শিরোমণি। আধ্যাত্মিকতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। আল্লাহভীরুতা এবং দীন ও ‘ইবাদাতের প্রতি একনিষ্ঠতা তাঁকে ওলীদের মধ্যে অন্যতম এবং ‘আলিমদের নেতা হিসেবে সমাজে সমাদৃত করে।^৫ ‘ইলমের গভীরতা ও প্রশস্ততা তাঁর রচনাবলীর বর্ণাঢ্যতায় বিদ্যমান। তীক্ষ্ণ স্মৃতি, বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী আত-তাবরীযী স্বীয় গবেষণা ও লেখনীর ক্ষেত্রে ছিলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের একজন দক্ষ বিশ্লেষক।^৬ তাঁর কবরের প্রশস্ততা ও জান্নাতকে আবাসস্থল কামনা করে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দিহলবী স্বীয় *লাম’আতুত তানকীহ* গ্রন্থের শুরুতে তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, দুনিয়াবিমুখ, খোদাভীরু এবং আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ, নৈতিক ও সম্মানিত ব্যক্তি।^৭

প্রকৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক বা নামসহ তাঁর কোন ছাত্রের উল্লেখ কোথাও পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন গ্রন্থপ্রণেতা ও রিজাল শাস্ত্রবিদের গবেষণামূলক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁর অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও অনুসারী ছিল। সাথে সাথে এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, ‘ইলমুল হাদীছ ও রিজাল শাস্ত্রসহ জ্ঞান জগতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য প্রমাণ করে, খতীব আত-তাবরীযীর অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রয়েছেন, যাঁর উল্লেখ তেমন একটা পাওয়া যায় না। সরাসরি শিক্ষকমণ্ডলীর নাম পাওয়া না গেলেও কৌণিকভাবে আমরা জানতে পারি যে, যাঁর ঐকান্তিক প্রেরণা ও উৎসাহে তিনি *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেই শরফুদ্দীন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন ‘আদিল্লাহ আত-তাবরীযী (মৃ. ৭৪৩ হি.) তাঁর সরাসরি শিক্ষক ছিলেন। এ বিষয়ে খতীব আত-তাবরীযীর নিজ উক্তিই প্রমাণ বহন করে। তিনি স্বীয় গ্রন্থ *আল-ইকমাল লিতারাজিমি রিজালিল মিশকাত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। “এই গ্রন্থ রচনা হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেছি ৭৪০ হিজরীর ২০ রজব জুমু’আহর দিন।

আমি মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল খতীব আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমাপ্রার্থী একজন গুনাহগার দুর্বল বান্দাহ। আমার অভিভাবক ও শায়খের পরামর্শ ও সহযোগিতায় অত্র কিতাব সম্পন্ন করেছি। যিনি (শায়খ) মুফাসসিরদের নেতা, কুরআন বিশারদ, হক্কানী ‘আলিমদের ইমাম, জাতি ও দীনের গর্ব, মুসলমানদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত প্রামাণ্য দলীল। আর তিনি হচ্ছেন (আমার শিক্ষক) আল হুসাইন ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আত তীবী। খতীব আত-তাবরীযী আরও উল্লেখ করেছেন যে, এরপর আমি অত্র কিতাবটি *মিশকাতুল মাসাবীহ* কিতাবের ন্যায় তাঁর সামনে উপস্থাপন করলাম। তিনি মিশকাতের ন্যায় একাধিকবার নিখুঁতভাবে দেখে দিয়েছেন এবং একে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।”^৯

তাঁর শিক্ষক আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আত-তীবী-এর উক্তিও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্বীয় গ্রন্থ শারহুত তীবী-এর ভূমিকা সংযোজনে বলেন, “এ গ্রন্থ প্রণয়নে ইতোপূর্বে আমি পরামর্শ চেয়েছি আব্দুল্লাহর একজন সম্মানিত বান্দাহ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-খতীব এর নিকট, যিনি আমার দীনী ভাই, দৃঢ় ঈমানদার, আউলিয়া কিরামের অবশিষ্ট ব্যক্তি, সৎ লোকদের নেতা, দুনিয়াত্যাগী ও ইবাদাতগুজার। আল্লাহ তাঁর সম্মানকে চিরস্থায়ী করুন।”^{১০}

হাদীছ শিক্ষা ও সংকলনের উদ্দেশ্যে এবং রিজাল শাস্ত্রের সঠিকতা প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন হাদীছবেত্তা ও রিজাল শাস্ত্রবিদের নিকট তিনি গমন করেছেন, দূর-দূরান্তে সফর করেছেন, কন্ট্রাকারী ও গিরিসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি যেমনি মুহাদ্দিছ, হাফিয, ফকীহ, মুজতাহিদ ও ইসলামিক স্কলার ছিলেন, তেমনি একাধারে প্রখ্যাত খতীব, দা‘ঈ, শায়খুল ইমাম, শায়খুল ইসলাম, মহিউস সুন্নাহ ও বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নৈতিকতা, কর্মপ্রিয়তা, ইখলাস, একনিষ্ঠতা, আব্দালাহীয়া, পরহেজগারী, দুনিয়াবিমুখতা, সমায়ুর্ভূততা, অল্পেচুষ্ট, প্রবল আনুগত্য, কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী ইত্যাদি হাজারও নৈতিক গুণ তাঁকে একজন প্রকৃত মানুষ, কালজয়ী পুরুষ, যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং বরণীয় মুহাদ্দিছ হিসেবে বিশ্বজগতে পরিচিতি এনে দিয়েছে।^{১১}

৭৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *মিশকাতুল মাসাবীহ* প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন এবং পাঠক সমাজে প্রকাশ করেন। এ বছরই জুম‘আতুল বিদা অর্থাৎ রমযান মাসের শেষ জুম‘আবার জ্ঞানাকাশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র খতীব আত-তাবরীযী আব্দুল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।^{১২} মোল্লা ‘আলী আল-কারী, ইয়াকূত আল-হাম্বীসহ অনেক ঐতিহাসিক উপর্যুক্ত এ মতকেই সমর্থন করেছেন।^{১৩} উমার রিদা কাহালাহর মতে, তিনি ৭৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।^{১৪} খাইরী সা‘ঈদ-এর তাহকীককৃত মিসরের কায়রো থেকে প্রকাশিত *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু সাল ৭৪১ হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৫}

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরীযী হাদীছ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্যাসত্য যাচাই করে বিশুদ্ধতা নিরূপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ কালজয়ী মুহাদ্দিছ হাদীছ সংকলনে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল-খতীব আত-তাবরীযী। পূর্ববর্তীদের ন্যায় তিনিও ‘ইলমুল হাদীছ চর্চায় জীবন অতিবাহিত করে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ গবেষণা, যাচাই-বাছাই এবং সনদ প্রক্রিয়ার সঠিকতা নিরূপণসহ হাদীছ সত্যায়নের যাবতীয় মাপকাঠি বজায় রেখে তিনি সংকলন করেন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত সংকলন *মিশকাতুল মাসাবীহ*। সহীহ হাদীছ নিরূপণে বর্ণনাকারীদের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য মুহাদ্দিছগণ জীবন চরিত্র নামে যে অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছেন তা-ই *ইলমু রিজালিল হাদীছ* নামে পরিচিত।^{১৬} খতীব আত-তাবরীযীর *ইলমু রিজালিল হাদীছ*ও সর্ব পদচারণা

বিদ্যমান। তিনি রাসূল সা. এর সীরাহ বর্ণনাসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈর জীবন চরিত আলোচনা করে এ গ্রন্থের নাম দেন *আল ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল*। নিম্নে হাদীছ চর্চা, সংকলন, সংরক্ষণ, সত্যাসত্য নিরূপণ ও গবেষণা সম্পর্কে খতীব আত-তাবরীযীর অবদানস্বরূপ তাঁর প্রণীত গ্রন্থ সম্পর্কে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো :

আল-ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল

ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খতীব আত-তাবরীযীর অনবদ্য রিজাল গ্রন্থ এটি। এখানে তিনি রাসূল সা. এর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে সাহাবীগণের অবদানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সজ্জায়ন করে পাঁচ শতাধিক সাহাবীর জীবন আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। রাসূল সা. এর জীবন আলোচনার পর বাকী সাহাবীদের জীবন অনুচ্ছেদে বিভাজন করে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে মুকসিরীন হিসেবে ৭ জন, মুতাওয়াসসিতীন হিসেবে ৪ জন এবং মুকিল্লীন হিসেবে ৫৫ জন সাহাবীর জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি আশ'আরায়ে মুবশশিরা ও বদরী সাহাবী মিলে মোট ৭৯ জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবন উল্লেখ করেছেন। এরপরে তৃতীয় অনুচ্ছেদ থেকে উনত্রিশতম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আরবী হরফের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সজ্জায়ন করে ৪৪৪ জন সাহাবী, তাবি'ঈন ও তাবি তাবি'ঈদের জীবন, তাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এ গ্রন্থে তিনি হাদীছের বিভিন্ন পরিভাষা, এর সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস ও নীতিমালা, হাদীছ শিক্ষাদানের আদব ইত্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গ্রন্থের আলোচনার বর্ণাঢ্যতা, সজ্জায়নের ধারাবাহিকতা এবং তথ্যাদি উপস্থাপনের পরতে পরতে খতীব আত-তাবরীযীর পাণ্ডিত্যের ছাপ বিদ্যমান।^{১৭} পরবর্তীতে এ গ্রন্থের অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং এর অনুসরণে আরও অনেক রিজাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মিশকাতুল মাসাবীহ

যুগশ্রেষ্ঠ খতীব, হাদীছবেত্তা, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও সুন্নাহ জিন্দাকারী হিসেবে পরিচিত খতীব আত-তাবরীযীর অনবদ্য সংকলন হলো *মিশকাতুল মাসাবীহ*। এটি মূলতঃ বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বদ্রু হাদীছের সংকলন। প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পাঠক সমাজে এটি যেমন জনপ্রিয় তেমন শিক্ষাজগত এবং গবেষণা জগতেও এটি সমাদৃত। অনিন্দ্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সম্পাদনায় সজ্জিত এ গ্রন্থটিতে ২৬টি কিতাব বা অধ্যায়ের অধীনে ৬২৭৫টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।^{১৮} অধ্যায় ও অনুচ্ছেদভিত্তিক বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছ সজ্জায়ন রাবীগণের নামোল্লেখের স্পষ্টতা, সংগৃহীত কিতাবের উল্লেখ ইত্যাদি *মিশকাতুল মাসাবীহ*কে সকল যুগের ও কালের এবং সর্বশ্রেণির নিকট সমান জনপ্রিয়তা দান করেছে।

মিশকাতুল মাসাবীহ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

মিশকাতুল মাসাবীহ প্রণয়নের প্রকৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এটি মূলতঃ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাস'উদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-ফাররা আল-বাগাবী^{১৯} সংকলিত কিতাবুল মাসাবীহ^{২০} এর বর্ধিত সংস্করণ। *মাসাবীহ* বা *কিতাবুল মাসাবীহ* কিংবা *মাসাবীহুস সুন্নাহ* কিতাবটি সমৃদ্ধ ও অনবদ্য কিতাব, যা গ্রহণযোগ্য হাদীছ গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর অধ্যায়সমূহ ফিকহী মাসআলা সজ্জায়নের অনুরূপ কিংবা মানুষের নিত্য জিজ্ঞাসিত প্রয়োজনীয় বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে যা সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ও বোধগম্য। কিন্তু মাসাবীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীছসমূহে রাবীর নাম এবং সংগৃহীত কিতাবের নাম উল্লেখ না থাকায় তৎকালীন হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এমতাবস্থায়, গ্রন্থটির গুরুত্ব ও পাঠকপ্রিয়তা অবলোকন করে আল-খতীব আত-তাবরীযীর শিক্ষক শারফুদ্দীন আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আদিল্লাহ আত-তাবী তাঁর প্রিয় ছাত্র আত-তাবরীযীকে এর সনদ প্রণয়নসহ

অন্যান্য বিষয় সংযোজন করতে অনুরোধ করেন। প্রিয় শিক্ষকের অনুরোধে আত-তাবরীযী অত্র মাসাবীহ গ্রন্থখানিকে সম্পাদনাপূর্বক যাবতীয় শ্রীবৃদ্ধি করতে ব্রতী হন। বিশেষতঃ তিনি প্রতিটি হাদীছের সনদ সংযোজন অর্থাৎ রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি প্রতিটি হাদীছের শেষে মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে অধিকাংশ বাব বা অনুচ্ছেদের শেষে তৃতীয় ফসল বা তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। এতে করে বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীছ তাঁকে সংকলন করতে হয়েছে। এভাবে দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে ৭৩৭ হিজরীতে রমযান মাসের শেষ শুক্রবার গ্রন্থখানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থীয় সমাদৃত সংকলন প্রণয়ন সমাপ্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন *মিশকাতুল মাসাবীহ*।^{২১} গ্রন্থটি সম্পন্ন করে স্বীয় শিক্ষক আল্লামা শারফুদ্দীন আত-তীবীর নিকট উপস্থাপন করেন। প্রিয় ছাত্রের কাজ দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এটিকে তিনি অত্যন্ত গ্রন্থীয় হিসেবে পছন্দ করেন। সর্বোপরি তিনি এ গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন যা *শারহুত তীবী* নামে খ্যাত।^{২২}

মিশকাতুল মাসাবীহ পরিচিতি

হিজরী ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরীযী প্রণীত একটি জনপ্রিয় হাদীছ গ্রন্থ হলো *মিশকাতুল মাসাবীহ*। মাসাবীহ শব্দটি মিসবাহুন এর বহুবচন। যার অর্থ নক্ষত্র, আলোকমালা, চেরাগ বা বাতিসমূহ। আর মিশকাত শব্দের অর্থ বাতি রাখার স্থান বা চেরাগদানি। এখানে মাসাবীহ বা আলোকমালা দিয়ে সূন্যাহ বা হাদীছসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আর মিশকাত দিয়ে হাদীছসমূহ সন্নিবদ্ধ করার স্থান বা সংকলিত কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। খাইরী সায়ীদ এর তাহকীককৃত ২০০৪ সালে মিসরের কায়রোস্থ আল-মাকতাবাহ আত-তাওফীকিয়াহ থেকে প্রকাশিত *মিশকাতুল মাসাবীহ* হতে লক্ষণীয় যে, এতে ২৭টি কিতাব বা অধ্যায়ের অধীনে মোট ৬২৭৫টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে-

১. *كتاب الايمان* এর মধ্যে ৫টি *باب* ও ১৮টি *فصل* এর অধীনে শুরু থেকে ১৯৭টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
২. *كتاب العلم* এর মধ্যে তিনটি *فصل* এর অধীনে ১৯৮ থেকে ২৮০ পর্যন্ত ৮৩টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
৩. *كتاب الطهارة* এর মধ্যে ১৩টি *باب* ও ৪২টি *فصل* এর অধীনে ২৮১ থেকে ৫৬৩ পর্যন্ত মোট ২৮৩টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
৪. *كتاب الصلاة* এর মধ্যে ৫৩টি *باب* ও ১৬০টি *فصل* এর অধীনে ৫৬৪ থেকে ১৫১৭ পর্যন্ত মোট ৯৫৪টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
৫. *كتاب الجنائز* এর মধ্যে ৭টি *باب* ও ২৪টি *فصل* এর অধীনে ১৫১৮ থেকে ১৭৬৬ পর্যন্ত মোট ২৪৯টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
৬. *كتاب الزكاة* এর মধ্যে ৯টি *باب* ও ২৮টি *فصل* এর অধীনে ১৭৬৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত মোট ১৮৪টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
৭. *كتاب الصوم* এর মধ্যে ৯টি *باب* ও ৩০টি *فصل* এর অধীনে ১৯৫১ থেকে ২১০৩ পর্যন্ত মোট ১৫৩টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
৮. *كتاب فضائل القرآن* এর মধ্যে ২টি *باب* ও ৯টি *فصل* এর অধীনে ২১০৪ থেকে ২২১৬ পর্যন্ত মোট ১১৩টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

৯. **كتاب الدعوات** এর মধ্যে ১টি **باب** ও ৬টি **فصل** এর অধীনে ২২১৬ থেকে ২২৮০ পর্যন্ত মোট ৬৫টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১০. **كتاب اسماء الله تعالى** এর মধ্যে ৭টি **باب** ও ২৪ টি **فصل** এর অধীনে ২২৮১ থেকে ২৪৯৯ পর্যন্ত মোট ২১৯টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১১. **كتاب المناسك** এর মধ্যে ১৫টি **باب** ও ৪৬টি **فصل** এর অধীনে ২৫০০ থেকে ২৭৫৩ পর্যন্ত মোট ২৫৪টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১২. **كتاب البيوع** এর মধ্যে ১৯টি **باب** ও ৬০টি **فصل** এর অধীনে ২৭৫৪ থেকে ৩০৭৭ পর্যন্ত মোট ৩২৪টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৩. **كتاب النكاح** এর মধ্যে ১৭টি **باب** ও ৫২টি **فصل** এর অধীনে ৩০৭৮ থেকে ৩৩৭৯ পর্যন্ত মোট ৩০২টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৪. **كتاب العتق** এর মধ্যে ১টি **باب** ও ৬টি **فصل** এর অধীনে ৩৩৮০ থেকে ৩৪০৩ পর্যন্ত মোট ২৪টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৫. **كتاب الأيمان والذنور** এর মধ্যে ১টি **باب** ও ৬টি **فصل** এর অধীনে ৩৪০৪ থেকে ৩৪৪৩ পর্যন্ত মোট ৪০টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৬. **كتاب القصاص** এর মধ্যে ৪টি **باب** ও ১৩টি **فصل** এর অধীনে ৩৪৪৪ থেকে ৩৫৫২ পর্যন্ত মোট ১০৯টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৭. **كتاب الحدود** এর মধ্যে ৬টি **باب** ও ১৮ টি **فصل** এর অধীনে ৩৫৫৩ থেকে ৩৬৫৮ পর্যন্ত মোট ১০৬টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৮. **كتاب الإمارة والقضاء** এর মধ্যে ৪টি **باب** ও ১৫টি **فصل** এর অধীনে ৩৬৫৯ থেকে ৩৭৮৪ পর্যন্ত মোট ১২৬টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
১৯. **كتاب الجهاد** এর মধ্যে ১১টি **باب** ও ৩৬টি **فصل** এর অধীনে ৩৭৮৫ থেকে ৪০৬১ পর্যন্ত মোট ২৭৭টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
২০. **كتاب الصيد والذبائح** এর মধ্যে ৩টি **باب** ও ১১টি **فصل** এর অধীনে ৪০৬২ থেকে ৪১৫৬ পর্যন্ত মোট ৯৫টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
২১. **كتاب الأطعمة** এর মধ্যে ৫টি **باب** ও ১৫টি **فصل** এর অধীনে ৪১৫৭ থেকে ৪৩০১ পর্যন্ত মোট ১৪৫টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
২২. **كتاب اللباس** এর মধ্যে ৪টি **باب** ও ১৪টি **فصل** এর অধীনে ৪৩০২ থেকে ৪৫০৭ পর্যন্ত মোট ২০৬টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
২৩. **كتاب الطب والرقي** এর মধ্যে ২টি **باب** ও ৯টি **فصل** এর অধীনে ৪৫০৮ থেকে ৪৫৯৯ পর্যন্ত মোট ৯২টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।
২৪. **كتاب الرؤيا** এর মধ্যে ৩টি **فصل** এর অধীনে ৪৬০০ থেকে ৪৬২১ পর্যন্ত মোট ২২টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

২৫. **كتاب الآداب** এর মধ্যে ২২টি **باب** ও ৬৫টি **فصل** এর অধীনে ৪৬২২ থেকে ৫১৪৩ পর্যন্ত মোট ৫২২টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

২৬. **كتاب الرقاق** এর মধ্যে ৮টি **باب** ও ২৭টি **فصل** এর অধীনে ৫১৪৪ থেকে ৫৩৬৫ পর্যন্ত মোট ২২২টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

২৭. **كتاب الفتن** এর মধ্যে ৪০টি **باب** ও ১১৪টি **فصل** এর অধীনে ৫৩৬৬ থেকে ৬২৭৫ পর্যন্ত মোট ৯১০টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

মোট ২৭টি **كتاب** বা অধ্যায় রয়েছে। এর অধীনে ২৬৮টি **باب** বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। আর **فصل** এর ক্ষেত্রে **كتاب** বা অধ্যায়ের অধীনে ৮১টি এবং **باب** এর অধীনে ৭৭৩টি মোট ৮৫৪টি **فصل** বা অনুচ্ছেদ রয়েছে। সকল অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের অধীনে সর্বমোট ৬২৭৫টি হাদীছ সন্নিবদ্ধ রয়েছে।^{২৩}

মিশকাতুল মাসাবীহ-এর বৈশিষ্ট্য

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থটি হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী রচিত মাসাবীহ গ্রন্থের বর্ধিত সংস্করণ। তাই লক্ষণীয় যে, মাসাবীহ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সাথে খতীব আত-তাবরীযী এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন, যাতে গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন হয়েছে। গ্রন্থটির মৌলিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনার প্রয়াস পাব:

বর্ণনাকারীর নাম: আল-বাগাবী সংকলিত মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীছসমূহ সনদবিহীন ছিল। সেখানে খতীব আত-তাবরীযী গ্রন্থের প্রতিটি হাদীছের শুরুতে রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম সংযোজন করেছেন। এ বিষয়ে আল-খতীব আত-তাবরীযী নিজেই বলেন, আমি মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা করে মাসাবীহ গ্রন্থের প্রত্যেকটি হাদীছ কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করেছি এবং রাসূল সা. হতে প্রথম বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছি।^{২৪} গ্রন্থের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সংযোজনে এটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

অধ্যায় বিভক্তিকরণ: গ্রন্থখানিকে শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠক সমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে লেখক বিভিন্ন কিতাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। ইসলামী শরী'আতের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিচারে অধ্যায়সমূহের ক্রমধারা নির্বাচন করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক ২৭টি কিতাব বা অধ্যায় সংযোজন করে বিষয়ভিত্তিক ৬২৭৫টি হাদীছ সন্নিবেশ করেছেন।^{২৫}

পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্তিকরণ ও সংযোজন: খতীব আত-তাবরীযী গ্রন্থখানির মধ্যে আল-বাগাবীর অনুসরণে বাব বা পরিচ্ছেদ এবং ফাসল বা অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থকার দুটি অধ্যায় ব্যতীত সকল অধ্যায়ের অধীনে সরাসরি তিনটি করে ফাসল এবং অল্প কিছু বাব ব্যতীত সকল বাবের অধীনে তিনটি করে ফাসল যুক্ত করেছেন। মোট ২৭টি অধ্যায়ের অধীনে ২৬৮টি পরিচ্ছেদ এবং ৮৫৪টি অনুচ্ছেদ যুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তৃতীয় ফাসলগুলো খতীব আত-তাবরীযী নিজে যুক্ত করেছেন এবং এর হাদীছগুলো নিজে সংকলন ও সংযোজন করেছেন। স্বীয় গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনায় এ কথা উল্লেখ করেছেন।^{২৬}

হাদীছ সংগ্রহের সূত্র উল্লেখ: *মিশকাতুল মাসাবীহ* এর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খতীব আত-তাবরীযী যে মূল গ্রন্থ থেকে হাদীছটি সংগ্রহ করেছেন কিংবা আল্লামা বাগাবী সংগৃহীত হাদীছ যে মৌলিক গ্রন্থে পেয়েছেন তা হাদীছের শেষে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে শাইখাইন অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম প্রণীত সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উভয় গ্রন্থে বিদ্যমান হাদীছকে মুত্তাফাক 'আলাইহ বলে অভিহিত করেছেন। যদি একই হাদীছ এই দুই গ্রন্থে থাকার পরে অন্য গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকে তাহলে

প্রাধান্য বিবেচনায় অন্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করে শুধুমাত্র এ দুই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আর এ দুই গ্রন্থে না থাকলে গুরুত্ব বিবেচনায় ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য গ্রন্থের নাম বা সূত্র উল্লেখ করেছেন।^{২৭}

অধ্যায়সমূহে হাদীছের ধারাবাহিকতা: অধ্যায়ের অধীনে এবং পরিচ্ছেদের অধীনে অনুচ্ছেদগুলোর ধারাবাহিকতায় তিনি প্রথম অনুচ্ছেদে শাইখাইনের হাদীছ যথাসাধ্য স্থান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে সিহাহ সিভাহর অন্যান্য গ্রন্থ এবং অন্যান্য সংকলনগুলো থেকে সংগৃহীত হাদীছমূহকে ধারাবাহিকভাবে স্থান দেয়ার চেষ্টা করেছেন।^{২৮}

দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান: সাধারণ পাঠকের নিকট গ্রন্থটিকে সহজবোধ্য ও পাঠযোগ্য করার লক্ষ্যে তিনি দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। যেমন ইমাম বাগাবী যে সকল হাদীছকে গরীব বা দয়ীফ বলেছেন, খতীব আত-তাবরীযী যথাসাধ্য সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। যেহেতু রিজাল শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই তার প্রণীত ব্যাখ্যা ‘আলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।’^{২৯}

একাধিক রিওয়াযাত বর্জন: মৌলিক গ্রন্থসমূহে একই হাদীছ বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা কিংবা মতনে সামান্য শাস্ত্রিক পরিবর্তন হিসেবে একাধিকবার বা সকল রাবী থেকেই বর্ণিত হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু খতীব আত-তাবরীযী একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন রাবীর বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ না করে পাঠকের সুবিধার্থে অতি গ্রহণযোগ্য ও সহজবোধ্য একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।^{৩০}

হাদীছের মৌলিকত্ব যাচাই: খতীব আত-তাবরীযী *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থের প্রতিটি হাদীছের মৌলিকত্ব যাচাই-বাছাই করেছেন। হাদীছটি কোন গ্রন্থে কোন সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এর সঠিকতা প্রমাণ সাপেক্ষে গ্রন্থে সন্নিবেদন করেছেন। হাদীছটি গরীব বা দয়ীফ হলে এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।^{৩১}

প্রসিদ্ধ ইমামগণের ও তাঁদের কিতাবের নাম উল্লেখ: আত-তাবরীযী হাদীছের গুরুত্বপূর্ণ ইমামগণের রিওয়াযাতকৃত বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ হাদীছগুলো গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে শুরুতে রাসূল সা. হতে প্রথম বর্ণনাকারী সাহাবী বা তাবি‘ঈর নাম উল্লেখ করেছেন এবং শেষের দিকে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হাদীছটি রিওয়াযাত হয়েছে তাঁর নামসহ গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ ইমামের নাম জুড়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে খতীব আত-তাবরীযী নিজেই বলেন, “আমি যখন কোন হাদীছের শেষে কোন ইমামের নাম উল্লেখ করবো, তখন মনে করতে হবে যে, আমি হাদীছের পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছি। তাঁরা স্বীয় কিতাবে এ কাজ সম্পন্ন করে আমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।”^{৩২}

জীবন ঘনিষ্ঠ শরী‘আহ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক সজ্জায়ন: পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর‘ঈ বিষয়সমূহের গুরুত্ব বিচারে এর ধারাবাহিক অধ্যায় বিন্যাস করা হয়েছে এবং হাদীছসমূহও সেভাবেই সন্নিবেদন করা হয়েছে। যেমনিভাবে ইসলামী শরী‘আতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক বিষয় ঈমান, শর‘ঈ জ্ঞান, পবিত্রতা, সালাত এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাতাশটি অধ্যায় সাজানো হয়েছে।^{৩৩}

মূল্যায়ন

হুসাইন ইবন মাস‘উদ আল-বাগাবী সংকলিত মাসাবীহ গ্রন্থের বর্ণিত সংস্করণ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ আল-খতীব আত-তাবরীযী প্রণীত *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থ যুগশ্রেষ্ঠ উভয় মুহাদ্দিসের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফসল। আল-বাগাবী বিষয় সজ্জায়ন ও বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছ সংগ্রহ করে যেমনি তার মেধা ও

মননের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনিভাবে আত-তাবরীযী এর বিষয়সমূহকে আরও জীবনঘনিষ্ঠ করে হাদীছসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন, সত্যাসত্য যাচাই করেছেন এবং বিশুদ্ধতা নিরূপণে সনদ সংযোজনসহ মূল তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যাতে করে গ্রন্থটি সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে সকল শ্রেণির আলিম, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ পাঠকের নিকট প্রিয় পাঠে পরিণত হয়। আত-তাবরীযী গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে স্বীয় শিক্ষক হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আত-তাবরীযীর সম্মুখে উপস্থাপন করলে আত-তাবরীযী গ্রন্থের সার্বিক দিক অবলোকন করে আনন্দে আবেগাপ্ত হন এবং গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যার নাম দেন *শারহুত তাবরী*।^{৩৪}

হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আত-তাবরীকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে এ কিতাবের অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। অনেক হাদীছ বিশারদ এ গ্রন্থের গুরুত্ব বিচারে যথাযথ মূল্যায়নের তাগিদে গ্রন্থটিকে বিশ্লেষণ করে অনেক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের দেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশেও গ্রন্থটির গুরুত্ব বিচারে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, আলিয়া ও কওমী মাদরাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সিলেবাস ও কারিকুলামভুক্ত রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, পাঠক সমাজের আগ্রহ আর গবেষণার দিক বিবেচনা করে বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল ডাটাবেইজ হিসেবে বিভিন্ন ভার্যুয়াল মাধ্যমে গ্রন্থটি নেট জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা যায়, গ্রন্থটি সকল সমাজেই যথাযথ সমাদৃত ও মূল্যায়িত হচ্ছে।

ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় মূল উৎস হিসেবে হাদীছের গুরুত্ব, দৈনন্দিন ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে এর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। তাই যুগ যুগ ধরে হাদীছ সংরক্ষণ, সংকলন, বিশুদ্ধতা নিরূপণ, এসবের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চলে আসছে। *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থের এ সকল দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থটি যথার্থ হয়েছে। এর সনদ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, তথ্যসূত্র উল্লেখ, বিশুদ্ধতা নিরূপণ, জটিলতা নিরসন ইত্যাদি দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। এদিক থেকে *মিশকাতুল মাসাবীহ*কে ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় মূল উৎস হিসেবে তথ্যসূত্রের অন্যতম উপাদান ও নির্ভরযোগ্য কিতাব বিবেচনা করা যায়।

বিষয় নির্বাচন, অধ্যায় বিভক্তিকরণ, পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহে বিষয় সংশ্লিষ্ট যথাযথ হাদীছ সন্নিবদ্ধ করে এর মান বজায় রাখা ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায়, গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষমার্গে অবস্থান করার যথেষ্ট উপাদান এতে বিদ্যমান। গবেষণার জগতে তথ্যসূত্র উদ্ভাবন ও গ্রহণের যে প্রক্রিয়া বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান, তাতে সার্বিক দিক বিবেচনায় গ্রন্থটিকে প্রাথমিক তথ্যসূত্রের উপাদান হিসেবে নির্ণয় করা যায়।

ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করলে লক্ষণীয় যে, ইসলামী শরী‘আত ও দ্বীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক। ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র যদি ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী চলতে চায় তাহলে *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থটি তাদের অনুসরণীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেহেতু রাসূল সা. এর সুন্নাহ অকাট্য ভিত্তিতে কিংবা বিশুদ্ধতা নিরূপিত হয়ে সংকলিত হয়েছে। তাই মাস‘আলা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি মৌলিক হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক দিক বিবেচনা করলে এ গ্রন্থে যেভাবে বিষয় নির্বাচন করে হাদীছ সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে এ গ্রন্থের বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছ অর্থাৎ রাসূল সা. এর নির্দেশনা ও উপদেশমত ব্যক্তি চললে ও সমাজ পরিচালনা করলে একটি সুন্দর আদর্শিক সমাজ উপহার দেয়া সম্ভব। নৈতিক দিক মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাই, একজন ব্যক্তি যদি সঠিক নৈতিক মূল্যবোধে স্বীয় জীবন পরিচালনা করতে চায় তাহলে এ

গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়কেন্দ্রিক হাদীছগুলো বা রাসূল সা. এর নির্দেশনাসমূহ সঠিকভাবে পালন করে তাহলে নিজেকে নৈতিকভাবে সুন্দর ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস পবিত্র হাদীছের সংকলন; মানবতার মূর্তপ্রতীক, কল্যাণ ও শান্তির শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহী রাসূল সা. এর অমীয় বাণীর সমাহার। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস ও বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ আল-কুরআনের বাস্তব প্রয়োগকৃত বর্ণনার সন্নিবেশ এ গ্রন্থখানি। তাই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও যথাযথ মূল্যায়িত হওয়ার মূল কারণ এটি রাসূল সা. এর বাণী, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বা বাস্তব প্রয়োগ। একে গুছিয়ে-সাজিয়ে আরেকটু বেশি উপভোগ্য করে তুলেছেন ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খতীব আত-তাবরীযী।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ালীউদ্দীন আবু 'আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আদিল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরীযী ছিলেন হিজরী অষ্টম শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফকীহ, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও বাগ্মী। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা-সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস হাদীছ শাস্ত্রকে আলোকিত ও সঞ্জীবিত করেছেন। *মিশকাতুল মাসাবীহ* গ্রন্থ প্রণয়ন করে সাধারণ পাঠক থেকে গুরু করে জ্ঞানী, পণ্ডিত ও গবেষক শ্রেণি পর্যন্ত সকলের নিকট হাদীছের মৌলিক ও গ্রহণযোগ্য কিতাব হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। *মিশকাতুল মাসাবীহ* কিতাবের অধ্যয়নভিত্তিক বিষয় নির্বাচন, এর পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ সংযোজন, যথার্থ স্থানে হাদীছ সন্নিবেশকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো অনবদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর সনদ বিশ্লেষণ এবং তথ্যসূত্র উপস্থাপন গ্রন্থটিকে মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। সার্বিক বিচারে আল-খতীব আত-তাবরীযী হাদীছ শাস্ত্রে এবং রিজাল শাস্ত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তা অতুলনীয়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর প্রথম থেকে অদ্যাবধি তার অবদান থেকে ইসলামী জ্ঞান জগত ও মুসলিম জাতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়ে আসছে এবং সবশ্রেণির নিকট তিনি এবং তার প্রণীত কিতাব সমাদৃত ও মূল্যায়িত হয়ে আসছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ১ খাইরুদ্দীন আয-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ৭ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাজিন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১২।
- ২ 'উমার রিযা কাহালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি.) পৃ. ২১১।
- ৩ ইবনুল আছীর, *তারীখুল কামিল*, ১ম খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুল আযহারিয়াহ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৮২।
- ৪ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
- ৫ সাইয়িদ শরীফ মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল-কাতানী, *আর রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১৭২।
- ৬ মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৬।
- ৭ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দিহলবী, *লাম'আতুত তানকীহ*, মুকাদ্দামাহ অংশ, ১ম খণ্ড (লাহোর: মাকতাবাহ মুস্তাফাস্, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ১৪।

- ৮ তাঁর নাম 'আব্দুদ দঈফ হুসাইন ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আত-তাবী। তিনি হিজরী অষ্টম শতকের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, হাফিয, ইমাম, শাইখ এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁর নির্দেশেই খতীব আত-তাবরীযী মিশকাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নিজেও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। দ্র. মু'জামুল মুয়াল্লিফীন, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩।
- ৯ ওয়ালীউদ্দীন আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-খতীব আত-তাবরীযী, আল-ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল (দিল্লী: কুতুব খানায়ে রশীদিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৬৩২।
- ১০ আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আত-তাবী, শাহহত তীবী 'আলা মিশকাতিল মাসাবীহ (কায়রো: মাকতাবাতু নাযযার মুসতাফা আল-বায়, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৯।
- ১১ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাজী (র.)-এর মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ খতীব আত-তাবরীযী (র.)-এর মিশকাতুল মাসাবীহ: একটি পর্যালোচনা, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ২০৯-২১১।
- ১২ খাইরুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৭ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালানীন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১২।
- ১৩ ইয়াকুত ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-হাম্ববী, মু'জামুল বুলদান, ১ম খণ্ড (বৈরুত: ইহইয়ায়িত তুরাখিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৪৩০।
- ১৪ 'উমার রিদা কাহালাহ, মু'জামুল মুয়াল্লিফীন, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মুয়াসসাসাভুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩৭।
- ১৫ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-খতীব আল-'উমরী আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাহ আত-তাওফীকিয়াহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১।
- ১৬ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, হাদীছের বিপ্লবিতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬২।
- ১৭ আল-ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।
- ১৮ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-খতীব আল-'উমরী আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।
- ১৯ তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মাদ। উপাধি-মুহিউস সুন্নাহ, রুকনুদ্দীন, যহীরুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম ও আল-বাগাবী। ৪৩৩ হিজরীর জামাদিউস উলা মাসে খুরাসানের বাগশূর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, হাদীছ বিশারদ, ফকীহ, হাফিয, সীরাহ ভাষ্যকার ও রিজাল শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশটিও বেশি প্রকাশিত গ্রন্থ বর্তমানে সমাদৃত হয়ে আছে। তিনি ৮০ মতান্তরে ৯০ বছর জীবিত থেকে ৫১৩ মতান্তরে ৫১৬ কিংবা ৫২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১২৫৮; ইবন তাগরী বারদী, আন-নুজুমুয যাহিরাহ, ৫ম খণ্ড (কায়রো: ওয়াযারাতুছ ছাকফিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ২২৩; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৫০।
- ২০ মাসাবীহ বা মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থটি আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী সংকলিত একটি অনবদ্য হাদীছ গ্রন্থ। এর হাদীছ সংখ্যা ৪৭১৯টি। এ গ্রন্থের হাদীছসমূহ সনদবিহীন হওয়ায় সমকালে সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়। এর অনেক ভাষ্যগ্রন্থ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। অধ্যায় সংযোজন, বিষয় বিন্যাস, প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য বজায় রেখে হাদীছ নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রন্থটি জনপ্রিয় এবং অনবদ্য। দ্র. সিয়রু আ'লামিন নুবালা, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০; তাজুদ্দীন আস-সুবুকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়াহ আল-কুবরা, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়ায়িত তুরাখিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২১৪; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন (মিসর: মাতবা'আতুল 'আলাম, ১৮৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৯৭-১৬৯৯।
- ২১ মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ, পৃ. ৫-৮।
- ২২ মু'জামুল মুয়াল্লিফীন, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩; হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী (র.)-এর মাসাবীহুস সুন্নাহ ও ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ খতীব আত-তাবরীযী (র.)-এর মিশকাতুল মাসাবীহ: একটি পর্যালোচনা, পিএইচ.ডি থিসিস, পৃ. ২০৭।
- ২৩ দ্র. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-খতীব আল-'উমরী আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।
- ২৪ মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ, পৃ. ৫।
- ২৫ তদেব, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

-
- ২৬ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।
- ২৭ দ্র. মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।
- ২৮ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।
- ২৯ তদেব, পৃ. ৬-৭।
- ৩০ মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।
- ৩১ হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী (র.) এর মাসাবীহ সুন্নাহ ও ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ খতীব আত-তাবরীযী এর মিশকাতুল মাসাবীহ: একটি পর্যালোচনা, পিএইচ.ডি থিসিস।
- ৩২ মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।
- ৩৩ মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১-৫১১; ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৪৯৫; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৮২।
- ৩৪ শারহুত তীবী, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪।

আল-কুরআনে কসম: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মুহা. আবুল ফুতুহ*

Abstract: Oath is normally used to affirm reality and reliability of information. It's considered one of the most prevalent and effective ways of drawing attention or eliciting trust in interpersonal and intercultural communications. Imam az-Zarkashi (d. 1392CE) defines an oath as a sentence that confirms a statement through emphasis. Oath in the holy Qur'an is divided into three main categories, namely; *Yamin al-Laghwa* (Accidental Oath), *Yamin Mun'aqidah* (Determined Oath) and *Yamin Ghamus* (Immersed/False Oath). In Islam, it is not allowed to swear by any creature of Allah except by the Name or Attribute of Allah. The Qur'an has used oaths frequently with a view to appeal to its target audience. The most popular Muslim explanations for the Qur'an's use of oaths, apparently, are theological, namely, that they either point to the existence and majesty of the Creator. Allah the Almighty takes an oath of himself approximately seven times in the holy Qur'an. Similarly Allah takes an oath of the sun or the moon in the holy Qur'an. This article aims at giving brief discussion on oath in the holy Qur'an.

ভূমিকা : আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর নাযিল করেছেন। আল-কুরআন নাযিলের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও দুনিয়া-আখিরাতে সফল জীবনের পথ নির্দেশ করা। আল-কুরআনের রচনামূল্য ও বিষয়বিন্যাস স্বতন্ত্র। এর প্রকাশরীতি, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি ও আবেদন অনুপম। এর চিত্তাকর্ষক শব্দ, অভিনব বাচনভঙ্গি, অকৃত্রিম বাক্যবিন্যাস এবং আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য চিরন্তন। আল-কুরআনের এমন বাক্যলিপি ও স্বতন্ত্র রচনামূল্য আরবজাতিতে হতবাক করে দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে কসম বা শপথ করেছেন। এসব কসমের উদ্দেশ্য এবং রহস্য সম্পর্কে ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সারকথা হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত বিধানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা, মহাজাগতিক নিদর্শনসমূহের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কসমকৃত বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝাতে আল-কুরআনে কসম প্রসঙ্গ এসেছে। এর অনেক শরয়ী বিধান রয়েছে। মানুষের পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে কসম করা বড় ধরনের অপরাধ। আলোচ্য প্রবন্ধে কসমের পরিচয়, প্রকার, বিধান ও আল-কুরআনে কসমের উল্লেখ ও ব্যবহারশৈলী উপস্থাপিত হয়েছে।

কসমের পরিচিতি : قسم (কসম) শব্দটি يَمِينُ (ইয়ামিন) শব্দের প্রতিশব্দ। اَيْمَانُ শব্দটি এর একবচন। আভিধানিক অর্থ শক্তি, শপথ, দিব্য, বৈধব্য, আল্লাহর নামে শপথ ইত্যাদি।^১ তবে يَمِينُ শব্দের মূল অর্থ ডান হাত। এটি কসম অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ হলো, তৎকালীন লোকজন শপথ করার সময় একে অপরের হাত ধরতো।^২ আল্লামা রাগিব আল-আসপাহানি বলেন, কসম শব্দটি يَمِينُ বা শপথ অর্থে এসেছে। যার মূল الْقَسَامَةُ যা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক. الْقَسَمُ বা শপথ; দুই. الْعَهْدُ বা অঙ্গিকার।^৩ ভাষাতত্ত্ববিদ ড. ইবরাহিম আনিস তার বিখ্যাত *আল-মুজামুল ওয়াসীত* গ্রন্থে কসম প্রসঙ্গে বলেন, 'কসম বা শপথ হলো কোন বস্তু মানুষের অন্তরে পতিত হওয়া এবং তা নিয়ে ভাবা; অতঃপর সে ভাবনাকে শক্তিশালী করে সত্যে পরিণত করা'।^৪

* এম. ফিল. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মূলত, কসম বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলার নাম বা তার গুণসমূহ উল্লেখ করে কোন কথাকে মজবুত ও শক্তিশালী করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়- 'কসম এমন শক্তিময় বন্ধন যা দ্বারা কসমকারী ব্যক্তির কোন কাজ করা বা না করার ইচ্ছা দৃঢ় করা হয়'।^৫

القسم هو يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئاً

'কসম এমন শপথ যা দ্বারা শপথকারী কোন বিষয়ের গুরুত্ব প্রদান করে'।^৬

কোন কোন ভাষাবিদ কসমের সংজ্ঞা প্রদানে বলেন, কোন বক্তব্যকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা এবং তার ভাব ও উদ্দেশ্যকে বক্তার চাহিদা অনুযায়ী দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা। যেন অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ দূরীভূত হয়। সেই সাথে বিশ্বাসী শ্রোতাদের হৃদয় প্রশান্তি ও আস্থা লাভ করে।^৭

কসমের এর সংজ্ঞা প্রদানে আল্লামা জুরজানি বলেন, কসম বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ করে কোন সংবাদকে শক্তিশালী করা বা গুরুত্বারোপ করা।^৮

আল-কুরআনে কসমের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য : সাধারণত শপথ করা হয় কোন বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি নিজেই সবকিছুর স্রষ্টা ও রাজাধিরাজ। তাঁর ক্ষেত্রে মিথ্যা উপস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। নিজের কোন কথা বা বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যও তাঁর কসম করার প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার সময় কসম করেছেন। এসব কসমের দ্বারা আল-কুরআনের বর্ণনাধারা সৌন্দর্যমণ্ডিত, অলংকারপূর্ণ, বলিষ্ঠ ও সুসমন্বিত হয়েছে। ইসলামি চিন্তাবিদ মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানী বলেন, শপথ হচ্ছে আরবি ভাষালঙ্কারের একটি বিশেষ শৈলী। এর দ্বারা বক্তব্য বলিষ্ঠ হয় এবং কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয়।^৯ ইসলামি গবেষকগণ আল-কুরআনে আল্লাহ্র কসমের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে তা উপস্থাপিত হলো-

এক. وَتَوْكِيدِهِ اর্থاً: কোন সংবাদকে সত্যায়ন ও বলিষ্ঠ করা। যাতে বিষয়টি গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর হয়।^{১০} যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ لِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

'তারা তোমার কাছে জানতে চায়, এটা কি সত্য? বলে দাও, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটি অবশ্যই সত্য। আর তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না'।^{১১}

তৎকালীন আরবের অধিকাংশ লোক পরকালের আযাবের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইতো। তাই আল্লাহ্ তা'আলা রাসুল (সা.) কে বলেন, তারা আপনার কাছে জানতে চায় যে, এ আযাব কি কোন বাস্তব বিষয়? আপনি বলে দিন, হ্যাঁ। আমার পালনকর্তার শপথ, তা একান্তই বাস্তব বিষয়। এ আযাতে কসমের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালীন আযাবের বিষয়টি সত্যায়ন ও বলিষ্ঠ করা হয়েছে।

দুই. بَيَانُ شَرَفِ الْمَقْسَمِ بِهِ وَعُلُوِّ قَدْرِهِ اর্থاً: কসমকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর সম্মান ও উন্নত মর্যাদার বিবরণের জন্য কসম করা।^{১২} যেন সাধারণ মানুষ আল্লাহ্র কাছে কসমকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান ও উঁচু মর্যাদার বিষয়ে অবগত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা রাসুল (সা.)-এর পবিত্র জীবনের কসম করেছেন।

لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

‘আপনার জীবনের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল’।^{১৩} আয়াতে لَعْمَزُكُ এর মধ্যে রাসুল (সা.) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর জীবনের কসম করে সৃষ্টিকুলের কাছে তাঁর মহান মর্যাদা উপস্থাপন করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনের কসম খেয়ে কুরআনের মর্যাদা উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেন, ص وَالْفُرَّانِ ذِي الذِّكْرِ ‘ছোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের’।^{১৪} এখানে আল-কুরআনের শপথ করে এর মর্যাদা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে পবিত্র মক্কা ভূমি, তুরে সীনি, তিন ও যায়তুনের মর্যাদা উপস্থাপনের লক্ষ্যে এসবের কসম করেছেন।^{১৫}

তিন. মহাজাগতিক নিদর্শনসমূহের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য কসম করা। প্রাচীন আরবের লোকজন সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়ের কসম করতো। এ উপস্থাপন শৈলীটি আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন।^{১৬}

চার. এছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা‘আলা পরকাল, পুনরুত্থান ও কিয়ামত ইত্যাদি বিষয়ের কসম করেছেন। যেন মানুষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করে ইসলামের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সচেতন হয়।^{১৭}

কসমের প্রকার : ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ কুরআন-সুন্নাহ পর্যালোচনা করে কসমকে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন।

১. يَمِينٌ غَمُوسٌ (ইয়ামিনে গুমূস)

২. يَمِينٌ مُنْعَقَدَةٌ (ইয়ামিনে মুন‘আকিদাহ)

৩. يَمِينٌ لَّغْوٌ (ইয়ামিনে লাগভ)।^{১৮}

يَمِينٌ غَمُوسٌ (ইয়ামিনে গুমূস) : অতীতের কোন বিষয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করাকে يَمِينٌ غَمُوسٌ বলা হয়।^{১৯} যেমন কেউ একটি কাজ করেও জেনে শোনে না করার শপথ করলো। এমন মিথ্যা শপথ কবির গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন’।^{২০} এ ধরনের কসমের ক্ষেত্রে কোন কাফফারা নেই। তবে পাপের জন্য তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।^{২১} يَمِينٌ غَمُوسٌ (গুমূস) অর্থ যা ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ- শপথকারীকে গুনাহ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।^{২২}

অবশ্য ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এধরনের কসমের ক্ষেত্রেও কাফফারার বিধান রয়েছে। কাফফারার বিধান মূলত আল্লাহর নামের মর্যাদা রক্ষা না করার পাপ মোচনের জন্য। মিথ্যা বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রূপে পেশ করার মাধ্যমে এ পাপ সাব্যস্ত হয়েছে। তবে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর যুক্তির বিপক্ষে বলেন- উপরোক্ত কসম কবির গুনাহ। পক্ষান্তরে কাফফারা একটি ইবাদত যা রোযা দ্বারা আদায় করা হয় এবং এতে নিয়তের শর্তও রয়েছে। কাজেই কবির গুনাহের সাথে এটি সম্পৃক্ত হতে পারে না।^{২৩}

يَمِينٌ مُنْعَقَدَةٌ (ইয়ামিনে মুন‘আকিদাহ) : ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথকে ইয়ামিনে মুন‘আকিদাহ বলে।^{২৪} এ জাতীয় কসম ভঙ্গ করলে অবশ্যই কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

‘আল্লাহ অনর্থক শপথের জন্য তোমাদের দায়ী করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো সে সবের জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন’।^{২৫}

এক্ষেত্রে তিন শর্তে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

১. শপথকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন হতে হবে।

২. নিজ ইচ্ছায় কসম করতে হবে।

৩. সেচ্ছায় কসম ভঙ্গ করতে হবে। উল্লিখিত তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।^{২৬}

يَمِينُ لَفُو (ইয়ামিনে লাগভ) : অতীত বা বর্তমান কালের কোন বিষয়ে নিজের ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করে কসম করা। অথচ প্রকৃত বিষয়টি তার ধারণার বিপরীত। এরূপ কসমকে ইয়ামিনে লাগভ বলে।^{২৭} যেমন কোন সূত্রে তথ্য পেয়ে শপথ করে বলা হলো- অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। পরে দেখা গেল, এটি সঠিক নয়। অথবা কোন ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কসম করে ফেলা। এভাবে অনিচ্ছাকৃত মুখে শপথ বাক্য উচ্চারিত হলেও ইয়ামিনে লাগভ।^{২৮} একসমের ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে পাকড়াও করবেন না। উল্লেখ্য, ইয়ামিনে লাগভ ও ইয়ামিনে গুমূসের মধ্যে পার্থক্য শুধু ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণেই। অতীত বা বর্তমানের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই।

কসমের কাফফারা : কাফফারা হলো, নেক আমল যেমন সদকা, রোযা অথবা অনুরূপ ইবাদতের দ্বারা পাপ ঢেকে দেওয়া।^{২৯} ইসলামি বিশেষজ্ঞদের মতে, কসমের ক্ষেত্রে কাফফারা কেবল তখনই হয় যখন ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করা সম্পর্কে কসম করা হয় এবং তা ভঙ্গ করা হয়। কসমের কাফফারা তিনভাবে হতে পারে।

১. দশজন মিস্কিনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেওয়া।

২. দশজন মিস্কিনকে নামায আদায় করা যায় মত বস্ত্র দান করা।

৩. একজন কৃতদাস বা দাসি মুক্ত করে দেওয়া। এই তিনটির কোনটিই সম্ভব না হলে ধারাবাহিকভাবে তিনদিন রোযা রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

‘অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো সে সবার জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। এর কাফফারা, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান কিংবা একজন কৃতদাস মুক্তি। আর যার সমর্থ নেই তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো’।^{৩০}

অর্থাৎ তিনটি কাজের মধ্যে থেকে সেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে। ১. দশজন মিস্কিনকে খাবার খাওয়ানো। নিজের পরিবারকে যে ধরনের খাবার খাওয়ানো হয় সে ধরনের মধ্যম মানের খাবার।^{৩১} প্রত্যেক মিস্কিনকে দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন চাল বা এ জাতীয় অন্য কিছু অর্ধ সা’ দিতে হবে। অর্ধ সা’ এর পরিমাণ হচ্ছে এক কেজি ৬৩৬ গ্রাম।^{৩২} চালের সাথে তরকারি বা গোশত দেয়া উচিত। আবার দশজন মিস্কিনকে একসাথে দুপুর বা রাতের খাবার খাওয়ানো যেতে পারে। ২. দশজন মিস্কিনকে বস্ত্র দান করা। প্রত্যেককে কমপক্ষে এতটুকু কাপড় দেওয়া যা দ্বারা নামায আদায় করা যায়।^{৩৩} ৩. একজন কৃতদাস বা দাসী মুক্ত করে দেওয়া।

অনেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কসমের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কসমকারী, জোর জবরদস্তীতে কসমকারী এবং ভুলে যাওয়া অবস্থায় কসমকারী সবার বিধান সমান। সবার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْيَمِينُ

অর্থাৎ ‘তিনটি বিষয় এমন, যেগুলোর নিশ্চিতটিও নিশ্চিত এবং উপহাসটিও নিশ্চিত। বিয়ে, তালাক ও শপথ’।^{৩৪}

আল-কুরআনের কসমের ব্যবহার শৈলী : আল-কুরআনের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমা-উদাহরণ ও অনবদ্য বর্ণনামূলক এক কথায় অতুলনীয়। কুরআন যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে তার মধ্যে তার ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য অন্যতম। এ মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তুকে মানুষের নিকট অলঙ্কারপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা এবং শরি‘আতের বিধান পালনের প্রতি মানুষকে আগ্রহ করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা‘আলা কসম করেছেন। আল-কুরআনে বিশেষত চারটি পদ্ধতিতে কসম করা হয়েছে।^{৩৫}

১. কসম শব্দের মূল ত্রিয়ার ব্যবহার।
২. শপথের হরফ واو (ওয়াও) ব্যবহার করে। যেমন واللّٰه (ওয়াল্লাহ) অর্থ-আল্লাহর কসম।
৩. শপথের হরফ باء (বাব) ব্যবহার করে। যেমন بالله (বিব্ব্বাহ) অর্থ-আল্লাহর কসম
৪. শপথের হরফ تاء (তাব) ব্যবহার করে। যেমন، تالله (তাল্লাহ) অর্থ-আল্লাহর শপথ।^{৩৬}

আল-কুরআনে কসমের ব্যবহার পদ্ধতির একটি পরিসংখ্যানমূলক তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

এক. আল-কুরআনে قسم (কসম) শব্দটি মোট ২৩বার বিভিন্ন রূপান্তরে এসেছে। নিম্নোক্ত ছকে তা প্রদত্ত হলো-

শব্দ	ব্যবহার সংখ্যা	সূরা ও আয়াত
أُقْسِمُ	৮ বার	ওয়াকিয়াহ: ৭৫, হাক্বাহ: ৩৭, মা‘আরিজ: ৪, কিয়ামাহ: ১, কিয়ামাহ: ২, তাকভীর: ১৫, আল-ইনশিকাক: ১৬, বালাদ: ১
فَسَمِ	২ বার	ফাজর: ৫, ওয়াকিয়াহ: ৭৬
أُقْسِمُوا	৬ বার	মায়িদা: ৫৩, কলাম: ১৭, আল-আন‘আম: ১০৯, নাহল: ৩৮, নূর: ৫৩, ফাতির: ৪২
يُقْسِمَانِ	২ বার	আল-মায়িদাহ: ১০৬ ও ১০৭
فَأَسْمَهُمَا	১ বার	আল-আ‘রাফ: ২১
تُقْسِمُوا	১ বার	আন-নূর: ৫৩
يُقْسِمُونَ	১ বার	আয-যুখরুফ: ৩২
فَسَمْنَا	১ বার	আয-যুখরুফ: ৩২
تَسْتَقْسِمُوا	১ বার	আল-মায়িদাহ: ৩

উপরোক্ত ছকে উল্লিখিত কসমের সকল শব্দ আল-কুরআনে يَمِين (ইয়ামিন) বা শপথ অর্থে এসেছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু সূরা আয-যুখরুফের আয়াত। এ আয়াতে ব্যবহৃত يَقْسِمُونَ ও فَسَمْنَا শব্দদ্বয় বিভক্ত অথবা বন্টন করা অর্থে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

‘তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে’।^{৩৭}

এ আয়াতে ব্যবহৃত **وَقَسَمْنَا** ও **يُقْسِمُونَ** শব্দদ্বয় বন্টন করে ও বন্টন করেছি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুই. আল-কুরআনের বিশাল অংশজুড়ে **وَ** (ওয়াও) এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে এই ‘ওয়াও’ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় ‘ওয়াও’ কসম অর্থে এসেছে। আরবি ভাষাবিদদের মতে, **حروف القسم** তথা কসমের অব্যয়সমূহের মধ্যে আল-কুরআনে ওয়াও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।^{৩৮} আল-কুরআনের ভাষ্যকার, আরবি ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণিকদের অভিমত পর্যালোচনা করে দেখা যায় আল-কুরআনের ৩০টি সুরার মোট ৪৭ স্থানে **وَ** এর দ্বারা কসম করা হয়েছে।^{৩৯} নিম্নে তা প্রদত্ত হলো-

সুরা নং	সুরার নাম	কসমের وَ এর ব্যবহার সংখ্যা	সুরা নং	সুরার নাম	কসমের وَ এর ব্যবহার সংখ্যা
০২	সুরা আল-বাকার	৫ বার	৫৩	সুরা নজম	২ বার
০৬	সুরা আন‘আম	২ বার	৬৪	সুরা তাগাবুন	১ বার
১৪	সুরা ইবরাহিম	১ বার	৬৮	সুরা কালাম	১ বার
১৫	সুরা হিজর	৫ বার	৭৪	সুরা মুদাসির	৩ বার
২১	সুরা আশিয়া	২ বার	৭৭	সুরা মুরাসালাত	১ বার
৩১	সুরা লোকমান	২ বার	৭৯	সুরা নাজিয়াত	১ বার
৩৪	সুরা সাবা	১ বার	৮৫	সুরা বুরাজ	১ বার
৩৬	সুরা ইয়াসিন	১ বার	৮৬	সুরা তারিক	২ বার
৩৭	সুরা সাফ্যাত	১ বার	৮৯	সুরা ফাজর	১ বার
৩৮	সুরা ছোয়াদ	১ বার	৯১	সুরা শামস	১ বার
৪৩	সুরা যুখরুফ	২ বার	৯২	সুরা লাইল	১ বার
৪৪	সুরা দোখান	১ বার	৯৫	সুরা তীন	১ বার
৪৬	সুরা আহকাফ	১ বার	১০০	সুরা ‘আদিয়াত	১ বার
৫০	সুরা কাফ	১ বার	১০৩	সুরা ‘আসর	১ বার
৫১	সুরা যারিয়াত	২ বার			
৫২	সুরা তুর	১ বার			

আরবি ব্যাকরণে **وَ** দিয়ে শুরু হওয়া বাক্য বিভিন্ন রকম অর্থ হতে পারে। যেমন এবং, তারপর, এরপর, কসম, মনে পড়ে ইত্যাদি। উপরোক্ত ছকে উল্লিখিত আয়াতসমূহে ‘ওয়াও’ অব্যয় দিয়ে আরম্ভ হওয়া আয়াতসমূহ **قسم** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝাতে, কখনো বক্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে, কখনো বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝাতে আবার কখনো গভীর রহস্য উন্মোচনের জন্য **وَ** এর কসম উল্লেখ করেছেন।

তিন. تاء (তা) (ওয়াও) এর ন্যায় শপথের একটি অব্যয়। তবে تاء (তা) কেবলমাত্র “আল্লাহ্” শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এটি আল্লাহ্ তা‘আলার বড়ত্ব, মহত্ব ও শক্তিমত্তা প্রকাশ করে। “আল্লাহ্” ব্যতীত তাঁর অন্য গুণবাচক নামের সাথেও تاء (তা) ব্যবহার হয় না।^{৪০} এজন্য تالرحمن، تالرحيم বলা যায় না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা‘আলা تاء (তা) দ্বারা শপথ করেছেন। বিশেষত সূরা ইউসুফে تاء (তা) দ্বারা বেশকিছু স্থানে শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا اَرْتَا اَوْ لَنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ‘তারা বলল, আল্লাহ্র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনো চোর ছিলাম না’।^{৪১} এ আয়াতে আল্লাহ্ শব্দের সাথে تاء (তা) যুক্ত করে কসম করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা ইউসুফের ৮৫, ৯১ ও ৯৫ নম্বর আয়াতে تاء (তা) দ্বারা কসম করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা আশ্বিয়ার ৫৭ নম্বর আয়াতে, সূরা শুয়ারার ২৭ নম্বর আয়াতে, সূরা সাফফাতের ৫৬ নম্বর আয়াতে, সূরা নাহালের ৫৬ ও ৬৩ নম্বর আয়াতসহ আল-কুরআনের বেশকিছু স্থানে تاء (তা) দ্বারা কসম করা হয়েছে।

চার. باء (বা) (ওয়াও) এবং تاء (তা) এর ন্যায় باء (বা) অব্যয় দ্বারাও কসম করা হয়ে থাকে। باء (বা) অব্যয়টি الصاق বা মিলিত করা বা যুক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহা কসম এর ক্রিয়ার সঙ্গে কসমকৃত ব্যক্তি বা বস্তুকে যুক্ত করে। কসমের ক্ষেত্রে باء (বা) অব্যয়টি দুটি অর্থের সাথে নির্দিষ্ট। তা হলো- ১. الاستعطاف বা মিনতি করা।^{৪২} যেমন বলা হয়: بِاللّٰهِ اُخْبِرْنِي অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম! আমাকে অবহিত করুন। এখানে সংবাদ জানতে চাওয়া হয়েছে। باء (বা) এর সাথে কসমের ফে‘ল বা ক্রিয়াকে উল্লেখ করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ جِهْدًا اٰمَنَانَهُمْ অর্থাৎ ‘তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কসম করে’।^{৪৩} এ আয়াতে اٰمَنُوْا ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ফে‘ল বা ক্রিয়াকে গোপন করে শুধু باء অব্যয় ব্যবহার করারও অবকাশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ ‘আপনার ইজ্জতের কসম আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দিব’।^{৪৪} এ আয়াতে শুধুমাত্র فَبِعِزَّتِكَ এর মধ্যে ব্যবহৃত বা অব্যয় দ্বারা শপথ করা হয়েছে। এর পূর্বে কোন ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়নি।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলার কসম : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর ঐশী বিধানকে মানুষের নিকট বলিষ্ঠভাবে উপস্থানের জন্য আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কসম করেছেন। কখনো তিনি নিজ সত্ত্বার কসম করেছেন, কখনো আল-কুরআনের কসম করেছেন, আবার কখনো তার সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়বস্তু যেমন-চন্দ্র, তারকা, কিয়ামত, মানব আত্মা, ফেরেশতা, সাক্ষ্য লালিমা, সময়-কাল, উল্লেখযোগ্য পবিত্র স্থানসমূহ, উষ্টী, মেঘমালা, বাতাসসহ ইত্যাদির কসম করেছেন।

আল্লাহ্র নিজ সত্ত্বার কসম: আল্লাহ্ তা‘আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মোট ১০ স্থানে নিজ সত্ত্বার কসম করেছেন। এর মধ্যে ২টি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ ও ৮টি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।^{৪৫} তবে কোন কোন কুরআন বিশেষজ্ঞ ৭ অথবা ৮ স্থান বলে উল্লেখ করেছেন।^{৪৬}

১. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقُّ ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার শপথ! তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য’।^{৪৭}

২. فُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقُّ ‘আপনি বলে দিন, অবশ্যই আমার পালনকর্তার শপথ এটা সত্য’।^{৪৮}

৩. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَهُمُ الشَّيْطَانَ. অর্থাৎ ‘সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রিত করবো’।^{৪৯}

৪. অর্থাৎ ‘সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম! অবশ্যই তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করবো’।^{৫০}

৫. অর্থাৎ ‘অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে’।^{৫১}

৬. অর্থাৎ ‘আমি কসম করছি উদয়াচল ও অন্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম’।^{৫২}

৭. অর্থাৎ ‘বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ’।^{৫৩}

৮. অর্থাৎ ‘কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ-অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত’।^{৫৪}

৯. অর্থাৎ ‘আল্লাহর কসম! তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে’।^{৫৫}

১০. تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَآلَهُمُ الْيَوْمَ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ ‘আল্লাহর কসম! আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সেই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’।^{৫৬}

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা নিজ সত্ত্বার কসম করেছেন। যেন মানুষ সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক আদিষ্ট বিধানসমূহ অকুণ্ঠচিত্তে ও দৃঢ়ভাবে পালন করেন।

আল-কুরআনের কসম : আল্লাহ তা‘আলা ৬ (ছয়) স্থানে আল-কুরআনের কসম করেছেন। যার অধিকাংশই সুরার প্রথম দিকের আয়াত।

১. অর্থাৎ ‘প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ’।^{৫৭}

২. অর্থাৎ ‘ছোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের’।^{৫৮}

৩. অর্থাৎ ‘ক্বাফ। সম্মানিত কুরআনের শপথ’।^{৫৯}

৪. অর্থাৎ ‘শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের’।^{৬০}

৫. অর্থাৎ ‘শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের’।^{৬১}

৬. অর্থাৎ ‘এবং লিখিত কিতাবের শপথ’।^{৬২}

শেষোক্ত আয়াতে লিখিত কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।^{৬৩}

কালের কসম: সময় বা কাল হচ্ছে মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ যেটি একটি বিশেষ মাত্রা এবং যেখানে ভৌত ঘটনাসমূহ একটি ক্রমধারায় ঘটে। আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই

কালের কসম করেছেন। কখনো মধ্যাহ্ন, কখনো অপরাহ্ন, আবার কখনো নিশান্ত ও প্রাতঃ কালের শপথ করেছেন। আল-কুরআনের প্রায় ১৩ স্থানে আল্লাহ তা'আলা সময়ের কসম করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নের শপথ করে বলেন, وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا অর্থাৎ 'শপথ সূর্যের ও পূর্বাহ্নের'।^{৬৫} এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى অর্থাৎ 'শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়'।^{৬৬} আল্লাহ তা'আলা দিনের শপথ করে বলেন, وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاهَا অর্থাৎ 'শপথ দিনের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে'।^{৬৭} এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى অর্থাৎ 'শপথ দিনের যখন সে আলোকিত হয়'।^{৬৮}

আল্লাহ তা'আলা প্রভাত বেলার শপথ করে বলেন, وَالْفَجْرُ অর্থাৎ 'শপথ ফজরের'।^{৬৯} এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ অর্থাৎ 'শপথ প্রভাত বেলার যখন তা আগমন করে'।^{৭০} আরো বলেন, وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ অর্থাৎ 'শপথ রাতের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়'।^{৭১} আল্লাহ তা'আলা রাতের শপথ করে বলেন, وَاللَّيْلُ إِذَا غَسَّسَ অর্থাৎ 'শপথ রাতের যখন তা অবসান হয়'।^{৭২} এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, وَاللَّيْلُ إِذَا غَسَّسَ অর্থাৎ 'শপথ রাতের এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে'।^{৭৩} আরো বলেন, وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى অর্থাৎ 'শপথ দশ রাতের'।^{৭৪} আরো বলেন, وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى অর্থাৎ 'শপথ রাতের যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে'।^{৭৫} আরো বলেন, وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى অর্থাৎ 'শপথ রাতের যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে'।^{৭৬} আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْعَصْرِ অর্থাৎ 'শপথ যুগের (সময়ের)'।^{৭৭}

আল্লাহ জালালুদ্দীন সুযুতী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এমন কিছু সময়ের কসম করেছেন যেটা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া এ সময়গুলোতে ঐকান্তিকতা সহকারে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সময়।^{৭৮}

তীন, যয়তুন, মক্কা নগরী ও সীনান পর্বতের কসম: তীন ও যয়তুনের কসম করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالزَّيْتُونِ অর্থাৎ 'শপথ ডুমুর এবং জলপাই ফলের'। একই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তুরে সিনীন ও পবিত্র মক্কা নগরীরও শপথ করেছেন। আল্লাহর বাণী: وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ অর্থাৎ 'এবং তুরে সিনীন ও এই নিরাপদ নগরীর শপথ'। তাফসিরকারগণ বলেন, আল-কুরআনের সূরা তীনে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। ১. তীন তথা ডুমুর বৃক্ষ, ২. যয়তুন বৃক্ষ, ৩. সীনান পর্বত ও ৪. মক্কা নগরী। এই বিশেষ শপথের কারণ, তুর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুনের বৃক্ষও উপকারী। কোন কোন তাফসিরকার বলেন, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ (সিরিয়া) যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। ইবরাহিম (আ.)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করে মক্কায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ নবীগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। তুর পর্বত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলার স্থান। সিনীন অথবা সীনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর তথা মক্কাভূমি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জন্মস্থান ও বাসস্থান। এসব কারণে আল্লাহ তা'আলা একত্রে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর শপথ করেছেন।^{৭৯}

চাঁদ ও সূর্যের কসম: মহাকাশে এমন সব সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন, যাদের বিশালতা মানব কল্পনার বাইরে। আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজির মধ্যে অন্যতম চন্দ্র ও সূর্য। সূর্য ও পৃথিবীর আবর্তনে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি হয়। সূর্য-ই হলো পৃথিবীর আলো ও তাপের উৎস। অন্যদিকে চাঁদ আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি। এটি বিশেষ নিয়মে মানব কল্যাণার্থে আসমানের মহাশূন্যে নির্দিধায় বাধা বন্ধনহীন অবস্থায় সঞ্চার করছে। চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে এ পৃথিবীর বুকে আলো বিকিরণ করছে। এই চাঁদ ও সূর্যের মাঝে দার্শনিকদের ভাবনা, কবিদের কল্পনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার লুকিয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা আল-

কুরআনে চাঁদ ও সূর্যের কসম করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, **وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاَهَا** অর্থাৎ ‘শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে (উদিত হয়)’।^{৭৯} আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশের বিষয় উপস্থানের ক্ষেত্রে তাঁর কুদরতের দু’টি নিদর্শন চাঁদ ও সূর্যের কসম করেছেন।

আসমান ও জমিনের কসম: আসমান অর্থ-আকাশ বা মহাশূন্য আর জমিন অর্থ- ভূমি, ভূ-পৃষ্ঠ, পৃথিবী ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা‘আলা এ দুটিকে অনুপমরূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ** অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ যিনি আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন’।^{৮০} আল্লাহ্ তা‘আলা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে আসমানের শপথ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ** অর্থাৎ ‘পথবিশিষ্ট আকাশের শপথ’।^{৮১} এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা আকাশের শপথ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, জান্নাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে। অন্যত্র জমিনের শপথ করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, **وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها** অর্থাৎ ‘শপথ জমিনের এবং তিনি যা বিস্তৃত করেছেন’।^{৮২} আল্লাহ্ তা‘আলা আসমান ও জমিনের শপথ করে তাঁর সৃষ্টির মহিমা ও বিশালতাকে সৃষ্টিজগতের নিকট প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কসম করেছেন। বিশেষ করে তারকারাজি, ফেরেশতা, বায়তুল মামুর, কিয়ামত, মানবাত্মা, সাক্ষ্য-লালিমা, পিতা-পুত্র, জোড়-বেজোড়, উত্তাল সমুদ্র, অশ্ব, বাতাস, মেঘমালা, দৃশ্য-অদৃশ্য ইত্যাদি বিষয়ের কসম করেছেন। মূলত আল্লাহ্ তা‘আলা যখন কোনো কিছুর শপথ করেন, তা নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দায়িত্ব হলো, এসকল বিষয় থেকে শিক্ষা নেয়া ও গুরুত্বের সাথে পালন করা।

আল্লাহ্‌র ব্যতীত অন্যের কসম নেয়ার বিধান : আল্লাহ্ তা‘আলার নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা কসম এমন জনের নামেই হয়ে থাকে যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা‘আলাই হচ্ছেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, সকল শক্তির আঁধার। সৃষ্টি করার ক্ষমতা, যোগ্যতা কেবলমাত্র তাঁরই রয়েছে। কসম বা শপথ কেবল তাঁর নামেই হতে পারে। পিতা-মাতা কিংবা সৃষ্টির অন্যকিছুর নামে শপথ খাওয়ার কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **أَلَا إِنَّ اللَّهَ** অর্থাৎ ‘সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে। অন্যথায় চূপ থাকে’।^{৮৩} তবে বিশেষজ্ঞগণ এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তা হলো, সৃষ্টিজীবের নামে কসম করার বিধান নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা কিভাবে সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। আল-কুরআনের গবেষকগণ এ উত্তরে বেশকিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। মূলত নিষেধের এ বিধান সাধারণ সৃষ্টিজীবের জন্য। আল্লাহ্ তা‘আলা সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন- এটা তাঁর একক বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোন বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলার কালামে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোন সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।^{৮৪} এছাড়াও জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) তার *আল-ইতকান* গ্রন্থে আল্লাহ্‌র কর্তৃক সৃষ্টির নামে কসম খাওয়ার প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির নামে নয় বরং সৃষ্টির প্রতিপালকের নামে শপথ করেছেন। মূলত: এখানে مضاف বা সম্বন্ধকৃত পদকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেমন-التين এর পরিবর্তে رَبِّ التين হবে; الشمس এর পরিবর্তে رَبِّ الشمس হবে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা এমন সকল বিষয়বস্তুর শপথ করেছেন, যেগুলো তৎকালীন আরবদের নিকট খুব সম্মান ও মর্যাদার ছিল। জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন জাতি যেন এ সব কসমের মাধ্যমে তাওহীদের পথে ফিরে আসে এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ৮৫

উপসংহার : কসম আল-কুরআনের ভাষা শৈলীর একটি অনুপম রূপ। আল-কুরআনের ভাষা যেমন স্বচ্ছ তেমনি এর বাক্যবিন্যাসও অত্যন্ত নিখুঁত, অভিনব ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কসম আল-কুরআনের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গির মাধুর্যতা ও আলঙ্কারিকতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝাতে, কখনো বক্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে, কখনো বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝাতে, আবার কখনো বা গভীর রহস্যের বাতায়ন উন্মোচনের জন্য আল-কুরআনের বহু স্থানে কসম বা শপথ করেছেন। আল-কুরআনের মূল অলৌকিকতা এর ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য এবং অনুপম রচনাশৈলীর মধ্যে অনেকাংশে নিহিত। পরিশেষে বলা যায়, আল-কুরআনের অলৌকিকতা এর অসাধারণ রচনাশৈলীর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে। মক্কার কুরাইশদের মত আল-কুরআনের অতুলনীয় ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষাশৈলী দর্শনের সামনে গোটা বিশ্ব বারবার মাথা নত করেছে।

তথ্যনির্দেশ

- ১ জুবরান মাসউদ, আর-রায়েদ (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালানিন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ৬৩১; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ, তা. বি.), পৃ. ৭৭৩।
- ২ জামাল উদ্দিন ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা. বি.) পৃ. ৪৯৬৭; শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আর-রাযী, মুখতারুস সাহা (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.), পৃ. ৭৪৫।
- ৩ আল্লামা রাগিব আল-আসপাহানি, মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন (দামেস্ক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৬৭০।
- ৪ ইবরাহিম আনিস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (ঢাকা: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৪৩৪ হি.) পৃ. ৭৬২।
- ৫ আবুল হাসান আল-কুদুরী, আল মিসবাহুন নুরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী, ২য় খণ্ড (ঢাকা: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ২৪৩।
- ৬ আবুল হাসান ইবনু সিদাহ, আল-মুখাসাস, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহয়ায়িত তুরাস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৭১।
- ৭ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বকর, দিরাসাতুন ফী উলুলমিল কুরআন (কায়রো: দারুল মানার, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪০৩।
- ৮ আহমদ ইবন ফারিস, মু'জামুল মাকায়িসীল লুগাত (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯খ্রি.) পৃ. ৬৫২।
- ৯ আল্লামা তাকি উসমানী, তাফসীরে তাওযীছুল কুরআন, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, তা.বি.), পৃ. ১৫৮।
- ১০ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বকর, দিরাসাতুল ফী উলুলমিল কুরআন, পৃ. ৪০৩।
- ১১ সুরা ইউনুস, আয়াত: ৫৩।
- ১২ ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, আল-বায়ান ফী উলুলমিল কুরআন (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৬খ্রি.), পৃ. ১৯৩।
- ১৩ সুরা হিজর, আয়াত: ৭২।
- ১৪ সুরা সোয়াদ, আয়াত: ১।

- ১৫ জালালুদ্দিন সুয়ুতী, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন* (কায়রো: আল-হায়'আতুল মিসরিয়্যাহ আল-'আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৫৯।
- ১৬ ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, *আল-বায়ান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৩।
- ১৭ আদনান মুহাম্মদ জুরজুর, *মাদখাল ইলা তাফসীরিল কুরআন ওয়া 'উলুমিহী* (দামেস্ক: দারুল কলম, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ২৮৬।
- ১৮ আবুল হাসান আল-কুদুরী, *আল মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৪৪।
- ১৯ আবু বকর আহমাদ আল-জাসাস, *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহয়্যাত তুরাস, ১৪০৫ হি.), পৃ. ১১১; আবু ওয়ালিদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, *বিদয়াতুল মুজতাহীদ ওয়া নেহয়াতুল মাকসাদ*, ১ম খণ্ড (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, তা. বি.), পৃ. ৩৪৮।
- ২০ জামাল উদ্দিন আয যাইলায়ি আল-হানাবি, *নাসবুর রায়াহ লি আহাদীসিল হিদায়াহ* (বৈরুত: মুয়াসসাতুর রাইয়ান, তা.বি.), পৃ. ২৯২।
- ২১ বুরহান উদ্দীন আল-মুরগিনানী, *আল-হিদায়াহ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৩১৭।
- ২২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনু: মাওলানা মহিউদ্দীন খান, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৯৬।
- ২৩ বুরহান উদ্দীন আল-মুরগিনানী, *আল-হিদায়াহ*, ২য় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩০৫।
- ২৪ ইয়াহইয়া ইবন আদিল আজিজ, *আল-জামি' বাইনাস সহীহাইন আল-বুখারি ও মুসলিম* (বৈরুত: ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৫৮।
- ২৫ সুরা মায়েদা, আয়াত: ৮৯।
- ২৬ বুরহান উদ্দীন আল-মুরগিনানী, *আল-হিদায়াহ*, ২য় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩০৫।
- ২৭ আবু মুহাম্মদ ইবন কুদামা আল-মাকদিসী, *আল-মুগনী*, ৮ম খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসাহ, তা.বি.), পৃ. ৬৮৮।
- ২৮ আবু বকর আহমাদ আল-জাসাস, *আহকামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬; মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৩য় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৬।
- ২৯ যয়নুদ্দিন ইবন নাজিম আল-হানাবী, *আল-বাহরুর রায়েক ফী কানযিদ দাকায়িক*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২খ্রি.), পৃ. ১০৮।
- ৩০ সুরা মায়িদা, আয়াত: ৮৯।
- ৩১ ড. আব্দুর রাহীম, *আল-ইয়ামীন ও কাফফারাতুহ* (মক্কা: হায়'আতুত তাদরীস, ১৪৩২হি.), পৃ. ১৭০।
- ৩২ ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, *ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০২০খ্রি.), পৃ. ৬৭।
- ৩৩ ইমাম আবু জা'ফর আত-তাবারী, *জামে'উল বায়ান*, ৭ম খণ্ড (কায়রো: মাতবা'আতু মুস্তাফা আল-বাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৮হি.), পৃ. ১৬; হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাহীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (বৈরুত: দারু ইবন হাজম, তা.বি.), পৃ. ৮৯।
- ৩৪ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি, *জামি' আত-তিরমিযি*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহইয়াই তুরাসিল আরবি, তা.বি.), পৃ. ৪৯০, হাদিস নং ১১৮৪।
- ৩৫ আবুল হাসান আল-কুদুরী, *আল মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৪৫।
- ৩৬ মাহমুদ ইবন উমার আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭হি.), পৃ. ৫২৮।
- ৩৭ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩২।
- ৩৮ সাফা আব্দুল্লাহ নায়িফ হারদান, *আল-ওয়াও ওয়াল ফা ওয়া ছুম্মা ফীল কুরআনিল কারীম* (ফিলিস্তিনি: জামি'আতুন নাজাহ, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১২০।
- ৩৯ মুহাম্মদ বকর ইসমাইল, *দিরাসাতু ফী উলুমুল কুরআন* (বৈরুত: দারুল মানার, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৩২৩।

-
- ৪০ ইবরাহিম ইবন আস-সারী ইবন সাহল আয-যুজাজ, মা'আনিল কুরআন ওয়া 'ইরাবিহী, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: 'আলিমুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ১২০।
- ৪১ সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৩।
- ৪২ ইবরাহিম ইবন আস-সারী ইবন সাহল আয-যুজাজ, মা'আনিল কুরআন ওয়া 'ইরাবিহী, ৩য় খণ্ড, প্রাপ্ত, পৃ. ১২১।
- ৪৩ সুরা আন-নূর, আয়াত: ৫৩।
- ৪৪ সুরা সোয়াদ, আয়াত: ৮২।
- ৪৫ ইবনু কাইয়ুম আল জাওজীয়াহ, আত-তীবইয়ান ফী আইমানিল কুরআন (মক্কা: দারু 'আলামি ফাওয়ায়িদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৯হি.), পৃ. ১৬।
- ৪৬ ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, আল-বায়ান ফী উলুলুমিল কুরআন, প্রাপ্ত, পৃ. ১৯৪।
- ৪৭ সুরা যারিয়াত, আয়াত: ২৩।
- ৪৮ সুরা ইউনুস, আয়াত: ৫৩।
- ৪৯ সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৮।
- ৫০ সুরা হিজর, আয়াত: ৯২।
- ৫১ সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫।
- ৫২ সুরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ৪০।
- ৫৩ সুরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭।
- ৫৪ সুরা সাবা, আয়াত: ৩।
- ৫৫ সুরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৬।
- ৫৬ সুরা আন-নাহল, আয়াত: ৬৩।
- ৫৭ সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ২।
- ৫৮ সুরা সুরা ছোয়াদ, আয়াত: ১।
- ৫৯ সুরা ক্বাফ, আয়াত: ১।
- ৬০ সুরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২।
- ৬১ সুরা দোখান, আয়াত: ২।
- ৬২ সুরা তুর, আয়াত: ২।
- ৬৩ মাহমুদ ইবন উমার আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাপ্ত, পৃ. ৪০৮।
- ৬৪ সুরা শামস, আয়াত: ১।
- ৬৫ সুরা আদ-দুহা, আয়াত: ১-২।
- ৬৬ সুরা শামস, আয়াত: ৩।
- ৬৭ সুরা আল-লাইল, আয়াত: ২।
- ৬৮ সুরা ফজর, আয়াত: ১।
- ৬৯ সুরা আত-তাকভীর, আয়াত: ১৮।
- ৭০ সুরা আল-মুদাসির, আয়াত: ৩৪।
- ৭১ সুরা আত-তাকভীর, আয়াত: ১৭।
- ৭২ সুরা আল-ইনশিকাক, আয়াত: ১৭।
- ৭৩ সুরা আল-ফাজর, আয়াত: ২।
- ৭৪ সুরা আশ-শামস, আয়াত: ৪।

-
- ৭৫ সুরা আল-লাইল, আয়াত: ১।
- ৭৬ সুরা আছর, আয়াত: ১।
- ৭৭ জালালুদ্দীন সুয়ুতী, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
- ৭৮ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা' আরেফুল কোরআন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১২।
- ৭৯ সুরা আশ-শামস, আয়াত: ১-২।
- ৮০ সুরা সিজদাহ, আয়াত: ৪।
- ৮১ সুরা যারিয়াত: আয়াত: ৭।
- ৮২ সুরা শামস, আয়াত: ৫ ও ৬।
- ৮৩ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, *আস-সহিহ*, (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ১৬৪, হাদিস নং ৬৬৪৬; আবুল হুসাইন ইবনে হাজ্জাজ, *সহিহ মুসলিম* (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৮০, হাদিস নং ৪৩৪৬।
- ৮৪ জালালুদ্দীন সুয়ুতী, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৭।
- ৮৫ প্রাগুক্ত।

Terrorism: A Theoretical Analysis in The Light of Islam

Mohidul Islam*

Abstract: Terrorism is not a phenomenon of recent years and the whole world is now in global threat for terrorists. Terrorism has different kinds and religious terrorism is one of them. Some knaves, conspirator and haters of Islam are misinterpreting the noble teachings of Islam and trying to fulfil their desires by the name of religious terrorism. But, every religion of the world hates terrorists and terrorism. Specially, Islam equates an illegal murder of a single man to the murder of all mankind. Islam is a religion of peace, comfort and reconciliation. The aim of Islam is to establish peace between man and the rest of Allah's creation. Islam abominates all kinds of crime, opacity, disorder and terrorist. It strictly prohibits Muslim never to become criminal and terrorist. Because, terrorist hampers all kinds of development. The effects of terrorism are devastating for any country and nations. Socio-economic and political causes are main reasons for terrorism. People need to find out the root causes of terrorism and exterminate those causes entirely from society.

Keywords: Terrorism, French Revolution, Statement of Islam, Devastating effects, Political conflict, Dangerous paw.

Introduction

Terrorism is the terrible disorder in the modern world that is destroying universal peace gradually. The paw of terrorists has been surrounded the earth like Octopus recently. Terrorism creates enmity among people. It scares the peaceful condition, horrify peace loving people, invade on the dignity and wealth of nation. It creates disaster and chaos in the whole world. Terrorist activities are being held in all countries of the earth. Terrorism is pushing the young society to destruction day by day. Some haters of Islam are blaming Islam as a religion of Terrorist. Eventually, the noble teachings of Islam always ensure the welfare of human beings. Islamic dictations are the greatest remedy for terrorism disease. People can save themselves by following the Islamic rituals from the dangerous paw of Islam. So, the vision of Islam about terrorism and some ways to annihilate terrorism have been flourished in this article according to logical reasoning.

Definition of terrorism

The Arabic term of Terrorism is- الإرهاب. The literal meaning of terrorism is violence, oppression, injustice, torment, fierceness, ferocity, cruelty, extreme fear etc. Its literal meaning is the use of violence and intimidation in the pursuit of political aims^১ or to force a government to act especially because of the fear it causes among the people.^২

The very word 'Terrorism' originates during the late eighteenth century from French 'terrorist' from Latin 'terror'. The word was originally applied to supporters of the Jacobins in the French Revolution, Who advocate repression and violence in pursuit

* M.Phil. Fellow, Department of Arabic, University of Rajshahi.

of the principles of democracy and equality.^৩ That means Terrorism is a broad concept that has its origins in the French Revolution of 1789.^৪

The researchers have come up with over 200 definitions to describe the phenomenon of terrorism; there is actually a growing consensus among scientists about its core meaning.^৫ The objective of terrorism is capturing of lands by bloodshed, usurping power, acquiring wealth and establishing supremacy and authority by plundering and killing people.

Zayd Bin Muhammad Bin Haadee Al-Madkhalee said,

الإِرْهَابُ كَلِمَةٌ مُبْنِيٌّ لَهَا مَعْنَى ذُو صُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ يَجْمَعُهَا الْإِخَافَةُ وَالتَّرْوِيعُ لِلْأَمِينِ،
وَقَدْ تَجَاوَزَ الْإِخَافَةَ وَالتَّرْوِيعَ إِلَى إِزْعَاقِ الْأَنْفُسِ الْبَرِيَّةِ وَاتِّلَافِ الْأَمْوَالِ
الْمَعْصُومَةِ أَوْ هَيْبِهَا، وَهَتَكَ الْأَعْرَاضَ الْوَصُونَةَ وَشَقَّ عَصَا الْجَمَاعَةِ^٦

“Irhab, terrorism is an established word that possess a lots of synonymous words.
As like as to horrify an innocent man, sometimes to kill a person by unlimited
scare, to destroy protected resources.”

It is said in the book name ‘Al Maosuatul Arabiyyahtul ‘Alamiyyah (الْمَوْسُؤَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْعَالَمِيَّةُ)

الإِرْهَابُ : إِسْتِخْدَامُ الْعُنفِ أَوْ التَّهْدِيدُ بِهِ لِإِثَارَةِ الرُّعْبِ^٧

“The terror is to be applied force for the scary or scare through force.”

Islami Fiqh Council guided by Rabitatul ‘Alami Al-Islami gives the following definition of terrorism. They said,

الْعُدْوَانُ الَّذِي يَمَارِسُهُ أَفْرَادٌ أَوْ جَمَاعَاتٌ أَوْ دَوْلٌ بِغْيَا عَلَى الْإِنْسَانِ دِينَهُ وَعَقْلَهُ وَمَالَهُ، وَعَرْضُهُ^٨

“Terrorism is the illegal practice of a person, organization or state against of the
religion, intellectuality, wealth and reputation.”

This definition includes policy out of fears and threats, losses, unjust murders, wrong deeds, illicit acts, invasion by weapons etc. Anarchy, Menacing, insecurity, chaos are highly focused in this enunciation. In another perspective, creating environmental disaster, destroying personal and national wealth, wrecking natural resources are also included in terrorism.

It is written in the new Encyclopedia Britannica,

“Terrorism: The systematic use of violence to create a general climate of fear among people and thereby to bring about a particular political objective.”^৯

That means terrorism is being organized in the world’s conscience for making a special political purpose. According to FBI (Federal Bureau of Investigation),

“Terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government. The civilian population or any segment there of in furtherance of political or social objectives.”^{১০}

In a definition, we find terrorism as “violence or the threat of violence directed against the public or a sector of the public with the intent of furthering sectarian or political goals which arises from the belief that terror is legitimate tool for change.”^{٥٥}

Terrorists create chaos for a particular purpose, they damage lives and resources, generate instability in the country and society, annihilate peace and security, destroy monuments and buildings, concern the citizen and finally create a threat to the freedom and sovereignty of a country.

In gist, Terrorism is a term that terrifies people and generates panic among them. On the other hand, Terrorists are those who are involved with misanthropist activities.

Types of terrorism

Many scholars in terrorism of the world have categorized terrorism in different kinds. Alex Peter Schmid, a former Officer-in-Charge of the Terrorism Prevention Branch of the United Nations distinguishes among five types of terrorism. These are: a) Social-revolutionary terrorism (left-wing), b) Right-wing and racist terrorism, c) Single issue terrorism, d) Nationalist and separatist terrorism (including ethnic terrorism), and finally, e) Religious terrorism.^{٥٦}

We find different types of terrorism. These are:

1. Civil terrorism , 2. Colonial terrorism, 3. State terrorism, 4. International terrorism, 5. Religious terrorism, 6. Cyber Terrorism

1. Civil terrorism: Civil terrorism is a collective violence interfering with the peace, security and normal functioning of the community. The terrorism that threatens the civil and social life of the people by criminal gangs. It is carried out by bandits and the like, looting money, shedding blood, and in manipulating people's lives and properties by the force of arms. Such crime is called in Islam (al-harabah: banditry), or (grand theft) to be distinguished from (minor theft) which is normal theft. Allah says,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{٥٧}

“The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world and a great torment is theirs in the hereafter.”

2. Colonial terrorism: Colonial Terrorism is occurred to grab the land and it attacks on sovereignty of a country. One country tries to dominate and rule another country by brutal force. And, when there is resistance by the occupied state, the occupying country begins killing and destroying properties in order to force the people of the occupied country to comply and surrender. This colonialism is either for settlement or for replacement purposes, planning for gradual genocide of the native population in order to replace them with the occupying people.

3. State terrorism: State terrorism defined broadly as terrorist acts carried out by governments in pursuit of political objectives, often as parts of their foreign policy. A state terrorizes its citizens or a certain group of them who has a different race, language, religion or beliefs. The state uses military force to suppress and conquer its opponents and try to exterminate them. In this regard, the Holy Quran mentioned the Pharaonic model, who terrorized (the children of Israel) through the annihilation of their males. Allah the almighty says,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.^{৪৮}

“Verily Fir’aun (Pharaoh) exalted himself in the land and made its people sects, weakening (oppressing) a group (i.e. Children of Israel) among them, killing their sons, and letting their females live. Verily, he was of the Mufsidin (i.e. those who commit great sins and crimes, oppressors, tyrants, etc.).”

4. International terrorism: International Terrorism involves violent acts or acts dangerous to human life. It violates the criminal laws of any state. It is very complicated kinds of terrorism. However, International Terrorism is the most dangerous type of terrorism because it is being committed at an international level. This type of terrorism is evident in most of the United States policy. The US wants all other countries in the world to approve their foreign policy and follow their motto “either you are with us, or you are with the terrorists”.^{৪৯}

5. Religious terrorism: The Muslims are required to be ready for their enemies and defend their home countries. They have to make every effort to protect their religion and their country and defend them. Thus, it is evident that the national resistance against the invaders is legitimate. No religion, law, moral norms nor international charters can deny it. Allah the Almighty says,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُلْفَئْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.^{৫০}

“And make ready for them whatever force you can and horses tied at the frontier, to frighten thereby the enemy of Allah and your enemy and others besides them, whom you know not, Allah knows them. And whatever you spend in Allah's way, it will be paid back to you fully and you will not be wronged.”

But knave, conspirator and haters of Islam are gaining their personal profit by the name of Religious Terrorism. The perpetrators must use religious scriptures to justify or explain their violent acts or to gain recruits. So, terrorist acts in the name of religion have become one of the most important security challenges we face. According some scholars in terrorism, Religious terrorism is a type of religious violence where terrorism is used as a tactic to achieve religious goals or which are influenced by religious identity. Indeed, no religion of the world support terrorists and terrorism.

6. Cyber terrorism: Cyber Terrorism defines a premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs and data which results in violence against non-combatant targets by subnational groups or clandestine agents. Cyber Terrorism refers the use of the internet to conduct violent acts that result in, or threaten, loss of life or significant bodily harm, in order to achieve political or ideological gains through threat or intimidation. It also sometimes considered an act of Internet terrorism where terrorist activities, including acts of deliberate, large-scale disruption of computer networks, especially of personal computers attached to the Internet by means of tools such as computer viruses, computer worms, phishing and other malicious software and hardware methods and programming scripts.

The statement of Islam about terrorism

Islam is the religion of peace, comfort, humanity and brotherhood. There is no place of terrorism in Islam. Islam has appeared to exterminate all kinds of terrorism, torture, depression and exploitation. This unique religion has established the flow of peace to keep the worlds humanity well.

If we studied al-Quran deeply it will be appeared that, Islam and Al-Quran does not support killing people in illegal way. Allah, The Most High narrates,

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ٥٩

“If anyone killed a person not in retaliation of murder or to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind.”

In another place of Al-Quran Allah declares,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٦٠

“And whoever kills a believer intentionally, his recompense is hell to abide therein, and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him.”

Allah, the most merciful says,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. ٦١

“And those who invoke not any other ilah (God) along with Allah, nor kill such life as Allah has forbidden, except for just cause nor commit illegal sexual intercourse and whoever does this shall receive the punishment. The torment will be doubled to him on the day of resurrection and he will abide therein in disgrace.”

Islam never indulge terrorism. only for *Fitnah*, the life and wealth, the prestige and reputation, the faith and religion are facing threat and catastrophe. On the other hand, human life is falling in hamper and going to astray only for *Fasad*. In the verse of Al-

Quran Fitna and Fasad refers terror and terrorist activities. Allah, the most magnificent says,

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۝

“Al-Fitnah (Terror) is worse than killing.”

Rather Islam teaches us to establish peace and comfort in society. Almighty Allah says,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

“And we did not send you (O dear prophet Muhammad (SAWS)) except as a mercy for the entire world.”

That is why, prophet Muhammad (SAWS) was very kind hearted and conscious to the peace of others. Prophet Muhammad (SAWS) has tried his heart and soul to eliminate terrorism from whole world before and after of his prophethood. If we study Quran and *Sunnah* with a lot of enthusiasm, we will comprehend that terrorism has been expressed by the words of *Fitna* and *Fasad*. ২২

Eventually, terrorism is nothing but chaos and anarchy in society and these are being created from threat and panic. Messenger Muhammad (SAWS) had taken a positive step to impede terrorist by setting up ‘Hilful Fuzul’ when he was 20 years old. The first point of his organization was “By Allah! We will help the oppressed person unitedly in Makka city against all tyrannies.” Thus he puts a supreme contribution to abrogate Makka city from injustice, illegitimacy, oppression and terrorism.

He was emigrated from Makka to Madina and started to live there peacefully. He made a peaceful treaty named ‘Medina Charter’ with other citizens of Madina specially with Jews. This charter with 47 articles is regarded as a unique document to prevent terrorism. ২৩

Medina Charter was the treaty of Muhammad, the Prophet (the Messenger of Allah) between the Believers and Muslims of the Quraish and the people of Yathrib, and between those who follow them and join them in fighting (the common enemy). And also that the Jews of the tribe of ‘Auf constitute an Ummah Wahidah with the Believers, even though the Jews will follow their own religion and the Muslims will follow their own; and this will include both their friends and themselves. ২৪

Al-Quran has urged every people to build a terrorist free earth. Almighty Allah says,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۝

“And do not do mischief (terror) on the earth after it has been set in order.”

Ibn Kathir said at the explanation of this verse,

ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماثية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك. ২৫

“Allah has forbidden to turmoil (terror) on earth after establishing peace there and ordered to stay away from disquieting activities. The disorders will be detrimental for people to work properly in a peaceful circumstances. For this reason, Allah The Most High has given an embargo to raise anarchy.”

Imam Kurtubi (R) said,

إِنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى نَهَى عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلٍ أَوْ كَثْرٍ بَعْدَ صَلَاحٍ قَلٍ أَوْ كَثْرٍ. ٢٩

“Allah has prohibited to originate more or less disorders (at globe) after forming there bitless peace.”

Allah the most high disfavors predominance of terrorism in universe. Allah the most merciful says,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ. ٣٠

“And when he turns away, he creates turmoil (terror) in the earth and destroys crops and lives and Allah is not pleased with turmoils.”

Terrorists are detestable to all. Allah says,

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. ٣١

“And those who break the pact of Allah after its ratification sever what Allah has commanded to be joined and spread turmoil (terror) in the earth, their share is only the curse and their destiny is the wretched abode.”

Islam has ordered Muslims to fight jointly against terrorism. The believers (Mu'mins) have declared this battle for saving faith. Allah himself states thus,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. ٣٢

“And fight against them until no mischief remains.”

Allah the most great announces about the gruesomeness of terrorism.

Allah says in the holy Quran,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ٣٣

“Sedition is tougher than murder.”

Terrorists want to prove themselves as a pacificator at society. Allah the most gracious says,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ٣٤

“And when it is said to them, ‘Do not turmoil (terrify) in the earth.’ They say, ‘We are only peacemaker’.”

Islam commands us to make a brotherhood and equality by overtopping terrorist and terrorism. Muhammad (SAWS) narrated,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. ٣٥

“Certainly, the blood of others, their properties and prestiges are strictly prohibited to you like this day, month and city.”

Islam does not approve bloodshed. Prophet Muhammad (SAWS) said,

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.^{৪৪}

“The person who kills a person under pact in the Muslim’s town will not get the fragrance of paradise although the fragrance of paradise is available in distance of forty years.”

Muhammad (SAWS) advised the warlord thus,

اغزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا.^{৪৫}

“In the name of Allah, fight on his way. Fight against the disbelievers of Allah. Don’t be angry and jealous with others. Don’t betray, break the treaty, perish the limb and finally don’t kill the children.”

Prophet (SAWS) told his companions not to kill the woman and children. So, we can say undoubtedly, Islam never cherish and support terrorism.

Root causes of terrorism

I shall successively deal with the following structural factors: poverty, democracy, inequality and oppression, education, globalisation and modernisation, and finally evil. In addition, I will distinguish four facilitators: state structure, state sponsorship, press freedom in democracies, and finally the radical interpretation of religion.^{৪৬} People think there are some factors that may contribute to terrorism:

- a) Poverty and high population growth rate
- b) Inequality and oppression
- c) Globalization and modernization
- d) Press freedom in democracies
- e) Radical interpretation of religion
- f) Political oppression
- g) Terrorist organization
- h) ICT and transportation technology
- i) Religion as a cause and catalyst for political violence and terrorism
- j) High Unemployment
- k) Lagging economies
- l) Political disenfranchisement
- m) Extremism
- n) Ethnic conflict
- o) Territorial conflict

Effects of terrorism

The effect of terrorism in the present world is devastating. There is not a single place or area which is free from the scar of terrorism. There is virtually no nation, large or small, rich or poor that is not affected by terrorism. Some effects of terrorism are given below.

- a) **Erosion of security:** Terrorism erodes at both the individual level and the community level, the sense of security and safety people usually feel. Terrorism challenges the natural need of human to see the world as predictable, orderly and controllable. Studies have shown that deliberate violence creates longer lasting mental-health effects than natural disasters or accidents.
- b) **Augment the cost of business:** The cost of all businesses worldwide has increased to include additional security and mail screening devices. The cost in lost productivity is immeasurable, as all business travelers now spend additional hours waiting in lines at airports.
- c) **Increasing security cost and decreasing revenues:** Terrorism creates an environment with increasing security costs and decreasing revenues. In many countries, extra security agents or police has to be assigned to cope with the increased task of combating terrorism.
- d) **Reducing tourism:** The fear form terrorist attacks has severely reduced the number of tourists in many countries particularly the small island countries. As a result, poor nations are being very badly affected.
- e) **Severe reduction in business:** The effects of terrorism on the developing countries are simply devastating and no amount of free trade agreements alone can offset this problem. Terrorism has severely reduced the potentiality of business in country and abroad.
- f) **Hinder national development:** Because of terrorism development works can not be implemented in many areas. Before implementation the security of the project and its workers need to be ensured. This delays he implementation of development projects.

The ways to overcome from the dangerous paw of terrorism

Terrorism is a curse and one of the major problems in recent world. Some befitting and necessary steps should be taken to prevent, resist and pass through the terrorism. It is impossible to eradicate terrorism by making rules but people can uproot this from society by the implementation and proper application indeed. People should not think that terrorism will be eliminated through the application of law and punishment. In most of the cases, socio-economic conditions and political causes are main reason of terrorism. So, firstly people have to find out the root causes of terrorism and need to uproot them. Secondly, they have to close the possible ways that pave the terrorist. Finally, government should launch special act to smash their heinous activities. The following measures may be taken to stop terrorism.

- a) **Poverty alleviation:** Poverty breeds criminals and terrorists. The government with assistance from donors and donor countries should take concerted efforts to eradicate poverty from society. If we can do this, terrorist and criminal activities will be reduced automatically.
- b) **Eradication of politics of conflict:** Political unrest, particularly politics of conflict is one of the main reasons for terrorist activities in our country. If we can solve this problem, it will reduce the problem of terrorism.
- c) **Good governance:** Good governance strategy includes the reduction of fraud, inefficiencies, inequities and corruption. This will ensure people's right thereby helping them to lead a peaceful and dignified life. If people are sure about their rights and privileges, this will change their mindset towards a positive attitude.
- d) **Ensure rule of law:** It is emergency to strengthen and make best possible use of law against terrorism on conflict prevention, negotiation, mediation, peacekeeping and peace building. The government has to ensure rule of law so that nobody is deprived of his/ her rights.
- e) **Employment opportunities:** Sometimes unemployment leads people to astray. So, if we can create new working places for the unemployment, terrorism will be removed from society. The government should put importance on taking development plans that will ensure more jobs for citizens. Once unemployment is reduced, it will create an environment which will automatically help to reduce terrorism.
- f) **Eliminations of party conflict:** All political parties should sit together and find out a solution to stop political conflicts through discussion among them. This will help to decline political terrorism.
- g) **Publications the consequences of terrorists:** People have to raise a religious, logical and scientific report of family, society and state's terrorist through electronic media and print media. They need to publish the detestable situation of terrorist according Quran and Sunnah.
- h) **Practice of religious provisions:** People should do proper practice of religious provisions in our personal, domestic and in social life. Children should be cared of by religious customs and practices from childhood. We have to teach them about the fear of almighty Allah in our family, society and in educational institution. People need to build up domestic and social resistance against terrorism.
- i) **Raising up religious values:** People need to exercise religious values against terrorism. Every religion hates terrorism and assures the punishment of terrorist. The sense and consequence of terrorism need to be awakened in heart of everyone.
- j) **Changing the mode of entertainment:** We need to arrange a new mood of well decorated and moral entertainment. After that, we have to create a hate to the

minds and thoughts of people against terrorism through proper education, literature and culture. We should arouse mildness to humanity, duties towards the countries and the nation, responsibility to other creations and promote a beautiful mentality.

- k) Banning the harmful sites of Internet:** All porn sites, nude and nastic pictures, amorous dailies and publications should be banned by government to protect the nation from the invasion of dirty culture.
- l) Enhancement the way of justice:** If the enemy and ally can be judged by equal justice then terrorism will be evicted to fully from society. Islam has shown us the way of justice and fairness. So, people need to impute the rules of Islam to eradicate terrorism.
- m) Creation of close network:** To further encourage non-governmental organization and civil society to engage, as we can enhance our efforts to implement our strategy against terrorist. People should come in one platform unitedly and implement their motto against terrorism without cast and creed and regardless of political views. In many cases, terrorist take the chance of inter conflict of politician in different parties. There may have the difference among political parties but they should work hand to hand against terrorist and the nation devastating activities.
- n) Ensuring human rights:** Measure to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis for the fight against terrorism.
- o) Condemnation of terrorism:** To consistently, unequivocally and strongly condemn terrorism in all its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes as its constitute one of the most serious threats to international peace and security.

Conclusion

Terrorism is a curse for mankind. It destroys the peace of mind as well as the peace of society. The overall economic development of a country is hampered due to terrorism. The negative effect of terrorism is devastating in the developing countries. It makes the poor countries poorer. The world communities are taking counter terrorism programs to stop it. Islam has given special emphasis to the reasons of terrorism and to resolve it. For this purpose, Islam has emphasized to prevent poverty, illiteracy, unemployment and moral degeneration. We can remove terrorism by implementing Islamic provisions and by raising up ethical values. We hope that one day the world will be free from the evil of terrorism and people will be able to live in peace. May Allah help us to build up an ideal and affluent nation, country and state that will be set free from terrorism.

Notes & References

- ^১ Judy Pearsall (Editor), *The New Oxford Dictionary of English* (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 1915.
- ^২ A. S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 1233.
- ^৩ Md. Mujahidur Rahman & Most. Dilshad Surma, "The virtual Position of Islam on Terrorism", *The Islamic University Studies (Part-A)*, Vol.13 (Kustia: Islamic University Press, June 2007), p. 259.
- ^৪ A. Giddens, *Sociology* (Oxford: Blackwell Publishers, 5th edition, 2006), p. 881.
- ^৫ T. Bjorgo, *Root Causes of Terrorism: Myths reality and ways forward* (New York: Routledge, 2005), p. 01.
- ^৬ Zayd Bin Muhammad Bin Haadee Al-Madkhalee, *Al-Irhab wa Atharuhu Fil Afrad Wal Mujtami 'ah* (Dammam: Daru Sabilil Mu'minin, 1st edition, 1418 H.), p. 10.
- ^৭ Shayakh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ash-Sheikh, "Al-Irhab Asbabuhu Wa Wasail Ul Ilaj", *Majallatul Buhuth Al-Islamiyah* (Saudi Arabia: Central Darul Iftah, Rajob- Shawal 1424 H), pp. 108-109.
- ^৮ *Ibid*, p. 114; Dr. Muhammad Kabirul Islam, *Jihad o Jangibad: Prekhit Bangladesh* (Rajshahi: Shamal Bangla Publications, 2010), p. 37.
- ^৯ *The New Encyclopaedia*, Vol. 11 (USA : 2002), p. 650.
- ^{১০} Forkan Ali, "Santrashbad: Khomotar Laraiyer Hatear", *Daily Inqilab*, 25 June, 2007, p.14.
- ^{১১} Joy Robert Nash, *Dictionary of Crime, Criminal Justice, Criminology and Law Enforcement* (New York: Paragon House, 1992), pp. 386-387.
- ^{১২} A.P. Schmid, *Root Causes of Terrorism* (New York: Routledge, 2005), p. 224.
- ^{১৩} Surah Al-Maidah, 5: 33
- ^{১৪} Surah Al-Qasas, 28: 4.
- ^{১৫} Dr. Baker S. Mawajdeh, "The Culture of Peace and the Prevention of Terrorism from the Perspectives of Islamic Education and the United Nations", *Journal of Education and Practice*, Vol.8 (Jordan: Ministry of Education, Hashemite Kingdom of Jordan, 2017), p. 52.
- ^{১৬} Surah Al-Anfal, 8: 60.
- ^{১৭} Surah Al-Maidah, 5: 32.
- ^{১৮} Surah An-Nisa, 4: 93.
- ^{১৯} Surah Al-Furqan, 25: 68-69.
- ^{২০} Surah Al-Baqarah, 2: 217.
- ^{২১} Surah Al- Anbiya, 21: 107.
- ^{২২} Dr. Md. Shofiqul Islam, "Samajik Srinkhola Binoster Karon: Islami Dristite er Protikar", *University Journal of Arts and Law*, Vol.35 (Rajshahi: Rajshahi University Press, 2007), p. 300; Dr. Muhammad Mahbubur Rahman, *Akhlaq o Noitikota: Islami Dristivongi* (Dhaka: Islami Foundation, 2018), p. 325.
- ^{২৩} Dr. Md. Shofiqul Islam, *op.cit.*, p. 300.
- ^{২৪} Abul Fida Ismail Ibn 'Umr Ibn Katir al Quraissy, *Al-Bidaya wan nihaya*, Vol.3 (Riyadh: Maktabatul Falah, ND), pp. 224-226.
- ^{২৫} Surah Al- Araf, 7: 56.
- ^{২৬} Ibn Kathir, *Tafsirul Quranil Azim*, Part-2, (Dhaka: Islami Foundation Bangladesh, 4th ed. 1413 H.), p. 231.

-
- ۛۛ Muhammad Ibn Ahmed Al-Kurtubi, *Al-Jamiee Li Ahkamil Quran*, Part-7, (Bairut: Darul Fiqr, 1995), p. 145
- ۛۛ Surah Al- Baqarah, 2: 205.
- ۛۛ Surah Ar-Rad, 13:25.
- ۛۛ Surah Al- Anfal, 8: 39.
- ۛۛ Surah Al-Baqara, 2: 191.
- ۛۛ Surah Al-Baqara, 2: 11.
- ۛۛ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari*, (Kayro: Maktabatus Safa, 2003), Hujjatul Biday, Hadith No. 4051; Muslim Ibnul Hajjaj Al-kushairi, *Sahih Muslim*, Babu Hajjatun Nabiya (SAWS), Hadith No. 2137.
- ۛۛ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari*, Vol. 4 (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyaah, N.D), Hadith No. 3166.
- ۛۛ *Sahih Muslim*, Babu Ta'mirul Imamil Amr, Hadith No. 3261.
- ۛۛ Chris Jan Geugies, *The Origins of Terrorism: a comparison between the international anti-terrorism strategies of the USA and the Netherlands* (University Press: University of Twente, Enschede, Netherlands, 2007), p. 21.

***Ikhtilāf* (Disagreement) in Islamic Jurisprudence: An Analytical Study**

Dr. Md. Rafiqul Islam*

Abstract: The juristic disagreement (*Ikhtilāf*) among the jurists on various aspects of Islamic laws is an accepted matter in the traditional Islamic jurisprudence. In fact, disagreement normally takes place at the time when the jurists do not have any clarified provision on debatable matters. So, they have to apply independent judgment (اجتهاد) in finding a solution to a legal question for which there is no direct guideline in the Qur’ān or *ḥadīth*. Usually, juristic disagreement occurs among the jurists due to their mental capabilities and talents, different understanding and interpretation of the legal texts, different juristic methodologies and principles of *Usul al-Fiqh* as well as some factors related to *ḥadīths*. This paper is a humble attempt to explain the mentionable reasons for disagreements among the jurists along with some concluding remarks.

Introduction

Fiqh (Islamic Jurisprudence) was not recorded in written form in the lifetime of the Prophet (sm), and none conducted any research in this regard then. Like in the Prophetic period, *fiqh* was not codified in the period of the Companions.¹ Nevertheless, juristic dealings continued to be discussed and realized. After the death of the Prophet (sm), the Companions had to embrace the responsibility to lead the Muslim community in the divine as well as earthly issues. New sort of problem was encountered by people and they required creative solutions. If on a certain problem, any instruction could be found in the holy Qur’ān or in the *Sunnah* of the Prophet (sm), there could be no problem. But, new issues and situations continued arising and relating to them there was guidance neither in the Qur’ān nor in the *Sunnah*. On such situations, the Companions tried every possible means to base their solutions on the dictum of the Qur’ān and the *Sunnah*. However, on many occasions, they could not find any instruction relating to the matter in question in the Qur’ān or in the *Sunnah*. As a result, they had to construct decisions on such issues as per *Ijtihād* as well as personal viewpoints.² Similarly, the *tābi’ūn* learnt *fiqhī* rulings from the Companions. Hearing the *ḥadīths* from them, the *tābi’ūn* preserved it with their opinions for using them in their *fiqhī* rulings. They preferred the decrees of one Companion to that of the other and sometimes abandoned their *ḥadīths* considering weak.³ In this situation, they solved the arisen problem according to their *Ijtihād*. Thus, they formed individual *Madhhab* in their own cities.⁴ We have witnessed how the four schools of Islamic Jurisprudence (*Madhhab*) had finally founded themselves in the Muslim world all over. It is reported that both in the present time and the olden time there are and were people to criticize the schools of jurisprudence. However, these four schools neither oppose one another nor nurture any dogmatic stand about them. According to Shaykhī Muḥammad Zāhid al-Kawthārī (d. 1952), the jurists do have agreement on

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi.

two-thirds of the issues at least.^৫ Nicholas Aghnides states that though the schools hold different stands regarding the applications of the rulings, they basically follow the same principles, which he regards as multiple paths leading to the same destination.^৬

In fact, many scholars believe that the disagreement among the Muslim jurists is nothing but a blessing which is also asserted by ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz who states, “I don’t desire and wish that the Companions of the Prophet (sm) don’t disagree. If there was only one view, people’s idea on Islām would have been restricted and limited. In fact, these people with disagreement are scholars who ought to be followed. If a person followed any one of them, it means he followed the *Sunnah*.”^৭ Even though disagreement is acceptable considering its importance for the dissemination of Islamic learning, it is not always welcome, for when disagreement goes beyond the normal level and is not based on valid ruling, it becomes a problem. I will endeavor to discuss some of the most important reasons for disagreement amongst the Jurists without restricting these differences to a specific era or stage.

a. The Definition of اختلاف

اختلاف (*Ikhtilāf*) is an Arabic word. It is an infinitive noun (مصدر) of verb, like اجتنب, which is used from the conjugation (باب) -افتعال. Etymologically, the word اختلاف comes from the root ف-ل-خ, which means originally to replace or to succeed,^৮ as Allāh says, فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب, “i.e. And there has succeeded them or came after them an evil posterity who inherited the Book.”^৯

It is used in Arabic from the same root several times in different variations and conjugations (باب) for several meanings. For example, (a) (بعده) behind or after; As Allāh says, (i) يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم “i.e. He (Allāh) knows what appears before them and after them.”^{১০}

(ii) It is also said in Arabic, خلف الليل النهار, “i.e. the night followed or came after the day.”^{১১} This meaning can also be found in the Qur’ān; as Allāh says, “وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِّمَنۢ يَّرَادُ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا”-i.e. and it is He Who has made the night and the day in succession for whoever desires to remember or desires gratitude.”^{১২} Night comes after day and takes its place, just as day comes later and takes place of night.

(b) (خلاف او مخالف) contrary side, opposite side; as Allāh says, أَوْ نَقُطِعْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ, “i.e. or their hands and their feet shall be cut off on opposite sides.”^{১৩}

(c) اختلاف means to differ in opinions, as Allāh says; “إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ”-i.e. the Religion before Allāh is *Islām* (submission to His Will); nor did the people of the Book dissent there from except through envy of each other, after knowledge had come to them.”^{১৪} There is correct and incorrect understanding in the difference of opinions. The one who has come to a

correct understanding gets rewarded just like the one who has come to an incorrect conclusion, as they both honestly tried to reach the truth of the matter.

(d) It is accessible that اختلاف proceeds among Muslims, but Allāh monitor them to the righteousness as long as they chase it from Him, the almighty Allāh says; **فَهْدَى** -i.e.—... **اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** Allāh by His Grace guided the believers to the truth, concerning that wherein they differ and Allāh guides them on the right path whom He wills.”¹⁵

So, we can say that اختلاف means to differ or vary, which especially signifies differences of opinion on religious matters among the jurists (فقهاء) or among the legal doctrines and schools (مذاهب). Such diversity is permissible as long as the basic principles of *Islām* are not affected. اختلاف is thus the opposite of اجماع (consensus).¹⁶ The existence of اختلاف on a given issue permits Muslims to choose the interpretation of religious teachings that best suits their own circumstances and causes the least harm. Two famous sayings from *ḥadīth* in favour of اختلاف were attributed to the Prophet Muḥammad (sm); viz., (i) “اختلاف امتي رحمة للناس” -i.e. the difference of opinion among the (my *Ummah*) community is a blessing”¹⁷ and (ii) “اختلاف اصحابي” -i.e. the difference of opinion among the Companions is a blessing for my community.”¹⁸

اختلاف thus enabled the emergence of four equally orthodox legal schools: the Mālikī, the Ḥanafī, the Shāfi‘ī and the Ḥanbalī, within each of which there have been diverse interpretations of the same religious texts. Disagreements among Muslim theologians usually focus on details of legal practices, which, though relatively minor when compared with the great doctrines of the faith, are nevertheless most relevant to everyday life.

(b) The Major Causes of Disagreements among the Jurists are as follows.

1. The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to the kind of people and their inherent differences

Allāh has created differences between human beings in their mental capabilities and talents, their languages and experience, their perceptions and thoughts. All these naturally give rise to a multiplicity and variety of opinions and judgments. Therefore, the ability to differ is a manifestation of the creative power and wisdom of Allāh. It is insurance against rigidity and works for diversity. Differences open minds into thinking in new ways to stimulate intellectual growth and development. And this has served as an engine of progress for the human civilization. Allāh says in the Qur’ān; **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَنِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا** “... **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَنِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا**” -i.e. and if Allāh willed, he would have made you one nation, but He intended to test you in what He has given you; so race to good. To Allāh is your return all together and He will then inform you concerning that over which you used to differ.”¹⁹ He said elsewhere in the Qur’ān, **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً** “... **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً**”

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ i.e. and if your Lord had willed, He could have made mankind one nation, but they will not cease to differ.”^{২০} From the aforementioned verses we can understand that being different is by Allāh’s design. Despite failing to understand the real meaning of the text, they continue to defend them. This could be due to various forms of vice, such as arrogance, vain desires (الهيوى), competition, boastfulness, tyranny and sadism etc. Allāh says, “وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ” i.e. And none differed over the Scripture except those who were given it, after the clear proofs came to them out of jealous animosity among themselves.”^{২১} In addition to these, ignorant people sometimes talk about things that they have no knowledge of.

Today, ignorance about *Islām* is one of the most leading causes of differences among the Muslims. The Muslim has been under a persistent attack internally and externally, and the values and teachings of *Islām* have faded out from the Muslim hearts.

Differences among people cannot be and will not be eliminated. Therefore, we have to make our differences and disagreements of opinion to the advantages of the *Ummah*. To differ and disagree is only natural, but the way we differ, is a matter of attitude and discipline.

2. The *Ikhṭilāf* (Disagreement) due to the different understanding and interpretation of the Legal text

The differences over explanation were known during the lifetime of the Prophet (sm), and those questions which were drawn to his attention were clarified by the Prophet (sm) himself. But the Muslim scholars have noted many examples from the primary texts i.e. the Qur’ān and the *Sunnah* on which no clear information is recorded from the Prophet (sm) or his Companions and the issue therefore remained subject to explanation which causes disagreement. For example;

(a) Use of (المشترك) homonyms in the legal texts

Disagreement over the meaning of a word may be due to the occurrence of homonyms which carries more than one meaning that can sometimes be opposite to one another. As a result, same word would provide different interpretations at different times and to different people. These words are called (المشترك) Homonym. Al-Qur’ān possesses many texts having homonyms that offer disparate connotations to the Companions and the jurists. For example; (i) The word فُرُوء in the verse وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (i.e. A divorcee should keep herself for three *Qurū*)^{২২} has more than one meaning which means both purification and menstruation or the period of bleeding during a woman’s menses. The text in question is concerned with the waiting period (عدة) of a divorced woman, which she must observe before she marries again. Her عدة consists of three فُرُوء, which could mean either three menstruations (حيض) or three clean periods (طهر) between two menstruations.

The latter meaning would actually imply four menstruations and, therefore, a longer waiting period. The Companions differed over this and some among them, including

‘Uthmān b. ‘Affān, ‘Ā’ishah and Zayd b. Thābit ® took the latter meaning whereas ‘Umar b. al-Khaṭṭāb and ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd ® took the former. The *fuqahā*’ of ‘Irāq, including the Ḥanafīs, have followed ‘Umar’s ® interpretation whereas the majority of the *fuqahā*’ of Hijāz, including the Shāfi‘īs have followed ‘Uthmān and ‘Ā’ishah, and the *Ikhtilāf* has remained unresolved till now.

(ii) It is noted that *ḥadīth* also contains such words which signify more than one meaning. For example; The Prophet (sm) said concerning divorce, “لا طلاق ولا عتاق” (In some manuscripts, the word غلاق comes instead of إغلاق). The word إغلاق has more than one meaning which denotes both anger and duress. *Imām* Abū Dāwud (rh) explains that the word إغلاق may mean anger.^{٣٩} So, the meaning of the *ḥadīth* will be “The divorce and manumission given in the state of anger will not occur.” Some Ḥanbalī scholars have taken the meaning of *Imām* Abū Dāwud (rh) and on the basis of this, opined that divorce pronounced in a state of anger does not occur.^{٤٠} However, many scholars have rejected this meaning by stating that people normally divorce their wives in the state of anger. If divorce does not occur in the state of anger, every person will claim, “I was angry when I gave divorce, so my divorce should not count.” On the other hand, the divorce given in anger or in the state of anger occurs according to the majority (جمهور) of *fuqahā*’. *Imām* Bukhārī (rh), in his *Jāmī*, has included a heading which contains “باب الطلاق في الإغلاق”. The great expositor of *Ṣaḥīḥ* al-Bukhārī Badr al-Dīn al-‘Aynī (rh) declares that through the inclusion of this, *Imām* Bukhārī wants to object to those who hold that divorce in the state of anger does not occur.^{٤١}

(b) Use of words in (الحقيقي) real meaning or (المجازي) metaphorical meaning in the legal text: The word of the text may sometimes denote both a literal and a metaphorical meaning, and there are instances of this in the Qur’ān. For instance, in the context of ritual cleanliness, the ablution (وضوء) that is taken for obligatory prayers is normally vitiated in various ways, including physical contact with members of the opposite sex. The words that are used in the Qur’ān are “أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ” ... تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ” i.e. Or when you touched women and find no water, then seek sacred soil and wipe over your faces and hands with it.”^{٤٢} The Ḥanafīs understood the word لَامَسْتُمُ to mean sexual intercourse, whereas the Shāfi‘īs maintained both the literal and the metaphorical meanings of the word which means that وضوء is broken not only by sexual intercourse but also by a mere touch or handshake with the member of the opposite sex.^{٤٣} The *Ikhtilāf* of this question has also remained unresolved ever since.

(c) Differences of opinions due to variant readings (اختلاف القراءات)

Due to the exactness and correct spelling of Arabic word or even the diacritical mark on the last letter of the word also contribute to the emergence of disagreement among the scholars.

An appropriate example of the above mentioned phenomenon is as Allāh says (i) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ -i.e. ‘O you who believe ! when you prepare for prayer (الصَّلَاةِ), wash your faces and your hands up to the elbows, and rub your heads, and your feet up to the ankles.’^{২৮} The last letter of the word أَرْجُلَكُمْ when read with a *fataḥ* signifies the meaning that you have to ‘wash your feet’ whereas when read with a *kasrah* means that you have to rub your feet. Ḥādrat Nāfi‘, Ibn ‘Āmir, Ya‘qūb, al-Kisā’ī and Ḥafṣ ® read the reference to feet as أَرْجُلَكُمْ (with a *fataḥ*) while Ibn Kathīr, Abū ‘Amr and Ḥamzah (rh) read it as وَأَرْجُلَكُمْ (with a *kasrah*).^{২৯} Consequently, the different recitations lead to variations of opinion among the *fuqahā*’ over whether the feet should be washed or rubbed. The majority of the *fuqahā*’ (جمهور) interpret that washing is required, while the Imamites (Shi‘ah) maintain that rubbing feet is mandatory. The Zāhiris say that the feet should be subjected to a combination of washing and rubbing, while Ibn Jarīr (rh) thinks that it is a matter of choice.^{৩০}

(ii) Similar example exists in *ḥadīth* also, as it is reported that the Prophet (sm) said, “ ذِكَاةُ الْجَنِينِ ذِكَاةُ امَةِ -i.e. the slaughtering of the fetus is the slaughtering of the mother.”^{৩১} If a sheep is slain in accordance with the proper Islamic regulations and out of its womb we find a dead lamb or fetus, will it be allowed for us to eat this with or without slaughtering the latter?

The last letter of the word ذِكَاةُ when read with a *dhammah* gives the meaning that the fetus does not have to be slaughtered separately, whereas when read with a *fataḥ* means that it needs to be slaughtered. Sufyān al-Thawrī, Ibn al-Mubārak, Imām Aḥmad and Imām Shāfi‘ī (rh) supported this view,^{৩২} while the other jurists would consider slaughtering the fetus mandatory before its being consumed, which was maintained by Imām Abū Ḥanīfah (rh).^{৩৩}

(d) The Qur’ānic word relevant to command (الأمر) and prohibition (النهي) may convey either an obligation (الوجوب), a mere recommendation (الندب) , or even a permissibility (الإباحة)

(i) It is common knowledge that a direct imperative verb (الأمر) often indicates a command to fulfill an obligation and the negative imperative verb (النهي) indicates prohibition. Similarly, these imperative forms of verb of the Qur’ānic language, however, are not always used in this absolute sense. A word may occur in the imperative mood and it may convey either a obligation (الوجوب), a mere recommendation (الندب), or even a permissibility (الإباحة), which is far removed from the idea of a command. Thus the Qur’ānic word فَاكْتُبُوهُ is a command to the believers who give or take credit to ‘set it down in writing’ is regarded as offering guidance and advice. This command (الأمر) is linguistically a command but documentation here is generally held to be only recommended (الندب), not obligatory. Only the Zāhiriyyah have held that the text here conveys an obligation and have consequently made documentation a requirement of every loan and deferred

transaction. We also read in the Qur'ān command forms such as “كلوا واشربوا” –i.e. eat and drink”^{٧٩} which conveys permissibility (الإباحة) only. For eating and drinking are the necessities of human life and a command in respect of them must be logically allowed. Similarly, the command in respect of hunting with reference to the *Hajj* ceremonies provided in the Qur'ān, “وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا” –i.e. and when you come out of *Ihrām*, then you hunt.”^{٨٠} The words in both these examples only convey permissibility even though they are in the imperative mood.^{٨١} As already mentioned, the majority of ‘*Ulamā*’ (جمهور) have held that a command (الأمر) generally conveys an obligation (الوجوب) unless there are indications to suggest otherwise.

(ii) Likewise, prohibition (النهي) is the opposite of a command. The typical form of a prohibitory order in Arabic is that of negative command. A prohibition may convey a variety of meanings. Primarily, a direct prohibition (النهي), the negative imperative in the Qur'ān, may either convey a total ban, which is normal meaning of a prohibition, as Allāh says, “وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا” –i.e. don't get adultery,”^{٨٢} or encourage abstinence from acts which are improper or disliked, as Allāh says, “لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَنَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ” –i.e. do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to certain categories of the disbelievers.”^{٨٣} An example of Prohibition (النهي) which conveys a reprehension (كراهية), or moral guidance (إرشاد) in avoiding undesirable curiosity, as Allāh says, “لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ” –i.e. don't ask about things which, if they are shown to you, will distress you,”^{٨٤} and also it indeed conveys a host of other meanings, and the precise import of the words of the text is often determined by reference to supportive evidence in the Qur'ān itself or the *ḥadīth*, and the *fuqahā* have differed in their opinions. Some have held that illegality (تحريم) is the primary meaning of *nahī* while others consider reprehension (كراهية) to be the original meaning of it.

(e) The Differences of opinions due to Isolated (الشاذ) method of recitation

There are various modes and methods in which the Qur'ān can be recited. Some methods are well established while others are not. Those methods which are not so well established are known as شاذ or isolated modes of recitation. Some scholars accept شاذ recitation as sufficient enough proof to establish a ruling while others stand to differ. The *fuqahā* who accept the usage of شاذ methods of recitation as a means of establishing any ruling will differ from those who will not accept it. For instance: Allāh says in the Qur'ān concerning keeping fast of *kaffārah* due to breaking an oath; “فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ” –i.e. however, if someone cannot afford a slave, he has to fast for three days. That is expiation for the oaths that you have sworn.”^{٨٥} This is the normal famous *qira'ah* of the verse. It is difficult to understand from the verse that either he has to fast three consecutive days or not. However, ‘Ubay b. Ka‘ab ® recited as “فصيام ثلاثة أيام متتابعات” –i.e. he has to fast for three consecutive days.”^{٨٦} On the basis of this *qira'ah*, *Imām* Abū Ḥanīfah (rh) opined that he will have to fast three consecutive days whereas those who do not accept this they will not do so.^{٨٧}

(f) The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to disparate interpretation of a legal text

One example of this would be the differences of opinion among the Companions over the division of won land when the Muslim soldiers conquered ‘Irāq and Egypt. The distribution of the won-land became an unsolved issue. ‘Umar ® wanted to distribute the land to its original owners on whom land tax (خراج) would be imposed and the collected tax would be used for the betterment of the Muslims, while others opined that the land should be distributed among the soldiers.

This disagreement happened because of their disparate understanding and interpretation of two Qur’ānic texts regarding to the issue. The Qur’ān states, “وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ -i.e. And (you) know that out of all the booty (الغنيمة) that you may acquire (in war) a fifth share is assigned to Allāh and the Messenger and to near relatives, orphans, the needy and the wayfarer.”⁸⁸ ‘Umar ® regards that this verse presents a general rule which is validated by the following: “وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -i.e. And those who came after them say; our lord; forgive us, and our brethren who came before us with belief.”⁸⁹

‘Umar ® interpreted the word الذين in this *ayah* as a linking participle to the previous *ayah*, namely, “مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ -i.e. Again Allāh declares, “What Allāh has bestowed on his Messenger and taken away from the people of the township belongs to Allāh, to his Messenger.”⁹⁰ ‘Umar ® regards these two verses related as both of them delineate the same subject matter which is why the former (8:4) is validated by the latter (59:10). Nevertheless, most of the Companions did not agree with ‘Umar’s ® point of view and in contrast, they proposed that both of the verses mentioned above deal with dissimilar phenomena; the former (8:4) talks about (الغنيمة) booty while the latter (59:10) sheds light on *al-Fa’y*. As such, majority of the Companions thought that the conquered land should be distributed among the soldiers. This was an instances of *Ijtihād* by ‘Umar ® and by those who differed with him in their understanding of the text.

(g) The Differences of opinions due to grammatical meanings

There were some certain grammatical constructions to Arabic which were ambiguous. For example; the word إلى could simply mean ‘up to’ but not including, as in the case of the Qur’ānic verse “فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ” -i.e. then wash your faces and your forearms up to the elbows.”⁹¹ *Imām* Ju‘far, Ibn Dāwud al-Zāhirī along with some Mālikī scholars interpreted this verse to mean “up to” but not including the elbows. On the other hand, the four *Imāms* also interpreted the verse to mean “up to” including the elbows.⁹²

3. Several factors related to *ḥadīth* which causes *Ikhtilāf*

Most of the juristic differences among the early scholars can be traced back to the narration of sayings attributed to the Prophet (sm). Some reasons for disagreements concerning *ḥadīth* are as follows:

(a) The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to absence of information of a *ḥadīth* on the issue

(i) It happened that the Companions resorted to *Ijtihād* due to their own experience or ignorance regarding a particular ruling on a specific matter. For instance, if a Companion was aware of the verdict relating to a certain phenomenon, he would implement that, while if a Companion did not have any idea of that very verdict regarding that certain topic, he would effectuate *Ijtihād* which many a time concurred with the *ḥadīth*, and sometime might not have done so. Sometimes it occurred that a certain Companion might not have been aware of the *ḥadīth* on a particular issue at all. Thus, it is obvious that the scholars were different in terms of their possession of the knowledge of the *Sunnah*, for not every single *ḥadīth* reached every single *Mujtahid*. It is reported that Ibn Mas'ūd ṛ was asked about the alimony (مهر) of a widowed woman whose husband had passed away without sharing the bed with her. Concerning this matter, he was not aware of any ruling from the Prophet (sm). This continued for one month and after persistence from the people, he ṛ ruled that she would be given alimony (مهر) equivalent to the women of her social standing. She had to complete her waiting period and receive her inheritance.⁸⁵ On the incident, Ma'qil b. Sinān ṛ said, “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا” i.e. the Prophet (sm) had provided the same verdict on an identical incident concerning Barwa' bint. Wāshiq ṛ as you did.” Hearing this Ibn Mas'ūd ṛ was overwhelmed with joy since he did fortunately follow the principle of the Prophet (sm) in the same case.⁸⁶

(ii) In another case, it is reported that Abū Hurayrah ṛ said, “مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا” i.e. whoever wakes up from sleep with *janābah* (*janābah* is a major impurity on account of sexual intercourse requiring a *ghusl*) cannot carry on with his fasting. Hearing this, 'Ā'ishah and Umm Salmah ṛ, the pious wives of the Prophet (sm), objected saying, “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ” i.e. the Prophet (sm) would remain *junubī* up to morning, then he would bathe and continue to fast.” When Abū Hurayrah ṛ was told of what they said he ṛ immediately amended his former opinion and said, “هَمَا أَعْلَمُ” i.e. they know better.”⁸⁷

(b) The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to doubt over the authenticity of a *ḥadīth*

The prerequisites and requirements for a *ḥadīth* to be authentic also made the scholars differ from one another. The uninterrupted flow of transference is imperative to prove a *ḥadīth* as authentic. The jurists disagreed over the practical use and realization of this prerequisite. One example is concerning the living expenses of a woman who has been finally divorced. 'Umar's ṛ view was that she should have lodging and

maintenance (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ), on the facts of the Qur'ānic injunction: “أَسْكِنُوهُمْ مِنْ” -i.e. let them live in the same style as you live.”^{৫২} Then he ® learnt the *ḥadīth* narrated by Fāṭimah bint. Qays ® stating that the Prophet (sm) neither permitted maintenance (النَّفَقَةُ) to her nor lodging (السُّكْنَى) after she had received three *ṭalāqs* (divorces). ‘Umar ® rejected it for it being contrary to the text of the Qur’ān. However, he ® was not convinced by her words and said, “لَا نَتْرُكُ كِتَابَ” -i.e. I will not abandon the book of Allāh and the *sunnah* of our Prophet (sm) for the words of a woman about whom I do not know (whether she is telling the truth or lying) whether she has remembered correctly or forgotten.”^{৫৩} Then he ® recited the verse of the Qur’ān, “لَا تُخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِهِمْ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ” -i.e. do not expel them from their houses, nor shall they leave unless they are guilty of open lewdness.”^{৫৪} Actually ‘Umar ® doubted the authenticity of the *ḥadīth* and consequently disagreement arose, with some people saying that she should have her expenses and others maintenance (السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ).

(c) The differences of opinions due to different wordings of a narration (اختلاف الرواية)

Sometimes there are different wordings of a narration which occur disagreement among the Jurists. Different scholars took different wordings which led to variation in opinions. An example of this reason is as follows: Abū Hurayrah ® narrates that the Prophet (sm) said regarding prayer upon the deceased, “من صلي علي جنازة في المسجد فلا” -i.e. whoever prays over a deceased in the mosque, then there is nothing against him.”^{৫৫} Other narration contains the wordings; “فلا شيء له” -i.e. then there is nothing for him.”^{৫৬}

Those scholars who take the wordings of “فلا شيء عليه” permit *ṣalāh* on the deceased in the mosque. On the contrary, those who take the wording “فلا شيء له” disapprove of *ṣalāh* on the deceased in the mosque. There is a minor difference between له and عليه in Arabic which causes differences in opinion among the Jurists. This is one narration, from one *ṣaḥābī* with the difference of just two letters yet the whole ruling changes. Nobody changed any narration on his own accord, rather this is how the *ḥadīth* was narrated.^{৫৭} From this we can see how complicated the Arabic language is. This leads us to another reason of why we have differences of opinions.

(d) The *Ikhṭilāf* (Disagreement) due to contradictory reports of *ḥadīths* on the same issue

There textual variations in versions of the same *ḥadīth* may cause differences among the jurists. Furthermore, some scholars may receive a *ḥadīth* which has a consistent internal meaning whereby it is possible to get a good understanding of its intended sense. Others are not so fortunate and their understanding of the *ḥadīth* will be a variance with the intended sense. (i) One example of this is a *ḥadīth* in which the Prophet (sm) stated, “إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَنْكَحُ” -i.e. The *Muḥrim* shall not marry or be

married (in the state of *Muḥrim*).^{٥٦} This is contradicted by the *ḥadīth* narrated by Ibn ‘Abbās ®, “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ”, i.e. the Prophet (sm) married Maymūnah ® in the state of *Muḥrim*.^{٥٧} The Majority scholars (جمهور) endorse the first *ḥadīth*, while Abū Ḥanīfah (rh) regards marriage as being permissible on the basis of Ibn ‘Abbās’s ® report that the Prophet (sm) married her (Maymūnah ®) in the state of *Muḥrim*. The jurists differ over this question on the basis of which of the two reports should be accorded preponderance.

(ii) *Mut‘ah* was allowed for the Muslims till the war of *Khaybar*. Then on the occasion of *Khaybar* war, the Prophet (sm) prohibited it. It is reported that Ibn ‘Abbās ® said, “إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ”. i.e. The Prophet (sm) forbade from *mut‘ah* and eating the meat of domestic donkey on the war of *Khaybar*.^{٥٨} Later on, the permission for *mut‘ah* was resumed again on the war of *Awṭās* (أَوْطَاسَ) yet was stopped soon. As Ibn Hajar (rh) narrated it on the reference of *Imām* Muslim, “رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى”, Ibn ‘Abbās ® opines that the permission for *mut‘ah* has been granted because of exigency and the needs of the situation when the exigency concluded the permission is stopped. The majority hold that the Prophet (sm)’s permission of *mut‘ah* was *mubāḥ* ruling and it was later on forbidden by the Prophet permanently on the day of the conquest of Mecca. They term it abrogated and do not find any contradiction between such a *ḥadīth* on *mut‘ah*.^{٥٩}

(e) The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to weak *ḥadīth* (حديث ضعيف)

Vast majority of scholars accept weak narrations in absence of any strong narration. They (jurists) follow *Ijtihād* and proclaim the *ḥadīth* to be weak. Nevertheless, some other scholars’ *Ijtihād* would regard the *ḥadīth* to be genuine and strong. Identically, one jurist may consider a specific transmitter in the chain (سند) of *ḥadīth* to be not believable while another may believe it wholeheartedly. One jurist may doubt that the narrator (راوي) heard the *ḥadīth* from the original relater, whereas another jurist may view the opposite. One jurist may think that a certain chronicler disseminated the *ḥadīth* in a state of hesitancy like, he might have lost his book, or he might have been indecisive due to old age complications etc., whereas another jurist may feel strongly that the narrator reported the *ḥadīth* in a sound mental state. The relater may also forget that he described a certain *ḥadīth* and thus is unable to recall it at a subsequent period or simply declines that he even transmitted such a *ḥadīth*. Due to this kind of situation, one jurist may consider a certain *ḥadīth* to be faulty while another jurist may still regard the *ḥadīth* to be valid since he clearly remembers the *ḥadīth*. Sometimes, some of them give preference to a weak narration over analogy which is an accepted source of Islamic Jurisprudence. In fact, those scholars who accept weak narrations in establishing a ruling will differ with those who do not accept weak narrations as a strong enough proof. Vast majority of scholars (جمهور علماء) accept weak *ḥadīth* (حديث ضعيف) in the absence of any strong *ḥadīth*. In fact they prefer a weak *ḥadīth* to analogy (قياس) which is an accepted source of Islamic jurisprudence.

Those scholars who accept weak *ḥadīths* in establishing a ruling will differ with those who do not accept weak *ḥadīths* as strong enough proof. As a matter of fact, they would prefer it to *qiyās*, the analogical reasoning.^{৩০}

(f) The causes of differences on the basis of *খবর الاحاد* (Solitary *ḥadīth*)

The jurists may differ over their methodologies of establishing the authenticity of a *ḥadīth*, especially the solitary (*أحاد*) *ḥadīth*. It is a report of odd individuals, which remains below a *mutawātir* or a *mashhūr ḥadīth*. The Ḥanafīs prefer the apparent (*ظاهر*) meaning of the Qur’ān to the *ahād ḥadīth* to deduce rulings. Concerning the marriage of an adult woman, the Ḥanafīs maintain that the adult and mature woman can sign her own contract of marriage without consulting her guardian, whereas the other three schools require the presence of a legal guardian (*ولي*) to validate the marriage. The majority have relied on one of the *ahād ḥadīths* which simply declares: “*لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ*”-i.e. there shall be no marriage without a guardian.”^{৩১} The Ḥanafīs have relied instead on the Qur’ānic verse: “*فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ*”-If he has divorced her, then she is not lawful to him until she marries (*حَتَّى تَنْكِحَ*) a husband other than him.”^{৩২} On the basis of the word *حَتَّى تَنْكِحَ* used in the feminine singular mood which has enabled the Ḥanafīs to conclude that an adult woman may conduct her own marriage without any legal guardian. The text here is characterized as manifest (*ظاهر*) in respect of guardianship as this is a secondary theme of the text. The main theme of the text is divorce, which is why it (*ظاهر*) is considered weaker evidence. Yet the Ḥanafīs have preferred it to the *ḥadīth* mentioned above, which, although definitive in meaning, is less than it in respect of authenticity and proof.^{৩৩}

(g) The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to forgetting the *ḥadīths*

Forgetting a certain *ḥadīth* on the part of a jurist sometimes would cause disagreement to happen. Though the *ḥadīth* reaches the jurist authentically, he may have forgotten about it. For instance: Once ‘Umar ® presented a *Fatwā* declaring that a person in a situation of major ritual impurity (*جنب*) and having no water around him must wait to say prayer till he finds water. Then ‘Ammār ® reminded him of the *ḥadīth* that the Prophet (sm) once permitted ‘Umar and ‘Ammār ® to perform *Tayammum* in such a situation. Even after this reminder, ‘Umar ® failed to remember the incident.^{৩৪} This sort of forgetting very often happened among the scholars of the early as well as later eras.

(h) The *Ikhtilāf* (Disagreement) occurs due to the apparent incorrect retention of a *ḥadīth*

It is narrated that Ibn Abī Mulaykah ® said, when Umm Abān died in Makkah, we came to attend her funeral, and Ibn ‘Umar and Ibn ‘Abbās ® also attended. I was sitting between them and there came a sound of crying from the house. Then Ibn ‘Umar ® asked ‘Amr b. ‘Uthmān ®, “Why don’t you tell them not to weep? Because,

the Prophet (sm) said, “إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه” –i.e. a dead person tormented because of his family’s crying over his death.”^{٩٧} Same *ḥadīth* was also narrated by ‘Umar ®. Ibn ‘Abbās ® said; when ‘Umar ® died, I mentioned this *ḥadīth* to ‘Ā’ishah ®. Hearing this, she ® disagreed to this and said, “إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها” –i.e. once the Prophet (sm) passed by a Jewish woman who had expired while her family were mourning.” Then He (sm) said, “إنهم ليكون – عليها وإنها لتعذب في قبرها – i.e. they are crying over her, but she is being punished in her grave.”^{٩٨} ‘Ā’ishah ® concluded that mourning of the family was not linked to the punishment on the demised woman. In addition to that, she mentioned a Qur’ānic verse, “أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وِّزْرَ أُخْرَىٰ” –i.e. that no bearer of burdens will bear the burden of another”^{٩٩} and said, most probably ‘Umar ® had forgotten or made a mistake. Rather, the Prophet (sm) told, “إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ” –i.e. Allāh will increase the torment of the *kāfir* because of his family’s crying for him.”^{١٠٠}

(i) The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to disparate views of a *ḥadīth*

Sometimes, the Companions had disparate views regarding the obvious significance of an action they observed the Prophet (sm) performs. His practice is witnessed by many of them but the interpretation depends on individual’s understanding and capacity. Some would take it as a sign of obedience to Allāh whereas others would regard it as simply something allowed (مباح). For example, during his Ḥajj journey, the Prophet (sm) left ‘Arafat and halted at a place named ‘Abṭah’ which was regarded as an act of reverence and *ibādah* by Abū Hurayrah and Ibn ‘Umar ®. Thereby it got included among the practices of *Sunnah* of Ḥajj whereas ‘Ā’ishah and Ibn ‘Abbās ® considered it as simply an accidental event, nothing like a *Sunanh*.^{١٠١}

(j) The Scholars disagreed over some of the conditions and requirements that render a *ḥadīth* as authentic or not. For instance, according to *Imām* Bukhārī and others it was mandatory for the narrator and his teacher to have met at least for once whereas *Imām* Muslim and others felt that mere prospect of meeting is sufficient. The succeeding outcome of this disagreement is that *Imām* Muslim may regard a *ḥadīth* to be authentic while *Imām* Bukhārī may not. As such, the scholars adopting *Imām* Muslim’s concept would accept the *ḥadīth* as the proof in an issue of legal ruling. In contrast, those who follow *Imām* Bukhārī’s view may not apply the proof of *Imām* Muslim in a proceeding. Similarly, they also had different stand-points over the trustworthiness and honesty of the narrator of the *ḥadīth*.^{١٠٢}

(k) Sometimes, the jurists may have received a *ḥadīth* accompanied with its cause and result with which the jurists will realize its implication and would judge accordingly. The same *ḥadīth* may have reached another jurist without cause and result, for which his realization would be different and as such his jurisdiction would be different also.^{١٠٣}

4. The *Ikhtilāf* (Disagreement) due to different juristic methodologies and principles of *Usūl al-Fiqh*

The *fiqhī masā'il* of the *Imāms* found a systematic and extensive use after the *tābi'ūn* which finally led to the emergence of several popular *Madhhabs*. Among them four *Madhhabs* attained the world-wide fame and are named after their founders, like, Mālikī, Ḥanafī, Shāfi'ī and Ḥanbalī *Madhhabs*. Since then the differences began to arise among the *Madhhabs* conspicuously on the basis of some reasons. For example, the Mālikī *Madhhab* was mainly developed in Ḥijāz on the basis of the sayings and verdicts of 'Umar, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbās, 'Aī'shah, Zayd b. Thābit ® and their followers (*tābi'ī*); Sa'id b. Musayyib, 'Urwah, Salīm and so on.⁹⁸ In addition to that, they have each reflected the cultural trends and customs of the society in which they had emerged. The verdicts and sayings of *Imām* Mālik (rh) have also been collected by his disciples and commented upon by them. *Muwatṭā'* of *Imām* Mālik (rh) is a good representation of the *fiqh* methodology of his *madhhab*. On the other hand, Ḥanafī *madhhab* was developed in 'Irāq based on the *fatāwā* and sayings of 'Abd Allāh b. Mas'ūd, 'Ali ®, qāḍī Shūrāyḥ (rh), Ibrāhīm Nakḥī as well as the other scholars and jurists of Kūfah.⁹⁹ The differences between Mālikī and Ḥanafī *Madhhabs* are found in their treatment of deriving the legal rulings. The former takes it ordinarily while the latter makes its use extensively.

The emergence of Shāfi'ī-*Madhhab* was held after Abū Ḥanīfah and *Imām* Mālik (rh).

It is interesting to note that Shāfi'ī *Madhhab* was developed initially during the years of his residence in Baghdād, and subsequently in Egypt where he resided for several years. It is claimed that he found the customs of the Egyptians so different that he revised and changed a great deal of his earlier rulings, so much so that he is generally known to have developed two *Madhhabs*, the old and the new.⁹⁹ Changes of time and place, and developments in the customs and culture of society are not confined to these *Madhhabs* but are generally reflected in the works of the *jurists*. An *Ikhtilāf* that originates due to cultural and customary differences is not always confined to minor issues as the scope of disagreement among schools and scholars often extend from specific issues to methods of reasoning, attitudes and perceptions over the basic evidence of the *Sharī'ah*.

The major factor in explaining the emergence of differences of opinions is known to the *fuqahā'* is over the methodology and principles of *Usūl al-fiqh*. The *Imāms* differed in the principles and rules they used. For example;

(a) *Imām* Mālik (rh) held the Medinite consensus to be the most authoritative, or only the valid form of *Ijmā'*. The majority, on the other hand, did not confine *Ijmā'* to any particular region but considered it as an embodiment of the general consensus of the learned *mujtahids* of the Muslim community.⁹⁹

(b) The *jurists* may have differed because of variant approaches and methodologies they used in extracting *fatāwā* from the sources. Sometimes they differed over the use

of certain aspects as reasonable and acceptable sources of jurisprudence. The practice of the people of Madīnah (أعمال أهل المدينة) is acceptable in the Mālikī School and not accepted by the other schools.^{ۛۛ}

(c) The leading schools have also differed over the authority of *fatwā* of a Companion as a proof and basis of judgment. *Imām* Mālik (rh), for example, has admitted the verdict and ruling of a Companion as a true manifestation of the *Sunnah* and therefore authoritative. Likewise, some have disagreed that the ruling of a Companion being authoritative over something which the latter has reported directly from the Prophet (sm), not his interpretation, impression, or action.^{ۛۛ}

(d) The scope of disagreement (*Ikhilāf*) over methodological principles also extends to rules of interpretation and the implied meaning of word forms such as the general (عام) and the specific (خاص). The general (عام) ruling of the text is definitive (قطعي) according to the Ḥanafīs but it is speculative (ظني) according to the majority (جمهور). One of the consequences of this would be that no conflict can arise between ‘*ām* and *khāss*, according to the majority, since the latter will always prevail over the former. But since Abū Ḥanīfah (rh) held general (عام) ruling to be definitive (قطعي), a conflict can arise between one *qat’ī* textual evidence and another speculative (ظني) evidence.^{ۛۛ}

(e) The jurists may have disagreed because of different methodologies and principles they used in deriving rulings from the sources which would help them differ in their convictions. For example: The *muṭlaq* (مطلق) remains absolute in its application unless there is a limitation to qualify it. According to majority (جمهور), when a *muṭlaq* is qualified into a *muqayyad* (مقيد), the latter is to be given priority over the former. But, the Ḥanafīs maintain that when the *muṭlaq* and *muqayyad* differ in their causes, none overrides the other and that each should be implemented independently.^{ۛۛ}

(f) *Imām* Abū Ḥanīfah and Mālik (rh) used to derive rulings on the basis of *mursal* (a *ḥadīth* transmitted by a *tābi’ī* from the Prophet (sm) directly dropping a *ṣaḥabī* from the *isnād*) and *munqaṭa’* (an *isnād* having a single link moving somewhere in the middle, in one place or more) *ḥadīths* without any hesitation. On the other hand, *Imām* Shāfi’ī always avoided them.^{ۛۛ}

(g) *Imām* Mālik included in the *Sunnah*, not only *ḥadīth* from the Prophet (sm), but also the precedent of Companions and the common practice of the Madinite ‘*Ulamā*’ (أعمال أهل المدينة). *Imām* Mālik preferred the latter to solitary *ḥadīth* on the basis that it was a more reliable indicator of the true *Sunnah* of the Prophet (sm) than a solitary report by odd individuals. For example, *Imām* Mālik did not accept the *aḥād ḥadīth* which validated the option of cancellation in contracts (*khīyār al-majlis*). As the Prophet (sm) said, “الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا”، i.e. the seller and the buyer have the right to keep or return goods as long as they have not parted or till they part.”^{ۛۛ} This *ḥadīth* provided that the parties to a sale are free to change their mind so long as they have not separated, nor left the meeting of the contract. The reason for this was that the

ḥadīth in question was either not known to them or that they had known it but did not consider it reliable enough since it was a solitary *ḥadīth* and was not widely known to them to rely on it. After all that was contrary to Madinite practice. On the other hand, *Imām Shāfi'ī* held that the *tābi'ūn* had remained unknown with many such *ḥadīths* which were collected properly by the later scholars of Islām. In presence of an authentic *ḥadīth*, he considered the *Ijtihād* of the *tābi'ūn* unreliable and the former was unequivocally valid. While illustrating the example of *khīyār al-majlis* which neither Abū Ḥanīfah nor Mālik (rh) had implemented in their rulings on the matter.^{৬৫}

(h) There are differences, for example, with regard to juristic preference (*Istiḥsān*) which the majority have accepted as a valid proof and a source of the *Shariah* but which *Imām Shāfi'ī* has rejected altogether.^{৬৬}

Imām Shāfi'ī also objected Abū Hanifa's *Istiḥsān* and considered it a misunderstanding about the difference between the *rā'y* and the *Qiyās*. *Imām Shāfi'ī* recognized *qiyās* on the basis of the texts rather than on *rā'y*.^{৬৭}

Conclusion

The Muslim *Ummah* should regard the Qur'ān and the *Sunnah* as the sources of solutions to all sorts of problems arising later on. The Prophet (sm) is reported to have repeatedly said, *تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله* –i.e. I left two things among you. You shall not go astray so long as you hold on to them; the book of Allāh and the *Sunnah* of His prophet (sm).^{৬৮} Despite this, there is clear proclamation in the Qur'ān regarding such reference which a Muslim can in no way defy otherwise his belief will remain incomplete. Allāh says, *فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ* –i.e. if you differ in anything among yourselves, refer it to Allāh and his Messenger, if you believe in Allāh and the last day.^{৬৯}

Problems of new types that had no clear instructions in the *Sharī'ah* were faced by people. Solving those fresh problems required new rules and regulations that would be designed based on the changing scenario of the society and conforming to the guidance of *Sharī'ah*. For meeting this purpose, the only efficacious way was *Ijtihād* on which the Prophet (sm) guided as well as trained his Companions. Only after the Companions investigated into the Qur'ān and the *Sunnah* in search of any direction regarding the arisen problems, they would turn to *Ijtihād* to effectuate their personal views.

‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (rh) wrote in a bid to remind *Qāḍī Shūrāyḥ* relating to the sources of *Sharī'ah*: “The issues should be considered in the first place in accordance with the holy Qur'ān. If no solution or direction as to the problem to be solved is found in the Qur'ān, one must turn to the *Sunnah* of the Prophet (sm). Again, if the *Sunnah* does not provide any dictum regarding the question, one should turn to the consensus of opinion among the Muslims. Only at the failure of all the above options, one can judge the problem by himself.”^{৭০}

In addition, the Companions, in compliance with *Qiyās*, recognized as another legalized way of solving issues. On some cases, disagreement occurred among the Companions when they were confronted with the difficult cases, especially after the death of the Prophet (sm), but this type of situation happened only temporarily because it could be settled right away through the concept of *Shūrā*,^{١٨٩} as it is clearly stated in the Qur'ān ; “وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ”-i.e. and those who have responded to their Lord and established prayer, and whose affairs are a matter of counsel, and from what we have provided them, they spend.”^{١٩٠} Even Allāh said in the Qur'ān commanding the Prophet (sm); “فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ”-i.e. so by mercy from Allāh (O Muḥammad), you were lenient with them. And if you had been rude (in speech) and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So, pardon them and ask forgiveness for them and consult with them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allāh. Indeed, Allāh leaves those who rely upon Him.”^{١٩١} In order to exercise *Shūrā*, we must develop respect and tolerance for the opinions of each other. It is a prior condition of *Shūrā*. As the Islamic kingdom spread and innumerable new problems arose, the domain of *Ikhtilāf* got expanded in the coming generations. Accordingly, though the jurists came up with different solutions for a matter in question, they never deviated from the fundamental guidance of the Qur'ān and the *Sunnah*.

As far we have conceived up to now, we have to realize that the difference and the variety which appears inevitably in our life is a natural thing. Thus, this is not the main problem or negative norm which can cause the malaise of the *Ummah*; instead, the core or root problem generally comes from ourselves who do not understand Islām as a way of life, as the Companions understood *Islām* in their period. As a result, what we need to do now is to change ourselves first. We have to change our minds, our understandings, our attitudes and our actions so they are in keeping with the spirit of *Islām*.

In addition to that, it is very necessary to weep out all such misconception and to develop tolerance as well as appreciation of each other's points of view among the jurists as well as within the various schools of thoughts in Islamic Jurisprudence. The understanding of the causes of *Ikhtilāf* may also lead to reconsideration of many legal issues ultimately resulting in the comparison of different points of view and give importance to the emergence of a common *Fiqh*. Otherwise, strife will increase among the Muslims and unity among them will never return. On the other hand, the infidels continue to oppress the Muslims, which is not desirable.

Notes and References

- ^১ Al-Dehalwī, Shāh Walī Allāh, *al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf*, (Beirūt: Dār al-Nafā'is, 1404 A.H.), p. 15.
- ^২ *Op. cit.*, p. 23.
- ^৩ *Op. cit.*, pp. 30-31.
- ^৪ Sampadona Porishad, *Fatawa O Masa'il*, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2007 A. C.), vol. 1, p. 218.
- ^৫ Silqīnī, Dr. Ibrāhīm, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Abū Ḍḥabī: Manār al-Islām, 1991 A.C.), p. 12; Shoayb Ahmed, *The Development of Islamic Jurisprudence and Reasons for Juristic Disagreements Among the Schools of Law*, (M.A. Thesis submitted for the degree of MASTER OF ARTS in the Dept. of Islamic Studies, in the University of South Africa, Nov. 2005 A.C.), p. 112.
- ^৬ Aghnides, Nicolas, *Mohammedan Theories of Finance with an Introduction to Mohammedan Law and a Bibliography*, (Lahore: The Premier Book House, n.d.), p.109.
- ^৭ Zarqā, Mustafā Aḥmad, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, (Beirūt: Dar al-Fikr 1967 A.C.), p.212.
- ^৮ Lane, Edward William, *Arabic-English Lexicon*, (Printed in The United States of America, 1956 A.C.), Book: 1, Part: 2, p. 792.
- ^৯ Al-Qurān: Sūrah al-A'rāf: 169 (If it comes from the conjugation (باب) of نصر its meaning will be to succeed or to come after them. vide Edward Lane, *op. cit.*, p. 792.
- ^{১০} Al-Qurān: Sūrah al-Baqarah: 255.
- ^{১১} Edward Lane, *op. cit.*, p. 792.
- ^{১২} Al-Qurān: Sūrah al-Furqān: 62.
- ^{১৩} Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 33.
- ^{১৪} Al-Qurān: Sūrah Ali 'Imrān: 19.
- ^{১৫} Al-Qurān: Sūrah al-Baqarah: 213.
- ^{১৬} *Al-Ijmā'* is defined as the agreement and consensus of the *Mujtahids* of the Muslim community after the Prophet Muḥammad (sm) in a particular era on a specific ruling. Vide Al-Zarkāshī, Muḥammad b. 'Abd Allāh b. Baḥr, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Usūl al-Fiqh*, (Kūwait: al-Wajārah al-Awqāf, n.d.), vol.2, p. 353.
- ^{১৭} Al-Tha'alābī, 'Abd al-Raḥmān, *al-Zawāhir al-Ḥassān fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1418 A.H.), vol.2, p. 85.
- ^{১৮} Al-Qāhirī, Zayn al-Dīn, *Fayḍ al-Qadīr Sharh al-Jāmi' al-Ṣaḡhīr*, (Egypt: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 A.H.), vol. 1, P. 209.
- ^{১৯} Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 48.
- ^{২০} Al-Qurān: Sūrah al-Hūd: 118.
- ^{২১} Al-Qurān: Sūrah al-Baqarah: 213.
- ^{২২} *Op. cit.*, : 228.
- ^{২৩} Abū Dāwūd Sulaymān b. al-Ash'ath, *Sunan*, (Beirūt: Al-Maktabah al-'Asriyyah, n.d.), vol.2, p.258; Al-'Aynī, Badr al-Dīn, *Umdah al-Qārī*, (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), vol.20, p. 250.
- ^{২৪} *Op. cit.*, p. 251.
- ^{২৫} *Ibid.*
- ^{২৬} Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 6.
- ^{২৭} Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Tafsīr al-Rāghib*, (University Ṭantā: Kulliyah al-Adāb, 1999 A.C.), vol. 4, p. 286; Al-Qurtubī, *Shams al-Dīn, Tafsīr al-Qurtubī*, (Cairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1964 A.C.), vol. 5, p. 225.
- ^{২৮} Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 6.

- ١٥٠ Al-Baghawī, Muḥī al-Sunnah, *Tafsīr al-Baghawī*, (Dār Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1997 A. C.), vol. 3, p. 22.
- ١٥١ Al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, (Egypt: Dār al-Ḥadīth, 1993 A.C.), vol. 1, p. 212.
- ١٥٢ Abū Dāwūd, *op. cit.*, vol. 3, p.103.
- ١٥٣ Al-Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad b. ‘Īsā, *Sunan*, (Egypt: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1975 A.C.), vol. 4, p. 72.
- ١٥٤ Abū Bakr b. Abū Shaybah, *Musannaf Ibn Abū Shaybah*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 1409 A.H.), vol. 7, p. 288.
- ١٥٥ Al-Qurān: Sūrah al-Baqarah: 282.
- ١٥٦ *Ibid.*: 60.
- ١٥٧ Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 2.
- ١٥٨ Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī‘ah*, (Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, n.d.), vol. 3, p. 88.
- ١٥٩ Al-Qurān: Sūrah al-Isrā': 32.
- ١٦٠ Al-Qurān: Sūrah al-Hijr: 88.
- ١٦١ Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 101.
- ١٦٢ *Ibid.*: 89.
- ١٦٣ Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far, *Jāmi‘ al-Bayān*, (Dār Hijr li al-Ṭabā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, 2001 A.C.), vol. 8, p. 652.
- ١٦٤ Al-Bayḍawī, al-Qāḍī Nāsir al-Dīn, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Tāwīl*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1418 A.H.), vol.2, p. 142.
- ١٦٥ Al-Qurān: Sūrah al-Anfāl: 41.
- ١٦٦ Al-Qurān: Sūrah al-Ḥashr:10.
- ١٦٧ *Op. cit.*, : 7.
- ١٦٨ Al-Qurān: Sūrah al-Mā'idah: 6.
- ١٦٩ Philips, Dr. Abū Ameenah Bilal, *The Evaluation of Fiqh* (Islamic Law and the *Madhabs*) (Riyād: International Publishing House, n.d.), pp. 91-95.
- ١٧٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَتَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَمَاتَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُنْتَبِهُمُ، قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لَا وَكُنْ وَلَا شَطَطٌ، وَلَهَا الْمِيزَاتُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. Al-Nasā'ī, Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad b. Shu‘aib, *Sunan*, (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986 A.C.), vol. 6, p. 121.
- ١٧١ *Ibid.*
- ١٧٢ Imām Muslim b. Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), vol.2, p. 779; Al-Tirmidhī, *op. cit.*, vol. 3, p. 140.
- ١٧٣ Al-Qurān: Sūrah al-Ṭalāq: 6.
- ١٧٤ Imām Muslim, *op. cit.*, vol.2, p. 1118
- ١٧٥ Al-Qurān: Sūrah al-Ṭalāq:1.
- ١٧٦ Abū Dāwūd, *op. cit.*, vol.3, p. 307.
- ١٧٧ Al-Baghḍādī, ‘Alī b. al-Ja‘ad, *al-Musnad*, (Beirut: Muwassasah Nādīr, 1990 A.C.), vol. 1, p. 404.
- ١٧٨ Ibn Baṭṭāl, *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2003 A.C.), vol. 3, p. 310.
- ١٧٩ Imām Muslim, *op.cit*, vol. 2, p. 1030.
- ١٨٠ Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Muwassasah al-Risālah, 1993 A.C.), vol. 5, p. 483.
- ١٨١ Imām al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ*, vol. 7, p. 12
- ١٨٢ Ibn Hajar, *Fath al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 A.H.), vol. 9, p. 167.
- ١٨٣ *Op. cit.*, p. 170; Dehalwī, *al-Inṣāf*, p. 30.
- ١٨٤ ‘Awwāmah, Muḥammad, *Athār al-Ḥadīth al-Sharīf fī Ikhtilāf al-A‘immah al-Fuqahā’*, (Jeddah: Dār al-Qiblah, 1990 A.C.), p. 26.

-
- ৬৪ Al-Tirmidhī, *op. cit.*, vol. 3, p. 399.
- ৬৫ Al-Qurān: Sūrah al-Baqarah: 230.
- ৬৬ Immenkamp, Beatrix., *Marriage and Celibacy in Mediaval Islām: A Study of Ghazal's Kitāb Adāb Al-Nikāh*, (King's College, Cambridge, 1994.), p. 67.
- ৬৭ Imām Muslim, *op. cit.*, vol. 1, p. 280.
- ৬৮ *Op. cit.*, pp. 29-30.
- ৬৯ *Ibid.*
- ৭০ Al-Qurān: Sūrah al-Najm: 38.
- ৭১ Al-Nasā'ī, *op. cit.*, vol. 4, p. 17.
- ৭২ Al-Dehalwī, *Al-Inṣāf*, p. 27.
- ৭৩ 'Awwāmah, *op. cit.*, p. 21.
- ৭৪ 'Alwānī, Dr. Ṭāhā Jābir, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*, (Riyād: al-Dār al-'Ilmiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1991 A.C.), p. 111.
- ৭৫ Al-Dehalwī, *Al-Inṣāf*, p. 37.
- ৭৬ *Fatawa O Masa'il*, p. 218.
- ৭৭ 'Abd al-Qādir, *op. cit.*, p. 175.
- ৭৮ *Op. cit.*, pp. 236-37.
- ৭৯ Hallaq, Wael, *History of Islāmic Legal Theories*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997 A.C.), p. 259.
- ৮০ 'Abd al-Qādir, *op. cit.*, p. 235.
- ৮১ Kamali, M. H., *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Malayecasia: Islamic Text Society, 2nd edit, 1991 A.C.), p. 109.
- ৮২ *Op. cit.*, p. 112.
- ৮৩ Al-Dehalwī, *Ḥujjatullāh al-Bālighah*, (Beirūt: Dār al-Jīl, 2005 A. C.), vol. 1, p. 252.
- ৮৪ Ibn al-Jawzī, *Al-Imān al-Awsaṭ*, (Al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Sa'ūdiyyah, 1423 A.H.), vol. 1, p. 614.
- ৮৫ Al-Dehalwī, *al-Inṣāf*, p. 44.
- ৮৬ Al-Dehalwī, *Ḥujjatullāh al-Bālighah*, vol. 1, p. 253.
- ৮৭ *Ibid.*; al-Dehalwī, *al-Inṣāf*, p. 44.
- ৮৮ Ibn Qudāmāh, *Tahrīm al-Nazr fī Kutub al-Kalām*, (Riyād: 'Ālam al-Kutub, 1990 A.C.), vol.1, p. 69.
- ৮৯ Al-Qurān: Sūrah al-Nisā': 59.
- ৯০ Shiblī Nu'mānī, *Omar, the Great: the Second Caliph of Islām*, Trans.: Zafar 'Alī Khan, (Lahore: Muhd. Ashraf, 1946 A.C.), p. 69.
- ৯১ *Shūrā* means consulting two or more persons as an essential requirement in all affairs, developing self confidence knowing that their ideas are meaningful and valued.
- ৯২ Al-Qurān: Sūrah al-Shu'arā: 38.
- ৯৩ Al-Qurān: Sūrah alī 'Imrān: 159.

আল-কুরআন তিলাওয়াতে মাখ্‌রাজ ও সিফাতের বিধানাবলী

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: The importance and necessity of *Makhraj* and *Sifat* is immense in reciting the holy Quran. The pronunciation of Arabic letters is known properly to all by *Makhraj*. *Sifat* can be used to distinguish between perfect and imperfect pronunciation. The word *makhraj* means the place where the letters come out. *Makhraj* separates the character of one letter from the others. In terminological term, the method of pronouncing Arabic letters from a specific place is called *makhraj*. *Makhraj* is divided into two types these are: *Al-'Ammah* and *Al-Khassah*. The total number of *makhrajs* is seventeen. These originate from five places. The word *sifat* is established through any other object. In terminology, the condition that arises when the letters are pronounced from *Makhraj* is called *Sifat*. The permanent properties of Arabic letters or *Sifat* are seventeen in total. These attributes are always presented in the letters and so they are called permanent. It is very important to reserve these attributes in the time of pronouncing Arabic letters. Ten *Sifats* come in pairs out of these seventeen and the remaining seven *sifats* come in single. *Sifat* comes in pairs means, that if there is one of these letters, the letter of the pairs will not be existed. In other words, each character must have a feature from each of these five pairs. On the other hand, the remaining seven *Sifats* come alone. These are available in some letters and not attainable in other letters.

ভূমিকা

আল্লাহ তা‘আলার বাণী সম্বলিত বিশুদ্ধ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। এটি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর নবুওয়াতের দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআন মুসলিম জাতির জন্য সংবিধানস্বরূপ। এ গ্রন্থটি মুসলমানদের জন্য জীবন বিধানের পাশাপাশি ইবাদত পালনেরও অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের বহু ইবাদত আল-কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্য ইসলামী শরী‘আতে আল-কুরআনুল কারীমের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি শুধু আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করাও ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত সম্পর্কে বহু নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। আরবী হরফসমূহকে উত্তমরূপে আদায় করার জন্য ‘ইলমুত-তাজবীদে মাখ্‌রাজ ও সিফাতের বিধানাবলীর উদ্ভব হয়েছে। বিশুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার জন্য মাখ্‌রাজ ও সিফাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক। এজন্যই আলোচ্য প্রবন্ধে আল-কুরআন তিলাওয়াতে মাখ্‌রাজ ও সিফাতের বিধানাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাখ্‌রাজ-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

মাখ্‌রাজ (مَخْرَج) শব্দটির মীম (ميم) বর্ণে যবর, খা (خاء) বর্ণে সাকিন এবং রা (راء) বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। এটি إِسْمٌ ظَرْفٌ থেকে خُرُوجٌ মাসদার থেকে এসেছে। শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَخْرَجٌ^১ যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ - ‘আমাকে বের করুন সত্যরূপে।’^২ আল-জাওহারী (র) বলেন,

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

الْمَخْرَجُ مَوْضِعُ الْخُرُوجِ يُقَالُ خَرَجَ مَخْرَجًا حَسَنًا^৩

- ‘মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান। যেমন বলা হয়, সে ভালোভাবে বের হয়েছে।’

ড. ‘আব্দুল কায্যুম ইবন ‘আব্দিল গফুর আস-সিন্দী ও ড. তারিক ইবন মুহাম্মাদ আল-খাওয়াতির বলেন,

الْمَخَارِجُ: جَمْعُ مَخْرَجٍ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: مَحَلُّ الْخُرُوجِ^৪

- ‘আল-মাখারিজ (الْمَخَارِجُ) শব্দটি বহুবচন, একবচনে مَخْرَجٌ। আভিধানিক অর্থ, অক্ষর বের হওয়ার স্থান।’

পারিভাষিক সংজ্ঞা

‘ইলমুত-তাজবীদের পরিভাষায়, আরবী অক্ষরসমূহ উচ্চারিত হওয়ার স্থানকে মাখরাজ বলে। তাজবীদ শাস্ত্রবিদগণ মাখরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

১. মুহাম্মাদ ‘আলী আত-থাহানুভী (র) (মৃত ১১৫৮ হি.) বলেন,

الْمَخْرَجُ: عِبَارَةٌ عَنْ مَوْضِعِ خُرُوجِ الْحَرْفِ وَظُهُورِهِ وَتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاسِطَةِ صَوْتٍ^৫

- ‘মাখরাজ অর্থ অক্ষর উচ্চারণের স্থান, যা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে নিজে প্রকাশ হয় এবং অন্য অক্ষর থেকে পৃথক হয়ে প্রকাশ হওয়ার স্থান।’

২. কারও কারও মতে, وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ^৬, ‘মাখরাজ হলো যে স্থান থেকে অক্ষর সৃষ্টি হয়। তবে প্রথম সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট।’

৩. আবু ‘আমর ‘উছমান ইবন সা‘ঈদ আদ-দানী বলেন,^৭ الْمَخْرَجُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ الْحَرْفُ^৮, ‘মাখরাজ হলো অক্ষরের উৎপত্তি স্থল।’

৪. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনূজী (র) (মৃত ১৩০৭ হি./১৮৮৯ খ্রি.) বলেন,

وَهُوَ مَعْرِفَةُ تَصْحِيحِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ كَيْفِيَّةً وَكَمِّيَّةً، وَصِفَاتِهَا الْغَارِضَةُ لَهَا بِحَسَبِ مَا يَفْتَضِيهِ طِبَاعُ الْعَرَبِ^৯

- ‘আরবের স্বভাব ও ব্যবহার অনুযায়ী আরবী অক্ষরের সিফাত এবং তার পরিমাণ পদ্ধতিসহ মাখরাজ বিশুদ্ধকরণ সম্পর্কে জানাকেই মাখরাজ বলে। আর তা নির্দিষ্ট স্থান থেকে উচ্চারণ করার পদ্ধতি সঠিকভাবে জানাকেই হরফের মাখরাজ বলে।’

৫. ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

الْمَخَارِجُ: مَحَلُّ خُرُوجِ الْحَرْفِ وَتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَعْرِفَ مَخْرَجَ الْحَرْفِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَكِّنَهُ بَعْدَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ أَوْ يُشَدِّدَهُ فَحَيْثُ انْقَطَعَ صَوْتُهُ كَانَ مَخْرَجَهُ^{১০}

- ‘মাখারিজ হলো অক্ষর বের হওয়ার স্থান, যার মাধ্যমে অন্য অক্ষর হতে পৃথক হয়। যদি কোন ব্যক্তি মাখরাজ জানতে চায়, তবে তাকে হামযা ওয়াসলির পরে উক্ত অক্ষরকে সাকিনযুক্ত অথবা তাশদীদ যুক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে। স্বর বন্ধ হবে যেখানে সেটিই হলো মাখরাজ।’

৬. মুফতী মুহাম্মাদ ‘আমীমুল ইহসান (র) (১৩২৯-১৩৯৫ হি.) বলেন,

الْمَخْرَجُ: عِبَارَةٌ عَنْ مَوْضِعِ خُرُوجِ الْحُرُوفِ الْهَجَائِيَّةِ وَظُهُورِهَا وَتَمْيِيزِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِوَاسِطَةِ صَوْتٍ.^{১০}

-‘মাখরাজ হলো কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে একটি বর্ণ অন্য বর্ণ থেকে পৃথক করার স্থান, প্রকাশ হওয়া বা বর্ণমালা বের হওয়ার স্থান।’

৭. আহমাদ মুহাম্মাদ ‘আলী দাউদ বলেন,

إِنَّ لِكُلِّ حَرْفٍ مَخْرَجَهُ الْخَاصُّ بِهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَخْرَجِ أَى حَرْفٍ فَسَكِّنْهُ أَوْ شَدِّدْهُ وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ الْهَمْزَةَ فَحَيْثُمَا يَنْقَطِعُ الصَّوْتُ يَكُونُ مَخْرَجُ الْحَرْفِ.^{১১}

-‘প্রত্যেকটি অক্ষরের নির্ধারিত মাখরাজ রয়েছে। অতএব কোন অক্ষরের মাখরাজ জানতে চাইলে উক্ত অক্ষরকে সাকিনযুক্ত অথবা তাশদীদযুক্ত করে পূর্বে একটি হামযা প্রবেশ করিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেখানে স্বর স্তব্ধ হবে সেখানেই উক্ত অক্ষরের মাখরাজ।’

৮. মোল্লা ‘আলী আল-কারী (র) বলেন,

هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحَيْزِ الْمَوْلَدِ لِلْحَرْفِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَوْضِعُ ظُهُورِهِ وَتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ.^{১২}

-‘অক্ষরের উচ্চারণের স্থান। এমন একটি ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক প্রকাশ্য অর্থ হলো যে স্থান থেকে অক্ষর প্রকাশিত হয় বা অন্য অক্ষর থেকে পৃথক হয়।’

৯. ড. ‘আব্দুল কায়ুম ইব্ন ‘আব্দিল গফুর আস-সিন্দী বলেন,

الْمَخَارِجُ: إِصْطِلَاحًا: مَحَلُّ خُرُوجِ الْحَرْفِ، وَتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ هُوَ: الْحَيْزُ الْمَوْلَدُ لِلْحُرُوفِ.^{১৩}

-‘পরিভাষায় অক্ষর বের হওয়ার স্থান ও এক অক্ষরকে অপর অক্ষর থেকে পৃথক করার স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। অথবা অক্ষরের উৎপত্তিস্থলকে মাখরাজ বলা হয়।’

উদাহরণ: أ، أُ، إ، ع، أَف، أَق، أَم، أَنْ

অতএব বলা যায়, অক্ষর উচ্চারণের উৎপত্তিস্থলকেই মাখরাজ বলা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিটি অক্ষর ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। যা অক্ষরসমূহকে পৃথক করে থাকে।

মাখরাজের আলোচ্য বিষয়

আরবী অক্ষর উচ্চারণের স্থান থেকে সঠিকভাবে অক্ষর উচ্চারণ করাই মাখরাজের আলোচ্য বিষয়। এ সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনূজী আল-ভূপালী (র) বলেন,

بَسَانِطُ الْحُرُوفِ الْعَرَبِيَّةِ بِحَسَبِ مَخَارِجِهَا وَصِفَاتِهَا.^{১৪}

-‘আরবী সমস্ত অক্ষরকে তার নিজস্ব মাখরাজ ও সিফাত থেকে উচ্চারণ করাই মাখরাজের আলোচ্য বিষয়।’

মাখরাজের উদ্দেশ্য

মাখরাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনূজী আল-ভূপালী (র) বলেন,

تَحْصِيلُ مَلَكَةِ إِيرَادِ تِلْكَ الْحُرُوفِ فِي الْمَخَارِجِ، عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ.^{১৫}

-‘আরবী অক্ষরসমূহকে আরবের পরিভাষায় প্রচলিত উহার নিজস্ব মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করার শক্তি অর্জন করা।’

মাখরাজের সংখ্যা

মাখরাজের সংখ্যা নিয়ে ‘আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনুল জায়ারী (র), খলীল ইব্ন আহমাদ, মাক্কী ইব্ন আবী তালিব, আবুল কাসিম আল-হুযালী, আবুল হাসান শুরায়হ্ প্রমুখের মতে, ‘মাখরাজের সংখ্যা উনিশটি।’ যা পাঁচটি ‘আম মাখরাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনেক নাহবিদ ও ক্বারীগণের মতে, মাখরাজের সংখ্যা ষোলটি। যা চারটি ‘আম মাখরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা হুরুফুল জাওফিয়াহর মাখরাজকে বাদ দিয়েছেন। হুরুফে জাওফিয়াহ্ হলো মাদ্দ ও লীনের হুরুফ। আলিফের মাখরাজ আকুসায়ে হালকু, ওয়াও এবং ইয়া এ দুটিকে হরকতসহ উচ্চারণের মাখরাজকে মাখরাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কুতরব, আল-জারমী, আল-ফাররা, ইবনু দুরায়ব, ইব্ন কায়সান-এর মতে, ‘মাখরাজের সংখ্যা চৌদ্দটি।’ যা চারটি ‘আম মাখরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।^{১৬}এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ‘আলী আত-থাহানুভী (র) বলেন,

اُخْتَلَفَ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ فَصَحِيحٌ عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَمُقَدِّمِينَ النَّحَاةِ كَالْخَلِيلِ أَنَّهَا سَبْعَةٌ عَشْرَةٌ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ سِتَّةً عَشَرَ، فَأَسْقَطُوا مَخْرَجَ الْحُرُوفِ الْجَوْفِيَّةِ وَهِيَ حُرُوفُ الْمَدِّ وَاللَّيْنِ. وَقَالَ قَوْمٌ أَرْبَعَةً عَشَرَ، فَأَسْقَطُوا مَخْرَجَ النُّونِ وَاللَّامِ وَالرَّاءِ.^{১৭}

-‘অধিকাংশ ক্বারী, মুতাক্বাদিমীন ও নুহহাত; যেমন- খলীল-এর মতে, মাখরাজ মোট ১৭টি (সতেরটি)। উভয় দলের অধিকাংশের মতে, মাখরাজ ১৬টি (ষোলটি)। তারা মুখের খালি জায়গা থেকে উচ্চারিত অক্ষরের মাখরাজটি অর্থাৎ মাদ্দ ও লীনের অক্ষরের মাখরাজটি বাদ দিয়েছেন। আর অপর একদলের মতে, মাখরাজ ১৪টি (চৌদ্দটি)। তারা নূন, লাম ও রা-এর মাখরাজ বাদ দিয়েছেন।’

ইবন হাজিব (র) বলেন,

وَكُلُّ ذَلِكَ تَقْرِيْبٌ، وَإِلَّا فَلِكُلِّ حَرْفٍ مَخْرَجٌ، لِأَنَّ الصَّوْتِ السَّيِّجَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْحُرُوفِ، وَالْحَرْفُ هَيْئَةٌ عَارِضَةٌ لَهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ بَعْضُهَا بَعْضًا حَقِيقَةً، بَلْ بِحَسَبِ الْجِهَارَةِ وَاللَّيْنِ وَالْغَلْظَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

-‘এ সকল কথা হচ্ছে অনুমান। নচেৎ প্রতিটি অক্ষরের জন্য পৃথক মাখরাজ রয়েছে। কেননা সরল স্বরই হচ্ছে হুরুফের স্থান। অক্ষর তার অতিরিক্ত আকৃতি। মৌলিকভাবে যার একটি অপরটির বিপরীত নয়; তবে স্পষ্টতা, কোমলতা, কাঠিন্যতা ইত্যাদি গুণাবলী হিসেবে বিপরীত।’

ইবনুল জায়ারী (র) (মৃত ৮৩৩ হি.) বলেন,

مَخَارِجُ الْحُرُوفِ سَبْعَةٌ عَشَرَ * عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَنْ اخْتَبَرَ.^{১৮}

-‘যারা মাখরাজসমূহকে পরীক্ষা ও নির্বাচন করেছেন তাদের মতে মাখরাজ ১৭টি।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

وَعَدَدُ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ سَبْعَةٌ عَشْرَةٌ، وَمَوَاضِعُهَا خَمْسَةٌ: أَوَّلًا: الْجَوْفُ، ثَانِيًا: الْحَلْقُ، ثَالِثًا: اللِّسَانُ، رَابِعًا: الشَّفَتَانِ، خَامِسًا: الْخِشْمُ.^{১৯}

-‘অক্ষরের উচ্চারণ স্থান ১৭টি। আর এগুলো ৫টি জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়। প্রথমত: মুখের ফাঁকা জায়গা থেকে, দ্বিতীয়ত: কণ্ঠনালী, তৃতীয়ত: জিহ্বা, চতুর্থত: দুই ঠোঁট এবং পঞ্চমত: নাকের বাঁশি।’

ক্বারী মুহাম্মাদ ইবরাহীম বলেন, ‘সকল অক্ষরের মাখরাজ মোট ১৭টি। বিখ্যাত ক্বারীগণ কোথাও তিনটি অক্ষরে একটি মাখরাজ, কোথাও দুটি অক্ষরে একটি মাখরাজ আবার কোথাও একটি অক্ষরে একটি মাখরাজ নির্ধারণ করেছেন। এমনিভাবে ২৭টি অক্ষরকে ১৭টি মাখরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।’^{২০}

উপর্যুক্ত মতামতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাখরাজের সংখ্যা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ ইমাম, ‘আলিম ও ক্বারীর মতে মাখরাজের সংখ্যা সতেরটি।

মাখরাজের প্রকারভেদ

মাখরাজ দুভাগে বিভক্ত। এক. আল-‘আম্মাহ্, দুই. আল-খাস্সাহ্।

এক. আল-‘আম্মাহ্: আম্মাহ্ হলো এমন মাখরাজ, যেখান থেকে এক বা একাধিক অক্ষর উচ্চারিত হয়। জমহূর ‘আলিমগণের মতে যার সংখ্যা পাঁচটি। যথা- ১. মুখের ফাঁকা জায়গা, ২. কণ্ঠনালী, ৩. জিহ্বা, ৪. দুই ঠোঁট এবং ৫. নাকের বাঁশি।

দুই. আল-খাস্সাহ্: খাস্সাহ্ বলা হয় এমন মাখরাজকে, যা নির্দিষ্ট কোন জায়গা থেকে এক বা একাধিক অক্ষর উচ্চারিত হয়। জমহূর ‘আলিমগণের মতে, এ ধরনের মাখরাজের সংখ্যা সতেরটি। যা মাখরাজুল ‘আম্মাহ্‌র মধ্যে এভাবে বিন্যস্ত হয়। ১. আল-জাওফ, ২. আল-হাল্ক্ব, ৩. আল-লিসান, ৪. আশ্-শাফাতান, ৫. আল-খায়শূম।^{২১}

মোটকথা, আল-‘আম্মাহ্ বলা হয় এমন মাখরাজকে, যা একাধিক মাখরাজকে সম্পৃক্ত করে। আর আল-খাস্সাহ্ হলো যা নির্দিষ্ট একটি মাখরাজের সাথেই সম্পৃক্ত। নিম্নে মাখরাজের প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা করা হলো:

১. আল-জাওফ (الْجَوْف) বা মুখের খালি জায়গা

মুখের মধ্যে শূন্যস্থানকে জাওফ বলে। জাওফে মাত্র একটি মাখরাজ, যা থেকে তিনটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

الْجَوْفُ، وَفِيهِ مَخْرَجٌ وَاحِدٌ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْحُرُوفُ الْمَدِّ الثَّلَاثَةُ: الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ.^{২২}

–‘আল-জাওফ হলো মুখের খালি স্থান। এখানে একটি মাত্র মাখরাজ রয়েছে। এখান থেকে মাদ্দের তিনটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। মাদ্দের অক্ষর তিনটি: আলিফ, ওয়াও, ইয়া।’

আহমাদ মুহাম্মাদ ‘আলী দাউদ বলেন,

الْجَوْفُ وَهُوَ فَرْعٌ يَقَعُ بَعْدَ الْخَلْقِ مِنَ الدَّخْلِ فِيهِ مَخْرَجٌ وَاحِدٌ.^{২৩}

–‘জাওফ হলো হাল্ক্বের পরের মুখের ভিতরের খালি অংশ। এখানে একটি মাখরাজ রয়েছে।’

ইবনুল জায়ারী (র) বলেন,

فَالْجَوْفُ لِلْهَوِيِّ وَأَخْتِيهِ وَهِيَ * حُرُوفٌ مَدِّ لِلْهَوَاءِ تَنْتَهِي^{২৪}

–‘অতঃপর আলিফ এবং তার উভয় সাথীর (يا ও واو) মাখরাজ জাওফে দাহান এবং এ তিনটি (يا+وا+ا) অক্ষরকে মাদ্দাহ বলে, যা বাতাসের ওপর শেষ হয়।’

উদাহরণ

- ক. আলিফ (الف) যখন সাকিন হয় এবং তার পূর্বের অক্ষর যবর বিশিষ্ট হয়। যথা- قَالَ -
 খ. ওয়াও (واو) যখন সাকিন হয় এবং তার পূর্বের অক্ষর পেশ বিশিষ্ট হয়। যথা- الْمَغْضُوبِ، ابُو، -
 গ. ইয়া (يا) যখন সাকিন হয় এবং তার পূর্বের অক্ষর যের বিশিষ্ট হয়। যথা- نَسْتَعِينُ، اَبِي -

আলিফ (الف) উচ্চারণ করার সময় মুখ এবং গলার মাঝখান খোলা থাকে এবং যে ওয়াও (واو) ও ইয়া (ياء) মাদ্দের জন্য নির্দিষ্ট, তার মাখরাজের আলিফের উচ্চারণের ন্যায় জাওফ বা খোলা থাকে। এ তিনটি অক্ষর বাতাসের ওপর সম্পন্ন হয়ে থাকে। মুখ, হাল্কু এবং জিহ্বা কারো সাথে মিলে না; বরং মুখ হাল্কুর মাঝখানে যে বাতাস সৃষ্টি হয় তার ওপর সম্পন্ন হয়।^{২৫}

২. আল-হাল্কু (الْحَلْقُ) বা কণ্ঠনালী

হাল্কু-এর মাখরাজ তিনটি। যথা-

- ক. আকুসায়ে হাল্কু: কণ্ঠনালীর মূল, যা সিনার সাথে মিলিত তাকে আকুসায়ে হাল্কু বলে। এ স্থান থেকে দুটি অক্ষর হামযা (ء) ও হায়ে হাওয়ায (هَاء) উচ্চারিত হয়। যথা- أَهْ، أَدْ -

- أَفْصَى الْحَلْقِ (يَقْبِي أَبْعَدَهُ مِمَّا يَلِي الصَّدْرِ) أ. هـ. -
 ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন, ‘কণ্ঠনালীর মূল, যা সিনার সাথে মিলিত থাকে তাকে আকুসায়ে হাল্কু বলে।’

- খ. ওয়াসতে হাল্কু: কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল থেকে যা উচ্চারিত হয় তাকে ওয়াসতে হাল্কু বলে। এ স্থান থেকে দুটি অক্ষর ‘আইন (عَيْن) ও হায়ে হুজী (حَاء) উচ্চারিত হয়। যথা- أَحْ، أَعْ -

- গ. আদনায়ে হাল্কু: কণ্ঠনালীর শেষস্থল থেকে যা উচ্চারিত হয়, তাকে আদনায়ে হাল্কু বলে। এ স্থান থেকে দুটি অক্ষর গাইন (غَيْن) ও খা (خَاء) উচ্চারিত হয়। যথা- أُخْ، أُغْ -

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন, ‘কণ্ঠনালীর শেষস্থল থেকে যা উচ্চারিত হয়, তাকে আদনায়ে হাল্কু বলে।’

উপরে বর্ণিত ছয়টি অক্ষর যেহেতু হাল্কু থেকে উচ্চারিত হয় তাই এগুলোকে হুরূফে হাল্কী (حُرُوفُ الْحَلْقِ)ও বলা হয়। ইবনুল জাযারী (র) (মৃত ৮৩৩ হি.) বলেন,

ثُمَّ لِأَفْصَى الْحَلْقِ هَمْزٌ هَاءٌ ثُمَّ لَوْسَطِهِ فَعَيْنٌ حَاءٌ أَذْنَاهُ غَيْنٌ خَاءٌ هَا وَالْقَافُ.

- ‘অতঃপর সিনার দিকে গলার শেষভাগে হামযা (همزة) ও হা (هَاء)-এর মাখরাজ। অতঃপর এ গলার মধ্যস্থলে ‘আইন (عَيْن) ও হা (حَاء)-এর মাখরাজ। আর গাইন (غَيْن) ও খা (خَاء)-এর মাখরাজ গলার উপরিভাগ।’

৩. আল-লিসান (اللِّسَانُ) বা জিহ্বা

লিসান বা জিহ্বার মাখরাজ ১০টি এবং এ সকল মাখরাজ-এর অক্ষর ১৮টি। নিম্নে এ মাখরাজসমূহের আলোচনা প্রদত্ত হলো:

প্রথম মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া, তার বরাবর উপরের তালুর সাথে মিলিত অবস্থায় দুই নুকতা বিশিষ্ট ক্রাফ (قَاف) উচ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে মিলিয়ে কাফ (كَاف) উচ্চারিত হয়। উল্লিখিত হরফদ্বয়কে হুরুফুল হুত্তিয়াহ্ (حُرُوفُ الْحُطْيَةِ) বলা হয়।

তৃতীয় মাখরাজ: জিহ্বার মাঝখান, তার বরাবর উপরের তালুর সাথে মিলিয়ে জীম (جيم), শীন (شين) ও ইয়া (ياء) এ তিনটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। জ্ঞাতব্য যে, এ স্থান থেকে উচ্চারিত ইয়া হলো ياء غير (حُرُوفُ الشَّجَرِيَّةِ) হুরুফুল শাজারিয়াহ্ (حُرُوفُ الشَّجَرِيَّةِ) বলা হয়। ‘যে ইয়া মাদের জন্য নয়।’ আর এ তিনটি অক্ষরকে হুরুফুশ শাজারিয়াহ্ (حُرُوفُ الشَّجَرِيَّةِ) বলা হয়।

চতুর্থ মাখরাজ: জিহ্বার গোড়ার কিনারা তার বরাবর উপরের পাঁচটি দাঁতের মাড়ির সাথে মিলিয়ে দোয়াদ (ضاد) উচ্চারিত হয়। উল্লেখ্য যে, অনেকেই এ উচ্চারণে ভুল করে থাকেন। তন্মধ্যে কেউ জিহ্বার আগা সামনে উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে মিলিয়ে দোয়াদ (ضاد) উচ্চারণ করেন। আবার কেউ কেউ গোড়ার সাথে মিলিয়ে দাল (دال) উচ্চারণ করেন। উভয়টিই মারাত্মক ভুল। মূলত উচ্চারণটি হবে উল্লিখিত দুটি অক্ষরের মাঝামাঝি। আশরাফ ‘আলী থাহানুভী (র) (মৃত ১৩৬২ হি.) বলেন, ‘দোয়াদ (ضاد) অক্ষরটি জিহ্বার বাম দিক থেকে উচ্চারণ করা সহজ।’^{৩০}

পঞ্চম মাখরাজ: জিহ্বার আগা সামনের উপরের আটটি দাঁতের গোড়ার সাথে মিলিয়ে লাম (لام) উচ্চারিত হয়।

ষষ্ঠ মাখরাজ: জিহ্বার আগা সামনের উপরের ছয়টি দাঁতের গোড়ার সাথে মিলিয়ে নূন (نون) উচ্চারিত হয়।

সপ্তম মাখরাজ: জিহ্বার আগা সামনের উপরের চারটি দাঁতের গোড়ার সাথে মিলিয়ে রা (راء) উচ্চারিত হয়। বর্ণিত তিনটি অক্ষরকে হুরুফুয যুলফিয়াহ্ ওয়াত-তালফিয়াহ্ (حُرُوفُ الدُّلْفِيَّةِ) বলা হয়।

অষ্টম মাখরাজ: জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুটি দাঁতের গোড়ার সাথে মিলিয়ে তোয়া (طاء), দাল (دال) এবং তা (تاء) উচ্চারিত হয়। উল্লিখিত তিনটি অক্ষরকে হুরুফুন নুত ইয়াহ্ (حُرُوفُ النُّطْعِيَّةِ) বলা হয়।

নবম মাখরাজ: জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুটি দাঁতের আগার সাথে মিলিয়ে যোয়া (ظاء), যাল (ذال) এবং ছা (ثاء) উচ্চারিত হয়। এ তিনটি অক্ষরকে হুরুফুস-সিবইয়াহ্ (حُرُوفُ السَّبِيَّةِ) বলা হয়।

দশম মাখরাজ: জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুটি দাঁতের পেট এবং সেই বরাবর উপরের দুই দাঁত কিছুটা সাথে রেখে সোয়াদ (صاد), যা (زاء) এবং সীন (سين) উচ্চারিত হয়। এই তিনটি অক্ষরকে হুরুফুস-সাফীরিয়াহ্ (حُرُوفُ الصَّفِيرِيَّةِ) বলা হয়।

ইবনুল জারী (র) বলেন,

أَقْصَى اللِّسَانِ فَوْقَ ثَمَّ الْكَافِ	
وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَا	أَسْفَلَ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشَّيْنِ يَا -
وَاللَّامُ أَذْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا	-
وَالرَّائِدَانِيَّةُ لِيُظْهِرَ أَذْخُلُ	-
	وَالنُّونُ مِنْ طَرْفِهِ تَحْتَ اجْعَلُوا

وَالطَّاءُ وَالذَّالُ وَتَامَنُهُ وَمِنْ - غُلْيَا الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنٌ
مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى - وَالطَّاءُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْغُلْيَا

-‘ক্বাফ (قاف)-এর মাখরাজ হবে, জিহ্বার গোড়া ওপরের তালুর সাথে লাগিয়ে অতঃপর ক্বাফ (كاف)-এর মাখরাজ।

ক্বাফ (قاف)-এর মাখরাজ থেকে একটু নিচে হবে (মুখের দিকে) অতঃপর জীম (جيم), শীন (شين) এবং মাদ্‌বিহীন ইয়া (ياء)-এর মাখরাজ জিহ্বা ও তালুর মধ্যভাগ এবং দোয়াদ (ضاد) বের হয় জিহ্বার পাশ থেকে।

উপরের ডানের অথবা বামের মোট দাঁতসমূহের ভিতরের গোড়ার সাথে মিলিত হয় এবং লাম (لام)-এর মাখরাজ জিহ্বার পাশের নিকট থেকে আরম্ভ হয়ে জিহ্বার শেষ পর্যন্ত।

এবং নূন (نون) বের হয় জিহ্বার কিনারা থেকে যা নিচু করে আদায় করতে হয় এবং রা (راء)-এর মাখরাজ ঐ নূন (نون)-এর নিকটেই হয়। এ রা (راء) আদায় করতে জিহ্বার পিঠও ব্যবহার হয়।

এবং তা (تاء), দাল (دال), তোয়া (طاء) বের হয় (জিহ্বার আগা) ও ছানায় ‘উলইয়ার (গোড়া) থেকে এবং সাফীর এর অক্ষর সোয়াদ (صاد), সীন (سين), যা (ياء)-এর স্থান থেকে আদায় হয়।

(জিহ্বার আগা) থেকে এবং ছানায় সুফলার উপরিভাগ থেকে যোয়া (ظاء), যাল (ذال) ও ছা (ثاء) ছানায় ‘উলইয়ার জন্য।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

1. مَا بَيْنَ أَفْصَى اللِّسَانِ مِمَّا يَلِي الْخَلْقَ. ق, 2. أَفْصَى اللِّسَانِ تَحْتَ مَخْرَجِ الْقَافِ. ك, 3. مِنْ وَسْطِ وَوَسْطِ الْخَنْكَ الْأَعْلَى. ج, ش, 4. مِنْ أَوَّلِ حَافَتِهِ مَعَ مَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ الْغُلْيَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. ض, 5. مِنْ أَوَّلِ حَافَتِهِ إِلَى مُنْتَهَى طَرْفِهِ. ل, 6. مِنْ طَرْفِهِ تَحْتَ مَخْرَجِ اللَّامِ قَلِيلًا. ن, 7. مِنْ رَأْسِهِ. ر, 8. مِنْ طَرْفِهِ وَأَصُولِ الثَّنَايَا الْغُلْيَا. ط د ت, 9. مِنْ طَرْفِهِ مِنْ بَيْنِ الثَّنَايَا الْغُلْيَا وَالسُّفْلَى. ص. ز. س, 10. مِنْ طَرْفِهِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْغُلْيَا. ظ. ذ. ث.

১. কণ্ঠনালীর সাথে মিলিত জিহ্বার গোড়া হতে ‘ক্বাফ’ উচ্চারিত হয়। ২. ক্বাফের মাখরাজের নিচে জিহ্বার গোড়া হতে ‘ক্বাফ’ উচ্চারিত হয়। ৩. উপরের তালুর মধ্যখান হতে ‘জীম, শীন, ইয়া’ উচ্চারিত হয়, তবে মাদ্‌দের হরফ ব্যতিত। ৪. জিহ্বার কিনারা দুপাশের বা একপাশের মাড়ি হতে ‘লাম’ উচ্চারিত হয়। ৫. দাঁতের সাথে লাগিয়ে ‘দোয়াদ’ উচ্চারিত হয়। ৬. লামের মাখরাজের একটু নিচে জিহ্বার কিনারা হতে ‘নূন’ উচ্চারিত হয়। ৭. জিহ্বার সম্মুখ ভাগ হতে ‘রা’ উচ্চারিত হয়। ৮. জিহ্বার আগা ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে ‘তা, দাল, তোয়া’ উচ্চারিত হয়। ৯. ছানায় সুফলা ‘উলইয়া দাঁতের মাঝখান এবং জিহ্বার আগা ও ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে ‘সোয়াদ, যা, সীন’ উচ্চারিত হয়। ১০. জিহ্বার আগা ও ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে ‘ছা, যাল, যোয়া’ উচ্চারিত হয়।

৪. আশ্-শাফাতান (الشَّفَتَانِ) বা দুই চোঁট

এ স্থান থেকে চারটি মাখরাজের অক্ষর উচ্চারিত হয়। যথা-

প্রথম মাখরাজ: নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে ফা (فاء) অক্ষরটি উচ্চারিত হয়। ইবনুল জায়ারী (র) বলেন,

مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ مَبْطِنِ الشَّفَةِ - فَأَلْفًا مَعَ أَطْرَافِ الثَّنَائِيَا الْمُشْرِفَةِ ۝

-‘উভয় জিহ্বা ও ছানায়া ‘উলইয়ার কিনারা থেকে এবং নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ যখন ওপরের দাঁতের কিনারার সাথে মিলবে সেখান থেকে ফা (فاء) বের হয়।’

দ্বিতীয় মাখরাজ: দুই ঠোঁট থেকে মীম (ميم), ওয়াও (واو) এবং বা (باء) উচ্চারিত হয়। ইয়া (ياء) উচ্চারিত হয় দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে। তাই ইয়া (ياء) অক্ষরকে হুরুফ বাহরী (حُرُوفُ الْبَاهِرَةِ) বলা হয়। পক্ষান্তরে মীম (ميم) যেহেতু ঠোঁটের শুকনা অংশ থেকে উচ্চারিত হয় তাই তাকে হুরুফ বাররী (حُرُوفُ الْبَرَرَةِ) বলা হয়। আর ওয়াও (واو) উচ্চারিত হয় দুই ঠোঁটের অসম্পূর্ণ গোলাকার স্থান থেকে। উল্লিখিত এ চারটি অক্ষরকে হুরুফ শাফবিয়াহ (حُرُوفُ الشَّافَوِيَّةِ) বলা হয়। ৩৪

ইবনুল জায়ারী (র) বলেন,

لِلشَّافَتَيْنِ أَلْوَاؤُ بَاءً مِيمٌ ۝

-‘উভয় ঠোঁটের জন্য মাদ্দিবিহীন বা (باء) ও ওয়াও (واو) এবং গুল্লাহ্ বিহীন মীম (ميم) অর্থাৎ উভয় ঠোঁট তিনটি অক্ষরের মাখরাজ।’

৫. আল-খায়শূম (الْخَيْشُومُ) বা নাকের বাঁশি

গুল্লাহর মাখরাজ হলো নাকের বাঁশি। ইবনুল জায়ারী (র) বলেন, وَغَنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ, ইবনুল জায়ারী (র) বলেন, ‘গুল্লাহর মাখরাজ হচ্ছে নাকের বাঁশি।’ এ স্থান থেকে গুল্লাহ্ উচ্চারিত হয়। যেমন- إِمَّا، إِنَّ-।

মাদ্দি বা নাকের ভিতর দিয়ে উচ্চারণ করা বৈধ নয়। বর্তমানে এমন বহু কারী রয়েছেন, যারা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মাদ্দিকে নাকের ভিতর দিয়ে উচ্চারণ করেন।

আল-কুরআন তিলাওয়াতে সিফাতের বিধানাবলী

মাখরাজ থেকে উচ্চারিত অক্ষরের গুণাগুণ বিচারের জন্য সিফাতের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। কেননা সিফাতের মাধ্যমে অক্ষর উচ্চারণের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। এর মাধ্যমেই তিলাওয়াতের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। রুচিশীল ব্যক্তি মাত্রই তা পছন্দ করে থাকে। নিম্নে সিফাতের পরিচয় উল্লেখপূর্বক এর বিধানাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

সিফাত (صِفَة)-এর পরিচয়

সিফাত (صِفَة) শব্দটি একবচন, বহুবচনে সিফাতুন (صِفَات)। এর শাব্দিক অর্থ, গুণাবলী। হাফিয আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ বলেন,

الصِّفَاتُ فِي اللُّغَةِ مَا قَامَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي الْحَسَنَةِ أَوْ الْمَعْنَوِيَةِ كَالْيَبَادِ وَالْخُمْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ ۝

-‘সিফাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, অনুভূত অথবা অর্থগত কতিপয় বিষয়, যা অন্য কোন বস্তুর সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- শুভ্রতা, লালিমা, জ্ঞান, সাহিত্য।’

ড. ‘আব্দুল কায়্যুম ইবন ‘আব্দিল গফুর আস-সিন্দী বলেন,

الصِّفَاتُ، جَمْعُ: صِفَةٍ، وَهِيَ لُغَةً: مَا قَامَتْ بِالْغَيْرِ.^{৭৭}

-‘সিফাতুন (صِفَات) শব্দটি বহুবচন, একবচনে সিফাতুন (صِفَة)। এর আভিধানিক অর্থ হলো, যা অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।’

‘ইলমুত-তাজবীদের পরিভাষায়, অক্ষরসমূহ যে সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষরসমূহের সিফাত বলা হয়।

কুরীগণের পরিভাষায় সিফাত হলো,

كَيْفِيَّةٌ عَارِضَةٌ لِلْحَرْفِ عِنْدَ حُصُولِهِ فِي الْمَخَارِجِ مِنَ الْجَهْرِ وَالرَّخْوَةِ وَالْهَمْسِ وَالشَّدَّةِ وَمَا أَشَبَّهَا ذَلِكَ.^{৭৮}

-‘মাখরাজ থেকে অক্ষর উচ্চারণের সময় জাহর, রিখাওয়াহ, হামস, শিদ্দাত বা অনুরূপ কোন বৈশিষ্ট্য, যা উক্ত অক্ষরের সাথে আবর্তিত হয় তাকে সিফাত বলা হয়।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

صِفَاتُ الْحُرُوفِ وَهِيَ الْكَيْفِيَّاتُ الْعَارِضَةُ لَهَا عِنْدَ حُصُولِهَا فِي مَخَارِجِهَا.^{৭৯}

-‘অক্ষরসমূহকে উচ্চারণের স্থান থেকে অর্জন করার সময় যে সকল পদ্ধতি সৃষ্টি হয় তাকে ঐ সকল অক্ষরসমূহের সিফাত বলা হয়।’

আশরাফ ‘আলী থাহানুভী (র) বলেন, ‘যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় ঐ সকল পদ্ধতিকে সিফাত বা বৈশিষ্ট্য বলা হয়।’^{৮০}

মুফতী মুহাম্মাদ ‘আমীমুল ইহসান (র) বলেন,

هِيَ عَوَارِضُ تَعْرِضُ لِلْأَصْنَواتِ الْوَاقِعَةِ فِي الْحُرُوفِ مِنَ الْجَهْرِ وَالرَّخَاوَةِ وَالْهَمْسِ وَأَمثالُ ذَلِكَ.^{৮১}

-‘জাহর, রিখাওয়াহ, হামস ইত্যাদি এমন কতিপয় বিশ্লেষণ, যা বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারিত স্বরের সাথে সম্পর্কিত হয় তাকে সিফাতুল হুরূফ বা অক্ষরসমূহের সিফাত বলা হয়।’

ড. ‘আব্দুল কায়্যুম ইবন ‘আব্দিল গফুর আস-সিন্দী বলেন,

إصْطِلَاحًا: مَحَلُّ خُرُوجِ الْحَرْفِ، وَتَمْيِيزُهُ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ هُوَ: الْحَيْزُ الْمَوْلَدُ لِلْحُرُوفِ.^{৮২}

-‘পরিভাষায় মাখরাজ থেকে অক্ষর উচ্চারণের সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সিফাত বলা হয়।’

‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

إصْطِلَاحًا: كَيْفِيَّاتٌ ثَابِتَةٌ لِلْحُرُوفِ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ مِنْ جَهْرٍ وَاسْتِغْلَاءٍ وَقَلْقَلَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.^{৮৩}

-‘পরিভাষায় অক্ষর উচ্চারণের সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় যেমন- জোরে বলা, আস্তে বলা, ক্বালক্বালাহ্ ইত্যাদিকে সিফাত বলা হয়।’

সিফাতের উপকারিতা

সিফাতের তিনটি উপকারিতা রয়েছে। যথা-

এক. একই মাখ্‌রাজ থেকে উচ্চারিত অক্ষরসমূহকে পৃথক করা যায়। যেমন- তোয়া, দাল, তা। এ তিনটি অক্ষর একই মাখ্‌রাজ থেকে উচ্চারিত হয়; কিন্তু সিফাতের মাধ্যমে তা পৃথক হয়।

দুই. দুর্বল ও স্ববল অক্ষরের পরিচিতি লাভ। যাতে করে জানা যায় যে, কোন অক্ষরে ইদ্‌গাম করা যাবে এবং কোন অক্ষরে ইদ্‌গাম করা যাবে না। কেননা স্ববল অক্ষরগুলোকে অন্য অক্ষরের সাথে ইদ্‌গাম করা হয় না।

তিন. বিভিন্ন মাখ্‌রাজ থেকে উচ্চারিত অক্ষর সিফাতের কারণে সুমধুরভাবে উচ্চারিত হয়।^{৪৪}

সিফাতের প্রকারভেদ

সিফাতের প্রকার নিয়ে ‘আলিমগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবনুল জায়ারী (র) ও তার অনুসারীগণের মতে, ‘সিফাতের অক্ষরের সংখ্যা মোট আঠারোটি।’ কারো মতে, এর সংখ্যা বিশটি। কেউ কেউ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরো বহুসংখ্যক মতামত পাওয়া যায়। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সিফাতের সংখ্যা বিশটি।^{৪৫}

সিফাত প্রথমত দুই প্রকার। এক. সিফাতুল লায়িমাহ্, দুই. সিফাতুল ‘আরিয়াহ্।

এক. সিফাতুল লায়িমাহ্: লায়িমাহ্ বলা হয় এমন সিফাতকে, যা সর্বাবস্থায় অক্ষরের সাথে যুক্ত থাকে, কোন অবস্থাতেই তা অক্ষর থেকে পৃথক হয় না। এ সিফাতের অপর নাম সিফাতুয্-যাতিয়াহ্।^{৪৬}

‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

فَالذَّائِيَّةُ: هِيَ الصِّفَةُ الْمَلْزَمَةُ لِلحَرْفِ بِمَعْنِي أَنَّهَا لَا تَفَارِقُهُ أَبَدًا كَالْقَلْقَلَةِ وَالشَّدَةِ.^{৪৭}

-‘অক্ষরের অত্যাৱশ্যকীয় সিফাতকে সিফাতুয্ যাতিয়াহ্ বলা হয়। অর্থাৎ এমন সিফাত যা কখনো অক্ষর থেকে পৃথক হয় না। যেমন- ক্বালক্বালাহ্ ও শিদ্দাহ্।

দুই. সিফাতুল ‘আরিয়াহ্: এমন সিফাত যা বিশেষ অবস্থায় কোন কারণে পাওয়া যায়। আবার কখনো কোন অবস্থাতে কোন কারণবশত পাওয়া যায় না।^{৪৮}

‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

العرضية: وهى الصفة التى تلحق الحرف أحياناً وتفرقه أحياناً أخرى كالتفخيم والترقيق.^{৪৯}

-‘‘আরিয়াহ্ হলো এমন সিফাত, যা কখনো পাওয়া যায় আবার কখনো পাওয়া যায় না। যেমন- মোটা ও পাতলা।’

ড. ‘আব্দুল কায্যুম বলেন, ‘সিফাতুল ‘আরিয়াহ্‌র অপর নাম সিফাতুল মুহাস্‌সিনাহ্ অথবা আল-মুহাললিয়াহ্। এ প্রকার সিফাতকে কখনো অক্ষরের সাথে পাওয়া যায় আবার কখনো অক্ষরের সাথে পাওয়া যায় না। এটি দুই প্রকার। যথা- ক. সিফাতুল মুতাদাদাহ্, খ. সিফাতুল গায়রুল মুতাদাদাহ্।^{৫০}

ক. সিফাতুল মুতাদাদাহ্: এর মধ্যে প্রত্যেক সিফাতের বিপরীত সিফাত পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক দুটি সিফাত থেকে যেকোনো সিফাত প্রত্যেক অক্ষরে পাওয়া যায়। যেমন- লাম (لَمْ) এর মধ্যে হাম্‌স

(هَمْس) যদি পাওয়া না যায় তবে জিহ্ব (جَهْر) সিফাতটি অবশ্যই পাওয়া যাবে। এটি চার প্রকার। আল-মাদ্দ ও আল-কাসর, আত্-তাফখীম ও আত্-তারকীক।

খ. সিফাতু গায়রুল মুতাদাদাহ্: এর মধ্যে বিপরীত সিফাতের অস্তিত্ব থাকে না, কেবল عَدَم শব্দটি যুক্ত করে বিপরীত করা হয়। সুতরাং বিপরীত অর্থটি তাতে গণ্য করা হয়নি। এটি চার প্রকার। যথা- আল-ইযহার, আল-ইদগাম, আল-কাল্ব ও আল-ইখফা।

সিফাতুল লায়িমাহ্ আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা- কিসমুন্-লাহ্ যিদ্দুন (قِسْمٌ لَهُ ضِدٌّ) ও কিসমুন্ লা যিদা লাহ্ (قِسْمٌ لَا ضِدَّ لَهُ)।

ক. কিসমুন্-লাহ্ যিদ্দুন (قِسْمٌ لَهُ ضِدٌّ)

কিসমুন্-লাহ্ যিদ্দুন সিফাতটি আবার পাঁচ প্রকার। কারও কারও মতে, এ প্রকারের সিফাত দশ প্রকার। ক্বারী মুহাম্মাদ ইবরাহীম (র) বলেন, ‘সিফাতের অক্ষর আঠারো প্রকার। যেমন- হাম্‌স, জাহ্‌র, শিদ্দাত, রিখাওয়াত, তাওয়াসসুত, ইসতি‘লা, ইসতিফাল, ইনতিবাক্ব, ইনফিতাহ্, ইয়লাক্ব, ইসমাত, সাফীর, ক্বালক্বালাহ্, লীন, ইনহিরাফ, তাক্বরীর, তাফাশ্শী, ইসতিতালাহ্।’^{৫৬} ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

فالقسم الأول: وهو الذي له ضد فعدد صفاته إحدى عشرة صفة وهي: الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضدها الشدة وبينهما صفة التوسط ويقال لها البينية أيضاً، والاصتفال وضده الاستعلاء، والانتفاح وضده الاطباق، والإصمات وضده الإذلاق.^{৫৭}

-‘প্রথম প্রকার: এমন সিফাত, যার বিপরীত সিফাত রয়েছে। এ প্রকার সিফাতের সংখ্যা এগারটি। যেমন- আল-জাহ্‌র, এর বিপরীত আল-হাম্‌স, আর-রিখাওয়াহ্ এর বিপরীত আশ্-শিদ্দাহ্; এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি সিফাত রয়েছে, তা হলো আত্-তাওয়াসসুত এর অপর নাম আল-বায়নিয়াহ্, আল-ইসতিফাল এর বিপরীত আল-ইসতি‘লা, আল-ইনফিতাহ্ এর বিপরীত আল-ইতবাক্ব এবং আল-ইসমাত এর বিপরীত আল-ইয়লাক্ব।’

নিম্নে সিফাতের উক্ত প্রকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. আল-হাম্‌স (الْهَمْس)

হাম্‌স শব্দের আভিধানিক অর্থ নিচু, অস্পষ্ট। এই সিফাত মোট দশটি হরফে পাওয়া যায়। ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

لُغَةُ: الْخَفَاءُ، وَاصْطِلَاحًا: جَرَيَانُ النَّفْسِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ لِضَعْفِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْمَخْرَجِ.^{৫৮}

-‘হাম্‌স শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্পষ্ট হওয়া। পরিভাষায়, মাখরাজের উপরে অক্ষরটির ভিত্তি দুর্বল হওয়ার কারণে উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসকে চালু রাখাকে হাম্‌স বলে।’

যে সকল অক্ষর মৃদু স্বরে উচ্চারিত হয় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হয় না সে সমস্ত অক্ষরকে হুরূফুল মাহমূসাহ্ (حُرُوفُ الْمَهْمُوسَةِ) বলে। আশরাফ ‘আলী থাহানূভী (র) বলেন, ‘হাম্‌স-এর বৈশিষ্ট্য যে বর্ণসমূহে পাওয়া যায়, তাকে মাহমূসাহ্ বলে।’^{৫৯} এর মর্ম হলো, ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণকালে কণ্ঠধ্বনি মাখরাজে এমন মৃদুভাবে উপস্থাপিত হয়, যাতে শ্বাস অব্যাহত থাকে। কিন্তু ধ্বনির মধ্যে এক প্রকারের ক্ষীণতা প্রকাশ পায়।

الفاء، والحاء، والتاء، والهاء، والشين، والحاء، والصاد، والسين، والكاف، والتاء

ইবনুল জারী (র) এই অক্ষরগুলোকে একত্রিত করে বলেন, مَهْمُوسَهَا فَحْتُهُ شَخْصٌ سَكَتٌ - 'মাহমুসার অক্ষরসমূহ হলো, فَحْتُهُ شَخْصٌ سَكَتٌ' ৫৫

- وَحُرُوفُهُ عَشْرَةٌ، مَجْمُوعَةٌ بِهَذَا التَّرَكِيبِ (فَحْتُهُ شَخْصٌ سَكَتٌ)) 'ইযযাত 'উবায়দ দা'আস বলেন, 'মাহমুস-এর অক্ষর মোট দশটি। এগুলোকে একসাথে فَحْتُهُ شَخْصٌ سَكَتٌ বলা হয়।' ৫৬

এই হরফগুলো আদায় করার সময় আওয়াজে নীচুতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয় এবং নিঃশ্বাস জারি থাকে।

২. আল-জাহর (الْجَهْرُ)

জাহর শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু, স্পষ্ট ও প্রকাশ হওয়া। এ সিফাতটি মাহমুসাহ ব্যতীত বাকি উনিশটি হরফে পাওয়া যায়। 'ইযযাত 'উবায়দ দা'আস বলেন,

الْجَهْرُ: لُغَةً: الْإِعْلَانُ، وَإِصْطِلَاحًا: اِنْحِبَاسُ جَرِي النَّفْسِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ لِقُوَّةِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْمَخْرَجِ. ৫৭

- 'আল-জাহর শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ হওয়া। পরিভাষায়, অক্ষরের উচ্চারণের সময় শ্বাস প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে জাহর বলে। আর এটি উচ্চারণ স্থানে শক্তিশালী নির্ভরতার কারণে হয়ে থাকে।'

যে সকল অক্ষর উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয় এবং উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তাদেরকে হরফুল মাজহুরাহ (حُرُوفُ الْمَجْهُورَةِ) বলা হয়। আশরাফ 'আলী থাহানুভী (র) বলেন, 'জাহর-এর বৈশিষ্ট্য যে সকল অক্ষরে পাওয়া যায় তাদেরকে মাজহুরাহ বলে।' ৫৮ এর মর্ম হলো, এ বর্ণসমূহ উচ্চারণের সময় কণ্ঠধ্বনি মাখরাজের মধ্যে এমন প্রবল বেগে এসে উপস্থাপিত হয়, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শ্বাস প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজের মধ্যে একপ্রকারের উচ্চৈঃস্বর সৃষ্টি হয়।

মাহমুসার দশটি অক্ষর ব্যতীত আরবী বর্ণমালার অবশিষ্ট উনিশটি অক্ষর মাজহুরাহ। যথা-

الهمزة، والباء، والجيم، والdal، والذال، والراء، والزاء، والصاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والقاف، واللام، والميم، والنون، والواو، والياء، والألف، والواو المدية، والياء المدية.

'ইযযাত 'উবায়দ দা'আস বলেন, 'মাহমুসার অক্ষর ব্যতীত আরবী বর্ণমালার অবশিষ্ট অক্ষরসমূহ হলো মাজহুরাহর হরফ।' ৫৯

এই হরফগুলো আদায় করার সময় মাখরাজে আওয়াজ শক্তিশালী, স্পষ্ট ও উঁচু হয় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

৩. আশ-শিদাত (الشِّدَّةُ)

শিদাত শব্দের অর্থ কঠিন, কঠোরতা ইত্যাদি। এই সিফাত কেবল আটটি হরফে পাওয়া যায়। 'ইযযাত 'উবায়দ দা'আস বলেন,

الشِّدَّةُ: لُغَةً: الْقُوَّةُ، وَإِصْطِلَاحًا: اِنْحِبَاسُ جَرِي الصَّوْتِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ لِكَمَالِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْمَخْرَجِ. ৬০

-‘আশ্-শিদাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কাঠিন্যতা। পরিভাষায়, অক্ষরের উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বর বা আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে শিদাত বলে। উচ্চারণের স্থানে পূর্ণ নির্ভর করার কারণে এরূপ হয়ে থাকে।’

যে সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় শ্বাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং কঠিন স্বরে উচ্চারিত হয় তাদেরকে হরফুশ শিদাত (حُرُوفُ الشِّدَّةِ) বলে। আশরাফ ‘আলী থাহানুভী (র) বলেন, ‘শিদাত-এর বৈশিষ্ট্য যে অক্ষরসমূহে পাওয়া যায় তাদেরকে হরফুশ শাদীদাহ বলা হয়।^৫ কেউ কেউ বলেন,

وَهَٰذَا حُرُوفٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الشِّدَّةِ وَالرَّخَاوَةِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُهُمْ: (لَيْنَ عُمَرَ) وَإِنَّمَا وَصِفَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الصَّوْتِ لَمْ يَنْحَبِسْ مَعَهَا إِنْجَابًا مَعَ الشَّدِيدَةِ وَلَمْ يَجْرِ مَعَهَا جَرِيَانًا مَعَ الرِّخَاوَةِ.

-‘এখানে শিদাত রিখাওয়ার মধ্যবর্তী কতিপয় অক্ষর বসেছে। সেগুলোকে পাঁচটি অক্ষরে লইন عُمر একত্রিত করা হয়েছে। এ গুণে গুণান্বিত করার কারণ হচ্ছে যে, শাদীদার ন্যায় এগুলো উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ হয় না আবার রিখাওয়ার ন্যায় শ্বাস প্রবাহিতও হয় না।’

এই প্রকৃতির অক্ষরসমূহ উচ্চারণ করার সময় মাখরাজের মধ্যে কণ্ঠস্বর এমন প্রবল বেগে এসে উপনীত হয়, যাতে কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আওয়াজের মধ্যে একপ্রকার কর্কশতা সৃষ্টি হয়।

এরূপ অক্ষর মোট আটটি। যথা-

الهمزة، والجيم، والdal، والقاف، والطاء، والباء، والكاف، والتاء.

ইবনুল জায়ারী (র) এ হরফগুলোকে সমন্বয় করে বলেন, (أَجْدُ قَطٍ بَكَتْ) এ অক্ষরসমূহের শাদীদার শব্দ হবে أَجْدُ قَطٍ بَكَتْ^৬।

‘শিদাত-এর ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন, أَجْدُ قَطٍ بَكَتْ وَحُرُوفُهُ مَجْمُوعَةٌ فِي قَوْلِهِمْ: أَجْدُ قَطٍ بَكَتْ (أَجْدُ قَطٍ بَكَتْ) শব্দে একত্রিত করা হয়েছে।^৭

এই হরফগুলো আদায় করার সময় মাখরাজে আওয়াজ বেশি শক্তভাবে অবস্থান করে, যার ফলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজে এক ধরনের কঠোরতা সৃষ্টি হয়।

8. আর-রিখাওয়াত (الرِّخَاوَةُ)

রিখাওয়াত হলো শিদাত ও তাওয়াসুত-এর বিপরীত সিফাত। এর আভিধানিক অর্থ নরম, কোমল। ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

الرِّخَاوَةُ: لُغَةً: اللَّيِّنُ، وَإِصْطِلَاحًا: جَرِيَانُ الصَّوْتِ مَعَ الْحَرْفِ لِضَعْفِ الْإِعْتِمَادِ عَلَي الْمَخْرَجِ.^৮

-‘রিখাওয়াত-এর শাব্দিক অর্থ কোমলতা। পরিভাষায়, উচ্চারণের স্থানের উপর নির্ভরতা দুর্বল হওয়ার কারণে অক্ষরের উচ্চারণের সাথে স্বর প্রবাহ অবশিষ্ট থাকাকে রিখাওয়াত বলা হয়।’

যে সকল অক্ষরের উচ্চারণ কোমল বা নরম স্বরে হয় এবং শ্বাস বাকি থাকে তাদেরকে হরফুর রিখাওয়াত (حُرُوفُ الرِّخَاوَةِ) বলে। আশরাফ ‘আলী থাহানুভী (র) বলেন, ‘যে বর্ণসমূহে এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাদেরকে রিখাওয়াত বলা হয়।’^৯

এ বৈশিষ্ট্যের মর্ম হলো, এ প্রকৃতির বর্ণসমূহ উচ্চারণ করার সময় মাখরাজের মধ্যে কণ্ঠস্বর এমন মৃদুভাবে উপনীত হয়, যাতে ধ্বনি অব্যাহত থাকে এবং আওয়াজে এক প্রকারের কোমলতা সৃষ্টি হয়।

এরূপ অক্ষর মোট ষোলটি। যথা-

الثَّاءُ، والحاء، والخاء، والذال، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والظاء، والغين،
والفاء، والهاء، والواء، والياء، والألف، والواو المدية، والياء المدية.

উপরোল্লিখিত গুণদ্বয়ের মাঝে অপর একটি صِفَتْ আছে, যাকে تَوَسُّطُ বলে। এ গুণ বিশিষ্ট অক্ষরগুলোকে হ্রস্বে মুতাওয়াসসাত বলে। এ গুণের পাঁচটি অক্ষর যাদের সমষ্টি لَنْ عُمَرَ এ অক্ষরগুলো উচ্চারণের সময় মাখরাজের মধ্যে আওয়াজ পরিপূর্ণ বন্ধ হবে না এবং পুরোপুরি চালুও থাকবে না।

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

وَحُرُوفُهَا خَمْسَةٌ عَشْرٌ، مَاعَدَا حُرُوفِ الشَّدَّةِ وَالتَّوَسُّطِ ۝

‘শিদ্দাত ও মুতাওয়াসসাতাহর অক্ষরগুলো ব্যতিত ১৫টি (পনেরটি) অক্ষর রিখাওয়াতের হরফ।’

এগুলো আদায় করার সময় মাখরাজে আওয়াজ বা ধ্বনি নরম, দুর্বল ও কোমলতার সাথে অবস্থান করে। তবে আওয়াজ অব্যাহত থাকে এবং আওয়াজে এক রকম নম্রতা পাওয়া যায়।

৫. আত্-তাওয়াসসূত (التَّوَسُّطُ)

এটি শিদ্দাত ও রিখাওয়াত-এর মধ্যবর্তী সিফাত। তাওয়াসসূত শব্দের আভিধানিক অর্থ মধ্যভাগ বা মাঝখান। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

التَّوَسُّطُ لُغَةً: الْإِعْتِدَالُ. وَاصْطِلَاحًا: إِعْتِدَالُ الصَّوْتِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحُرُوفِ ۝

‘আত্-তাওয়াসসূত শব্দের আভিধানিক অর্থ আল-ই-তিদাল অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিভাষায়, অক্ষর উচ্চারণের সময় শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াকেই তাওয়াসসূত বলা হয়।’

এ প্রকার সিফাতের অক্ষর পাঁচটি। যথা- الام، والنون، والعين، والميمين، والراء

ইবনুল জায়ারী (র) এ পাঁচটি অক্ষরকে একত্রে উল্লেখ করে বলেন,

وَيَبِينُ رَخْوَةً وَالشَّدِيدُ لَنْ عُمَرَ ۝

‘لَنْ عُمَرَ এর অক্ষরসমূহে রিখাওয়াহ ও শাদীদার মধ্যপস্থা অবলম্বন করা হবে।’

এ প্রকার মাখরাজের অপর নাম আল-বায়নিয়াহ্। বায়নিয়াহ্ অর্থ মধ্যম। এটিকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো, এটি উচ্চারণের সময় হ্রস্বশ শিদ্দাতের মত শ্বাস বন্ধও হয় না এবং রিখাওয়ার হ্রস্বে মত শ্বাস পরিপূর্ণ চালুও থাকে না। বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ۞

৬. আল-ইসতি‘লা (الِإِسْتِغْلَاءُ)

ইসতি‘লা শব্দের আভিধানিক অর্থ উঠু হওয়া। ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

الِإِسْتِغْلَاءُ لُغَةً: الْإِرْتِفَاعُ، وَاصْطِلَاحًا: إِرْتِفَاعُ اللِّسَانِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ إِلَى الْحَنْكِ الْأَعْلَى ۝

‘ইসতি‘লা শব্দের আভিধানিক অর্থ উঠু হওয়া। পরিভাষায়, অক্ষরের উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হওয়াকে ইসতি‘লা বলা হয়।’

‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الِاسْتِغْلَاءُ لُغَةً: اَلْعُلُوُّ وَالْاِرْتِفَاعُ، وَاصْطِلَاحًا: اِرْتِفَاعُ جُزْءٍ كَثِيرٍ مِنَ اللِّسَانِ عِنْدَ النَّطْقِ بِأَغْلَبِ حُرُوفِهِ إِلَى الْحَنَكِ الْأَعْلَى.^{৭১}

-‘ইসতি’লা শব্দের শাব্দিক অর্থ উচু হওয়া। পরিভাষায়, অক্ষরের উচ্চারণের সময় জিহ্বার অধিকাংশ অংশ উপরের তালুর দিকে উত্থিত হওয়াকে ইসতি’লা বলা হয়।’

যে সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উঠে যায়, সে অক্ষরগুলোকে হ্রস্বফুল মুসতা’লা (حُرُوفُ الْمُسْتَعْلَاءِ) বলে।

ইসতি’লা-এর অক্ষর সাতটি।। যথা- الخاء، والصاد، والظاء، والغين، والطاء، والقاف، والظاء-।

এ অক্ষরগুলোকে خُضْ ضَغْطُ قِظْ বাক্যে একত্রিত করা হয়েছে। ইবনুল জায়ারী (র) বলেন, وَسَبْعٌ، عُلُوٍّ (خُضْ ضَغْطُ قِظْ)-এর মধ্যে ‘আর মুসতা’লিআর অক্ষর সাত (خُضْ ضَغْطُ قِظْ) -এর মধ্যে সীমিত।^{৭২}

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন, (خُضْ ضَغْطُ قِظْ): يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: (خُضْ ضَغْطُ قِظْ) সাতটি অক্ষরকে خُضْ ضَغْطُ قِظْ বাক্যে একত্রিত করা হয়েছে।^{৭৩}

এ অক্ষরগুলো আদায়কালে জিহ্বার অধিকাংশ অংশ উপরের দিকে উঠে যায় এবং আওয়াজ মোটা হয়। ফলে অক্ষরগুলো মোটা হয়। উল্লিখিত সাতটি অক্ষর সর্বাঙ্গীয় মোটা হবে।

৭. আল-ইসতিফাল (الِاسْتِفَالُ)

আল-ইসতিফাল হলো আল-ইসতি’লার বিপরীত সিফাত। এর শাব্দিক অর্থ, নিচে থাকা। ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

الِاسْتِفَالُ لُغَةً: الْإِنْخِفَاضُ، وَاصْطِلَاحًا: اِنْخِفَاطُ اللِّسَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْحَرْفِ مِنَ الْحَنَكِ إِلَى قَاعِ الْفَمِ.

-‘ইসতিফাল শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকোচন। পরিভাষায়, তালু থেকে আওয়াজ বের হওয়ার সময় জিহ্বা নিচের দিকে পতিত হওয়াকে ইসতিফাল বলে।^{৭৪}

যে সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বা নিচের তালুর সাথে মিলিত হয়, তাদেরকে হ্রস্বফুল মুসতালিফাহ (حُرُوفُ الْمُسْتَفَالَةِ) বলে। মুসতা’লিআহ এর সাতটি অক্ষর ব্যতিত বাকি ২২টি অক্ষর মুসতালিফাহ।^{৭৫}

আল-ইসতিফালের অক্ষর ২২টি। যথা-

الهمزة، والباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، واليسن، والشين، والعين، والفاء، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والياء، والألف، والواو المدية، والياء المدية.

- وَحُرُوفُهُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا، وَهِيَ غَيْرُ حُرُوفِ الْإِسْتِغْلَاءِ، وَهِيَ عِشْرُونَ حَرْفًا، وَهِيَ غَيْرُ حُرُوفِ الْإِسْتِغْلَاءِ - ‘ইসতিফাল-এর ২১টি অক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ ইসতি’লার অক্ষরগুলো ব্যতিত সবগুলো।^{৭৬}

ইসতিফালের অক্ষরগুলো আদায়কালে জিহ্বার অধিকাংশ অংশ উপরের দিকে অর্থাৎ তালুর দিকে উঠে না; বরং নিচে থাকে ও আওয়াজ চিকন হয়। উপর্যুক্ত সিফাতের আলোচ্য বিষয় মোটা ও চিকন হওয়া।

৮. আল-ইনতিবাক্ব (الِانْطِبَاقُ)

ইনতিবাকু শব্দের আভিধানিক অর্থ মিলিত হওয়া। ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

الْإِنْطِبَاقُ لُغَةً: الْإِلصَاقُ وَإِصْطِلَاحًا: تَلَاصُقُ اللِّسَانِ وَاطِّبَاقُ عَلَيَّ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْحَنَكِ الْأَعْلَى عِنْدَ النُّطْقِ.^{৭৭}

-‘আল-ইনতিবাকু শব্দের আভিধানিক অর্থ মিলিত হওয়া। পরিভাষায়, কতিপয় অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বার কিছু অংশ উপরের তালুর সাথে মিলিত হওয়াকে আল-ইনতিবাকু বলে।’

যে সকল অক্ষর উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার কিছু অংশ উপরের তালুর সাথে মিলিত হয় তাদেরকে হুরূফুল মুনতাবিকাহ (حُرُوفُ الْمُنتَبِقَةِ) বলে।

আল-ইনতিবাকু-এর অক্ষর চারটি। যথা- والطاء، والضاد، والصاد، والظاء।^{৭৮} ইবনুল জায়ারী (র) বলেন, وَصَادُ ضَادُّ طَاءَ ظَاءٌ - وَصَادُ ضَادُّ طَاءَ ظَاءٌ مُطَبَّقَةٌ, ^{৭৯}

এ অক্ষরগুলো আদায়কালে জিহ্বার অধিকাংশ অংশ উপরের দিকে উঠবে এবং তালুর সাথে মিলবে। যার কারণে এ অক্ষরগুলো বেশি মোটা স্বরে বের হয়।

৯. আল-ইনফিতাহ (الْإِنْفِتَاحُ)

আল-ইনফিতাহ হলো আল-ইতিবাকু-এর বিপরীত সিফাত। এর আভিধানিক অর্থ, পৃথক হওয়া। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الْإِنْفِتَاحُ لُغَةً: الْإِفْتِرَاقُ. وَاصْطِلَاحًا: تَجَافِي اللِّسَانِ عَنِ الْحَنَكِ الْأَعْلَى لِيُخْرِجَ الرِّيحَ عِنْدَ النُّطْقِ بِأَغْلَبِ حُرُوفِهِ.^{৮০}

-‘আভিধানিক অর্থ আল-ইফতিবাকু অর্থাৎ পৃথক হওয়া। পরিভাষায়, যে সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরের তালুর সাথে মিলিত থাকে না; বরং পৃথকভাবে থাকে, যাতে অক্ষর উচ্চারণের সময় উক্ত খালি অংশ দিয়ে বাতাস বের হয়।’

যে সকল অক্ষর উচ্চারণ করার সময় উপরের তালুর সাথে মিলিত না হয়ে প্রশস্ত থাকে, তাদেরকে হুরূফুল মুনফাতিহাহ (حُرُوفُ الْمُنفَتِحَةِ) বলে।

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِنْفِتَاحِ مَا بَيْنَ اللِّسَانِ وَالْحَنَكِ وَخُرُوجِ النَّفْسِ مِنْ بَيْنَهُمَا عِنْدَ النُّطْقِ.^{৮১}

-‘যে সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও তালুর মাঝখানের অংশ উন্মুক্ত থাকে এবং এর মধ্যস্থান হতে শ্বাস বের হয়ে আসে তাদেরকে মুনফাতিহাহ বলে।’

মুতবাকাহ এর চারটি অক্ষর ব্যতিত বাকি পঁচিশটি অক্ষর মুনফাতিহাহ। যথা-

الهمزة، والباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، والخاء، والdal، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والعين، والغين، والفاء، والقاف، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والياء، والألف، والواو المدية، والياء المدية.

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন, وَهِيَ مَا عَدَا الْأَرْبَعَةَ الْمُطَبَّقَةَ - بِحُرُوفِهِ، وَهِيَ مَاعَدَا الْأَرْبَعَةَ الْمُطَبَّقَةَ. ^{৮২} অক্ষর ব্যতিত সব মুনফাতিহার অক্ষর।

মুনফাতিহার হরফগুলো আদায়কালে জিহ্বার অধিকাংশ অংশ উপরে উঠে এবং তালুর সাথে মিলে না।

ইয়লাক্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ পিছলে যাওয়া, জিহ্বার অগ্রভাগ, কিনারা ইত্যাদি।^{৮৩} 'ইযযাত
'উবায়দ দা'আস বলেন, وَهُوَ الزَّلْقُ، - الدَّلَاقَةُ - الْمَذْلَقَةُ শব্দটি الزَّلْقُ হতে উৎপন্ন; এর
অর্থ কিনারা।'^{৮৪}

الْإِدْلَاقُ لُغَةٌ : حَدُّ اللَّسَانِ وَبَلَاغَتُهُ وَطَلْقَتُهُ، وَقِيلَ : الطَّرْفُ. وَإِصْطِلَاحًا: خَفَّةُ الْحَرْفِ وَسُرْعَةُ النُّطْقِ بِهِ لِخُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكِ اللَّسَانِ أَيْ طَرَفِهِ أَوْ مِنْ طَرَفٍ إِحْدَ الشَّقَتَيْنِ أَوْ مِنْهُمَا مَعًا. ^{٢٥}

যে সকল অম্ফর জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের পাশ হতে উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে হ্রস্বফল মুযলিকাহ (حُرُوفُ الْمُدْلَقَةِ) বলে।

الْأَدْلَاقُ لُغَةً: جِدَّةُ الْمَسَانِ وَطَلَقَتْهُ، وَاصْطِلَاحًا: الْإِعْتِمَادُ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ عَلَى ذَلِكِ الْمَسَانِ أَوْ الشَّقَّةِ، أَيْ خُرُوجِ الْحَرْفِ بِسَهُولَةٍ وَيَسْرَةٍ

‘আল-ইয়লাক শব্দের আভিধানিক অর্থ জিহ্বার প্রখরতা, দ্রুততা, নির্বিঘ্নে চালনা করা বা উচ্চারণ করা। ঐ সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বা অথবা ঠোঁটের এক পার্শ্বে ভর করে উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে মযলিকাহ নামে নামকরণ করা হয়েছে।’

আল-ইযলাকু-এর অক্ষর ছয়টি। যথা- **الفاء، والراء، والميم، والنون، واللام، والباء**। এগুলোকে একসাথে **فِرَّ مِنْ لُبِّ** বলে। ইবনুল জাযারী (র) বলেন, **وَفَرَّ مِنَ لُبِّ الْحُرُوفِ الْمَذْنُوقَةِ** অক্ষরগুলোকে মযলিকাহ বলে।^{৮৭}

وَحُرُوفُهَا سِتَّةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: «(فَرَّ مِنْ لُبٍّ)» وَسَمِيَتْ مُذَلِّقَةً لِسُرْعَةِ النُّطْقِ بِهَا لِحَفَّتِهَا. ٥٦

‘আল-ইযলাক্ব-এর ৬টি অক্ষর রয়েছে, যাকে একসাথে **فِرْمَنْ لَّب** পড়া হয়। অক্ষরগুলো হালকা হওয়ায় দ্রুত উচ্চারণ সম্ভব হওয়ায় ময়লিকাহ নামে নামকরণ করা হয়েছে।’

উক্ত অক্ষরগুলো আদায়কালে তার মাখরাজ থেকে দ্রুত বের হয়। এগুলো জিহ্বা ও ঠোঁটের পার্শ্ব থেকে অত্যন্ত সহজ ও দ্রুতগতিতে আদায় হয়।

আল-ইসমাত হলো ইয়্লাকের বিপরীত সিফাত। এর আভিধানিক অর্থ, নিশ্চুপ থাকা, বিরত রাখা। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন, **الإِصْمَاتُ لُغَةً: الْمَنْعُ تَقْوُلٌ** - ‘আল-ইসমাত শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষেধ করা বা বিরত থাকা।’ যেমন বলা হয়ে থাকে, **صَمَّتْ عَنِ الْكَلَامِ أَيْ مَنَعَتْ نَفْسَهُ مِنْهُ**।^{৯৯}

‘আব্দুল ‘আযীয ইবন ‘আব্দিল ফাত্তাহ আল-ক্বারী বলেন,

الإصمات لغة: المَنْعُ يُقَالُ: أَصْمَتُهُ فَصَمَتَ أَيُّ مَنَعَهُ فَأَمْتَنَعَ: وَمِنْهُ الصَّمْتُ أَيُّ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْكَلَامِ.^{৯০}

-‘ইসমাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত রাখা। যেমন বলা হয়, তাকে নিষেধ করেছে, ফলে সে বিরত থেকেছে। এ শব্দ থেকে আস-সামতু অর্থাৎ কথা বলা থেকে বিরত থাকা।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

مِنَ الصَّمْتِ، وَهُوَ الْمَنْعُ. وَحُرُوفُهُ مَا عَدَا الْمُذْلَقَةَ وَسَمِيَتْ مُصَمَّتَةً لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ إِنْفِرَادِهَا فِي كَلِمَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَحْرَفٍ أَوْ خَمْسَةٍ، يَعْْنِي أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ كَانَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَحْرَفٍ كَجَعْفَرٍ، أَوْ خَمْسَةٍ أَحْرَفٍ كَسَفَرَجَلٍ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَعَ الْحُرُوفِ الْمُسَمَّتَةِ حَرْفٌ فَأَكْثَرَ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُذْلَقَةِ.^{৯১}

-‘ইসমাত শব্দটি الصَّمْتُ হতে উৎপন্ন, অর্থ বিরত রাখা। মুয়লিকাহ ব্যতীত অবশিষ্ট অক্ষরগুলো মুসমিতাহ। কেননা চার অক্ষর অথবা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে উল্লিখিত অক্ষরগুলোকে একাকি হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যে শব্দ চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেমন- جَعْفَر অথবা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট যেমন- سَفَرَجَل। এ শব্দের হুরুফুল মুসমিতার সাথে মুয়লিকাহ-এর এক বা একাধিক অক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।’

যে সকল অক্ষর জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের পাশ থেকে উচ্চারিত হয় না, তাদেরকে হুরুফুল মুসমিতাহ (حُرُوفُ الْمُصَمَّمَةِ) বলে। কারো কারো মতে, ইসমাতের দুটি পারিভাষিক সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন-

1. إِمْتِنَاعُ إِنْفِرَادِ الْحُرُوفِ الْمُصَمَّمَةِ أَصُولًا فِي الْكَلِمَاتِ الرَّبَاعِيَّةِ أَوْ الْخَمَاسِيَّةِ.

-‘চার অক্ষর অথবা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট শব্দসমূহের নিয়মানুসারে মুসমিতাহ অক্ষরগুলো একাকি হওয়া থেকে বিরত থাকা।’^{৯২}

2. مَنَعَ حُرُوفِهِ مِنْ أَنْ يُبْنَى مِنْهَا وَحْدَهَا كَلِمَةً رَبَاعِيَّةً أَوْ خَمَاسِيَّةً.

-‘অক্ষরসমূহ থেকে এককভাবে একটি শব্দ গঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখা। শব্দটি মূল অক্ষর হিসাবে চার অক্ষর বিশিষ্ট অথবা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে।’^{৯৩}

এটি হুরুফুল মুয়লিকাহ এর বিপরীত। অর্থাৎ মুয়লিকাহ এর ছয়টি হরফ ব্যতীত বাকি ২৩টি অক্ষর মুসমিতাহ-এর হরফ। যথা-

الهمزة، والتاء، والناء، والجيم، والحاء، والخاء، والذال، والذال، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والقاف، والكاف، والهاء، والواو، والياء، والألف، والواو المدية، والياء المدية.

এ হরফগুলো আদায়কালে তার মাখরাজ থেকে ধীরভাবে দৃঢ় ও মজবুতীর সাথে আদায় হয়।

খ. কিসমুন লা যিদা লাহ্ (قَسَمٌ لَا ضِدَّ لَهُ)

অধিকাংশ ক্বারীর মতে, কিসমুন ‘লা যিদা লাহ্’ সিফাত সাতটি। তবে গায়াতুল মারীদ গ্রন্থকার বলেন, ‘সিফাতু লা যিদা লাহ্ নয়টি। নিম্নে এগুলোর বিবরণ পেশ করা হলো:

১. আস-সাফীর (الصَّافِرُ)

সাফীর শব্দের আভিধানিক অর্থ, শিসের মত তেজ আওয়াজ। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

اصْطِلَاحًا: صَوْتُ زَائِدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الثَّنَائِيَا وَطَرْفِ اللِّسَانِ عِنْدَ النُّطْقِ بِأَحَدِ حُرُوفِهِ. ৯৪

-‘পরিভাষায়, যে অক্ষর উচ্চারণের সময় সামনের উপরের দুই দাঁত ও জিহ্বার কিনারা থেকে যে অতিরিক্ত আওয়াজ বের হয় তাকেই সাফীর বলা হয়।’

যে সকল অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ছানায়া নামক দাঁতের মধ্য হতে পাখির শব্দের ন্যায় এক প্রকার অতিরিক্ত শব্দ বের হতে থাকে, সে সমস্ত অক্ষরকে হুরুফুস সাফীরিয়াহ (الْحُرُوفُ الصَّافِيَرِيَّةُ) বলে।

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

صَوْتُ يَشْتَبِهُ صَوْتَ الطَّائِرِ، يَصْنَحُ النُّطْقَ بِأَحَدِ حُرُوفِهِ. ৯৫

-‘পাখির আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ, যা অক্ষর উচ্চারণের সময় হয়ে থাকে।’

সাফীরের অক্ষর তিনটি। যথা- الصَّادُ، وَالزَّائِ، وَالسَّيْنُ। ইবনুল জারী (র) বলেন, صَفِيرُهَا صَادٌ ৯৬ সাফীরের অক্ষর তিনটি। যথা- الصَّادُ، وَالزَّائِ، وَالسَّيْنُ। ইবনুল জারী (র) বলেন, صَفِيرُهَا صَادٌ ৯৬

সাফীর অক্ষরগুলো আদায়কালে তার মাখরাজের মাঝে চড়ুই পাখির আওয়াজের শিসের ন্যায় একটি অতিরিক্ত আওয়াজ হবে। কিন্তু হরফগুলোর আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- আস্-সীন (السَّيْنُ)-এর আওয়াজ পঙ্গপালের আওয়াজের মতো। আয্-যা (الزَّائِ)-এর আওয়াজ মধুমাছির আওয়াজের মতো। আস্-সোয়াদ (الصَّادُ)-এর আওয়াজ জলচর পাখির আওয়াজের মতো। যেমন- সোফ (السَّيْنُ)-এর আস্-সীন (السَّيْنُ), (الزَّائِ) এবং (الصَّادُ) এর আস্-সোয়াদ (الصَّادُ)।

২. আল-ক্বালক্বালাহ্ (الْقَلْقَلَةُ)

ক্বালক্বালাহ্ শব্দের অর্থ নড়ে উঠা। যে সকল অক্ষর উচ্চারণকালে তাদের মাখরাজ বা উচ্চারণস্থল হতে প্রতিধ্বনি হয়, বিশেষ করে উক্ত অক্ষরসমূহে তাশদীদ থাকলে প্রতিধ্বনি বেশি হয়, সে সকল অক্ষরকে ক্বালক্বালার অক্ষর (الْقَلْقَلَةُ) বলে। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الْقَلْقَلَةُ نَغَاءٌ : إِضْطِرَابٌ، وَاصْطِلَاحًا : إِضْطِرَابُ الصَّوْتِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ نَبْرَةٌ قَوِيَّةٌ. ৯৭

-‘শাব্দিক অর্থ আল-ইযতিরাবু অর্থাৎ নড়াচড়া করা বা স্থির না থাকা। পরিভাষায়, যে অক্ষর উচ্চারণের সময় এমনভাবে আওয়াজ নড়ে যায় যে, তার একটি শক্তিশালী প্রতিধ্বনি শোনা যায়।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقَلُّلِ الْمَخْرَجِ بِالْحَرْفِ عِنْدَ خُرُوجِهِ سَاكِنًا حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ نَبْرَةٌ قَوِيَّةٌ، ৯৮

-‘সাকিন অবস্থায় অক্ষরের উচ্চারণের সময় উচ্চারণস্থল নড়ে উঠাকে ক্বালক্বালাহ্ বলা হয়। এমনকি সাকিন অবস্থায় শক্তিশালী আন্দোলন প্রতিধ্বনিত হয়।’

আহমাদ মুহাম্মাদ ‘আলী দাউদ বলেন,

هِيَ قَلْقَلَةٌ أَوْ إِهْتِجَاجُ الْحَرْفِ السَّاكِنِ أَوْ تَحْرِيقُهُ حَرَكَةً خَفِيفَةً عِنْدَ ضَعْفِهِ حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ نَبْرَةٌ قَوِيَّةٌ. ৯৯

-‘কালকুলাহ্ বলা হয় সাকিনযুক্ত অক্ষরের কম্পন অথবা অক্ষরটিকে চাপ দিয়ে সামান্যভাবে আন্দোলিত করে উচ্চারণ করা, যাতে অক্ষরটির একটি শক্তিশালী প্রতিধ্বনি শোনা যায়।’

কালকুলাহর অক্ষর মোট পাঁচটি। এগুলোকে একত্রে **قُطْبُ جَدٍّ** বলা হয়। ইবনুল জায়ারী (র) বলেন, **قُطْبُ جَدٍّ** কে কালকুলার অক্ষর বলে।^{১০০}

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন, **((قُطْبُ جَدٍّ))** ‘কালকুলাহর পাঁচটি অক্ষর রয়েছে। যেগুলোকে একসাথে **قُطْبُ جَدٍّ** বলা হয়।’^{১০১}

যখন এ অক্ষরগুলো সাকিনযুক্ত হয় তখন আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়। যেমন-**خُلِقْتُ**-এর **قَاف**-এর **مَطْلَع**-এর **طَاء**-এর **لَمْ يَتَّبِ**-এর **الباء**-এর **وَجَعَلَنِي**-এর **جيم** এবং **صَدَّقِ**-এর **صَاد**-এর মধ্যে পাওয়া যায়।

কালকুলার স্তর

কালকুলার স্তর পাঁচটি। যথা-

এক. যদি কালকুলার হরফ তাশদীদযুক্ত ও মাওকূফ (ওয়াকূফ করা) হয়, তখন এগুলোর উপর কালকুলার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি হয়। যেমন-**وَتَبَّ، الْحَقُّ**।

দুই. যদি কালকুলার হরফ সাকিন ও মাওকূফ হয় তখন কালকুলার প্রকাশ প্রথম স্তর থেকে কম হবে। যেমন-**يَسْرِقُ، خُلِقُ**।

তিন. যদি কালকুলার হরফ মুশাদ্দাদ হয়ে মাওকূফ না হয়, তখন দ্বিতীয় স্তর থেকেও কম প্রকাশ হবে। যেমন-**الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ**।

চার. যদি কালকুলার হরফ সাকিন হয়ে মাওকূফ না হয়, তখন কালকুলার প্রকাশ তৃতীয় স্তর থেকেও কম হবে। যেমন-**خُلِقْنَا**।

পাঁচ. যদি কালকুলার হরফ হরকতযুক্ত হয়, তখন হরকত হওয়ার অবস্থায় এই সিফাত আদায় হবে। কিন্তু হরকতের কারণে এই সিফাতের প্রকাশ হবে না। তাই সাকিন হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে যে, এই অবস্থায় এই সিফাতের অনুভূতিও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে।

৩. আল-লীন (اللين)

লীন শব্দের অর্থ নরম, সহজ, কোমল। ওয়াও (واو) এবং ইয়া (ياء) সাকিন, তার পূর্বে যবর থাকলে সহজে অক্ষর দুটি উচ্চারিত হয় বলে এ দুটি অক্ষরকে হ্রস্বল লীন (**حُرُوفُ اللَّيْنِ**) বলে।

‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

اللَّيْنُ لَغَةٌ : السَّهْوَةُ وَاصْطِلَاحًا : إِخْرَجَ الْحَرْفَ مِنْ مَخْرَجِهِ بِسَهْوَةٍ وَعَدَمِ كُفَّةٍ عَلَى اللِّسَانِ।^{১০২}

-‘আল-লীন শব্দের আভিধানিক অর্থ আস্-সাহূলাতু অর্থাৎ কোমল হওয়া, নরম হওয়া। পরিভাষায়, কোন অক্ষর মাখরাজ থেকে বিনা কষ্টে ও সহজে উচ্চারণ হওয়াকেই লীন বলা হয়।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা’আস বলেন,

عِبَارَةٌ عَنْ مَدِّ حُرُوفِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ السَّاكِنَتَيْنِ بَعْدَ فَتْحِ حَالَةِ الْوَقْفِ مِثْلُ: خَوْفٌ وَبَيْتٌ مَعَ لَيْنٍ وَسَهْوَةٍ وَعَدَمِ كُلْفَةٍ عَلَى اللِّسَانِ.^{১০৩}

-‘ওয়াকফের অবস্থায় যবরের পরবর্তী সাকিনযুক্ত ওয়াও অথবা ইয়াকে জিহ্বার উপর হালকা, কোমল ও নরমভাবে দীর্ঘ করে পড়াকে লীন বলে।’

লীন-এর সিফাত মাত্র দুটি অক্ষরে পাওয়া যায়। যবরের বাম পার্শ্বে জযমওয়ালা ওয়াও (واو) অথবা ইয়া (ياء) যখন লীন (لين) বা সিফাত (صفت) হবে, তখন এ অক্ষরগুলো আদায়কালে তার মাখরাজ থেকে হালকাভাবে তড়িতাড়ি আদায় করতে হবে।

৪. আল-ইনহিরায়ফ (الإنحراف)

ইনহিরায়ফ শব্দের আভিধানিক অর্থ, ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الْإِنْحِرَافُ لُغَةً : الْمَيْلُ وَالْعُدُولُ. وَاصْطِلَاحًا : الْمَيْلُ بِالْحَرْفِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ حَتَّى يَنْصِلَ بِمَخْرَجٍ آخَرَ.^{১০৪}

-‘আল-ইনহিরায়ফ শব্দের আভিধানিক অর্থ আল-মায়লু ওয়াল ‘উদুলু অর্থাৎ সরে যাওয়া। পরিভাষায়, উচ্চারণের সময় মাখরাজ থেকে বের হয়ে অক্ষরটি এমনভাবে সরে যাওয়া যে অপর মাখরাজের সাথে মিলে যায়, এমন সিফাতকে ইনহিরায়ফ বলা হয়।’

যে সকল অক্ষর উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ একটু উল্টে যায় এবং নিজের উচ্চারণস্থল অতিক্রম করে অন্য অক্ষরের উচ্চারণের দিকে অগ্রসর হয়, তাদেরকে হুরুফুল মুনহারিফাহ (حُرُوفُ الْمُنْحَرِفَةِ) বলে।

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَيْلِ الرَّاءِ وَلِلَّامِ عَنْ مَخْرَجِهِنَّ إِلَى طَرْفِ اللِّسَانِ.^{১০৫}

-‘রা (ر) ও লাম (لام) এর উচ্চারণের সময় এদের উচ্চারণের স্থান হতে জিহ্বার অগ্রভাগের দিকে ধাবিত হওয়াকে ইনহিরায়ফ বলে।’

ইনহিরায়ফ (إِنْحِرَافٌ) এর সিফাতটি (صفت) হয় দুটি অক্ষরে। যথা- রা (راء) ও লাম (لام)। এ অক্ষরগুলো আদায়কালে একটি অক্ষর অন্য অক্ষরের মাখরাজের দিকে ধাবিত হবে। তবে তা না হওয়াই উচিত।

৫. আত্-তাকরীর (التكرير)

তাকরীর শব্দের অর্থ, বারবার বলা। যে অক্ষর উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ কিছুটা কেঁপে উঠে তাকে হরফুত তাকরীর (حَرْفُ التَّكَرُّارِ) বলে। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

التَّكَرِيرُ لُغَةً الْإِعَادَةُ. وَاصْطِلَاحًا : إِرْتِعَادُ رَأْسِ اللِّسَانِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ.^{১০৬}

-‘আত্-তাকরীর শব্দের আভিধানিক অর্থ পুনরাবৃত্তি করা। পরিভাষায়, অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ কেঁপে উঠাকেই তাকরীর বলা হয়।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قُبُولِ الرَّاءِ لِلتَّكْرِيرِ لِإِزْعَادِ طَرْفِ اللِّسَانِ عِنْدَ النُّطْقِ بِهَا، وَهَذِهِ الصِّفَةُ تُعْرَفُ
إِتِّجَتَبَ لِيَعْمَلَ بِهَا.^{১০৭}

-‘রা (راء) উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগের কম্পন হওয়ার কারণে রা অক্ষরটি বারবার উচ্চারিত হতে চায়, এটিকে তাকরার বলে। আর এগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য সংজ্ঞায়িত করা হয়, কার্যকর করার জন্য নয়।’

ইবনুল জারী (র) বলেন, فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ وَبِتَّكْرِيرِ جُعِلَ -‘লাম (لام) এবং রা (راء) এর মধ্যে যে রা (راء) কে সিফাতে তাকরীর-এর সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।’^{১০৮}

এ সিফাতটি কেবল রা (راء) অক্ষরের মধ্যে পাওয়া যায়। যেহেতু রা (راء) উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগে কম্পন হওয়ার ফলে একটি রা (راء) উচ্চারণ করতে গিয়ে একাধিক রা (راء) উচ্চারিত হয়। আর এজন্য এ প্রকারের সিফাতকে হরফুল মুকাররার (حَرْفُ الْمُكَرَّرِ) বলে।

৬. আত্-তাফাশশী (التَّفْشِي)

তাফাশশী শব্দের অর্থ, প্রশস্ততা। যে অক্ষর উচ্চারণকালে মুখের মধ্যে বাতাস যাওয়ার ফলে মুখ প্রশস্ত হয়, তাকে হরফুত তাফাশশী (حَرْفُ التَّفْشِي) বলে। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

التَّفْشِي لُغَةً الْإِنْتِشَارُ وَقِيلَ الْإِتْسَاعُ. وَاصْطِلَاحًا : انْتِشَارُ خُرُوجِ الرِّيحِ بَيْنَ اللِّسَانِ وَالْحَنَكِ الْأَعْلَى
عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ.^{১০৯}

-‘আত্-তাফাশশী শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রশস্ত হওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া। পরিভাষায়, অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও তালুর মাঝখানে বাতাস প্রশস্ত হয়ে বের হওয়াকে তাফাশশী বলা হয়।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ انْتِشَارِ النَّفْسِ فِي الْفَمِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالشَّيْنِ.^{১১০}

-‘শীন উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসকে মুখে ছড়িয়ে দেয়াকে তাফাশশী বলা হয়।’

আত্-তাফাশশী এর হরফ একটি। যথা- শীন (شين)। ইবনুল জারী (র) বলেন, وَلِلتَّفْشِيِّ الشَّيْنُ - ‘এবং তাফাশশীর জন্য শীন (شين)।’^{১১১}

তাফাশশী (تَفْشِي) সিফাতটি (صِفَتٌ) শুধু শীন (شين) অক্ষরে পাওয়া যায়। আর উক্ত অক্ষরটি আদায়ের সময় মুখের খালি স্থান আওয়াজে ছড়িয়ে যায়।

৭. আল-ইসতিতালাহ্ (الِاسْتِطَالَةُ)

ইসতিতালাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ, লম্বা হওয়া। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الِاسْتِطَالَةُ لُغَةً : الْإِمْتِدَادُ، وَاصْطِلَاحًا : إِمْتِدَادُ الصَّوْتِ مِنْ أَوَّلِ إِحْدَى حَافَتَيْ اللِّسَانِ إِلَى آخِرِهَا.^{১১২}

-‘আল-ইসতিতালাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ দীর্ঘ হওয়া, লম্বা হওয়া। পরিভাষায়, অক্ষর উচ্চারণের সময় জিহ্বার এক কিনারা থেকে অপর কিনারা পর্যন্ত স্বর দীর্ঘ হওয়াকে আল-ইসতিতালাহ্ বলা হয়।’

‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন,

وَهُوَ عِبَارَةٌ إِمْتِدَادِ الصَّادِ فِي مَخْرَجِهَا حَتَّى تَتَّصِلَ بِمَخْرَجِ اللَّامِ.^{১১৩}

-‘দোয়াদ অক্ষরটি নিজ উচ্চারণ স্থানে লম্বা হয়ে লামের উচ্চারণের স্থানের সাথে মিলিত হওয়াকে ইসতিতলাহ বলে।’

যেহেতু দোয়াদ (ضاد) উচ্চারণের সময় এর স্বর লম্বা হয়ে লাম এর উচ্চারণ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে। সেজন্য দোয়াদ (ضاد)-কে হরফুল মুসতাতিল (حَرْفُ الْمُسْتَطِيلِ) বলে।

ইসতিতলাহ (إِسْتِطَالَةٌ) এমন গুণ বিশিষ্ট অক্ষর, যা শুধু দোয়াদ (ضاد) অক্ষরের মধ্যে পাওয়া যায়। দোয়াদ (ضاد) আদায় করার সময় মাথুরাজের মধ্যে জিহ্বার কিনারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ লম্বা হয়। যেমন- وَلَا الضَّالِّينَ। ইবনুল জাযারী (র) বলেন, ضَادًا إِسْتِطِيلَ-‘দোয়াদ (ضاد)-কে ইসতিতলাহর সাথে পড়।’^{১১৪}

৮. আল-খাফাউ (الْخَفَاءُ)

খাফাউ শব্দের আভিধানিক অর্থ, গোপন করা। পরিভাষায়, অক্ষর উচ্চারণের সময় স্বরকে গোপন করে উচ্চারণ করাকে আল-খাফাউ বলা হয়। ‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الْخَفَاءُ لُغَةً : الْإِسْتِتَارُ. وَاصْطِلَاحًا : خَفَاءُ صَوْتِ الْحَرْفِ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ.^{১১৫}

-‘আল-খাফাউ শব্দের আভিধানিক অর্থ, গোপন করা, লুকানো। পরিভাষায়, অক্ষর উচ্চারণের সময় স্বরকে গোপন করে উচ্চারণ করাকে আল-খাফাউ বলা হয়।’

ড. আবুল বারাকাত হিজবুল্লাহ্ বলেন, خَفَاءُ صَوْتِ الْحَرْفِ-‘অক্ষর উচ্চারণের স্বর গোপন করাকে আল-খাফাউ বলা হয়।’^{১১৬}

আল-খাফাউ-এর অক্ষর চারটি। তিনটি মাদের অক্ষর এবং হা (هَاء) বর্ণ। এগুলোকে একসাথে হাবী (هَوِي) বলা হয়।

৯. আল-গুন্নাহ্ (الْغُنَّةُ)

গুন্নাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন স্বর, যা নাকের বাঁশিতে বাজে। পরিভাষায় গুন্নাহ্ হলো এমন সুমধুর স্বর যা নূন ও মীম বর্ণে সকল অবস্থায় সংঘটিত হয়। এর অক্ষর দুটি। যথা- মীম (ميم) ও নূন (نون)।

‘আতিয়াহ্ ক্বাবিল নাসির বলেন,

الْغُنَّةُ لُغَةً : صَوْتٌ لَهُ رَيْنٌ فِي الْخَيْشُومِ. إِنْصِلَاحًا : صَوْتٌ لَذِيذٌ مُرَكَّبٌ فِي جِسْمِ النَّوْنِ وَالْمِيمِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ.^{১১৭}

-‘গুন্নাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন স্বর, যা নাকের বাঁশিতে বাজে। পরিভাষায় গুন্নাহ্ হলো এমন সুমধুর স্বর, যা নূন ও মীম বর্ণে সর্বাবস্থায় সংঘটিত হয়।’

ড. আবুল বারাকাত হিজবুল্লাহ্ বলেন,

الْغُنَّةُ إِنْصِلَاحًا : هِيَ صَوْتٌ لَذِيذٌ مُرَكَّبٌ فِي جِسْمِ الْمِيمِ وَالنُّونِ الْمَشْدَدَتَيْنِ.^{১১৮}

-‘পরিভাষায় গুন্নাহ্ হলো এমন সুমধুর স্বর, যা মীম ও নূন বর্ণে তাশদীদ যুক্ত হলে সংঘটিত হয়।’

নূন (نون) ও মীম (ميم) ইখফা (إِخْفَاء) বা ইদগামে নাক্বিস (إِدْغَامٌ نَاقِصٌ)-এর অবস্থায় যে গুন্নাহ্ হয়ে থাকে তাই উদ্দেশ্য। আর এটা হ্রস্ব ফার‘ঈ (حُرُوفُ فَرْعِي); এখানে নূন মুখফা এবং ইদগামে নাক্বিসযুক্ত

নূন(نُونٌ مُخْفَى وَمُدْعَمٌ بِدَعَامٍ نَاقِصٍ) উদ্দেশ্য। সিফাতের গুল্লাহ্ এখানে উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ মতামত অনুযায়ী এই অক্ষরদ্বয়ের মাখরাজ ইখ্ফা বা ইদ্গাম-এর অবস্থায় আসল মাখরাজ (জিহ্বা ও দুই ঠোঁট) থেকে خَيْشُومٌ তথা নাকের বাঁশির মাখরাজে প্রভাব বিস্তার করে, আর গুল্লাহ্-এর সিফাত হরফের স্তরে পৌঁছে যাত-এর মত হয়ে যায়। যেমনিভাবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হুরুফুল মাদ্দাহ্-এর মাখরাজ আসল মাখরাজ থেকে জাওফ এর দিকে চলে যায়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আরবী অক্ষরসমূহের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা সিফাত মোট সতেরটি। এগুলোকে স্থায়ী বলার কারণ হলো, এ অক্ষরগুলোর মধ্যে এই সিফাতগুলো সবসময় বিদ্যমান থাকে। আরবী অক্ষর উচ্চারণের সময় এই সিফাতগুলো রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। এর মধ্যে দশটি সিফাত জোড়ায়-জোড়ায় থাকে, আর অবশিষ্ট সাতটি সিফাত এককভাবে আসে। জোড়ায়-জোড়ায় সিফাত আসার কারণ হলো, একটি অক্ষরের মধ্যে কোন একটি সিফাত থাকলে জোড়ার অপর অক্ষরটি থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি অক্ষরে এই পাঁচটি জোড়ার প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে। আর অবশিষ্ট সাতটি সিফাত এককভাবে আসে। অর্থাৎ কোন অক্ষরে তা বিদ্যমান থাকে আবার কোন অক্ষরে তা বিদ্যমান থাকে না। এ প্রকারগুলোর হুকুম অনুযায়ী আল-কুরআন তিলাওয়াত করা আবশ্যিক। কেননা আল-কুরআন তিলাওয়াতের সময় সঠিকভাবে মাখরাজ ও সিফাতের ব্যবহার না হলে অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে। আর অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ে কোন সাওয়াব লাভ করা যায় না; বরং এতে তিলাওয়াতকারী গুল্লাহ্গার হবেন। মোটকথা, আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতে মাখরাজ ও সিফাতের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যিক। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকলকে সঠিক বিধান অনুযায়ী আল-কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তথ্যনির্দেশ

- ১ কুসরী ইবরাহীম, নূহাতুল-কারী, অনুবাদ: হাফেজ আহমদ (ঢাকা: গোলশান লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ১০।
- ২ সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৮০।
- ৩ ইবন মানযুর আল-ইফরীরী, লিসানুল-‘আরাব, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াইত তুরাখিল ‘আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫২; আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আল-ফায়ুযী, আল-মিসবাহুল মুনীর, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল ‘ইলমিয়াহ্, ১ম সং., ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ১৬৮।
- ৪ ড. ‘আব্দুল-কায্যুম ইবন ‘আদিল গাফুর আস-সিন্দী, সাফহাতু ফী ‘উলূমিল কিরাআত (মাক্কাহ্ আল-মুকাব্বরামা: আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৬৭; ড. তারিক ইবন মুহাম্মাদ আল-খুওয়াতির, আয়সারুল বায়ান ফী তাজবীদিল কুরআন, তাকুদীম: ড. ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আদিল রহমান আল-জিবরান ও শায়খ মুহাম্মাদ কারীম রাজিহ্ (রিয়াদ: দারু কুনূয ইশবীলিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২০১।
- ৫ মুহাম্মাদ ‘আলী আত-থাহানুভী, কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল-ফুনুন, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্, ১৪২৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩।
- ৬ পূর্বোক্ত।

- ৭ আবু 'আমর 'উছমান ইবন সা'ঈদ আদ-দানী, *আত-তাহদীদ ফী ইতকানিত্ তাজবীদ*, তাহকীক: গানিম কুদুরী আল-হামদ (প্রকাশনা স্থান অনুল্লেক্স: দারুল আরদান, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ১০২; *আয়সারুল বায়ান ফী তাজবীদিল কুরআন*, পৃ. ২০১।
- ৮ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনুজী আল-ভূপালী, *আবজাদুল-উলুম*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯৭।
- ৯ 'ইযযাত 'উবায়দ দাআস, *ফাননুত-তাজবীদ* (জিদ্দাহ: দারুল মাতবু'আতিল-হাদীছাহ, ৮ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৫৫।
- ১০ মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল-ফিকহ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪৭৩।
- ১১ আহমাদ মুহাম্মাদ 'আলী দাউদ, *'উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীছ* (আম্মান: দারুল বাশারিয়াহ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৩০।
- ১২ *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, পৃ. ৪৭৩।
- ১৩ *সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত*, পৃ. ১৬৭।
- ১৪ *আবজাদুল-উলুম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭।
- ১৫ পূর্বোক্ত।
- ১৬ *আয়সারুল বায়ান ফী তাজবীদিল কুরআন*, পৃ. ২০২।
- ১৭ *কাশশাফু ইসতিলাহাতিল-ফুনুন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩।
- ১৮ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-জাযারী, *তায়্যাবাতুন নাশর ফিল কিরাআতিল 'আশার* (মদীনাতুল মুনাওয়্যারাহ: মাকতাবাতু দারুল হাদী, ২য় সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৫।
- ১৯ *ফাননুত-তাজবীদ*, পৃ. ৫৬।
- ২০ *নুযহাতুল-কারী*, পৃ. ১০।
- ২১ *সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত*, পৃ. ১৬৮; *আয়সারুল বায়ান ফী তাজবীদিল কুরআন*, পৃ. ২০১।
- ২২ *ফাননুত-তাজবীদ*, পৃ. ৫৬।
- ২৩ *'উলুমুল-কুরআন ওয়াল-হাদীছ*, পৃ. ১৩১।
- ২৪ *তায়্যাবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার*, পৃ. ৩৫।
- ২৫ *নুযহাতুল-কারী*, পৃ. ১০।
- ২৬ *ফাননুত-তাজবীদ*, পৃ. ৫৬।
- ২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।
- ২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।
- ২৯ *তায়্যাবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার*, পৃ. ৩৫।
- ৩০ মুহাম্মদ আশরাফ 'আলী তাহানুভী, *জামালুল-কুরআন* (ঢাকা: রশীদিয়াহ লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ৮।
- ৩১ *তায়্যাবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার*, পৃ. ৩৫।
- ৩২ *ফাননুত-তাজবীদ*, পৃ. ৫৭-৬০।
- ৩৩ *তায়্যাবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার*, পৃ. ৩৫।
- ৩৪ ক্বারী ইবরাহীম খলীল (র) বলেন, 'ওয়াও (وَ) মীম (میم), বা (باء) এ অক্ষরগুলো দুই ঠোঁটে থেকে বের হয়; কিন্তু এগুলোর মধ্যে মাদ্দ নেই। তবে ওয়াও (وَ) বের হবার সময় দুই ঠোঁটের মাঝখানে ফাঁকা হয়ে থাকে। আর বা (باء) ও মীম (میم)-এর উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট মিলিত অবস্থায় থাকবে।' *দ্র. নুযহাতুল-কারী*, পৃ. ১২।
- ৩৫ *তায়্যাবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার*, পৃ. ৩৫।

-
- ৩৬ হাফিয আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিজরুল্লাহ, দুরসু ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ (ঢাকা: প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৪৮।
- ৩৭ সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত, পৃ. ১৬৭।
- ৩৮ দুরসুন ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ৪৮; আব্দুর রায়যাক আল-বুকেরা, ফায়যুল-মাজীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ (কায়রো: আদ-দা'ওয়াতু ওয়াদ-দু'আহ, তা.বি.), পৃ. ২৫; শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাহমুদ, হাদিয়াতুল-মুত্তাফীয ফী 'আহকামিত্ত-তাজবীদ, তাহরীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (কায়রো: মাকতাবাতুস্ সুন্নাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ২৯; ড. আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল, মুযাক্করাতু ফী তাজবীদিল কুরআনিল কারীম (মক্কা: মা'আহ্‌হাদ আল-লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ১১।
- ৩৯ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৬৩।
- ৪০ জামালুল-কুরআন, পৃ. ১৪।
- ৪১ কাওয়া'ইদুল-ফিক্‌হ, পৃ. ৩৫০।
- ৪২ সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত, পৃ. ১৬৭।
- ৪৩ গয়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ১২৮।
- ৪৪ পূর্বোক্ত।
- ৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
- ৪৬ সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত, পৃ. ১৬৯।
- ৪৭ পূর্বোক্ত।
- ৪৮ সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত, পৃ. ১৬৯।
- ৪৯ গয়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ১২৯।
- ৫০ সাফহাতু ফী 'উলুমিল কিরাআত, পৃ. ১৭০।
- ৫১ নুযহাতুল-কারী, পৃ. ১৩।
- ৫২ গয়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ১২৯।
- ৫৩ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৬৫; গয়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ১৩০।
- ৫৪ জামালুল-কুরআন, পৃ. ১৪।
- ৫৫ তায়্যিবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার, পৃ. ৩৫।
- ৫৬ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৬৫।
- ৫৭ পূর্বোক্ত।
- ৫৮ জামালুল-কুরআন, পৃ. ১৪।
- ৫৯ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৬৫।
- ৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।
- ৬১ জামালুল-কুরআন, পৃ. ১৫।
- ৬২ তায়্যিবাতুন-নাশর ফিল-কিরাআতিল-'আশার, পৃ. ৩৫।
- ৬৩ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৬৬।
- ৬৪ পূর্বোক্ত; গয়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ১৩২।
- ৬৫ জামালুল-কুরআন, পৃ. ১৫।
- ৬৬ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৬৬।
- ৬৭ গয়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্ত-তাজবীদ, পৃ. ১৩১।

-
- ৬৮ তায়্যিবাতুন্-নাশর ফিল-কিরাতিল-‘আশার, পৃ. ৩৬।
- ৬৯ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩১।
- ৭০ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৭।
- ৭১ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩২।
- ৭২ তায়্যিবাতুন্-নাশর ফিল-কিরাতিল-‘আশার, পৃ. ৩৬।
- ৭৩ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৭।
- ৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।
- ৭৫ জামালুল-কুরআন, পৃ. ১৭।
- ৭৬ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৬।
- ৭৭ পূর্বোক্ত।
- ৭৮ পূর্বোক্ত।
- ৭৯ তায়্যিবাতুন্-নাশর ফিল-কিরাতিল-‘আশার, পৃ. ৩৬।
- ৮০ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৩।
- ৮১ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৮।
- ৮২ পূর্বোক্ত।
- ৮৩ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৪।
- ৮৪ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৮।
- ৮৫ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৪।
- ৮৬ কাওয়া‘ইদুত্-তাজবীদ, পৃ. ৪৪; ফায়যুল-মাজীদ, পৃ. ২৯; আল-মুখতাসারুল-মুফীদ, পৃ. ১৪; হাদিয়াতুল-কারী, পৃ. ৮৩।
- ৮৭ তায়্যিবাতুন্-নাশর ফিল-কিরাতিল-‘আশার, পৃ. ৩৬।
- ৮৮ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৮।
- ৮৯ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৪।
- ৯০ কাওয়া‘ইদুত্-তাজবীদ, পৃ. ৪৪।
- ৯১ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৬৮।
- ৯২ ফায়যুল-মাজীদ, পৃ. ২৬; কাওয়া‘ইদুত্-তাজবীদ, পৃ. ৪৪।
- ৯৩ আল-মুখতাসারুল-মুফীদ, পৃ. ১৪।
- ৯৪ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৫।
- ৯৫ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৭০।
- ৯৬ তায়্যিবাতুন্-নাশর ফিল-কিরাতিল-‘আশার, পৃ. ৩৬; ‘ইযযাত ‘উবায়দ দা‘আস বলেন, وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: الصَّادُ، وَالرَّأْيُ، وَالسَّيْنُ. ‘সাহীর-এর তিনটি অক্ষর রয়েছে। যথা- সোয়াদ (صَاد), সীন (سِين) ও যা (رَاء)।
- দ্র. ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৭০।
- ৯৭ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৫।
- ৯৮ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৭০।
- ৯৯ ‘উলুমুল-কুরআন ওয়াল-হাদীছ, পৃ. ১২৫।
- ১০০ তায়্যিবাতুন্-নাশর ফিল-কিরাতিল-‘আশার, পৃ. ৩৬।
- ১০১ ফাননুত্-তাজবীদ, পৃ. ৭০।
- ১০২ গায়াতুল মারীদ ফী ‘ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

-
- ১০৩ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৭১।
১০৪ গায়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৭।
১০৫ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৭১।
১০৬ গায়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৭।
১০৭ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৭১।
১০৮ তায়্যিবাতুন-নাশর ফিল-কিরআতিল-'আশার, পৃ. ৩৬।
১০৯ গায়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৮।
১১০ ফাননুত-তাজবীদ, পৃ. ৭১।
১১১ তায়্যিবাতুন-নাশর ফিল-কিরআতিল-'আশার, পৃ. ৩৬।
১১২ গায়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৮।
১১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।
১১৪ তায়্যিবাতুন-নাশর ফিল-কিরআতিল-'আশার, পৃ. ৩৬।
১১৫ গায়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৮।
১১৬ দুরুসু ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ৬০।
১১৭ গায়াতুল মারীদ ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ১৩৮।
১১৮ দুরুসু ফী 'ইলমিত্-তাজবীদ, পৃ. ৬০।

মধ্যযুগে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম অবদান (৬২২-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ)

ড. আবুল বাশার মোহাম্মাদ সরোয়ার আলম*

Abstract: The first institutional hospital was established in Jundeshapur, Persia in the Medieval Period to establish basic human rights medical services. With the advent of Islam, new dimensions were added to medical services. Under the guidance of the Holy Quran and Sunnah, Muslim rulers took an effective role in the expansion of medical services. As a result, during the rule of Umayyads, Abbasids, Fatimids, Aghlabi, Ayubi Mamluks, numerous hospitals were established in Baghdad, Damascus, Syria, Egypt, Jerusalem, Turkey, Spain, Cordoba, Granada, Tunisia, Morocco, etc. The services of the mobile hospital continued with the institutional hospital. Hospitals established in the middle ages ensured the treatment of all classes of people. Along with the famous hospital, medical school, library, mosque were established. Women men were treated in separate wards by experienced and physicians and nurses. All the expenses of the hospital were met from the treasury of the Waqf Board. Above all, from 622-1492 A.D., these hospitals played a fundamental role in medical services.

ভূমিকা

মধ্যযুগের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুনত্ব ও আধুনিকতার সাথে পরিচিত করেছে। মানুষকে অভিনব কল্যাণময় ও উদ্ভাবনের পথ দেখিয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকারের বিকাশে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। মধ্যযুগের প্রারম্ভিক সময় মানব সভ্যতা অন্ধকার ও অমানিশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি চর্চার পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এমন ক্রান্তিকালে ইসলামের আগমন মানবজাতির জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত করেছিল। মহানবী (সা.)-এর যুগে অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও ডাক্তারি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলিম শাসক ও বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং বাগদাদ, উত্তর আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া, আন্দালুস, কর্ডোভা প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য চিকিৎসালয় গড়ে ওঠে। এ সকল চিকিৎসালয়ে শ্রেণি ও পেশার রোগীদের সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগের মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের সকল সূত্রধরেই পরবর্তীকালের চিকিৎসালয় আধুনিকায়নের পথ বিকশিত হয়। এ যুগের চিকিৎসালয়সমূহ পরবর্তীকালে অনবদ্য অবদান রাখলেও এ সকল চিকিৎসালয়ের ইতিহাস বর্তমান সময়ের মুসলিম পাঠকের নিকট অনেকটাই অবহেলিত এবং এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তও অপ্রতুল। এজন্য পাঠক সমাজের নিকট মধ্যযুগের চিকিৎসা সেবা তথা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের অবদান ও ঐতিহ্য সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা আবশ্যিক, যেন পাঠক সমাজ তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত ইতিহাস জানতে পারে। মূলত এ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মধ্যযুগে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম অবদান (৬২২-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) শীর্ষক শিরোনামে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হলো।

চিকিৎসালয়ের পরিচয়

মধ্যযুগে^১ চিকিৎসালয়কে বিমারিস্তান বলা হতো। এটা ফার্সী ভাষার শব্দ। Bimar শব্দের অর্থ অসুস্থ বা অসুস্থ ব্যক্তি, আর Istan অর্থ অবস্থান বা জায়গা। সুতরাং বিমারিস্তান অর্থ হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তির জায়গা।^২

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Edward G. Browne বলেন, A hospital is a corruption of the Persian word Bimaristan, which signifies in that language a place for the sick.^৩

আরবীতে চিকিৎসালয়কে মুস্তাশফা বা দার আল শিফা বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে নিরাময় ঘর। চিকিৎসালয়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Hospital, যা ল্যাটিন শব্দ Hospes থেকে এসেছে। অর্থ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকর্তা আর Hospital শব্দের অর্থ হচ্ছে চিকিৎসাগার। চিকিৎসালয় হলো এমন একটি নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে অসুস্থ বা আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসক ও নার্সদের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

The New shorter Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে, An Institution or establishment Providing medical or surgical treatment for the ill or wounded.^৪

The New Encyclopedia Britannica তে বলা হয়েছে, A hospital is an Institution that is built staffed and equipped for the indefication diagnosis of disease and the treatment both medical and surgical of the sick and the injured.^৫

আফনান মুহাম্মাদ হামাদান বলেন, هو مبني أو جزء من مبني يستخدم للرعاية الطبية أو النفسية أو للتوليد أو لإجراء العمليات الجراحية “চিকিৎসালয় বলা হয় এমন একটি ভবন বা ভবনের অংশকে, যেটিকে চিকিৎসা পরিষেবা বা মানসিক পরিচর্যা বা সন্তান প্রসব বা অপারেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।”

চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি

চিকিৎসাবিজ্ঞানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রাচীন। ঠিক কোন সময় থেকে চিকিৎসালয়ের সূচনা হয়েছিল বলা কঠিন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুদূর অতীতকাল থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক কোন চিকিৎসালয় ছিল না। যদিও ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন মিসর, মেসোপটেমিয়া, চীন, পারস্য ও ভারতে চিকিৎসালয় কেন্দ্রিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল বলে অভিমত পেশ করেছেন। তবে ঐতিহাসিকদের এ দাবির অনুকূলে তথ্য-উপাত্ত অপ্রতুল। প্রাচীনকালে ধর্মযাজকদের অধীনে মন্দির কেন্দ্রিক চিকিৎসার প্রচলন ছিল। এগুলো স্বাস্থ্যসেবা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের পরিবর্তে এক অলৌকিক নিরাময়ের ভ্রান্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এস.কে হার্মানেহ বলেন, The were generally under the supervision of religious orders of various kinds for example, In ancient Mesopotamia and Egypt, medical practice in temples and elsewhere reflects the fact that care for the sick was mainly the privilege of the priest-physician.^৬

রোমানরাই সর্বপ্রথম চিকিৎসালয় ব্যবস্থার প্রচলন করে। সাম্রাজ্য জয়ের সাথে সাথে রোমানরা চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এভাবে ইউরোপে অসংখ্য সামরিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হলে বাইজান্টাইন, এডেসা, এথেন্স প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিজ্ঞানীরা জুন্দিশাপুর^৭ চলে আসেন। তৎকালীন শাসক নুশিরওয়ানের উদার নীতির ফলে সকল ধর্মের বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়ে জুন্দিশাপুরে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। যার ফলে পঞ্চম মতান্তরে ষষ্ঠ শতকে আরব নগরীর অদূরেই জুন্দিশাপুর চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চিকিৎসালয়কে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা কেন্দ্র বলা হয়।^৮ মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরতের কিছুদিন পর মসজিদে নববীর আঙিনায় তাবু টাঙিয়ে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এরূপ চিকিৎসালয়কে মুসলিম জগতের সর্বপ্রথম চিকিৎসালয় হিসেবে অভিহিত করা হয়।^৯ এছাড়া মহানবী (সা.) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তিনি যুদ্ধে আহত সাহাবীগণের চিকিৎসার জন্য যুদ্ধের ময়দানের অনতিদূরে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য উপযোগী

স্থানে তাবু স্থাপনের নির্দেশ দেন। তাবু ছিল যুদ্ধাহত সাহাবীগণের অস্থায়ী চিকিৎসালয়। খন্দক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা চিকিৎসা সেবার জন্য স্বতন্ত্র তাবু স্থাপন করেন। সাদ ইবন মুআয (রা.) যুদ্ধে আহত হলে মহানবী (সা.) তাকে এই স্বতন্ত্র তাবুতে রাখার নির্দেশ দেন। তাবুতে আহত রোগীদের সেবা দেয়ার জন্য প্রসিদ্ধ নারী সাহাবী চিকিৎসক রুফাইদা বিনতে সাদ আল-আসলামায়িয়া (রা.), উম্মু সিনান সহ অন্যরা চিকিৎসা সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে অস্থায়ী চিকিৎসালয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে,

عن محمود بن لبيد قال لما اصاب اكل ساعد يوم الخندق فنقل حوله عند امرأة يقال لها ربيعة و كانت تدوي الجرحى^{১১}

“মাহমুদ ইবন লাবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে যখন সাদ ইবন মুআয (রা.) আহত হলেন তখন মহানবী (সা.) বললেন, ‘তোমরা তাকে রুফাইদার তাবুতে নিয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, রুফাইদা (রা.) হলেন এমন এক নারী যিনি আহতদের সেবা করতেন।”

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের এই ধারণা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিল। খোলাফায়ে রাশিদীন-এর পরবর্তী যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার অব্যাহত থাকলে খলীফাগণ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ফলে বাগদাদ, কায়রো, আলেক্সান্দ্রিয়া, মরক্কো, ইস্পাহান, ঞানাডা, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য চিকিৎসালয় গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিকগণের মতে, মুসলিম জগতের চিকিৎসালয়ের সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও পারস্য থেকে মরক্কো এবং সিরিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪টি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল। অধ্যাপক ম্যাক্স বলেন,

We have authentic information concerning at least thirty four such institutions. They were distributed through the Islamic world from Persia to Morocco, from northern Syria to Egypt.^{১২}

ঐতিহাসিক ও পর্যটক টুডেলা বেঞ্জামিন ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণ ইতিহাস থেকে জানা যায়, সে সময় বাগদাদে ৬০টি চিকিৎসালয় ছিল। এ সকল চিকিৎসালয়ে সকল শ্রেণির রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হতো।^{১৩} প্রখ্যাত পর্যটক আল-মাকরিজি তাঁর ভ্রমণ ইতিহাসে কায়রোর পাঁচটি চিকিৎসালয়ের বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।^{১৪} প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে বাগদাদ, উত্তর আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া, আন্দালুস, কর্ডোভা, জেরুজালেম প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বমোট কতটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা সম্ভব না হলেও ঐ সকল অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বারা বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয় যে নির্মিত হয়েছিল, একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়। আর ঐ সকল চিকিৎসালয়কে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘ সময় গরীব, অসহায়সহ সকল শ্রেণির রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছিল। মধ্যযুগের চিকিৎসালয়সমূহের অনুকরণে পরবর্তীকালে আরো কতিপয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলমান ছিল।

চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম অবদান

মধ্যযুগে সমগ্র মুসলিম জগতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ধনাঢ্য ও দানশীল মুসলিমদের বদান্যতায় অনেক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে মুসলিম শাসিত প্রতিটি প্রদেশে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা অব্যাহত থাকে। একইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়সমূহের পর্যাণ্ড তথ্য-উপাত্ত পাওয়া দুষ্কর হলেও মধ্যযুগের বিখ্যাত পর্যটকদের ভ্রমণ ইতিহাস থেকে প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. আল-ওয়ালিদ চিকিৎসালয়

উমাইয়া শাসনামলে সর্বপ্রথম স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিক ৭০৬/৭০৭ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে দামেস্কে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই চিকিৎসালয়কে মুসলিম জগতের সর্বপ্রথম চিকিৎসালয় এবং একইভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানসিক চিকিৎসালয় বলা হয়।^{১৫} খলীফা অন্ধ, কুষ্ঠ ও মানসিক রোগীদের জন্য পৃথক ভবনের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া চিকিৎসালয়ের সাথে ভ্রমণকারীদের জন্য পৃথক অতিথিশালা নির্মাণ করা হয়। ঐতিহাসিক আল-তাবারী বলেন, Al-Walid's generous act of helping the sick was mainly a philanthropic decree to aid the blind and the disabled and to establish separate quarters where in lepers could be confined to prevent the spread of the disease.^{১৬}

চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ও সেবিকাদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া রোগীদের ঔষধ, খাবারসহ প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হতো। কুষ্ঠরোগীদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রোগের বিস্তাররোধে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে রাখা হতো। নির্ধারিত কক্ষের বাইরে তাদের যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল।

২. বাগদাদ চিকিৎসালয়

আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদ চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধন ও বাগদাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পারস্যের জুন্দিশাপুর চিকিৎসালয়ের অনুকরণে ৮০৫/৮০৯ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই চিকিৎসালয়কে বাগদাদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম চিকিৎসালয় বলে গণ্য করা হয়।^{১৭} জুন্দিশাপুরের আদলে এর নামকরণ করা হয় বিমারিস্তান। পরবর্তীকালে মুসলিম জগতের সকল চিকিৎসালয় বিমারিস্তান নামেই পরিচিতি লাভ করে। অধ্যাপক ম্যাক্স বলেন, From the Persian name for this is derived the title used for a hospital through out the Islamic world Bimaristan.^{১৮}

খলীফা বিজ্ঞানচর্চার বাতিঘর বাগদাদ নগরীতে চিকিৎসালয় নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জিবরিলকে প্রদান করেন। মোজাফফর হোসেন বলেন, Harun-ur-Rashid instructed his Personal Physician Jibrail b. Bukht Yishu to get constructed an extensive hospital in Bagdad.^{১৯}

খলীফা অত্র চিকিৎসালয়ে তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের নিয়োগ দেন। চিকিৎসালয়ের যাবতীয় খরচ রাষ্ট্রীয় কোষাগারসহ খলিফার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা হতো। বাগদাদ চিকিৎসালয়ের পরিষেবা অল্পসময়ের মধ্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে খলিফা হারুন-অর-রশীদ-এর বদান্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তী সময়ে আমির, ওমরাহ ও দানশীল ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসালয় নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৩. আল-কায়রোওয়ান চিকিৎসালয়

উত্তর আফ্রিকার রাজধানী কায়রোওয়ানে আগলাবী রাজবংশের শাসনকর্তা জিয়াদত উল্লাহ প্রথম ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসালয়ের স্থানের দিকে সম্পৃক্ত করে একে আল-কায়রোওয়ান চিকিৎসালয় বলা হয়। তবে চিকিৎসালয়টি আল-ডিমনাহ চিকিৎসালয় নামেও পরিচিত। আল-কায়রোওয়ান চিকিৎসালয়টি তৎকালীন সময়ে একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় ছিল। চিকিৎসালয়ের সাথে দর্শনার্থীর অপেক্ষা কক্ষ, মসজিদ, শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার কক্ষ, ধর্মীয় শিক্ষাদান কেন্দ্র, গোসলখানা প্রভৃতি সংযুক্ত ছিল। সামি খালাফ হামার্নেহ বলেন, The construction of al-Dimnah in Qayrawan was simple but adequate and the halls were well organized to include waiting rooms for

visitors, a chapel for worship and religious teaching and a special bath which in Islamic tradition can be used for washing prior to prayer.^{২০}

চিকিৎসকরা প্রতিদিন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে রোগীদের ঔষধ লিখে দিতেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে একদল ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। যাদের চিকিৎসা পরিষেবাগুলোতে রক্তপাত, হাড়ের সংশ্লেষণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুদান থেকে আগত নার্সদের দ্বারা চিকিৎসালয়ের সেবা দেয়া হতো। আল-কায়রোওয়ান চিকিৎসালয়ের পাশে পৃথক ভবনে কুষ্ঠরোগীদের জন্য ‘দারুল জুদামা’ নামে পৃথক একটি ওয়ার্ড ছিল। সে সময়ে কুষ্ঠরোগকে মানুষ অসৎ আচরণের লক্ষণ বলে মনে করত। চিকিৎসালয়ের যাবতীয় খরচ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও চিকিৎসাসেবা নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য দেশের ধনাঢ্য ও বিদ্বশালীরা চিকিৎসালয়ের কোষাগারে উদারহস্তে দান করত।^{২১}

৪. আল-ফুস্তাত চিকিৎসালয়

আহমাদ ইব্ন তুলুন মিসরে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মিসরের কায়রোতে ৮৭৩/৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বপ্রথম একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। আল-মুতলা‘আ আল-আরাবিয়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وكان أول مستشفى قام على أساس علمي هو هذا الذي أسسه ابن طولون بالقاهرة في القرن التاسع الميلادي وبقي حتى القرن الخامس عشر^{২২}

“কায়রোতে নবম শতকে ইব্ন তুলুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত হাসপাতাল ছিল। এ হাসপাতালটি পঞ্চদশ শতক অবদি টিকে ছিল।” ইব্ন তুলুন কর্তৃক নির্মিত চিকিৎসালয়কে আল-ফুস্তাত চিকিৎসালয় বলা হয়। আল-ফুস্তাত চিকিৎসালয়টি নির্মাণে ৬০ হাজার দীনার ব্যয় হয়েছিল। ইব্ন তুলুন আধুনিক চিকিৎসালয়ের প্রায় সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেন। মানসিক রোগীদের জন্য চিকিৎসালয়ে পৃথক বিভাগসহ মহিলা ও পুরুষের জন্য দুটি পৃথক ওয়ার্ড, গোসলখানা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করেন। থিওডোর উইথিংটন বলেন, It contained two baths for men and women respectively and a department for the insane.^{২৩}

চিকিৎসালয়ে রোগী ভর্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক রোগীকে বিশেষ পোশাক সরবরাহ করত এবং রোগীর পোশাক, টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী ছাড়পত্র দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিল। আল-ফুস্তাত চিকিৎসালয়ে প্রায় ছয়শত বছর পর্যন্ত সার্জিকাল তথা শল্যচিকিৎসার প্রচলন ছিল।^{২৪} চিকিৎসালয় সংলগ্ন একটি বিশালাকার মসজিদ ও জরুরী চিকিৎসা সেবার জন্য একটি ফার্মেসী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এছাড়া মেডিকেল শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যবস্থাসহ প্রায় লক্ষাধিক গ্রন্থের একটি সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার ছিল। প্রতি শুক্রবার এই ফার্মেসী বা ডাক্তারখানা হতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা রোগীদের উপদেশ প্রদান করতঃ বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হতো। ইব্ন তুলুন চিকিৎসালয়ের সেবার মান পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতি শুক্রবার চিকিৎসালয়ে গমন করতেন।^{২৫} আল-ফুস্তাত চিকিৎসালয় মূলত ওয়াকফ ফান্ডের টাকায় পরিচালিত হতো, যার মাসিক ব্যয় ছিল ১ হাজার দীনার। আহমদ ইব্ন তুলুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়টির অস্তিত্ব পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।^{২৬}

৫. সাইয়েদা সাইদিয়া চিকিৎসালয়

বাগদাদ নগরীর পূর্ব দিকে সাইয়েদা সাইদিয়া নামক একজন মহিলা নিজস্ব অর্থায়নে ৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে চিকিৎসালয়ের নামকরণ করা হয় বিমারিস্তানিস সাইদিয়া। সিনান ইব্ন সাবিত অত্র চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর

চিকিৎসালয়ের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। খিওডোর উইথিংটন বলেন, On the 14th of June A.D. 918, our old acquaintance sinan ibn Thabit opened the hospital founded by the Lady saidet in the Jahya market Place at Baghdad.^{২৭}

চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইদিয়া চিকিৎসালয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিমাসে ৬০০ দীনার বরাদ্দ দেন।^{২৮} আর সিনান ইব্ন সাবিত বিনা বেতনে অত্র চিকিৎসালয়ের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি রোগীদের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন।

৬. আল-মুকতাদিরি চিকিৎসালয়

আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদিরি বাগদাদ নগরীর পশ্চিমে সিরিয় দরজার নিকটবর্তী স্থানে ৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। খলীফার নামানুসারে চিকিৎসালয়ের নামকরণ করা হয় বিমারিস্তানিল মুকতাদিরি।^{২৯} সিনান ইব্ন সাবিতকে অত্র চিকিৎসালয়ের কর্মপরিকল্পনা, পরিচালনা ও চিকিৎসক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয়। চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য খলীফা নিজস্ব তহবিল থেকে মাসিক ২০০ দীনার বরাদ্দ দেন।^{৩০} খলীফা হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের বিমারিস্তানের পর পরবর্তী একশত বছর কোন খলীফা মুকতাদিরি চিকিৎসালয়ের অনুরূপ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেননি বলেই অনুমিত হয়। খলীফা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার পর বাগদাদের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে মেধাবী চিকিৎসকদের তালিকা প্রণয়নে সিনান ইব্ন সাবিতকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। সিনান পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বাগদাদের ৮৬০ জন চিকিৎসককে চিকিৎসা প্রদানের সনদ দেন। ফলে বাগদাদ থেকে অযোগ্য ও হাতুড়ে চিকিৎসক বিতাড়িত হয়।^{৩১} আবুল ফারাজ বলেন, Sinan who planned directed and appointed physicians for both hospitals was also authorized by the caliph in 931 to have the great honor of examining about 860 physicians of Baghdad and its vicinity, only those found qualified were granted licenses to practice.^{৩২}

খলীফা মুকতাদিরির উজির আলী ইব্ন ইসার নির্দেশে সিনান কিছু সংখ্যক চিকিৎসক দল গঠন করেন। এসকল চিকিৎসক জেলখানা ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে রোগাক্রান্ত লোকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।^{৩৩} এভাবেই তৎকালীন সময়ে সরকারিভাবে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। খলীফা মুকতাদিরি চিকিৎসা ব্যবস্থার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য বাগদাদের অধীনস্থ চিকিৎসালয়সমূহের সেবা সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার জন্য ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের আবু উসমান সাঈদ ইবন ইয়াকুবকে বাগদাদ, মক্কা ও মদীনার চিকিৎসালয়ে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।^{৩৪} খলীফার এমন উদ্যোগ সত্যিই কল্যাণকর ছিল। কেননা হজ্জের মৌসুমে এ দুটি শহরে চিকিৎসালয়ের কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ তদারকির প্রয়োজন ছিল।

৭. আদুদ আল-দৌলা চিকিৎসালয়

বুয়াইদ রাজবংশের আমির আদুদ আল-দৌলা-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদ নগরীর পশ্চিমে টাইগ্রিস নদীর তীরে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশালাকার চিকিৎসালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। Encyclopedia of Islamic Science and Scientists গ্রন্থে বলা হয়েছে, The most important of the Baghdad hospitals was that established in 372/982 by Adud al-Dawla.^{৩৫}

সামি খালাফ বলেন, আদুদ আল দৌলার মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে ৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসালয়টি নির্মিত হয়।^{৩৬} খিওডোর উইথিংটন বলেন, ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আদুদ আল-দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে একটি বিশালাকার চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।^{৩৭} চিকিৎসালয়টি তৎকালীন সময়ে সর্বোত্তম সরঞ্জামাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। আধুনিক যুগের পূর্বে বাগদাদে নির্মিত এই চিকিৎসালয়টি সবচেয়ে গৌরবময় চিকিৎসালয় হিসেবে বিবেচিত

ছিল। খলীফা চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা সেবা সর্বোচ্চ পর্যায়ে গড়ে তোলার জন্য ইরাক, পারস্যসহ তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের ডেকে এনে অত্র চিকিৎসালয়ে চাকুরি প্রদান করেন। এসকল বিখ্যাত চিকিৎসকদের মধ্যে জিবরিল ইবন বখতইয়াশ, চক্ষুবিদ আবু নাসের, শল্যবিদ আবুল খায়ের, অর্থোপেডিক সার্জন আবুস সালাত, ইস্পাহানের আব্দুর রহমান ইবন মানদুয়াহ প্রমুখ অন্যতম। আল কিফতীর মতে, আদুদী চিকিৎসালয়ে ৮০ জন চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। যাদের মাসিক ন্যূনতম ভাতা ছিল ৩০০ দিরহাম।^{৭৮} প্রসিদ্ধ মতামত হলো, অত্র চিকিৎসালয়ে ২৪ জন চিকিৎসক ও ২৮২ জন চিকিৎসাকর্মী নিযুক্ত ছিল।^{৭৯} সুশৃঙ্খল পরিচালনা ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কারণে হাসপাতালটি অন্যান্য চিকিৎসালয়ের মডেল হিসেবে বিবেচিত ছিল। খলীফা আদুদ আল দৌলার মৃত্যুর পর বাগদাদের সবচেয়ে উন্নত, বিস্তৃত বিন্যাসসমৃদ্ধ ও পরিবেশবান্ধব চিকিৎসালয়টির ব্যবস্থাপনার অধঃপতন ঘটে। একাদশ শতকের মধ্যভাগে টাইগ্রিস নদীর প্লাবনে চিকিৎসালয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর চিকিৎসালয়টি সংস্কার করে নব উদ্যমে চিকিৎসা প্রদানের উদ্যোগসহ চিকিৎসকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ডা. এলগুড বলেন, In a.d.1068 the hospital benefited from the legacies of a certain Abdul Malik who repaired the buildings and reendowed it. At the same time the staff was increased to 28 physicians.^{৮০}

চিকিৎসালয়টি সংস্কারের পর কয়েকবছর স্বাস্থ্যসেবা নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। ১০৭৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় চিকিৎসালয়টি বন্যায় প্লাবিত হয়। পরপর কয়েকবার প্লাবনের ফলে চিকিৎসালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বারো শতকের শেষের দিকে চিকিৎসালয় পুনরায় সংস্কার করা হয়। অতঃপর হালাকু খান কর্তৃক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসালয়টি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়। বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ভ্রমণকালে চিকিৎসালয়ের স্থানে একটি ধ্বংসস্তূপ দেখতে পান।^{৮১} মূলত হালাকু খানের আক্রমণের ফলে মুসলিম জগতের সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতিষ্ঠানসহ অনেক মূল্যবান সম্পদ চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যায়।

৮. আল-নূরী চিকিৎসালয়

জাঙ্গি রাজবংশীয় সেলজুক সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নূর আল-দীন মাহমুদ ইবন জাঙ্গি ১১৫৪ মতান্তরে ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রাজধানী দামেস্কে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানের নামানুসারে চিকিৎসালয়কে আল-নূরী চিকিৎসালয় বলা হয়।^{৮২} সুলতান নূর আল-দীন এই চিকিৎসালয় পরিচালনার দায়িত্ব বিখ্যাত চিকিৎসক আবুল মাজিদ আল বাহিলীকে অর্পণ করেন। আল-নূরী চিকিৎসালয় কারুকার্য খচিত নকশায় সুসজ্জিত ছিল। সুলতান নূর আল-দীন চিকিৎসালয়ের রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য বরাদ্দ দিতেন। চিকিৎসালয়ের সাথে একটি চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠাগার ছিল। সুলতান উক্ত পাঠাগারে চিকিৎসাশাস্ত্র বই দান করেন। পাঠাগারের সাথে একটি ক্লাসরুম ও চক্ষু বিভাগ ছিল। সেখানে শিক্ষা সম্পর্কিত বহু জটিল ও দুর্বোধ্য রোগের চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করা হতো।^{৮৩} আল-নূরী চিকিৎসালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ চিকিৎসালয়েই সর্বপ্রথম রেজিস্ট্রার খাতায় রোগীদের চিকিৎসার তথ্যাদি সংরক্ষণ করার প্রথা চালু করা হয়। চিকিৎসকরা ওয়ার্ড পরিদর্শনের পর রোগীর নামের পাশে ঔষধ ও খাবারের তালিকা লিপিবদ্ধ করতেন।^{৮৪} তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকরা অত্র চিকিৎসালয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত পর্যটক ইবন জুবারের ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে আগমন করেন। দামেস্কের শহর ও আল-নূরী চিকিৎসালয়ের সৌন্দর্য্যও চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে তিনি অভিভূত হন এবং চিকিৎসালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সামি খালাফ ইবন জুবারের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, In describing al-Nuri Hospital, he admired the way in which the administrator kept a register of the patients probably the earliest of its kinds in the history of hospitals.^{৮৫}

চিকিৎসালয়ের সঙ্গে একটি মেডিকেল স্কুল ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশুনা করত, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনুন নাফিস, ইবন আবী উসাইবিয়া, আবুল ফারাজ হোগরী প্রমুখ। প্রখ্যাত চিকিৎসক বদর আল-দীন প্রায় ৯০ বছর পর ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে মূলভবনের সাথে নতুন একটি ভবন যুক্ত করেন। আল-নূরী চিকিৎসালয় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কায়রোর মামলুক সুলতান আল-মানসুর অসুস্থ হলে এই চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। চিকিৎসালয়ের পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে তিনি কায়রোতে নূরী চিকিৎসালয়ের আদলে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মনস্থ করেন।^{৪৬}

৯. আল-সালাহানী চিকিৎসালয়

জেরুজালেমে ক্রসেডার ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জনস চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে। মূলত আহত সৈন্যদের জন্যই চিকিৎসালয়টি নির্মাণ করা হয়। একাদশ শতকের শেষে সেন্ট জনস চিকিৎসালয়ের সাথে একটি চিকিৎসালয়, নাইটদের জন্য প্রাসাদ এবং সেবিকাদের জন্য একটি মঠ বা বিহার সংযুক্ত করা হয়। চিকিৎসালয়ের সেবা সুশৃঙ্খল ছিল। যার ফলে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী, তীর্থযাত্রী এবং আহত সৈন্যরা চিকিৎসা গ্রহণ করত। Encyclopedia Britannica এছে বলা হয়েছে, Military hospitals come into being along the travelled routes, the knights hospital of the order of St. John in 1099 established in the holy land.^{৪৭}

সালাহ আল-দীন ক্রসেডারদের পরাজিত করে ১১৮৭/১১৯২ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করেন। অতঃপর ক্রসেডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি চিকিৎসালয়ের নামে বহু সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। চিকিৎসালয়ের নাম পরিবর্তন করে আল সালাহানী চিকিৎসালয় নামকরণ করা হয়। চিকিৎসালয়ের সাথে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ফার্মেসী ও মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। এছাড়া নারী ও পুরুষদের পৃথক ওয়ার্ডে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়। সালাহ আল দীন সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের নিয়োগ দেন।^{৪৮} অত্র চিকিৎসালয়ে প্রায় ২৭০ বছর চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে এক ভূমিকম্পে চিকিৎসালয়টি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

১০. আল মারাকেশ চিকিৎসালয়

উত্তর আফ্রিকার আল-মাহাদ রাজবংশের শাসনকর্তা আল মানসুর ইয়াকুব ইবন ইউসুফ মরক্কোর রাজধানী মারাকেশে ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশালাকার কারুকার্য খচিত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসালয়টি রাজধানীর মারাকেশে অবস্থিত বলে একে আল-মারাকেশ চিকিৎসালয় বলা হয়।^{৪৯} মরক্কোর আব্দুল ওয়াহেদ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, চিকিৎসালয় নির্মাণের জন্য শহরের মধ্যে খোলা সমতল জায়গা নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর প্রসিদ্ধ স্থপতিদের প্রণীত নকশা অনুযায়ী কারুকার্য খচিত সুন্দর ভবন তৈরী করা হয়। চিকিৎসালয়ের চারদিকে নানারকম ফুল ও ফলের গাছ রোপনসহ ভবনের প্রতিটি কক্ষে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।^{৫০} এছাড়া ভবনগুলোর মাঝে চারটি চৌবাচ্চা নির্মিত ছিল। যার মধ্যে একটি ছিল সাদা মার্বেল পাথরে বাঁধানো। চিকিৎসালয়টি মূল্যবান পশম, রেশম, তুলা এবং চামড়ার সুদৃশ্য কার্পেট দ্বারা সজ্জিত ছিল। ডা. এলগুড বলেন, In addition there were four large pools in the Centre of the building, one of which was lined with white marble. The hospital was furnished with valuable carpets of wool, cotton, silk and leather.^{৫১}

চিকিৎসালয়ের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রতিদিন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে রোগীদের ব্যবস্থাপত্র ও খাবার তালিকা প্রদান করতেন। রোগীদের ঔষধ ও খাবার চিকিৎসালয় থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি রোগীর দৈনিক খাদ্য সামগ্রীর জন্য ৩০ দিনার বরাদ্দ ছিল। গ্রীষ্মকালে পাতলা ও শীতকালে মোটা কাপড় এবং দিন ও রাতের জন্য পৃথক পোশাক রোগীদের সরবরাহ করা হতো। চিকিৎসালয়ের ছাড়পত্রের সাথে গরীব রোগীদের কিছু

টাকা দেয়া হতো। যাতে করে তারা কিছুদিন স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে। মারাকেশের ধনী, গরীব রোগী ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্যও এখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল।^{৫২} অপরদিকে চিকিৎসালয় সংলগ্ন একটি ব্যক্তিগত ব্যয়বহুল চিকিৎসালয় থেকে রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হতো। যেখানে প্রতিটি রোগীকে আজকের দিনে ১৫০১ ডলার সমপরিমাণ চিকিৎসা ফি প্রদান করা লাগত। সুলতান ইয়াকুব ইবন ইউসুফ প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাযের পর ঘোড়ায় চড়ে চিকিৎসালয় পরিদর্শন করত রোগীদের সুবিধা অসুবিধার খোজ খবর নিতেন।^{৫৩}

১১. আল-মনসুরী চিকিৎসালয়

মিশরের মামলুক শাসক সুলতান আল-মনসুর কালাউন ১২৮৪/১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে একটি বিশালাকার চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসালয়ের নামকরণ করা হয় আল-বিমারিস্তানিল কবির আল-মনসুরী।^{৫৪} তবে চিকিৎসালয়টি আল মনসুরী চিকিৎসালয় নামেই সমধিক পরিচিত। আল-মনসুরী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার অন্তরালে একটি ঘটনা নিহিত রয়েছে। যুবরাজ আল মনসুর ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে তিনি রেনাল কোলিক রোগে আক্রান্ত হয়ে দামেস্কের আল-নূরী চিকিৎসালয়ে ভর্তি হন। নূরী চিকিৎসালয়ের স্বাস্থ্যসেবা দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং কায়রোতে একটি চিকিৎসালয় স্থাপনে মনস্থির করেন।^{৫৫} কায়রোর শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ৪টি ভবন সম্বলিত ১০ হাজার ৬শ বর্গগজ আয়তনের একটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। প্রতিটি ভবনের চারদিকে পুকুর এবং প্রবেশ পথে বার্ণা সমেত খোলা মাঠ ছিল। চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য তিনি বিপুল সম্পদ ওয়াকফ করেন। চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ১০ লক্ষ দিরহাম।^{৫৬} চিকিৎসালয়টি উদ্বোধনের সময় তিনি বার্ণা থেকে এক কাপ লেবুজল পান করে এ কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য চিকিৎসালয়টি উন্মুক্ত। উইলিয়াম ওসলার আল-মাকরিজির বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, I have founded this institution for my equals and for those beneath me, it is intended for rulers and subjects for soldiers and for the emir, for great and small, freemen and slaves, men and women.^{৫৭}

আল-মনসুর চিকিৎসালয় থেকে ঔষধ, পোশাক, বিছানাপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো। এখানে প্রতিদিন ৪০০০ রোগীকে সেবা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক ওয়ার্ডে চিকিৎসা দেয়া হতো ও রোগীদের সেবার জন্য পুরুষ ও মহিলা নার্সের ব্যবস্থা ছিল। রোগের ধরণ অনুযায়ী যেমন-জ্বর, চক্ষুরোগ, আমাশয়, শল্যচিকিৎসা প্রভৃতির জন্য পৃথক ওয়ার্ড ছিল। চিকিৎসালয়ের পাশে একটি শিক্ষালয়, লাইব্রেরী, ক্লাসরুম, ঔষধের স্টোর, প্রার্থনাগৃহ, চিকিৎসকদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল।^{৫৮} সেখানে ধর্মীয় বিষয় ও পবিত্র কুরআন পাঠের ব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসালয়ে মানসিক রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড ছিল। মানসিক রোগীদের সুস্থতার জন্য সঙ্গীত থেরাপি ব্যবহার করা হতো। রোগীদের চিকিৎসালয় থেকে ছাড়পত্র দেয়ার সময় ঔষধ ও টাকা দেয়া হতো, যেন রোগীর উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি না হয়। আল-মুতাল্লা‘আ আল-আরাবিয়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وكان يعطى لكل ناقه عند خروجه من المستشفى بعض المال، حتى لا يضطر إلى العمل في فترة نقاهته، أما المصابون بالأرق فكان يرفه عنهم بالموسيقى الخفيفة، أو برواة القصص المحترفين^{৫৯}

“সুস্থ রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেয়ার পর কিছু অর্থ দেয়া হতো, যেন সে দুর্বল শরীর নিয়ে কাজে যোগদানে বাধ্য না হয়। আর নির্ধুম রোগীকে মৃদু সঙ্গীত বা পেশাদার গল্পকারের মাধ্যমে বিনোদন প্রদান করা হতো।”

আল-মনসুরী চিকিৎসালয় ৭শ বছর ধরে কায়রোবাসীকে সেবা দিয়েছিল। চিকিৎসালয়টি বর্তমানে চক্ষু বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার নামকরণ করা হয়েছে কালাউন চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়ের প্রাচীন দর্শনীয় দরজাটি এখনো কায়রোর ইসলামী জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

১২. তেব্রিজ চিকিৎসালয়

ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোল নৃপতি ও গাজানের প্রধানমন্ত্রী রশীদ উদ্দীন ফাদলুল্লাহ হামাদানী তেব্রিজে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নৃপতির অধীনে ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ২২ বছর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থেকে তিনি তেব্রিজের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অঙ্গন উদ্ভাসিত করেন। তিনি চিকিৎসালয়ের সঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজ ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এডওয়ার্ড জি ব্রাউন বলেন, He enjoyed enormous wealth and power, which he used in the most beneficent manner for the foundation of colleges, hospitals and libraries, the endowment of learning and the encouragement of scholars.^৬

রশীদ উদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের খ্যাতির কারণ হলো এর বিশালত্ব, চিকিৎসা ও শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার সুব্যবস্থা। তিনি চিকিৎসালয়ের সেবা ও শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য ভারত, মিসর, চীন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ৫০ জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নিয়োগ দেন। চিকিৎসালয়ের শিক্ষার্থী ছিল প্রায় ১ হাজার। প্রত্যেক চিকিৎসকের দায়িত্বে ১০ জন এবং শল্যবিদের সঙ্গে ৫ জন শিক্ষার্থী ছিল। তারা শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি চিকিৎসালয়ের দায়িত্ব পালন করত। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার্থীদের একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করত শিক্ষার্থীদের আংশিক খরচের ব্যবস্থাও সেখানে করা হয়েছিল।^৭ সর্বোপরি নানা শিল্প ও কারুকার্য খচিত দ্রব্যাদি দিয়ে চিকিৎসালয়কে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

১৩. আল-মুস্তানসিরিয়া চিকিৎসালয়

আব্বাসীয় খলিফা আল-মুস্তানসির বাগদাদের টাইগ্রিস নদীর বাম তীরে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১২২৭/১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।^৮ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি চিকিৎসালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট আসন ছিল ৩০৮টি। তন্মধ্যে ১০টি আসন মেডিকেল শাখার জন্য নির্ধারিত ছিল। ছাত্রদের বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা ছিল। গরীব ছাত্রদের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসে এক দীনার বৃত্তি দেয়া হতো। শিক্ষার্থীদের পাঠাগারসহ শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করত। চিকিৎসালয়টির নিজস্ব জনবল, কক্ষ ও ডিসপেনসারি ছিল। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরী ধ্বংস হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি অক্ষত ছিল। ইব্ন বতুতা ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ পর্যটনে এসে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর পদচারণা দেখেছেন বলে অভিহিত করেন।^৯

১৪. গ্রানাডা চিকিৎসালয়

মধ্যযুগে আন্দালুসে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর গ্রানাডা, কর্ডোভা, আন্দালুস প্রভৃতি শহরে অসংখ্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল চিকিৎসালয়ের মধ্য গ্রানাডা চিকিৎসালয় ছিল অন্যতম। নাসরিদ রাজবংশের শাসক মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন নসর আন্দালুসের রাজধানী শহর গ্রানাডায় ১৩৬৬/১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। Encyclopedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, At Granada the Nasrid Sultan Muhammad v, built a splendid hospital for sick and poor muslims completed in 768/1367.^{১০}

গ্রানাডা চিকিৎসালয় নির্মাণের সময় অত্র শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ মিলিয়ন। গরীব ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসালয়ে সংরক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে জানা

যায় মধ্যযুগে স্পেনের ইতিহাসে অত্র চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। চিকিৎসালয়টি স্পেনের ইসলামী স্থাপত্যের সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এছাড়া গ্রানাডায় মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত অত্র জনপদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করেছিল। সামি খালাফ হামার্নেহ বলেন, It is worth noting that this installation continued to operate for the care of the sick until the fall of Granada, the last hold of Islam in Spain in 1492.^{৬৫}

১৫. ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়

মধ্যযুগে স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবার প্রচলন ছিল। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা কখন থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, রোমান আমলে যুদ্ধের ময়দানে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে চিকিৎসা দেয়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা ছিল।^{৬৬} ইসলাম আগমনের পর মহানবী (সা.) হযরত রুফাইদা বিনতে আসলামিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধে আহত সাহাবীগণকে সেবা দানের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের প্রচলন করেন। হযরত রুফাইদা (রা.) অসহায়, দুস্থ ও যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করতেন। ইব্ন ইসহাক বলেন,

رفيدة امرأة من اسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمتها في مسجده ليعوده من قريب و كانت امرأة تدوي الجرحي و تحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين^{৬৭}

“রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে স্থাপিত রুফাইদা আসলামিয়ার তাবুতে হযরত সা‘দ ইব্ন মুআয (রা.)-এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মসজিদে তাবুটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কাছ থেকে তার খোজখবর নিতে পারেন। রুফাইদা (রা.) আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান করতেন। যাদের জীবন হুমকির মুখে তিনি তাদের চিকিৎসার বিনিময়ে সওয়াবের আশা করতেন।”

মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী সময়ে খলীফাগণ এ ধারা অব্যাহত রাখেন। বিশেষ করে সেলজুক সালতানাতের সুলতান মাহমুদ রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম হচ্ছে আজিজ আল-দীন চিকিৎসালয়। দশম শতাব্দীতে উজীর আলী ইব্ন ইসার নির্দেশে সিনান ইব্ন সাবিত ও তার দল বাগদাদের প্রত্যন্ত দুর্গমস্থানে অবস্থিত জেলখানার কয়েদিসহ শহর ও গ্রামের গরীব অসহায়দের মাঝে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেন। ঐতিহাসিক হিট্রি বলেন, Sinan organized a staff of physicians who would go from place to place carrying drugs and administering relief to ailing people other physicians made daily visits to jails.^{৬৮}

একাদশ শতকের প্রখ্যাত চিকিৎসক আব্দুল হাকিম আল-বাহালী তাঁর চিকিৎসক দল নিয়ে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে কাজ করেন। সাধারণ রোগীদের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের সেবাদানের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে আগত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।^{৬৯} শহর থেকে দূর-দূরান্তের গ্রামে দানসহ চিকিৎসা উপকরণ বহনের জন্য উট ব্যবহার করা হতো। সেলজুক আমলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় এতটাই প্রসারিত হয়েছিল যে, চিকিৎসার উপকরণ বহনের জন্য চল্লিশটি উটের প্রয়োজন হতো।^{৭০} চিকিৎসালয়ের সেবা বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ছিল। মুসলিমদের সেবাদানের পর চিকিৎসা উপকরণ থাকলে অন্যদের চিকিৎসা দেয়া হতো। মুসলিম জগতে উল্লিখিত চিকিৎসালয় ছাড়াও ফিরাতি,^{৭১} কারখ, তুতুশি^{৭২} ইম্পাহান, আরবেলা,^{৭৩} শিরাজ, গুরগাও, বিরিজ, হামাদান, কায়রো,^{৭৪} কায়সারী,^{৭৫} বুসরা,^{৭৬} মোজাফফরী, আতাবেগী প্রভৃতি চিকিৎসালয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

চিকিৎসালয়-এর বিশেষত্ব

মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়সমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট বিশেষত্ব ও অধিকাংশ চিকিৎসালয়ে অনেক সাদৃশ্য ছিল। প্রতিটি চিকিৎসালয়ে জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গ বৈষম্য উপেক্ষা করে রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হতো। মুসলিম চিকিৎসালয়ে মেয়েদের পৃথক ওয়ার্ডে স্ত্রী সেবিকা দ্বারা সেবার ব্যবস্থা ছিল। ওয়ার্ডগুলো মানসিক, সংক্রামক, অসংক্রামক, সার্জারী, চক্ষু প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত ছিল। রোগীদের বিনোদনমূলক উপকরণ হিসেবে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। খলীফা আল-মুকতাদিরের সময় থেকে চিকিৎসকদের জন্য লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন করা হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকদের সনদ প্রদান করা হতো। রোগীদের তথ্যাবলী রেজিস্ট্রার খাতায় লিপিবদ্ধ থাকত। প্রতিটি চিকিৎসালয়ের নিজস্ব ঔষধের সেন্টার ছিল। চিকিৎসালয়সমূহ ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনা হতো। ওয়াকফ বোর্ডের কোষাগার থেকে চিকিৎসালয়ের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হতো। সামি খালাফ হামার্নেহ বলেন, No Sooner did these hospitals progress in their medical activities than they also acquired an added source of income the waqf, which constituted public properties that were utilized by such institutions as hospitals and mosques.^{৭৭}

মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয়সমূহে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থাগারসহ মেডিকেল স্কুল ছিল, যেখানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো। চিকিৎসালয়ের সাথে মসজিদ, খ্রিস্টীয় ভোজনালয়সহ বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। সর্বোপরি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা উন্মুক্ত ছিল।

উপসংহার

চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতিপ্রাচীন। প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসালয়ের সূচনা নিরূপণ সম্ভব না হলেও একথা সত্য যে, রোমান শাসনামলে ড্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের সূচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পারস্যের জুন্দিশাপুরে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায়ে হিজরত করেন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে মসজিদে নববীর আঙিনায় তারু তৈরি করে চিকিৎসার শুভ সূচনা করেন। একই সাথে তিনি ড্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় পরিচালনার উদ্যোগ নেন। মধ্যযুগের খলীফা ও আমীর ওমরাহগণ মানুষের মৌলিক অধিকার চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক দামেস্কে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ধারা অব্যাহত থাকে। উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমি, আইয়ুবী মামলুক, আগলাবী প্রভৃতি শাসনামলে দামেস্ক, বাগদাদ, মিসর, সিরিয়া, জেরুজালেম, তিউনিসিয়া, মরক্কো, আন্দালুস (স্পেন), গ্রানাডা, কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য চিকিৎসালয় গড়ে ওঠে। চিকিৎসালয়ের সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান করা সম্ভব না হলেও বাগদাদে ৬০টি, কায়রোতে ৫টি এবং কর্ডোভায় ৫০টির অধিক চিকিৎসালয় বিদ্যমান ছিল। জেলখানা, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ড্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের প্রচলন ছিল। গরীব ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হতো। প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয়সমূহের সঙ্গে মেডিকেল স্কুল, পাঠাগার, প্রার্থনালয় বিদ্যমান ছিল। ওয়াকফ ফান্ডের কোষাগার থেকে চিকিৎসালয়ের যাবতীয় খরচ নির্বাহ হতো। শাসক শ্রেণির সদৃচ্ছা ও চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মধ্যযুগের চিকিৎসালয়সমূহে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তীকালে ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বে এ সকল চিকিৎসালয়ের সেবা ও কার্যক্রম মডেল হিসেবে গণ্য করা হতো। অথচ এ সকল চিকিৎসালয়ের ইতিহাস আধুনিক উত্তর পৃথিবীতে মুসলিম পাঠকদের অজানা। মুসলিম সমাজ মধ্যযুগের মুসলিমদের গৌরব ও অবদান বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু মুসলিম পাঠক সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে জেনে চিকিৎসাক্ষেত্রে অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ৩০০ থেকে ১৫০০ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলা হয়। মধ্যযুগের প্রথমার্ধকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্ধকার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। সমগ্র সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ স্থবির হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে ইসলাম আগমনের পর থেকে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয় এবং তা পনেরশত শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিক অষ্টম শতাব্দী থেকে পনেরশত শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালকে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করেন। মূলত ঐ সময়েই মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়।
বি.দ্র.: মাহমুদা ফজল, *প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভৌগোলিক জ্ঞান এবং পরিচিত পৃথিবী* (ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৫; ড. কাজী আবদুর রউফ ও কাজী আবুল মাহমুদ, *ভৌগোলিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)* (ঢাকা: স্বজন ট্রেডার্স, ২৭ নিউ পল্টন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯০।
- ^২ *The Encyclopedia of Islam* Vol. 1, (London: Luzac & Co. 1961 A.D.), p. 1222.
- ^৩ Edward G. Browne, *Arabian Medicine* (London: Cambridge University Press, 1912 A.D.), p. 102.
- ^৪ *The New Shorter Oxford English Dictionary* Vol. 1 (Oxford: Clarendon Press: 1993 A.D.), p. 1266.
- ^৫ *The New Encyclopedia Britannica* Vol. 23 (London: Encyclopedia Britannic Inc, 15th edition, 1986 A.D.), p. 916.
- ^৬ আফনান মুহাম্মাদ আহমাদ হামাদান, *ওয়াকিউল মুস্তাশফায়াত ফী মাদীনাতিনাবলুস*, (ফিলিস্তিন: অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস জামিআতুন নাজাহ আল-ওয়াতানিইয়াহ, নাবলুস, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৯।
- ^৭ Sami Khalaf Hamarneh, “Development of Hospitals in Islam”, *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* (London: Oxford University Press, July, 1962 A.D.), p. 377.
- ^৮ ইরানের পারস্য সাম্রাজ্যের খুজিস্তান প্রদেশের অন্যতম শহর জুন্দিশাপুরে নেসেটেরিয়ান খ্রিস্টানরা পঞ্চম মতান্তরে ষষ্ঠ শতকে জুন্দিশাপুর একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি চিকিৎসালয় ও মেডিকেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সে সময় চিকিৎসালয় বিমারিস্তান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। চিকিৎসালয়ের সাথে একটি অনুবাদ কেন্দ্র ও পাঠাগার ছিল। ভারত, চীন, এডেসা, সিরিয়া ও পারস্যের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অত্র চিকিৎসালয়ে কর্মরত ছিলেন। পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ করে ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসালয়টি পারস্য সাম্রাজ্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করেছিল এবং পরবর্তীকালে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জুন্দিশাপুর চিকিৎসালয় মডেল হিসেবে বিবেচিত ছিল। N.B. *Medical History from The Earliest Times*, p. 162; *The Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, p. 1223.
- ^৯ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* ৭ম খণ্ড, (ঢাকা: দি মালিক লাইব্রেরী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১১৮; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৪৭।
- ^{১০} *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।
- ^{১১} মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ* ১ম খণ্ড, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরফ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬৩১।
- ^{১২} Tomas Arnold and Alfred (ed), *The Legacy of Islam* (London: Oxford At the Clearendon on Press, 1931 A.D.), P. 335-336; Philip K Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan press Ltd, 1970 A.D.), P. 365.
- ^{১৩} *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।
- ^{১৪} Taqi al-Din Ahmed al-Maqrizi, *Al Mawaiz waal-itibar bi dhikr al-khitat wa al-athar* Vol. 2 (Cairo: Bulaq 1853. A.D.), PP. 405-408.

-
- ১৫ M. Zaki Kirmani and N.K.Sing (ed), *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists* Vol. 3 (New Delhi: Global vision publishing house, 2005 A.D.), p. 681; Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (Chicago: ABC International Group, Inc. 2001 A.D.), p. 89.
- ১৬ Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* Vol. 8, (Cairo: n.d.), p. 97; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 367.
- ১৭ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৯; ড. মুহাম্মদ সাউদ, ড. সিরাজুল ইসলাম অনুদিত, *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন* (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১, খ্রি.), পৃ. ৭৬; মূসা আল আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯২।
- ১৮ *The Legacy of Islam*, p. 335; *History of the Arabs*, p. 365.
- ১৯ Muzaffar Hussain, *Islam's Contribution to Science* (New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2004 A.D.), p. 199.
- ২০ *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 375.
- ২১ Hasan Abd al-Wahhab, *al-Tibb al-Arabi fi Ifriqiyh* Vol. 3, (Al-Fikr, Bleirut: 1958 A.D.), p. 907-916; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 375.
- ২২ ড. বাদাবি তাবানা ও অন্যান্য, *আল মুতলা' আ আল 'আরাবিয়াহ* (সৌদি আরব: ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫৬।
- ২৩ Edward Theodore withington, *Medical History from The Earliest Times* (London: The scientific press Limited, 1894 A.D), PP. 165-166.
- ২৪ *Al Mawiz wa al itibar bi dhikr al khitat wa al athar*, Vol. 2, p. 405; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, pp. 373-374.
- ২৫ *Arabian Medicine*, p. 102; *Medical History from The Earliest Times*, p. 166.
- ২৬ *History of the Arabs*, p. 365; *The Legacy of Islam*, p. 336.
- ২৭ *Medical History from The Earliest Times*, p. 163.
- ২৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।
- ২৯ *Medical History from The Earliest Times*, p. 163; *Islam's Contribution to Science*, p. 201.
- ৩০ *Islam's Contribution to Science*, p. 201.
- ৩১ মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩৯২; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ১৫৩।
- ৩২ Abu al-Faraj Bar Hebraeus, *Tarikh Mukhthasar al-Duwal* (Beirut: 1890. A.D.), PP. 281-282; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 369.
- ৩৩ খন্দকার মাহমুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ২৬৮।
- ৩৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।
- ৩৫ *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol. 3, p. 691.
- ৩৬ Sami Khalaf Hamarneh, *Health Sciences in Early Islam* Vol. 2, (Zahra Publication, 1983 A.D.), PP. 101-102.
- ৩৭ *Medical History from The Earliest Times*, p. 163.
- ৩৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।
- ৩৯ *The Encyclopedia of Islam*, Vol.1, p.1224.

-
- ^{৪০} Cyril Elgood, *A Medical History of Persia and The Eastern Caliphate* (London: Cambridge University Press, 1951 A.D.), PP. 168-170.
- ^{৪১} Abu Abdallah Muhammad Ibn Battuta, *Tuhfat al Nuzzar fi Gharaib al Amsar wa Ajaib al Asfar* Vol. 1, (Cairo: 1817 A.D.), p. 1134; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 370.
- ^{৪২} *Heath Sciences in Early Islam*, Vol. 2, p. 100; *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol. 3, p. 690.
- ^{৪৩} *Medical History from The Earliest Times*, p. 164.
- ^{৪৪} *The Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, p. 1224.
- ^{৪৫} Abu al-Hasan Muhammad Ibn Jubayr, *Rihlat Ibn Jubayr*, Vol. 5, Gibb Memorial series (Leiden: 1949 A.D.), PP. 283-284; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, PP. 371-372.
- ^{৪৬} বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
- ^{৪৭} *The New Encyclopedia Britannica*, Vol. 23, p. 916.
- ^{৪৮} *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 373.
- ^{৪৯} *The Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, p. 1224.
- ^{৫০} বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
- ^{৫১} *A Medical History of Persia and The Eastern Caliphate*, PP. 176-177.
- ^{৫২} *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 376; *The Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, p. 1224.
- ^{৫৩} বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।
- ^{৫৪} *Medical History from The Earliest Times*, p. 166; *Arabian Medicine*, p. 101.
- ^{৫৫} *Arabian Medicine*, p.102; *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 374.
- ^{৫৬} বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।
- ^{৫৭} William Osler, *The Evolution of Modern Medicine* (At Yale University of the Silliman foundation in April, 1913 A.D.), p. 67.
- ^{৫৮} *History of the Arabs*, p. 679; *Arabian Medicine*, p. 102.
- ^{৫৯} আল মুতালা'আ আল 'আরাবিয়াহ, পৃ. ৫৭।
- ^{৬০} *Arabian Medicine*, p. 103.
- ^{৬১} বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
- ^{৬২} প্রাণ্ডু, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।
- ^{৬৩} *A Medical History of Persia and The Eastern Caliphate*, PP. 231-232.
- ^{৬৪} *The Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, p. 1225.
- ^{৬৫} *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 377.
- ^{৬৬} *Medical History from The Earliest Times*, PP. 115-117.

-
- ৬৭ ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ আল কুরতুরী, *আল ইসতি'আব ফি মা'রিফাতিল আসহাব* ৪র্থ খণ্ড, (বৈরুত: দারুল জাইল, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৮৩৮।
- ৬৮ *History of the Arabs*, p. 365; *A Medical History of Persia and The Eastern Capliphate*, PP. 174-175.
- ৬৯ *আল মুতাল্লা'আ আল 'আরাবিয়াহ*, পৃ. ৫৬।
- ৭০ *Islam's Contribution to Science*, p. 207.
- ৭১ আব্বাসীয় প্রশাসনের মন্ত্রী ইবন আল ফিরাতি দশম শতাব্দীতে বাগদাদে একটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। তার নামের সাথে সম্পৃক্ত করে একে আল ফিরাতি চিকিৎসালয় বলা হয়। দ্র. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।
- ৭২ আলপ আরসালানের পুত্র তাজউদ্দৌলা তুতুশের ক্রীতদাস খামারতাজিন বাগদাদে একাদশ শতকের শেষভাগে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠান করেন। একে তুতুশি চিকিৎসালয় বলা হয়। n.b: *A Medical History of Persia and The Eastern Capliphate*, p. 212.
- ৭৩ আবু সাঈদ কাকুবুরী বাগদাদের আরবেলা নগরীতে চারটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। এগুলোতে অন্ধ ও দীর্ঘদিন থেকে রোগে কাতর রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হতো। n.b: *A Medical History of Persia and The Eastern Capliphate*, p. 172.
- ৭৪ আইয়ুবী বংশের শাসক সালাহ আল দীন আইয়ুবী মিসরের কায়রোতে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সালাহ আল দীন নিজেই নিয়মিত চিকিৎসালয় পরিদর্শন করে রোগীদের সাথে কুশল বিনিময় করতেন। n.b: *Islam's Contribution to science*, PP. 204-205.
- ৭৫ তুরস্কের কেন্দ্রীয় শহর আনাতোলিয়ার কায়সারী প্রদেশে প্রথম সেলজুক সুলতান ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যাকে দার আল শিফা বলা হয়। তবে এটি আনাতোলিয়া চিকিৎসালয় নামেও পরিচিত। n.b: *The Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, p. 1225.
- ৭৬ প্রথম অটোমান সুলতান ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের বুসরা জয় করে সেখানে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি বিশালাকার চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যাকে দার আল শিফা বলা হতো। [N.B: *The Encyclopaedia of Islam*, Vol, 1, p. 1225.
- ৭৭ *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, p. 381.

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন : প্রেক্ষাপট ও দর্শন

ড. মো. আব্দুল হান্নান*

Abstract: Education is the backbone of a nation. Educational institution is the main centre of education. Here, teachers are the principal elements of education. Education is for the splendid development of personality of learners and for keeping the social progress appropriate. It is not confined within the person's activity. Rather its aim is to build up the human life meaningful everywhere. According to Persi Nun, Education is the complete development of the individuality of a child, so that he/she can make original contribution to human life according to the best of capacity. In this respect, Alumni Association plays an important role as an essential element of co-curricular activities. This terminology recognized as a popular and an important 'World Organization' in international standard and modernization of education and research of the institutions. Moreover, it creates mutual and cordial attachment, sympathy, a respect, faith, harmony and bond between former and present learners. In this article, context and philosophy of Alumni Association have been presented.

ভূমিকা (Preface)

শিক্ষা মানুষের জীবন ও সমাজসম্পৃক্ত একটি প্রক্রিয়া। সামাজিক বিবর্তন ধারার সাথে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্যক্তির কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। এটি বৃহত্তর সমাজে যথোচিত প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের গতিশীল ধারায় সম্পৃক্ত করে। আর এই শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হলো শিক্ষাঙ্গন। যেখানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক একাত্মভাবে চর্চাই করে না; বরং দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডও সানন্দে চর্চা করে। কারণ পুঁথিগত বিদ্যাই পরিপূর্ণ বিদ্যা নয়। ব্যক্তিকে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনে উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সুনামগরিক, মননশীল, মার্জিত ও রুচিশীল এবং সুন্দর ও সত্যের অনুরাগী হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সহশিক্ষাক্রম (co-curricular) কর্মকাণ্ডের অন্যতম উপাদান হিসেবে শরীর চর্চা, বিতর্ক অনুষ্ঠান, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক চর্চা, ছাত্র সংসদ, ছাত্র কল্যাণ সংঘ, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।^১ ফলে শিক্ষার্থীদের দেহ, মন ও চিন্তা-চেতনার সুসম বিকাশ ঘটে।

১. পরিচয় (Acquaintance)

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এর প্রাণকেন্দ্র হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার অন্যতম মাধ্যম হলো অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (Alumni Association)। বর্তমান বিশ্বে উক্ত পরিভাষাটি বহুল প্রচলিত। অ্যালামনাই (Alumni) শব্দটি বহুবচন। একবচন অ্যালামনাস (Alumnus)। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Alere' অথবা 'Alo' থেকে উদ্ভূত।^২ ল্যাটিন ভাষায় এর শাব্দিক অর্থ ছাত্র-ছাত্রী, পালিত পুত্র, দাস-দাসী, লালন-পালন ইত্যাদি।^৩ পাশ্চাত্য অভিধানবেত্তা জন বসওয়েল-এর ভাষায়, *It referred to exposed children who were taken into a household where they regarded as somewhere between an heir and a slave, partaking in different ways of both categories.*^৪ অ্যালামনাস (Alumnus) শব্দ পুংলিঙ্গ। বহুবচন অ্যালামনাই (Alumni)। এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো অ্যালামনে (Alumna)। বহুবচন অ্যালামনেই (Alumnae)।^৫ তবে অ্যালামনাই (Alumni) বহুবচন শব্দটির

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচলন বেশি পরিদৃষ্ট হয়। এটি পুথলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়।^{১৬} সংক্ষেপে এটিকে অ্যালাম (Alum) অথবা অ্যালামস (Alums) বলা হয়।^{১৭} তবে এর প্রয়োগ অপ্রতুল।

ইংরেজি ভাষায় Alumni (অ্যালামনাই) শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রাক্তন, ভূতপূর্ব, সাবেক, পূর্বতন, বিগত ইত্যাদি।^{১৮} পরিভাষায় যারা কোন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথ ডিগ্রী অর্জন করে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজের দায়িত্ববোধ থেকে অর্জিত জ্ঞান সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ব্যবহার করেছেন।^{১৯} এ প্রসঙ্গে *The American Heritage Dictionary* গ্রন্থের ভাষ্য হলো, *An Alumnus or alumni is a former student and most often a graduate of an educational institution (School, College, University)*।^{২০} আর Association (অ্যাসোসিয়েশন) এর শাব্দিক অর্থ সংঘ, সংগঠন, সমিতি, সম্মেলন, পরিমেল, সংসদ ইত্যাদি।^{২১} পরিভাষায় কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কিছু সংঘবদ্ধ মানুষের বিধি-বিধান মেনে একত্রিত হওয়া।^{২২}

মূলত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (Alumni Association) হলো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন, যা প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সুদৃঢ় করে। পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান ও মননশীলতা দ্বারা তাঁরা দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণে নিবেদিত হন। কারণ এটি একটি পরিবন্ধ, যা মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যুগবদ্ধ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণার উৎস।^{২৩}

২. উৎস ও বিকাশ (Origin and Development)

বর্তমান বিশ্বে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত ও গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া এটি প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের নিকট আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কবে ও কোথায় প্রথম সূচনা হয় সেটি অনুসন্ধানের বিষয়। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক শহরস্থ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা আরম্ভ করে।^{২৪} এটি প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে এটি কিংস কলেজ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময় উক্ত নাম পরিবর্তন করে কলম্বিয়া কলেজ করা হয়। অতঃপর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। The Columbia College Alumni Association (CCAA) প্রবর্তনের দর্শন হলো কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য সুদৃঢ়করণ এবং নতুন প্রজন্মের নিকট আলোকস্তম্ভ হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন।^{২৫} পরবর্তীকালে অ্যালামনাই কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন যুবক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও ঘনীভূত করার জন্য Columbia College Young Alumni (CCYA) গঠন করে। তবে শর্ত হলো যারা দশ বছর পূর্বে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন, কেবল তাঁরাই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।^{২৬} এমনিভাবে প্রাক্তন নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ এবং বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে Columbia College Women (CCW) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজের প্রাক্তন নারী শিক্ষাবিদ লাওরেন যিনম্যান এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, *Something I am proud of as a Columbia College alumna is...."being a women pioneer in both college and the legal profession, having the courage to fight for my right to have a family and career."*^{২৭} তাই অ্যালামনাইয়ের পরিধি প্রসারের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে Columbia University Club স্থাপন করা হয়।^{২৮} প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের জন্য ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে The Alumni Medal

প্রবর্তন করা হয়। এমনকি আজীবন বিদ্যার্জন ও বই পড়ার প্রতি অনুপ্রাণনা সৃষ্টির লক্ষ্যে Columbia University Alumni Book Club স্থাপন করা হয়।^{১৯} এরপর যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে অবস্থিত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সূচনা করে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট জেমস ম্যাডিসন। তিনি দেশ-বিদেশের প্রাক্তন ও নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে Alumni Association of Nassau Hall গঠন করেন।^{২০} Nassau Hall হলো প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম একাডেমিক ভবন। ভবনটি ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে The Association of Princeton Graduate Alumni (APGA) করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬৮জন বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন এবং ১৭জন National Medal of Science প্রাপ্ত হন।^{২১} তাই অ্যালামনাইয়ের গতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের একাডেমিক পুরস্কার তথা Woodrow Wilson Award, The James Madison Medal, Moses Taylor Pyne Honor Prize, Porter Ogden Jacobus Fellowship, Award for Service to Princeton, Award for Excellence in Alumni Education ইত্যাদি চালু করা হয়।^{২২} ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। এটি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।^{২৩} বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন ও মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর জন্য ৪ জুলাই ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে The Alumni Association of the University of Virginia (AAUV) গঠিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তির ভিত্তিতে উক্ত নাম পরিবর্তন করে The Society of the Alumni of the University of Virginia করা হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ আইনে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে General Alumni Association of the University of Virginia করা হয়। অতঃপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় নাম সংশোধন করে প্রথম শিরোনামই নির্ধারণ করা হয়।^{২৪} ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সর্বব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে The University of Virginia Association Club স্থাপন করা হয়।^{২৫} এমনকি জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন নামে অর্ধ-শতাধিক অ্যালামনাই শিক্ষা পুরস্কার প্রদান করা হয়।^{২৬} এমনভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মন্ত্রী জে.এফ. ওবারলিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ওবারলিন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।^{২৭} কলেজের ৪৮ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে The Oberlin Alumni Association গঠিত হয়।^{২৮} পরবর্তীতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা কলেজ, সমাজ ও দেশের স্বার্থে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের জন্য অ্যালামনাই পদক ও পুরস্কার তথা Alumni Medal, Distinguished Achievement Award, Distinguished Service Award, Outstanding Young Alumni Award, Alumni Appreciation Award প্রদান করা হয়।^{২৯} অতঃপর কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে Oberlin Student Cooperative Association (OSCA) গঠন করা হয়।^{৩০}

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে Associated Harvard Alumni (AHA) গঠন করা হয়। ১ জুলাই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত নাম ঈষৎ পরিবর্তন করে Harvard Alumni Association (HAA) করা হয়।^{৩১} এর দর্শন হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ সাধনে সার্বিক সহায়তা করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য সুদৃঢ় করা।^{৩২} বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ যাবৎ ১৬০জন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নতুনত্ব সৃষ্টির কারণে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।^{৩৩} গবেষণার এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অ্যালামনাই কর্তৃপক্ষ Harvard Alumni Association Award প্রবর্তন করেন।^{৩৪}

এমনিভাবে, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার অন্টারিও প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী টরন্টো শহরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে কিংস কলেজ হিসেবে পরিচিতি ছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।^{৭৫} ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে The University of Toronto Alumni Association (UTAA) গঠিত হয়। তবে সামগ্রিক কার্যক্রম আরম্ভ হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে।^{৭৬} ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কৃতিত্বরূপ Awards of excellence, Student leadership awards, Award for community engagement, The rose wolfe distinguished alumni award, Arbor awards ইত্যাদি অ্যালামনাই পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।^{৭৭} এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া শহরে অবস্থিত মার্শাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন শুরু হয়।^{৭৮} এই অ্যালামনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হলেন এ.এস. ইয়াং এবং সেক্রেটারি হলেন জি.ভি. উইলার্ড। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পণ্ডিত ও সমাজসেবক, তাঁদের জন্য Williamson Medal প্রবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য হলো পদকটি যেন নতুন প্রজন্মের নিকট অপসূরমাণ আলোকবর্তিকা (Passing of the torch) হিসেবে কাজ করে।^{৭৯}

ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা অ্যাট চ্যাপেল হিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি সংক্ষেপে UNC নামে পরিচিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে UNC General Alumni Association গঠিত হয়।^{৮০} এর প্রথম সভাপতি হলেন জন মোটলী মোরহেড। তিনি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব সুদৃঢ়করণ, মঙ্গল কামনা ও শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে অবহিত করেন।^{৮১} অ্যালামনাইয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে George Watts Hill Alumni Centre নামে পৃথক ভবন নির্মিত হয়।^{৮২} প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা মানবকল্যাণে অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে Distinguished Alumnus/Alumna Award প্রবর্তন করা হয়।^{৮৩} অ্যালামনাই অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অভূতপূর্ব কাজ করেছেন, তাঁদের জন্য ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে Distinguished Service Medal চালু করা হয়।^{৮৪} এমনিভাবে, ৪০ বছর অথবা তার কম বয়সে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের জন্যও ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে Distinguished Young Alumni Award প্রদান করা হয়।^{৮৫} অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, যারা শিক্ষা ও গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের জন্যও ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে Faculty Service Award প্রবর্তন করা হয়।^{৮৬} মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগান শহরে অবস্থিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ আগস্ট ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে A Society of the Alumni নামক সংগঠন গঠিত হয়।^{৮৭} ৩০ জুন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে উক্ত নাম পরিবর্তন করে Alumni Association of the University of Michigan (AAUM) করা হয়। এর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি হলেন লুইস পি যোসিলীন। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে Athena Award এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে Council Recognition Award প্রবর্তন করা হয়।^{৮৮} এমনকি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন নারী শিক্ষার্থীদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অ্যালামনাইয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উৎসব আয়োজন করা হয়। তাই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে University of Michigan Black Alumni (UMBA) গঠন করা হয়।^{৮৯} অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। এটি ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগ ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে Oxford Medical Alumni (OMA) পরিমেল গঠন করে।^{৯০} এর সভাপতি হলেন প্রফেসর ডা. জন মরিস। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৭২ জন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সাফল্যের কারণে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত

হন। এজন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাসদেরকে অক্সনিয়ান (Oxonian) নামে বিশেষায়িত করা হয়।^{৫১}

ডার্টমাউথ কলেজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। কলেজটি ১৩ ডিসেম্বর ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে হ্যানওভার শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজে The Association of Alumni of Dartmouth College (AADC) গঠিত হয়।^{৫২} কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে Alumni Award প্রবর্তন করা হয়। এমনিভাবে প্রাক্তন যুবক শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আরও প্রবুদ্ধ করার জন্য ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে Young Alumni Award চালু করা হয়।^{৫৩} উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ চার্লস ওয়েকলী ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে Wisconsin Alumni Association (WAA) গঠন করেন।^{৫৪} বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কেবল গবেষণার জন্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে Wisconsin Alumni Research Foundation গঠন করা হয়।^{৫৫} এমনকি অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে Wisconsin Alumni House নামে পৃথক ভবন নির্মিত হয়।^{৫৬} তাই প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সমাজে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁদের জন্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে Distinguished Alumni Award প্রবর্তন করা হয়।^{৫৭} এভাবে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, শুধু তাঁদের জন্য 'Forward Under 40' নামে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।^{৫৮} ইকোল পলিটেকনিক ফ্রান্সে উন্নতমানের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট। এ প্রতিষ্ঠানের উপনাম হলো 'X'। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জন্য ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে Ecole Polytechnique Alumni Association (AX) গঠন করা হয়।^{৫৯} যদিও দীর্ঘসময় এর কার্যক্রম প্রায় স্থবির ছিল, তথাপিও ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সামগ্রিকভাবে কার্যক্রমের গতিশীলতা ফিরে আসে। পরবর্তীকালে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একাডেমিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।^{৬০} এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি. শহরে প্রতিষ্ঠিত জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে The Medical Society of Alumni Georgetown University (MSAGU) গঠন করা হয়।^{৬১} ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হিয়ালী উক্ত নাম পরিবর্তন করে A Society of Alumni (SA) করেন। অতঃপর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে The Georgetown University Alumni Association (GUAA) করা হয়। এর দর্শন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বন্ধন ও পুনঃবন্ধন স্থাপন করা।^{৬২} ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যালামনাই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের জন্য The William Gaston Award প্রবর্তন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলভিত্তিক বিভাগসমূহে সম্মানিত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে The Georgetown University Alumni Association Award প্রদান করা হয়।^{৬৩} অতঃপর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিভ্রমণের জন্য Georgetown University Alumni Association Travel Society গঠন করা হয়।^{৬৪} অপরদিকে, খ্রিস্টান পাদ্রী বেনেডিক্ট জোসেফ (দ্বিতীয়) ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে কলেজ অব দ্য হলিক্রস প্রতিষ্ঠা করেন। এ কলেজে ১ জুলাই ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে Holy Cross Alumni Association (HCAA) গঠন করা হয়।^{৬৫} সংগঠনের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হলেন যোহন জে. পাওয়ার। প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অত্যন্ত মেধাবী ও নেতৃত্বের অধিকারী, তাঁদের জন্য Hoc Signo Award এবং Young Alumni Leadership Award প্রবর্তন করা হয়।^{৬৬} এমনকি অ্যালামনাসদের সুখী-সমৃদ্ধ ও অর্থবহ জীবনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা কামনায় Alumni Career Development কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।^{৬৭}

স্মিথ কলেজ যুক্তরাষ্ট্রের নরথামটন শহরে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মানববিদ্যা বিষয়ক প্রসিদ্ধ মহিলা কলেজ। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে The Alumnae Association of Smith College (AASC) গঠন করেন।^{৬৮} এর দর্শন হলো To further the well-being of the College and its graduates by increasing the interest of members in the college and in each other.^{৬৯} অ্যাসোসিয়েশনের পরিধি ও কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুচারুরূপে পরিচালিত করার জন্য ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে Alumnae House নির্মাণ করা হয়।^{৭০} এমনকি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে The Smith College Medal প্রবর্তন করা হয়।^{৭১} এছাড়াও কলেজে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চর্চা ও চিন্তাবিনোদনের জন্য ১১টি Cultural Organization রয়েছে।^{৭২} এমনভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড শহরে অবস্থিত জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় ২৬ এপ্রিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে Alumni Association গঠন করে।^{৭৩} পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে Hopkins University Alumni Association (HUAA) করা হয়। উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও দর্শন বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবহিতকরণ ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিকরণ।^{৭৪} প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের দেশ ও জাতির স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়ার জন্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন একাডেমিক পুরস্কার তথা Woodrow Wilson Award for Distinguished Government Service, Heritage Award, Distinguished Alumnus Award, Global Achievement Award, Outstanding Recent Graduate Award, Community Champion Award^{৭৫} প্রবর্তন করা হয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের নিউ হ্যাভেন শহরের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে An Alumni Organization Independent of Yale গঠিত হয়।^{৭৬} ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নাম পরিবর্তন করে The Association of Yale করা হয়। অবশেষে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ঈষৎ পরিবর্তন করে The Yale Alumni Association (YAA) নামকরণ করা হয়।^{৭৭} বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ৬২ জন শিক্ষার্থী অদ্যাবধি বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্যের কারণে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।^{৭৮} এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে অ্যালামনাই কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন ও নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সংক্রান্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য The Yale Medal প্রবর্তন করেন।^{৭৯} মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হলো স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে The Stanford Alumni Association (SAA) গঠন করা হয়। এর দর্শন হলো To foster a lifelong intellectual and emotional connection between the university and its graduates.^{৮০} স্বনামধন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অদ্যাবধি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ৮৩জন নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।^{৮১} তাই গবেষণাকর্মে আরও অনুপ্রাণনা সৃষ্টির জন্য The Stanford Award of Excellence সম্মাননা চালু করা হয়।^{৮২} এছাড়াও যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল আন্তরিকতার সাথে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, তাঁদের সম্মানে অ্যালামনাই কর্তৃপক্ষ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে Stanford Association গঠন করেন।^{৮৩}

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রোড আইল্যান্ড কলেজ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাউন প্রেসিডেন্ট ইলিশা অ্যানড্রিউজ এর সম্মানে Andrews Association গঠন করা হয়।^{৮৪} ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে উক্ত নাম পরিবর্তন করে Alumnae Association of Brown University (AABU) করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের যথাযথ দায়িত্ব পালন ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক বেশ কিছু Alumnae Association of Brown University Award প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Brown Bear Award, The William Rogers Award, Alumni Service Award, Young Alumni Service, Brown Annual Fund Young Alumni Award, Brown Annual Fund Class Participation

Award, Association of Class Leaders Class of the year Award ইত্যাদি।^{৮৫} এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডার গেইনসভিলে অবস্থিত অন্যতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৪জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে The University of Florida Alumni Association (UFAA) গঠিত হয়।^{৮৬} মার্কিন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মিলটন ইয়াটস ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জন্য The Alma Mater^{৮৭} for the University of Florida গঠন করেন।^{৮৮} এমনকি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন সাফল্যময় জীবনের দ্বার উন্মুক্তের জন্য শিক্ষাবিদ জে. ওয়্যেনে বীইটজ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে The University of Florida Career Resource Center গঠন করেন।^{৮৯} অপরদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তদানিন্তন ব্রিটিশ ভারতে অক্সব্রিজ শিক্ষা ব্যবস্থা অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে The Dhaka University Old Boys Association (DUOBA) গঠন করে।^{৯০} অবশ্য এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. মমতাজ উদ্দিন আহমদ। এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি হলেন বিচারপতি মো. ইবরাহীম ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের অ্যাসোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্তকরণের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে নাম পরিবর্তন করে Alumni Association করা হয়। বর্তমানে এটি The Dhaka University Alumni Association (DUAA) নামে পরিচিত। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় পুরাতন রেলওয়ে এলাকায় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ভবন নির্মাণের জন্য জমিও বরাদ্দ করেন।^{৯১} ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণায় যুগোপযোগী মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষাবৃত্তি চালু করে। জাপানে প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হলো কীও বিশ্ববিদ্যালয়। এটি টোকিও রাজধানীর মিনাটো শহরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে Alumni Association গঠন করে।^{৯২} প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষা ও গবেষণায় দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। এমনকি জাপানের ৩জন প্রধানমন্ত্রী ও ১৯জন প্রেসিডেন্ট এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন শিক্ষার্থী ছিলেন।^{৯৩} অতঃপর অস্ট্রেলিয়ায় সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে Sydney University International House Alumni Association (SUIHAA) গঠন করে।^{৯৪} কর্মজীবনে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের জন্য Alumni Award for Cultural Contribution, Alumni Award for Service to Humanity, Alumni Award for Innovation and Entrepreneurship, Alumni Award for International Achievement, Alumni Award for Professional Achievement, Outstanding Achievements of Young Alumni Award ইত্যাদি নামে অ্যালামনাই পুরস্কার প্রদান করা হয়। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি নতুন প্রজন্মের উৎসাহ সৃষ্টি করা।^{৯৫} পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে Punjab University Alumni Association (PUAA) গঠন করে।^{৯৬} এর প্রেসিডেন্ট হলেন মাননীয় উপাচার্য ও সেক্রেটারি হলেন ডীন মহোদয়। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করার জন্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন পুরস্কার ও ছাত্র-বৃত্তি চালু করে।^{৯৭} ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী ইন্দোর কুমার গুজরাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিন একর জমির উপর Alumni House ভিত্তি স্থাপন করেন।^{৯৮}

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অগ্রহে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের (GPRB: Parliament Act No.XXVI,1973) অংশ হিসেবে ইনস্টিটিউট অব

বাংলাদেশ স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বাংলাদেশ বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানো এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ ও সৃজনশীল শিক্ষক ও গবেষক দল তৈরি করা।^{৯৯} ইনস্টিটিউটের স্বনামধন্য বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রফেসর ড. এম. জয়নুল আবেদীনের উদ্যোগে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে Institute of Bangladesh Studies Alumni Association (IBSAU) গঠিত হয়।^{১০০} এর দর্শন হলো প্রাক্তন ও বর্তমান গবেষকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন, সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো ও আন্তর্জাতিকমানের গবেষণায় গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগসমূহও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কার্যক্রম আরম্ভ করে। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে Rajshahi University Alumni Association (RUAA) গঠন করে। এর সভাপতি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. অরুণ কুমার বসাক। অতঃপর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এ্যাডহক কমিটির সুপারিশক্রমে ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. নূরুল হোসেন চৌধুরীকে সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় নির্বাচিত সভাপতি হন। অপরদিকে, লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে Leipzig University's International Alumni Network গঠিত হয়।^{১০১} সংক্ষেপে এটি Leipzig Alumni International (LAI) নামে পরিচিত। এর প্রেক্ষণ হলো প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আজীবন জ্ঞানার্জন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখা।^{১০২} তাই সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যারা অনন্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্মাননা ও পুরস্কারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।^{১০৩} ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাজ্যে ক্যামব্রিজ শহরস্থ বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ইংরেজিভাষী বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলম্ব হলেও সম্প্রতি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।^{১০৪} গ্রিক সংবিধানের আলোকে এর নামকরণ করা হয় Hellenic Cambridge Alumni Association (HCAA)। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ড. গোরডন ক্লার্ক।^{১০৫} বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের অভূতপূর্ব অবদানের জন্য অদ্যাবধি ১২০জন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এজন্য ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলামনাসদেরকে বিশেষভাবে ক্যান্টাব্রিজিয়ান (Cantabrigian) বিশেষণে অভিহিত করা হয়।^{১০৬} সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সমগ্র বিশ্বে উন্নতমানের যুগোপযোগী গবেষণা ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং গবেষকদের মধ্যে পারস্পরিক অর্থবহ সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে International Alliance of Research Universities Alumni Association Network গঠন করা হয়। সংক্ষেপে IARU Alumni Association Network বলা হয়। এটি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ১০টি গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।^{১০৭} বর্তমানে এর সভাপতি হলেন জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মাকুটু গুনুকামি। সংগঠনটির প্রধান কার্যালয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে অবস্থিত। বর্তমানে এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বমোট ১১টি।^{১০৮} এমনিভাবে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। তবে এক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives)

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণ একটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, অলাভজনক ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। এটি উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে সহশিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম উপাদান হিসেবে সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। যা প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝে গড়ে তোলে এক অপূর্ব অটুট বন্ধন ও বিশ্বাস। স্থাপিত হয় পারস্পরিক

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। আর এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম হলো যোগাযোগ। তাই শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে।

- অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচয় করে দেয়া, যাতে শিক্ষা ও গবেষণায় সৃজনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- সকল সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির এক অটুট মেলবন্ধন স্থাপন করা;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রম কর্মকাণ্ড চর্চা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক গ্রাম ও পাড়া-মহল্লায় অ্যালামনাই ক্লাব স্থাপন করা, যাতে তারা অযথা সময় অপচয় না করে শিক্ষা ও গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকে;
- সদস্যদের জন্য সম্মেলন, সমাবেশ, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, কর্মশিবির, প্রদর্শনী ও ভ্রমণের আয়োজন করা;
- দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সদস্যদের কার্যক্রম ও পরিচয় সংবলিত স্মরণিকা, নিউজলেটার, ম্যাগাজিন, পুস্তক মুদ্রণ ও ওয়েবসাইট প্রকাশ করা;
- শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন ও মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তাদান ও প্রতিষ্ঠান/বিভাগ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;
- সদস্যদের মধ্যে কেউ সামাজিক বা স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ে পড়লে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা;
- সদস্যদের কর্তব্য পালনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা;
- প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা;
- প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের জন্য পুরস্কার/শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- সদস্যদের ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া এবং কর্মসংস্থানের জন্য আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা;
- জাতীয় দুর্ভোগ মোকাবিলা এবং দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে কাজ করার জন্য একটি আর্থিক কল্যাণ তহবিল গঠন এবং তহবিলের অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- জাতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ ও কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা;
- সদস্যদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারণাগুলো পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা;
- অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সদস্যদের পারস্পরিক সংলাপ, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;

- প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের গবেষণাকর্মে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অথবা গবেষণা সংস্থার সহযোগিতার অনুসন্ধান করা;
- সর্বোপরি দেশ-বিদেশে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস অথবা বিভাগের কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নে গঠনমূলক বাস্তবধর্মী পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।^{১০৯}

৪. দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Philosophical points of view)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের স্বভাবসুলভ আচরণ। মানুষ মানুষের জন্য। একে অপরের পার্শ্বে দাঁড়ানো, পরামর্শ দেয়া ও সহযোগিতা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এই বার্তাটুকু পৌছানো ও বাস্তবায়ন করাই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মূল দর্শন। তাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বহুমুখী উপকার সাধিত হয়। নিম্নে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিধৃত হলো।

৪.১ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নিঃসন্দেহ একটি হিতকর সংগঠন। এটি প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে একে অপরের অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া দৈহিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সংশ্লিষ্টতার অভিব্যক্তি উৎসাহিত করে। অধ্যাপিকা আনিসা ফাতেমা শাকিল-এর ভাষায়, *'The Alumni Association's Primary focus is to strengthen alumni, relations between students and its alumni, while promoting and considering the best interest of the institute.'*^{১১০}

৪.২ সমাজে যেকোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। যার সাথে যত বেশি মানুষের সম্পর্ক ও জানা শোনা, বিপদ আপদে সাহায্য করার মানুষও তার তত বেশি। আর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই পরিবেশটির সুযোগ সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে নীল এম. খানফার বলেন, *'The exchange of information is a key driver. Alumni association can take this information and tailor new programs toward meeting these needs/wants.'*^{১১১} সুতরাং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো আমাদের আধুনিক জীবনে এক নতুন বাস্তবতা। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সেই বাস্তবতাকে আরও গতিশীল ও ত্বরান্বিত করে। সৃষ্টি করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব।

৪.৩ এটি শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্য একটি পথনির্দেশিকা (guideline) হিসেবে কাজ করে। যেন কর্মজীবনে তারা সততা, সাহসিকতা, দক্ষতা, ও সফলতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।^{১১২} এ প্রসঙ্গে ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম (১৯৩১-২০১৫) এর বার্তা চিরস্মরণীয়। তিনি বলেন, *তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার আহবান হলো ভিন্নভাবে চিন্তা করার সাহস থাকতে হবে, আবিষ্কারের নেশা থাকতে হবে, যে পথে কেউ যায়নি সে পথে চলতে হবে, অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস থাকতে হবে; সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর সফল হতে হবে। এগুলোই হলো সবচেয়ে মহৎ গুণ। এভাবেই তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তরুণদের কাছে এটাই আমার বার্তা।*^{১১৩}

৪.৪ এটি প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মানবপ্রীতির উপর গুরুত্বারোপ ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ়করণে সহায়তা করে। তাছাড়া উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে তাঁদের ধীশক্তি ও উদারতা বৃদ্ধিতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।^{১১৪} ফলে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

৪.৫ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের আনন্দময় ও আবেগঘন পরিবেশে একটি মিলনমেলায় পরিণত করে। যেখানে ভেসে ওঠে অতীত স্মৃতি ও ধ্যান-ধারণা। উদ্বুদ্ধ করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা। কারণ একটি আলোকিত মানুষ ও আদর্শ সমাজ গঠনে মার্জিত ও রুচিশীল সাংস্কৃতিক চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক সংস্কৃতিরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যা মানব জীবনকে আরও সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করে তোলে। জগত করে তোলে দেশ প্রেমের সদিচ্ছা। সমাজবিজ্ঞানী মথি আরনল্ড এর ভাষায় বিষয়টি এভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেন, *'Culture is a pursuit of our total perfection by means of get, thing to know, on all the matters which most concern us the best which has been thought the said in the world and through this knowledge, turning a stream of fresh and free thought upon own stock nations and habits which we now follow.'*^{১১৫}

৪.৬ এটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকাকে উৎসাহিত ও সংবর্ধিত করে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আনুগত্য, উৎসাহ ও উদীপনা প্রবলভাবে অব্যাহত রাখে। অধ্যাপক টারা এস. সিঙ্গার এ প্রেক্ষাপটে বলেন, *Alumni organizations also provide students with involvement opportunities that enhance their leadership skills by giving them the chance to interact with significant social and professional contacts. Such networking and professional contacts are invaluable to students.*^{১১৬} তাই সং, যোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্বই পারে সমাজে কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি নির্মূল করতে। কেননা সঠিক ও গঠনমূলক নেতৃত্ব ছাড়া দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

৪.৭ পৃথিবীর কোন মানুষই স্বয়ংসম্পন্ন নয়। কেউ না কেউ কারও না কারও উপর নির্ভরশীল। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে নবীন শিক্ষার্থীরা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন কাজে তাঁদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।^{১১৭} ফলে তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

৪.৮ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ। এটি প্রতিষ্ঠানের বিগত সকল শিক্ষার্থীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি নির্দিষ্ট স্থান করে দেয়। ফলে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, সামান্যটুকু হলেও তা পরিশোধ করার সুযোগ পায় এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা ও উন্নত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।^{১১৮}

৪.৯ এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নয়ন ও অর্থযোগান উৎসের সন্ধান দেয়। ফলে প্রতিষ্ঠান/বিভাগের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বতন্ত্র অ্যালামনাই ভবন নির্মাণ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ফান্ডসহ বহুবিধ উপকার সাধিত হয়।^{১১৯}

৪.১০ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নবীন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে জ্ঞানকোষে নতুন মাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে তারা অ্যালামনাইয়ের সদস্যভুক্ত হওয়ায় শিক্ষাঙ্গনে নিজেদেরকে যথেষ্ট সম্মানিত ও গর্ববোধ করে এবং বিদ্যার্জনে আরও বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী হয়।^{১২০}

৪.১১ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং-এর গ্রোডিং নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের উন্নত দেশে এমনও উদাহরণ রয়েছে যে, অ্যালামনাসরা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।^{১২১} কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দর্শন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। শিক্ষা ও গবেষণার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নয়। শিক্ষার্থীরা মূল বইয়ের সংস্পর্শে আসতে চায় না। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও বিভাগীয় সেমিনার ব্যবহারে তারা অনগ্রহী ও উদাসীন। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উচিত মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া এবং শিক্ষার্থীদের

পড়ালেখার উপর সার্বক্ষণিক কঠোর নজরদারি রাখা। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ইমেরিটাস ড. অরুণ কুমার বসাক এর ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমাদের সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাহত করতে পারি না। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার্থীরা মিথ্যা বলতে জানে না। অন্যের খাতা থেকে কপি বা নকল করা অপমানজনক মনে করে। আমাদের দেশে শিক্ষার্থী কেন! অভিভাবক, শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে উদাসীন। আমরা সবাই যদি একযোগে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মিথ্যা কথা বলা এবং না বুঝে মুখস্থ করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তাহলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কার্যকরী প্রশিক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবে।^{১২২} ফলে এক পর্যায়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং-এর গ্রেডিং এ উপরের দিকে স্থান লাভ করতে সমর্থ হবে।

৪.১২ আমাদের অনেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী সরকারের উচ্চপদস্থ স্থানে অবস্থান করে দেশ-বিদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা দিতে যাচ্ছেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল সার্ভিস, রাষ্ট্রদূত, ব্যাংক কর্মকর্তা ও এম.ফিল/পিএইচ.ডি গবেষক থেকে শুরু করে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রায়ই আমাদের নিতে হয়। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সেসব মহৎ মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।^{১২৩} ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আরও বেশি আকৃষ্ট হয় ও মনোনিবেশ করে। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

৪.১৩ সর্বশেষ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সহশিক্ষাক্রম (co-curricular) কর্মকাণ্ডের অন্যতম উপাদান হিসেবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল, যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা বিশ্লেষণ করে। পাশাপাশি এটি দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষেধক (remedial) হিসেবেও কাজ করে। অধ্যাপিকা আনিসা শাকিল এ প্রসঙ্গে বলেন, *It is a key portfolio in supporting and managing student related matters outside the classroom. It analyzes the examination results, quality analysis of performance, monitoring high flyers and proposing remedial measures for weak students.*^{১২৪} এছাড়াও অ্যালামনাই প্রতিষ্ঠানের চলমান শিক্ষা ও গবেষণার মান সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে।

উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায় যে, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব সংগঠন হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। এর দর্শন হলো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও যুগোপযোগীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। তাছাড়া প্রাক্তন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টি করে এক অপূর্ব অটুট বন্ধন। গড়ে উঠে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বাস ও ঐক্য। সংবর্ধিত করে শিক্ষার্থীদের আগামী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকা। যেন কর্মজীবনে তারা নৈতিক, মানবিক, সত্যতা, সাহসিকতা, দক্ষতা ও সফলতার সাথে দেশ-বিদেশে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। ফলে ফিরে আসবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ V.C. Pandey, *High Education is a Globalizing World* (Delhi: Isha Books, 2005), p. 6
- ^২ accessed on 28 November 2019, From wikipedia, the free encyclopedia; ল্যাটিন ভাষায় **Alere** ও **Alo** শব্দদ্বয় ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয়। দ্র. accessed on 23 May 2020, en.wikipedia.org/wiki/alumnus
- ^৩ *Oxford English Dictionary*, Vol-1 (Oxford: Oxford University Press, 1933), p. 260p; accessed on 23 January 2020, Marriam-webster; alumnus...
- ^৪ John Boswell, *The Kidness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance* (New York: Pantheon, 1988), Pp. 117-119
- ^৫ John Gage Alle, *Webster's Dictionary* (Chicago: Wilcox & Follett Book Company, 1983), p. 16; *An Alumnus* (Masculine, Plural Alumni) or *Alumna* (Feminine, Plural Alumnae) is a former student or Pupil of a School, College or University. cf. accessed on 12 January 2015, uni-of-oxford, custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1171/~whatdoes-alumni-mean%3F
- ^৬ *The world Book Dictionary* (Chicago: Word Book, Inc., 1988), p.63; the masculine plural alumni is correctly used for groups composed of both sexes. cf. accessed on 28 January 2020, dictionary.com/browse/alumni#:~:text=noun%2C%20plural%20a-lum; Library%20staff%20the%20party
- ^৭ accessed on 20 January 2020, thefreedictionary.com/alumnus
- ^৮ *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 43; *The Oxford English Dictionary*, Vol-1 (Oxford Clarendon Press, 1991), p. 373
- ^৯ accessed on 20 Janury 2020, From Wikipedia, the free encyclopedia; Nile M. Khanfar, Ziad Swaidan, Bahauddin G. Mujtaba, "A Study in relationship Orientation and prioritization of Alumni Association preferences with College Seniors in Higher education", *Contemporary Issues in Education Research-Third Quarter*, Vol-2, Number-3, 2009, pp. 15-16; Alumnus. pl. alumni, i. one that has attended or has graduated from a particular School, College or University, ii. one that is a former member (as of an organization) employee (as in an office), contributor (as to a magazine), or inmate (as of a penitentiary), cf. *Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged* (USA: G & C., Merriam Company, 1976), p. 64
- ^{১০} *The American Heritage Dictionary of the English Language* (New York: American Heritage Publishing Co. Inc., 1969), p. 39
- ^{১১} *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, p. 78
- ^{১২} *The New Dictionary of Thoughts* (USA: Standard Book Company, 1963), Pp. 34-35
- ^{১৩} accessed on 11 January 2019, "The State of Corporate Alumni: 2017 Surrey Results." Enterprise Alumni-large organization Alumni & Retiree Management
- ^{১৪} accessed on 28 January 2020, college.columbia.edu/alumni/about/board-of-directors
- ^{১৫} accessed on 2 February 2020, college.columbia.edu/about/history/timeline
- ^{১৬} accessed on 4 February 2020, college.columbia.edu/alumni/connect/ccya
- ^{১৭} accessed on 4 February 2020, college.columbia.edu/alumni/connect/ccw
- ^{১৮} accessed on 5 February 2020, alumni.columbia.edu/content/columbia-alumni-clubs
- ^{১৯} accessed on 5 February 2020, alumni.columbia.edu/content/get-involved
- ^{২০} accessed on 5 February 2020, alumni.princeton.edu/about
- ^{২১} accessed on 9 February 2020, en.wikipedia.org/wiki/princeton_University
- ^{২২} accessed on 6 February 2020, alumni.princeton.edu/volunteer/awards

-
- ১৫ accessed on 12 February 2020, en.wikipedia.org/wiki/university_of_virginia
- ১৬ accessed on 11 February 2020, alumni.virginia.edu/about/about-the-alumni-association/
- ১৭ accessed on 13 February 2020, uvaclubs.virginia.edu/clubs/uvaclubs-at-a-glance
- ১৮ accessed on 14 February 2020, s3.amazonaws.com/uva-alumni-scholarships/ media/ scholarship-Guide-2019.pdf
- ১৯ accessed on 11 March 2020, en.wikipedia.org/wiki/Oberlin_College
- ২০ accessed on 11 March 2020, oberlin.edu/alumni-relations/alumni-services
- ২১ accessed on 12 March 2020, http://www.oberlin.edu/alumni/
- ২২ accessed on 17 March 2020, en.wikipedia.org/wiki/Oberlin_Student_Cooperative_Association
- ২৩ accessed on 19 March 2020, alumni.harvard.edu/community/about-haa
- ২৪ *Ibid.*
- ২৫ accessed on 18 March 2020, en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University#Alumni
- ২৬ accessed on 20 March 2020, alumni.harvard.edu/community/about-haa/awards
- ২৭ accessed on 21 March 2020, en.wikipedia.org/wiki/University_of_Toronto
- ২৮ accessed on 23 March 2020, alumni.utoronto.ca/alumni-networks/u-t-alumni-association-/About-UTAA
- ২৯ accessed on 24 March 2020, alumni.utoronto.ca/events-and-programs/awards/awex
- ৩০ accessed on 27 March 2020, fandm.edu/alumni-connections/alumni-association/history-of-the-alumni-association
- ৩১ *Ibid*
- ৩২ accessed on 28 March 2020, alumni.unc.edu/about-the-gaa/
- ৩৩ accessed on 28 March 2020, alumni.unc.edu/about-the-gaa/what-is-the-gaa/
- ৩৪ accessed on 30 March 2020, alumni.unc.edu/about-the-gaa/history/
- ৩৫ accessed on 1 April 2020, alumni.unc.edu/awards-distinguished-alumnusalumna-award/
- ৩৬ accessed on 2 April 2020, alumni.unc.edu/awards-distinguished-service-medal/
- ৩৭ accessed on 2 April 2020, alumni.unc.edu/awards-distinguished-young-alumni-award/
- ৩৮ accessed on 3 April 2020, alumni.unc.edu/awards-faculty-service-awards/
- ৩৯ accessed on 5 April 2020, alumni.umich.edu/about-us-/our-history/; quab.lib.umich.edu/b/bhlead/umich-bhl-8730?byte=92230856; focusrgn=bioghist; subview=standard; view=reslist
- ৪০ accessed on 7 April 2020, community.alumni.umich.edu/alumnac/awards/athena-award
- ৪১ accessed on 8 April 2020, community.alumni.umich.edu/alumnac/awards/birthday-greeting
- ৪২ accessed on 9 April 2020, medsci.ox.ac.uk/get-involved/alumni/about-us/the-history-of-oxford-medical-alumni
- ৪৩ accessed on 13 April 2020, en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford
- ৪৪ accessed on 15 April 2020, alumni.dartmouth.edu/serve/association-alumni
- ৪৫ accessed on 17 April 2020, alumni.dartmouth.edu/serve/recognition/dartmouth-alumni-award
- ৪৬ accessed on 20 April 2020, uwalumni.com/about/waa-history/
- ৪৭ *Ibid*
- ৪৮ *Ibid*

-
- ৫৭ accessed on 22 April 2020, uwalumni.com/about/alumni-awards/distinguished-alumni-awards/
 ৫৮ accessed on 25 April 2020, uwalumni.com/about/alumni-awards/forward-under-40/
 ৫৯ accessed on 24 April 2020, in.linkedin.com/company/polytechnique-alumni
 ৬০ accessed on 27 April 2020, polytechnique.edu/en/awards-distinctions-0? page=1 & language=en
 ৬১ accessed on 29 April 2020, alumni.georgetown.edu/alumni-association/history
 ৬২ *Ibid*
 ৬৩ accessed on 29 April 2020, alumni.georgetown.edu/alumni-association/alumni-awards
 ৬৪ accessed on 29 April 2020, alumni.georgetown.edu/travel-society
 ৬৫ accessed on 1 May 2020, holycross.edu/alumni/crusaders-connect/hcaa/timeline
 ৬৬ accessed on 1 May 2020, holycross.edu/alumni/crusaders-connect/hcaa/hcaa-awards
 ৬৭ accessed on 3 May 2020, holycross.edu/alumni/careers
 ৬৮ accessed on 5 May 2020, smith.edu/about-smith/alumnae-relations/association-benefits
 ৬৯ *Ibid*
 ৭০ *Ibid*
 ৭১ accessed on 7 May 2020, smith.edu/about-smith/smith-history/smith-college-medal
 ৭২ accessed on 11 May 2020, en.wikipedia.org/wiki/Smith_College
 ৭৩ accessed on 11 May 2020, alumni.jhu.edu/history
 ৭৪ *Ibid*
 ৭৫ accessed on 10 May 2020, alumni.jhu.edu/award
 ৭৬ accessed on 13 May 2020, alumni.yale.edu/your-alumni-association/what-we-do
 ৭৭ *Ibid*
 ৭৮ accessed on 14 May 2020, en.wikipedia.org/wiki/Yale_University
 ৭৯ accessed on 15 May 2020, alumni.yale.edu/awards/the-yale-medal
 ৮০ accessed on 17 May 2020, alumni.stanford.edu/get/page/about-us
 ৮১ accessed on 19 May 2020, alumni.wikipedia.org/wiki/standford_University
 ৮২ accessed on 22 May 2020, collegeconsensus.com/rankings/best-college-alumni-networks/p.17,62
 ৮৩ *Ibid*
 ৮৪ accessed on 21 May 2020, brown.edu/about/history/timeline/alumnae-association-formed
 ৮৫ accessed on 24 May 2020, brunonia.brown.edu/alumni/volunteer/info/alumni-awards
 ৮৬ accessed on 27 May 2020, collegeconsensus.com/rankings/best-college-alumni-networks/
 ৮৭ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে কৃতবিদ্যা হয়ে উঠেছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে **Alma Mater** বলা হয়। দ্র. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, p. 40
 ৮৮ accessed on 1 June 2020, en.wikipedia.org/wiki/University_of_Florida
 ৮৯ accessed on 3 June 2020, en.wikipedia.org/wiki/j_wayne_Reitz_Union
 ৯০ accessed on 5 June 2020, duaa-bd.org/journey-of-duaa/
 ৯১ accessed on 7 June 2020, duaa-bd.org/2017/12/scholarship-for-education-and-social-activism-2017/
 ৯২ accessed on 9 June 2020, keio.ac.jp/en/news/2018/May/31/48-44286/

-
- ^{৯৩} accessed on 11 June 2020, <https://www.keio.ac.jp/ja/about/learn-more/by-the-numbers>; en.wikipedia.org/wiki/Keio_University
- ^{৯৪} accessed on 13 June 2020, [linkedin.com/company/sydney-university-international-house-alumni-association.suihaa-](https://www.linkedin.com/company/sydney-university-international-house-alumni-association.suihaa-)
- ^{৯৫} accessed on 14 June 2020, [sydney.edu.au/engage/alumni/awards.html](https://www.sydney.edu.au/engage/alumni/awards.html)
- ^{৯৬} accessed on 19 June 2020, en.wikipedia.org/wiki/university_of_the_Punjab#Notable_alumni
- ^{৯৭} accessed on 18 June 2020, [alumni.puchd.ac.in/awards-scholarships.php](https://www.alumni.puchd.ac.in/awards-scholarships.php)
- ^{৯৮} accessed on 23 June 2020, [alumni.puchd.ac.in/alumni-house.php](https://www.alumni.puchd.ac.in/alumni-house.php)
- ^{৯৯} আইবিএস এলামনাই সম্মেলন ২০১৬, *স্মরণিকা*, পৃ. ৭; প্রফেসর এম. জয়নুল আবেদীন, আইবিএস-বিগত পঁচিশ বছরের কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা, রজত জয়ন্তী উৎসব: ১৯৭৪-২০০০ ও সেমিনার: বাংলাদেশ স্টাডিজ, ৩রা জুন, ২০০০, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬
- ^{১০০} আইবিএস এলামনাই সম্মেলন ২০১৬, *স্মরণিকা*, পৃ. ৫-৬
- ^{১০১} accessed on 4 July 2020, [uni.leipzig.de/en/university/alumni/leipzig-alumni-international/](https://www.uni.leipzig.de/en/university/alumni/leipzig-alumni-international/)
- ^{১০২} *Ibid*
- ^{১০৩} accessed on 5 July 2020, [uni.leipzig.de/en/university/profile/ehrungen-und-auszeichnungen/honours-and-awards/](https://www.uni.leipzig.de/en/university/profile/ehrungen-und-auszeichnungen/honours-and-awards/)
- ^{১০৪} accessed on 10 July 2020, [alumni.com.ac.uk/group/hellenic.cambridge-alumni-association](https://www.alumni.com.ac.uk/group/hellenic.cambridge-alumni-association); Anila Fatima Shakil, "The Importance of Alumni Association at University Level in Karachi, Pakistan", *Education*, Vol-2, No. 1, Scientific and Academic Publishing, 2012, USA, p. 85
- ^{১০৫} accessed on 17 July 2020, [alumni.com.ac.uk/group/hellenic.cambridge-alumni-association](https://www.alumni.com.ac.uk/group/hellenic.cambridge-alumni-association)
- ^{১০৬} accessed on 29 July 2020, en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
- ^{১০৭} accessed on 4 May 2020, [iaruni.org/about/about-iaru](https://www.iaruni.org/about/about-iaru); [iaruni.org/research_initiatives](https://www.iaruni.org/research_initiatives); দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হলো- Australian National University, ETH Zurich, National University of Singapore, Peking University, University of California, Berkeley, University of Cambridge, University of Cape Town, University of Copenhagen, University of Oxford and University of Tokyo. cf. accessed on 12 August 2020, [iaruni.org/about/about-iaru](https://www.iaruni.org/about/about-iaru)
- ^{১০৮} *Ibid*; accessed on 13 August 2020, [iaruni.org/about/members](https://www.iaruni.org/about/members)
- ^{১০৯} accessed on 17 April 2020, objectives of Alumni association2016pdf-Adobe Reader; [alumni.puchd.ac.in/aims-objectives.php](https://www.alumni.puchd.ac.in/aims-objectives.php); accessed on 11 February 2020, my.ccis.edu/about-the-ccaa/welcome; alumni-virginia.edu/about/about-the-alumni-association/; accessed on 12 March 2020, ub.edu/web/ub/en/menu_eines/notices/2010/entrevistes/jordi_garcia.Alumni.html?
- ^{১১০} *Education*, Vol-2, No. 1, p. 26
- ^{১১১} *Ibid*
- ^{১১২} *Ibid*
- ^{১১৩} *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১১ শ্রাবণ ১৪২২, মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩
- ^{১১৪} accessed on 17 July 2020, <http://www.xaiver.edu/sall>
- ^{১১৫} G.S. Shurye, *Culture and Society* (India: University of Bombay, 1947), Pp. 61-62
- ^{১১৬} accessed on 13 May 2020, <http://www.bu.edu/alumni/int/connect/association.html>; Tara. S. Singer and Aaron W. Hushey, The Role of the Alumni Association in Student Life, *New Directions for student Services*, no.100, winter 2002, San Francisco, Wiley Periodicals, Inc, p. 65
- ^{১১৭} Student may become reliant upon alumni guidance as graduation approaches. Alumni in turn should embrace this relationship and look forward to having future "brothers/sisters". More knowledge, funds,

-
- and resources will be gained as alumni plow forward with networking and recruiting. cf. W.C. Johnson & A. Weinstein, *Superior Customer Value in the New Economy* (Boca Raton: CRC Press, 2004), p. 105
- ^{১১৮} *Contemporary Issues in Education Research-Third Quarter 2009*, Vol-2, No. 3, Pp. 15-16
- ^{১১৯} accessed on 19 July 2020, <http://www.hamdard.edu.pk/alumni>; Studied the role of alumni in the financial support of higher education and found that alumni who are financial contributors are more likely to be involved with their alma maters in other ways. cf. S. Gaier, *Increasing Alumni Involvement and Alumni Financial Support Through a Student Alumni Association* (Washington D.C.: ERIC Clearinghouse on Higher Education, 2001), p. 107
- ^{১২০} *New directions for Student Services*, no.100.winter2002, San Francisco, Wiley periodicals, Inc, p. 65
- ^{১২১} *Contemporary Issues in Education Research- Third Quarter*, Vol. 2, No. 3, p.17
- ^{১২২} *বিদ্যাবার্তা*, বর্ষ ১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.২
- ^{১২৩} *Superior Customer Value in the New Economy*, p. 105
- ^{১২৪} *Education*, Vol. 2, No. 1, p. 26

যাকাতের শর্তাবলী : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মো. আশরাফুল ইসলাম*

Abstract: Zakat is a very important provision of Islamic finance. Zakat is the distribution of a certain portion of the surplus wealth of the rich and affluent people of society among the poor and deprived people on a regular basis. Zakat is one of the means to purify the earned wealth. The importance of Zakat is immense to establish economic prosperity and non-discriminatory society. For this reason, in many places in the Qur'an, besides establishing prayers, instructions have also been given to pay Zakat. But like prayer, this provision is not obligatory on all Muslims, rich and poor alike; Rather, it is obligatory only on wealthy Muslims under certain conditions. All these conditions of Zakat have been discussed in three parts in this article. Firstly, The condition related to the person is to be a Muslim, independent, adult and sound knowledge. Secondly, Conditions related to assets should be fully ownership, nisab amount, growing up, surplus of normal needs, relief from debt and duration has to be one year. Thirdly, In the case of domestic animals, there must be some more conditions. Namely, to be a pet halal animal, to be a wandering animal and to be a workless animal. The main purpose of this article is to discuss the terms of Zakat in a rational way.

ভূমিকা

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। উপার্জিত সম্পদকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম হলো যাকাত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব অপরিমিত। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সুদভিত্তিক ঐক্যবদ্ধতা মূলোৎপাটন করা ইসলামী অর্থনীতির জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করত সুখম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ইসলামে যাকাত নামক চমৎকার ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচির বিধান রাখা হয়েছে। সমাজের বিভবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্ধৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাকাতকে ইসলামী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত হিসেবেও গণ্য করা হয়। এজন্য আল-কুরআনের বহু স্থানে নামায প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যাকাত আদায়েরও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নামাযের ন্যায় এ বিধান ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়; বরং নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কেবল বিভবান মুসলমানদের উপর ফরয। আলোচ্য প্রবন্ধে যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর যাকাত ফরয হওয়ার সে সকল শর্তাবলী সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَاةٌ^১। আভিধানিক অর্থে যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।^২ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, purification,^৩ purity, honesty, justification^৪ ইত্যাদি।

* এম.ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاة) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَذُكِّرْ﴾^৫ - 'যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে।'

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে যাকাত শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে সাদাকা (سَدَقَةٌ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।^৬ سَدَقَاتُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে صَدَقَاتُ। শব্দটির একবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾^৭ - 'আপনি ধনীদেব সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন।' অন্যত্র বহুবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾^৮ - 'তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদাকা বস্তুনে আপনাকে দোষারূপ করে।'

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতীত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

تَمْلِكُكَ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِمُسْتَحَقِّهِ بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ

- 'নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মালিক বানিয়ে দেয়ার নামই হচ্ছে যাকাত।'

যাকাতের বিধান ইসলামী শরীয়তের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾^৯

- 'আর তোমরা নামায কয়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'

যাকাতের শর্তাবলী

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ তথা যাকাতের বিধান সাধারণত সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়। ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মতে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। এ সম্পর্কে বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী (র) (৫৩০-৫৯৩ হি.) বলেন,

الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَلَكَ نَصَابًا مَلَكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ^{১০}

- 'স্বাধীন, জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম ব্যক্তি যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হয় এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির (সম্পদের) উপর যাকাত আবশ্যিক হবে।'

যাকাতের শর্তসমূহকে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। যথা- ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী, সম্পদের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী এবং চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী। নিম্নে এ সকল শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শর্ত (شَرَطٌ) শব্দটির পরিচয় প্রদত্ত হলো।

শর্ত (شَرَطٌ)-এর পরিচয়

শর্ত (شَرَطٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে شَرُوطٌ, شَرَايِطُ^{১১} আভিধানিক অর্থে শর্ত (شَرَطٌ) শব্দটি বাধ্যতামূলক করা, পরস্পর সম্মত হওয়া, অঙ্গীকারনামা, চুক্তিপত্র, শর্ত, পূর্বশর্ত, বিদারণ, ফাটল,

চিড় প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।^{১৩} এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, condition,^{১৪} precondition, provision, proviso, clause, rip^{১৫} ইত্যাদি। হাদীসে শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- একবচনের রূপ ব্যবহার করে নবী করীম (সা) বলেন,^{১৬} شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ‘আল্লাহর শর্তই সঠিক ও সুদৃঢ়।’ অন্যত্র বহুবচনের রূপ ব্যবহার করে নবী করীম (সা) বলেন,^{১৭} الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ‘মুসলমানদের উচিত দ্বীনের ব্যাপারে সন্ধির শর্তসমূহের উপর স্থির থাকা।’

পরিভাষায় শর্ত (شَرَطٌ) হলো, বস্তুর মূল বহির্ভূত এমন একটি বিষয়, যা ব্যতীত উক্ত বস্তু পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় না।

ইবন মানযূর আল-ইফরীকী (র) (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন,

إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالتَّزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ^{১৮}

-‘শর্ত (شَرَطٌ) হলো, ক্রয়-বিক্রয় বা অনুরূপ কোন বিষয়ের জন্য যাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে গঠন করা হয়।’

মুফতী মুহাম্মাদ ‘আমীমুল ইহসান (র) (১৩২৯-১৩৯৫ হি.) বলেন,

هُوَ تَغْلِيْقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بَحِيْثٌ إِذَا وَجَدَ الْأَوَّلُ وَجَدَ الثَّانِي^{১৯}

-‘শর্ত (شَرَطٌ) হলো, কোন বস্তুকে অপর কোন বস্তুর সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা, যেন একটিকে পাওয়া গেলে অপরটিকেও পাওয়া যাবে।’

ড. ইবরাহীম মাদকূর (১৯০২-১৯৯৬ খ্রি.) ও অন্যান্যরা বলেন,

مَا يُوضَعُ لِيَلْتَزِمَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ^{২০}

-‘ক্রয়-বিক্রয় বা অনুরূপ কোন বিষয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে যাকে গঠন করা হয়, তাকে শর্ত (شَرَطٌ) বলা হয়।’

ফিকহের পরিভাষায় শর্ত (شَرَطٌ) হলো,

مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إِلَّا بِهِ وَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ^{২১}

-‘বস্তুর মূল বহির্ভূত এমন একটি বিষয়, যা ব্যতীত বস্তু পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।’

মোটকথা, ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়া তথা আল্লাহ তা‘আলার নিকট গৃহীত হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত যে সকল বিষয়কে বাধ্যতামূলক হিসেবে উল্লেখ করেছে সেগুলোকে শর্ত (شَرَطٌ) বলে। আর যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত বিধায় তা ফরয হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ফকীহগণ কতিপয় শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সে সকল শর্তাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

ফকীহগণ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ শর্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১.১ মুসলিম হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো মুসলিম হওয়া। সুতরাং কোন অমুসলিম বা কাফিরের উপর যাকাত ফরয নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে ও যাকাত ফরয হওয়ার মত ধনসম্পদ থাকলে তার উপর অবশ্যই যাকাত ফরয হবে।^{২২} যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়াকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হলো:

ক. যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে যাকাত তৃতীয়। তাই যারা ইসলামের অনুসারী নয় তাদের উপর যাকাত ফরয হতে পারে না।^{২৩} ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

يُنْبِئُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ^{২৪}

-‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দান, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ আদায় করা এবং রমযানের রোযা পালন করা।’

খ. যাকাত একটি ইবাদত। আর ইবাদত সংঘটিত হওয়ার জন্য ঈমান ও ইসলামের উপস্থিতি আবশ্যিক। কিন্তু কাফির ব্যক্তির নিকট এরূপ গুণাবলী অনুপস্থিত। এতদ্ব্যতীত কাফির ব্যক্তি শরীয়তের বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট নয় এবং তার পক্ষ থেকে কোন ইবাদত সংঘটিতও হতে পারে না।^{২৫} কেননা ইবাদতকারী সাওয়াব অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তির সাওয়াব অর্জন করার কোন যোগ্যতা নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾^{২৬}

-‘আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।’

গ. কাফির ব্যক্তি যাকাত প্রদান করলেও তার যাকাত আল্লাহ তা‘আলার নিকট গৃহীত হবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾^{২৭}

-‘তাদের দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে।’

ঘ. যাকাত একটি সামাজিক ও সামষ্টিক দায়িত্বের ব্যাপার। এটি সামষ্টিক অধিকারের পাশাপাশি আল্লাহ তা‘আলার হক বিধায় কাফিরদের উপর যাকাত ফরয নয়।^{২৮}

ঙ. যাকাত হলো পবিত্রতা দানকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾^{২৯}

-‘আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।’

এ আয়াতে যে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে, তা কাফির ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব। কেননা কাফিররা বাহ্যিকভাবে পবিত্র হলেও শিরক ও কুফরের কারণে তাদের অন্তর অপবিত্র। সুতরাং পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ দান করলেও তারা পবিত্র হতে পারবে না।

- চ. কাফির ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয না হওয়ার ব্যাপারে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা) তাকে বাহরাইনে প্রেরণের সময় এ বিধানটি লিখে দেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَهَا فَلَا يُعْطِ

-‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটাই যাকাতের নিসাব, যা রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমদের প্রতি নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট থেকে তা চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় এবং তার চেয়ে বেশি চাওয়া হলে সে যেন আদায় না করে।’

ইমাম আবু হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের উপর বহাল থাকাও শর্ত। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার উপর থেকে যাকাতের বিধান রহিত হয়ে যায়। যেমন- কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উপর থেকে যাকাত আদায়ের বিধান রহিত হয়ে যায়।^{৩৬} আর কয়েক বছর পর ইসলাম ত্যাগকারী ব্যক্তি যদি পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তাকে মুরতাদ অবস্থার অতীত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে না। দারুল হারবে বসবাসকারী কোন কাফির যদি মুসলমান হয় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার পর দারুল ইসলামে পুনরায় ফিরে আসে, তবে এরূপ ব্যক্তি থেকে পূর্বের বছরগুলোর যাকাত গ্রহণ করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে না। কেননা ঐ সময় সে তার শাসনাধীন ছিল না।^{৩৭}

১.২ স্বাধীন হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে আযাদ বা স্বাধীন হতে হবে। সুতরাং কোন গোলাম বা ক্রীতদাসের উপর যাকাত ফরয নয়। যদিও তাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। কেননা ক্রীতদাসের কোন সম্পদ নেই। আর তার নিকট কোন সম্পদ থাকলেও তা তার মালিকের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। মোটকথা, স্বাধীন হওয়া ব্যতীত সম্পদের উপর ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয় না বিধায় তার উপর যাকাত ফরয নয়।^{৩৮} আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تَوَبَّرَ، فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ^{৩৯}

-‘যে ব্যক্তি খেজুর গাছ তাবীর করার পর গাছ বিক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা শর্ত করলে তা তারই। আর যদি কেউ গোলাম বিক্রয় করে এবং তার সম্পদ থাকে, তবে সে সম্পদ যে বিক্রি করল তার। কিন্তু ক্রেতা যদি শর্ত করে, তাহলে তা তার হবে।’

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ^{৪০}

-‘ক্রীতদাসের উপর সাদকাতুল ফিতর ব্যতীত অন্য কোন সাদকা বা যাকাত প্রযোজ্য নয়।’

অনুরূপভাবে মুদাব্বার,^{৩৬} উম্মু ওয়ালাদ^{৩৭} এবং মুকাতাব^{৩৮} গোলামের উপরও যাকাতের বিধান ফরয নয়। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যে মুকাতাব গোলাম তার চুক্তির অর্থ আদায়ের ব্যাপারে প্রচেষ্টারত, তার হুকুমও ঐ মুকাতাব গোলামের অনুরূপ, যে তার চুক্তির অর্থ আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট নয়। অর্থাৎ তার উপরও যাকাত ফরয নয়।^{৩৯}

১.৩ জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। তবে এ শর্তের ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.), হাসান (র) (২১-১১০ হি.), আবু জা'ফর (র), শা'বী (র) (২১-১০৩ হি.), আবু 'উবায়দ (র), ইবন হাজম (র), নাখ'ঈ (র) (৪৭-৯৬ হি.) প্রমুখের মতে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।^{৪০} অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর যাকাত ফরয নয়।^{৪১} পাগলের পাগলামী যদি পূর্ণ বছর অব্যাহত থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে পাগল ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর বছরের শুরু, মাঝে বা শেষের দিকে জ্ঞান ফিরে পায়- এর পরিমাণ কম বা বেশি হোক তাকে যাকাত দিতে হবে। পাগল ও নাবালকের সম্পদে যাকাত ফরয না হলেও কৃষি ফসল ও ফলমূলে যাকাত ধার্য হবে।^{৪২} উপর্যুক্ত মতের স্বপক্ষে দলীলসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾

-‘আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সাঙুনা স্বরূপ।’

এখানে যে পবিত্র ও পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তা বালক ও পাগলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা এ উদ্দেশ্য কার্যকর হয় গুনাহের প্রতিকূলে। আর এ দুজনের কোন গুনাহই নেই। তাই তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করণের কোন প্রশ্ন-ই উঠে না। অতএব এ দুব্যক্তি ব্যতিত অন্যদের থেকে যাকাত গ্রহণ করতে হবে।^{৪৪}

দুই. ‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ^{৪৫}

-‘তিনজনের আমল লেখা হয় না। তারা হলো, বালক- যতদিন না পূর্ণবয়স্ক হবে, ঘুমন্ত ব্যক্তি- যতক্ষণ না জেগে উঠবে এবং এবং পাগল- যতক্ষণ না বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হবে।’

আলোচ্য হাদীসে ‘আমল লেখা হয় না’ বলতে বুঝানো হয়েছে যে, এদের উপর শরীয়ত পালনের দায়িত্ব বর্তায় না। কেননা শরীয়তদাতার বাণী বুঝতে সক্ষম ব্যক্তি-ই শরীয়তের নির্দেশ পালনে বাধ্য। কিন্তু নাবালক ও পাগল শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তাদের উপর যাকাত ফরয নয়।^{৪৬}

তিন. যাকাত অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় একটি ইবাদত। আর ইবাদত পালনের জন্য নিয়ত জরুরি।^{৪৭} কিন্তু পাগল ও নাবালক এরূপ নিয়ত নির্ধারণে অক্ষম। তাই তাদের উপর যাকাতের ইবাদত পালন করা ফরয নয়।^{৪৮}

খ. ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.), 'আতা (র) (৬৪৭-৭৩২ খ্রি.), জাবির ইব্ন য়াদ (র) (২১-৯৩ হি.), মুজাহিদ (র) (২১-১০৪ হি.), যুহরী (র) (মৃ. ১২৪ হি.), ইসহাক (র), আবু ইয়ালা (র) (৩৮০-৪৫৮ হি.), ইবন 'উয়ায়না (র) (৭২৫-৮১৫ খ্রি.), আবু 'উবায়দ (র) (১৫৭-২২৪ হি.), ছাওর (র) (৭৬৪-৮৬০ খ্রি.) প্রমুখের মতে, নাবালক ও পাগলের সকল প্রকার সম্পদের উপর যাকাত ফরয।^{৫৯} এ মতের স্বপক্ষে তাঁদের দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

এক. আল-কুরআন ও হাদীসে সাধারণভাবে সকল ধনী ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। এতে পাগল ও নাবালকের ব্যাপারে পৃথক কোন বিধান উল্লিখিত হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾

-‘আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।’

আবু মুহাম্মাদ ইব্ন হাজম (র) (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতটিতে ছোট-বড়, সুস্থ-বিবেকবান ও পাগলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কেননা ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে তাদের সকলের-ই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি লাভের প্রয়োজন রয়েছে।^{৬০}

দুই. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

-‘নবী করীম (সা) মু‘আয (রা)-কে ইয়েমেনে (শাসকরূপে) প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রত্যহ দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর সাদকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) আদায় করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে।’

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, নাবালক ও পাগল দরিদ্র হলে তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। সুতরাং তারা যদি ধনী হয় তবে তাদের নিকট থেকে যাকাতের অর্থ আদায় করা হবে না কেন?

তিন. আনাস ইব্ন মালিক (রা) (১০ হি.পূ.-৯৩ হি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الرِّكَائِصُ

-‘তোমরা এতিমের মাল নিয়ে ব্যবসা করবে, যেন যাকাত তা না খেয়ে ফেলে।’

চার. ‘আমর ইবন শু‘আয়ব তাঁর পিতার সূত্রে দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ۝

–‘নবী করীম (সা) লোকদেরকে ভাষণ প্রদানকালে বলেন, যে ব্যক্তি এতিমের অভিভাবক হবে, সে যেন তার পক্ষে ব্যবসা করে। তার সম্পদকে যেন অলসভাবে ফেলে না রাখে। অন্যথায় যাকাত তা খেয়ে ফেলবে।’

পাঁচ. ইউসুফ ইবন মাহাক (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تُذْهِبَهَا وَلَا تَسْتَأْصِلْهَا الزَّكَاةُ ۝

–‘তোমরা এতিমের মালের দিকে লক্ষ্য রেখ, যেন যাকাত তা নিঃশেষ করে না ফেলে।’

ছয়. ‘উমার ইবনুল খাতাব (রা) (৪০ হি.পূ.-২৩ হি.) বলেন,

انْجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ ۝

–‘তোমরা এতিমের মাল নিয়ে ব্যবসা করো, যেন যাকাত তা না খেয়ে ফেলে।’

সাত. ধনীদের সম্পদ দ্বারা দারিদ্র দূরীকরণই মূল লক্ষ্য। এতে যেমন আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়, তেমনি সম্পদের পবিত্রতাও অর্জিত হয়। ৫৭

আট. যাকাত হলো আর্থিক দায়-দায়িত্ব। সুতরাং এটা অন্যান্য আর্থিক দায়-দায়িত্বের সমতুল্য। যেমন- স্ত্রীর ভরণ-পোষণ। আর এটি উশর ও খারাজের ন্যায়, যা অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের মাল থেকেও নেওয়া হয়। ৫৮

২. মাল বা সম্পদের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

মাল তথা সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এ সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল মালের উপর যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। নিম্নে মালের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী আলোচনা করার পূর্বে মাল শব্দের পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

মাল (مَالٌ)-এর পরিচয়

মাল (مَالٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে ʾأَمْوَالٌ। আভিধানিক অর্থে মাল (مَالٌ) শব্দটি ধন, সম্পদ, অর্থ, পণ্য, সম্পদ, তহবিল, ব্যবসার দ্রব্য, উৎকৃষ্ট বস্তু প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। ৫৯ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, property, possessions, chattels, goods, wealth, fortune, money, capital, revenue, stock, fund ইত্যাদি। ৬০

আল-কুরআনে মাল (مَالٌ) শব্দটি কখনো একবচন আবার কখনো বহুবচনের রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- একবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ʾوَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۝, ʾতোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান করো।’ অন্যত্র বহুবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ʾإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۝, ʾতোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ।’

পরিভাষায়, যে বস্তু অধিকৃত হয়, কার্যত ব্যবহার করা যায় এবং যার মূল্য আছে তাকে মাল (مَالٌ) বলে।

ইবন মানযুর আল-ইফরীকী (র) বলেন, ^{৩০} مَا مَلَكَتْهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ - 'জিনিসপত্রের মধ্যে তুমি যারই মালিক হবে তা-ই মাল।'

ড. ইবরাহীম মাদকুর ও অন্যান্যরা বলেন,

المال كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان (ج) أموال وقد أطلق في الجاهلية على الإبل ويقال رجل مال ذو مال ^{৩১}

- 'মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে সকল বস্তুর মালিক হয়, তাকে মাল বলা হয়। যেমন- পণ্য দ্রব্য, গৃহ সামগ্রী, ব্যবসার সম্পদ, ভূমি, স্বর্ণ-রৌপ্য বা জীব-জন্তু। এর বহুবচন হলো (أَمْوَالٌ) আমওয়াল। আর জাহিলিয়াতের যুগে উটের জন্য মাল শব্দটি ব্যবহৃত হতো।'

ইবন নুজায়ম (র) (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন, ^{৩২} مَا يُتَمَوَّلُ وَيُذْخَرُ لِلْحَاجَةِ - 'প্রয়োজনের জন্য যা সংগৃহীত ও সঞ্চিত হতে পারে তা-ই মাল।'

ইবনুল আছীর (র) বলেন,

المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يفتني ويملك من الأغنيان ^{৩৩}

- 'মূলত মাল বলতে মালিকানায় লব্ধ বোঝায়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে যে সকল জিনিসের মালিকানা লাভ হয় ও দখলে আনার চেষ্টা করা হয় তা সবই মাল রূপে গণ্য।'

মাল শব্দের অর্থ নির্ধারণে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তাঁদের কতিপয় মত উল্লেখ করা হলো।

ক. হানাফী ফকীহগণের মতে, যা করায়ত্ত করা যায় এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা যায় তা-ই মাল। এ দৃষ্টিতে দুটি গুণ ব্যতিত কোন জিনিসকে মাল বলা যাবে না। একটি হলো অধিকৃত হওয়ার গুণ এবং দ্বিতীয়টি হলো স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাব্যতা। যেমন- জমি, পশু প্রভৃতি যে সবার মালিক আমরা হয়ে থাকি তার সব-ই মাল; তা বস্তু হোক, দ্রব্য হোক বা নগদ টাকা হোক না কেন। যে সকল জিনিস উপস্থিত অবস্থায় অধিকৃত ও ব্যবহার হওয়ার যোগ্য নয়; কিন্তু সে সবার মধ্যে তা রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাও মালের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যা করায়ত্ত হওয়ার যোগ্য নয়, তা ব্যবহৃত হতে পারলেও মাল হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন- সূর্যের আলো ও তাপ, বাতাস ইত্যাদি। তেমনি যা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তা অর্জিত হলেও মাল হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন- পানির ফোটা, মৌমাছি, চাউলের একটি দানা, একমুঠো মাটি ইত্যাদি। মোটকথা, যে বস্তু অধিকৃত হয় এবং কার্যত ব্যবহার করা যায়, তাই মাল হিসেবে গণ্য হবে। ^{৩৪}

খ. ইমাম মুহাম্মাদ (র) (১৩২-১৮৯ হি.) বলেন, প্রত্যেক ঐ বস্তুকে মাল বলে, মানুষ যার মালিক হয়ে থাকে। যেমন- টাকা-পয়সা, অন্য কোন সামগ্রী বা জীব-জন্তু প্রভৃতি সবকিছুই মালের মধ্যে গণ্য। ^{৩৫}

গ. ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর মতানুসারে, বস্তুর ব্যবহারিকতাই হচ্ছে মাল। কেননা তাঁদের মতে, মূল জিনিসের অধিকৃত ও করায়ত্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা আবশ্যিক নয়। তার মৌল ও উৎস করায়ত্ত করার সম্ভাব্যতাই যথেষ্ট। আর ব্যবহারিকতার ক্ষেত্র ও উৎস করায়ত্ত করার দ্বারাই ব্যবহারিক মূল্য করায়ত্ত করা সম্ভব। যেমন- কেউ কোন গাড়ি করায়ত্ত করে নিলে অপরকে তার অনুমতি ব্যতিত তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা যায়। ^{৩৬}

মোটকথা, মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে সকল বস্তুর মালিক হয় এবং যার মূল্য আছে তাকে মাল বলে। কিন্তু সকল প্রকার মালের উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা ইসলামী শরীয়ত মানুষকে যে সহজতা ও সুখ-শান্তি বিধানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা মানুষকে কঠিনতায় নিষ্ক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। তাই যে সকল মালের উপর যাকাত ফরয হতে পারে তার শর্তাবলী তথা গুণ, পরিমাণ ও পরিচয় সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নে সে সকল শর্তাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

২.১ মালের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকা

প্রকৃতপক্ষে সকল ধন-সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কেননা তিনিই এ সকল মালের স্রষ্টা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)^{৭০}

-‘আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান করো।’

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ)^{৭১}

-‘হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করো।’

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে অনুগ্রহ করে রিযিক হিসেবে সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। এ রিযিক তিনি কাউকে অধিকহারে দান করেছেন আবার কাউকে কম দান করেছেন। সম্পদ দানের ক্ষেত্রে এ রকম তারতম্য করার কারণ হলো তাদেরকে পরীক্ষা করা। অর্থাৎ যারা সম্পদশালী তারা তাদের সম্পদ থেকে দরিদ্র ও নিঃস্বদের অধিকার আদায় করে কি-না? এবং যারা নিঃস্ব তারা তাদের এ অবস্থার উপর আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা বা ভরসা করে কি-না?^{৭২} এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)^{৭৩}

-‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ।’

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আমানত স্বরূপ সম্পদের মালিকানা প্রদান করেছেন। তিনি মানুষকে যেমন আয় করার ক্ষমতা দান করেছেন, তেমনি তা ব্যয় করারও নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু ব্যয় বা দান করতে হলে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকা প্রয়োজন। আর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা বলতে দুটো অংশকে বুঝায়। একটি হলো মালিকানা এবং অপরটি হলো পূর্ণাঙ্গ। মালিকানা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, করায়ত্ত করা, তার উপর শক্তি প্রয়োগ করা। কামাল ইব্বুল হুমাম বলেন,

(الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً إِلَّا لِمَنْعٍ)^{৭৪}

-‘(মালিকানা হলো) কোন বাধাদানকারী ব্যতীত হস্তক্ষেপ করা ও ব্যয় ব্যবহার করার প্রাথমিক শক্তি।’

আর পূর্ণাঙ্গ মালিকানার অর্থ হলো সম্পদ মালিকের একান্ত হস্তগত ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা। তাতে অন্য কারও অধিকার থাকবে না এবং সে নিজ ইচ্ছানুযায়ী তা থেকে ব্যয় ও ব্যবহার করতে পারবে; স্থায়ী হোক কিংবা সামান্য সময়ের জন্যই হোক তার উপকারিতা ও কল্যাণ সে ইচ্ছামত ভোগ করতে পারবে। সুতরাং বুঝা গেল করায়ত্ত এবং ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার ক্ষমতা এ দুটির মধ্যে যেকোনো একটি গুণ কারো মধ্যে অনুপস্থিত থাকলে তার সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে না।^{৭৫} যেমন-

- কেউ মালের মালিক; কিন্তু মাল তার আয়ত্তে নেই। যেমন- মাহরানার টাকা, যা এখনও হাতে আসেনি।
- কারও মাল আয়ত্তে আছে; কিন্তু তাতে তার মালিকানা সাব্যস্ত নয়। যেমন- মুকাতাব গোলাম ও ঋণী ব্যক্তি; মাল তাদের অধীনে থাকলেও তারা মালের মালিক নয়।
- কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক বা আমানতের সম্পদ উপস্থিত থাকলে এতে আমানতকারীর উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা সে উক্ত সম্পদের মালিক নয়।
- যে সম্পদে জনসাধারণের সমপরিমাণ মালিকানা রয়েছে, তাতে যাকাত ফরয নয়। যেমন- রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বায়তুল-মাল বা কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থ ইত্যাদি। কেননা এতে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা অনুপস্থিত।
- ব্যবসায়ী যে পণ্য ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে, তা হস্তগত করার পূর্বে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। কেননা তা এখনো তার করায়ত্ত হয়নি।^{৭৬}

উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের উপর যাকাত আবশ্যিক নয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল মালের উপর যাকাত আবশ্যিক নয় তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ওয়াক্ফকৃত সম্পদ

সাধারণভাবে ওয়াক্ফকৃত সম্পদের উপর যাকাত নেই। গরীব-মিসকীন, এতিম, মুজাহিদ, মুসাফিরখানা, মসজিদ, মাদরাসা, প্রভৃতির জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য নয়। কেননা এগুলো জনকল্যাণে নিয়োজিত। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়, ব্যক্তিবর্গ বা কোন পরিবারের উপর ওয়াক্ফ করা হয়, তাহলে তাদের উপর যাকাত ফরয হবে। কেননা এতে তাদের একক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় তারা অধিক অধিকারী। আর তাদেরকে তা থেকে কেউ উৎখাতও করতে পারে না।^{৭৭}

হারাম সম্পদ

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত বিধায় সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা, প্রতারণা বা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হারাম মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা এ সকল সম্পদ নিষিদ্ধ পছায় অর্জিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা এর মালিক নয়। তাই প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে তা ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আর যদি সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহলে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিত সমস্ত মাল দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।^{৭৮}

ঋণের সম্পদ

ঋণের মালের সাথে দুজন ব্যক্তি সম্পৃক্ত। ঋণদানকারী এবং ঋণগ্রহণকারী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা নাকি উভয়ের উপর-ই যাকাত আবশ্যিক? আবার ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা নাকি উভয় ব্যক্তিই যাকাতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. ‘ইকরামা (র) (২৫-১০৫ হি.), ‘আতা (র) প্রমুখ ফিক্‌হবিদ এবং যাহিরী মাযহাবের মতে, কাউকেই উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না। ‘আইশা (রা) বলেন, ঋণ দেয়া টাকার যাকাত নেই। কেননা এ টাকার মালিকানা উভয়ের ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ।

- খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) ও নাখ'ঈ (র)-এর মতে, ঋণের টাকার সুবিধা ভোগকারীর উপর যাকাত প্রদান করা কর্তব্য। কেননা এখানে যাকাতের শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া।
- গ. ইমাম আবু ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণের যাকাত দিতে হবে না; বরং ঋণদাতা যখন ঋণগ্রহিতার নিকট থেকে টাকা ফেরত পাবে তখন যাকাত প্রদান করবে।^{৭৯}
- ঘ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যদি কোন ব্যক্তির ঋণের বোঝা তার সম্পদ গ্রাস করার মত হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদের মালিক ঠিক সে পরিমাণ ঋণ যদি থাকে অথবা ঋণের টাকা ব্যতীত নিসাব বহাল না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা তার মাল তার মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। সুতরাং তার মালকে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। যেমন- পিপাসা নিবৃত্তির জন্য রক্ষিত পানি এবং ব্যবহারিক ও কর্তব্য সম্পাদনের কাপড়। পক্ষান্তরে কারো সম্পদ যদি ঋণের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে। কেননা তা প্রয়োজন থেকে মুক্ত।^{৮০}
- ঙ. সাহাবী ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে, ঋণদাতাকে উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। তবে তাঁদের মতে, ঋণ দুভাগে বিভক্ত। যথা-
- এক. এমন ঋণ, যা আদায় হওয়ার বা ফিরে পাওয়ার আশা আছে। যেমন- এরূপ সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে, যার নিকট থেকে ফেরত পাওয়ার আশা আছে।
- দুই. এমন ঋণ, যা ফিরে পাওয়ার আশা নেই। যেমন- ঋণগ্রহিতা হয়তো এমন অর্থ কষ্টে আছে, যার সচ্ছলতার কোন সম্ভাবনা নেই। অথবা ঋণগ্রহিতা সে ঋণের কথা অস্বীকার করেছে কিংবা সে ঋণের কোন প্রমাণপত্র নেই।^{৮১}
- এ দুপ্রকার অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে ফকীহগণ বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। যেমন-
- ক. 'আলী (রা) (মৃ. ৪০ হি.) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর মতে, প্রথম প্রকার ঋণের টাকা যে কয় বছর পর ফেরত পাওয়া যাবে, তখনই উক্ত বছরসমূহের যাকাত একসাথে আদায় করতে হবে।
- খ. হাসান (র) ও 'উমার ইব্ন 'আদিল 'আযীয (র) (৬১-১০১ হি.)-এর মতে, দ্বিতীয় প্রকার ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার পর শুধু এক বছরের যাকাত দিতে হবে।
- গ. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, অতীত বছরগুলোর কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। এমনকি যে বছর টাকা ফেরত পাওয়া যাবে, সে বছরের যাকাতও আদায় করতে হবে না।^{৮২}

যে ঋণগ্রহিতা কয়েক বছর পর ঋণ গ্রহণের কথা অস্বীকার করে পরবর্তীতে কয়েক বছর পর কারও কাছে তা স্বীকার করে; কিন্তু ঋণদাতার নিকট কোন প্রমাণ নেই। তারপর কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ঋণদাতার নিকট ঋণগ্রহিতা উক্ত টাকা ফেরত দিলে ঋণদাতার উপর যাকাত ফরয হবে না।^{৮৩}

চাকরিজীবীদের বেতন, সঞ্চয় ও পেনশন

এ সকল ক্ষেত্রে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি সম্পদের প্রকৃতি ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এজন্য প্রথমেই নির্ণয় করতে হবে, তা চাকরিজীবীর পূর্ণ মালিকানাধীন কি-না? অর্থাৎ মালিক ইচ্ছানুযায়ী উক্ত টাকা ব্যয় করার অধিকার রাখে কি-না? যদি ব্যক্তি উক্ত টাকার উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং রাষ্ট্র বা

প্রতিষ্ঠান তাকে বাধা প্রদান করতে না পারে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। ইমাম আবু উবায়দ (র) বলেন, ‘এ সম্পদ যেন তার হাতেই মজুদ রয়েছে। কাজেই উক্ত সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং অন্যান্য শর্তও বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে প্রতি বছর যাকাত প্রদান করতে হবে।’^{৮৪}

কোম্পানীর সম্পদ

কোম্পানীর শেয়ার ও তার মূল্যের উপর যাকাত ফরয নয়। অর্থাৎ কোম্পানীর যে কয়টি শেয়ার বা অংশ রয়েছে, কোম্পানীর শৃঙ্খলা বিধানে যে অংশ ব্যয় হয়েছে, তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদনকৃত পণ্য, ব্যবসার মাল, নগদ টাকা প্রভৃতি যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। উক্ত কোম্পানীতে যদি অংশীদার থাকে, তাহলে সে অংশীদারের অংশ ও কোম্পানীর আসবাবপত্র ক্রয়ের পর উৎপাদিত পণ্য বা নগদ টাকার পরিমাণ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপরও যাকাত ফরয হবে। আবার কেউ যদি উক্ত অংশ ক্রয় করে নেয়, তাহলে তার উপরও যাকাত ফরয হবে, যদিও পরবর্তীতে তার মূল্য কমে যাক না কেন।^{৮৫}

২.২ নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই ক্রমবর্ধনশীল যেকোনো সম্পদের উপর-ই যাকাত ফরয করা হয়নি; বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিসাব তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হওয়া অপরিহার্য শর্ত। ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে নিসাব বলা হয়। কাজেই শরীয়ত নির্দেশিত নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পাওয়া না গেলে উক্ত সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা হাদীসে যাকাত আদায়ের জন্য নিসাবের বিষয়টিকে শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।^{৮৬}

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسٍ دُونَ خُمُسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسٍ أَوْسَقُ صَدَقَةٌ^{৮৭}

-‘পাঁচ যাওদ (পাঁচটি) উটের কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপায় যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাত নেই।’

অন্যত্র হাদীসে উকিয়া ও ওয়াসাক-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আবু সালামা ইবন ‘আদ্রির রহমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উকিয়ার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأُ، قَالَتْ: أُنْذِرِي مَا النَّشَأُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نَصْفُ أَوْقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خُمُسُمَانَةٌ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ^{৮৮}

-‘আমি নবী করীম (সা)-এর স্ত্রী ‘আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণের মাহরানার পরিমাণ কত ছিল? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণের মাহরানা ছিল বার উকিয়া বা এক নাশ। এ কথা বলে তিনি নিজেই আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জান নাশ কী? আবু সালামা বলেন, নাশ কাকে বলে, তা আমি জানি না। তিনি (‘আইশা) বললেন, নাশ হলো অর্ধ উকিয়া, যা সর্বমোট পাঁচশ দিরহামের সমান হতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রীগণের জন্য এটাই ছিল মাহরানা।’

অত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, বার উকিয়া সমান ৫০০ দিরহাম। সুতরাং এক উকিয়া সমান ৪০ দিরহাম এবং ৫ উকিয়া সমান ২০০ দিরহাম।

অন্যত্র ওয়াসাক-এর ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত্-তিরমিযী (র) বলেন,

وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَخُمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ^{৮৯}

‘আর এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা’। সুতরাং ৫ ওয়াসাক সমান ৩০০ সা’।’

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাঁচ ওয়াসাক সমান ৯৮৮ কিলোগ্রাম বা ২৬ মণ ২২ সের ১২ ছটাক। কাজেই উশরের নিসাব ২৬ মণ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়।^{৯০} সাধারণভাবে ২০০ দিরহাম বা তদুর্ধ্ব নগদ অর্থ বা ব্যবসায়ের পণ্য, ৫২.৫ তোলা রৌপ্য বা ৭.৫ তোলা স্বর্ণ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর বিদ্যমান থাকলে তাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। তবে জমিতে উৎপাদিত পণ্যের নিসাবের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, জমিতে যা উৎপাদিত হবে, তার পরিমাণ কম বা বেশি হোক না কেন, তাতেই উশর আদায় করতে হবে।^{৯১} এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো:

এক. আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾^{৯২}

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।’

দুই. অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^{৯৩}

‘যখন (বৃক্ষ) ফলন্ত হয় তখন এগুলোর ফল খাও এবং কর্তনের সময়ে হক দান করো। আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।’

তিন. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعَشْرُ^{৯৪}

‘(উশরী) ভূমিতে যা উৎপাদিত হবে, তার উপরই উশর প্রদান করতে হবে।’

চার. সালিম ইব্ন ‘আদিল্লাহ ইব্ন ‘উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرُ^{৯৫}

‘আকাশের পানিতে যা-ই সিক্ত হবে, তাতেই উশর ধার্য হবে।’

খ. অধিকাংশের মতে, কৃষি জমিতে উৎপন্ন ফসল পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।^{৯৬} কেননা হাদীসে এরূপ নিসাবের কথা বিবৃত হয়েছে। আবু সা‘ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمَرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ دُرٍّ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ^{৯৭}

-‘পাঁচ ওয়াসাক-এর কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপার যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই।’

উশরের নিসাবের ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও তা আদায়ের হার সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অর্থাৎ যে জমিতে সেচ ব্যতীত কেবল নদী-নালা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে এক-দশমাংশ উশর প্রদান করতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ উশর প্রদান করতে হবে।^{৯৮}

সালিম ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন,

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَثْرُ، وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَثْرِ^{৯৯}

-‘বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর উশর (এক-দশমাংশ) ফরয। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ উশর (এক-বিশমাংশ) ফরয।’

২.৩ প্রবৃদ্ধিশীল মাল হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে মাল প্রবৃদ্ধিশীল হওয়া। আর যাকাত শব্দটিও এই ভাবধারাসম্পন্ন। কেননা তার প্রকাশ্য অর্থই হলো প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্তি। সম্পদ থেকে গৃহীত পরিমাণকে যাকাত বলা হয় এজন্য যে, তার চূড়ান্ত পরিণতিই হচ্ছে বরকত ও বৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^{১০০}

-‘আর তোমরা যা কিছু (আল্লাহর জন্য) ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। আর তিনি উত্তম রিযিকদাতা।’

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ﴾^{১০১}

-‘আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যে যাকাত প্রদান কর, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।’

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মতে, যে মাল তার মালিকের মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং পরিমাণে ক্রমশ বাড়তে থাকে তাকে প্রবৃদ্ধিশীল মাল বলে। সুতরাং যে সম্পদ প্রবৃদ্ধিশীল নয়, তাতে যাকাত ফরয নয়।^{১০২} যেমন- বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, ব্যবহার্য আসবাবপত্র, চলাচলের জন্তু বা যানবাহন, খিদমতের গোলাম, পড়ার বই, কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। কেননা এগুলো বর্ধিষ্ণু মাল নয় এবং মৌলিক প্রয়োজনে তা ব্যবহার হয়ে থাকে।^{১০৩} আর হাদীসেও এরূপ নির্দেশনাই বিবৃত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ^{১০৪}

-‘মুসলিম ব্যক্তির নিজ ব্যবহার্য ঘোড়া ও ক্রীতদাসের উপর কোন যাকাত নেই।’

ইমাম নববী (র) (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, এ হাদীসটির মূলকথা হলো, নিজ ব্যবহার্য সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয় না।^{১০৫} কেননা এরূপ হলে ব্যক্তির দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ কারণেই নবী করীম (সা) অক্ষমতা থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ^{১০৬}

-‘নবী করীম (সা) এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা, ভীর্ণতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।’

অন্যত্র হাদীসে অক্ষম ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ‘আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُلَوِّمُ عَلَى الْعَجْزِ^{১০৭}

-‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করেন।’

এজন্য নবী করীম (সা) কেবল ক্রমবর্ধনশীল সম্পদের উপর যাকাত নির্ধারণ করেছেন। যেমন- উট, গরু, ছাগল, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। কেননা এগুলো ব্যবসার মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অনেকে এগুলো পুঁজি করেও রাখে। আর ফল ও ফসলের মধ্যে যব, গম, খেজুর, কিশমিশ, মনাক্ক ও মধু বর্ধনশীল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলো উশরী জমি থেকে উৎপন্ন হলেই কেবল উশর দিতে হবে, অন্যথায় নয়। তাই এ সকল জিনিস কেউ যদি নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হয়, তবুও এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না। ফসল তোলার পর শুধু উশর প্রদান করলেই যথেষ্ট হবে। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে তাতে যাকাত ধার্য হবে।^{১০৮}

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য প্রবৃদ্ধিশীল হওয়া শর্তটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ইব্নুল-হুমাম (র) বলেন, যাকাত ফরয করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদিও সম্পদের মালিককে পরীক্ষা করা; কিন্তু সেই সাথে দরিদ্রদের দারিদ্র মোচন করাও তার অন্যতম লক্ষ্য। আর তা এমনভাবে করতে হবে, যেন সে নিজেই দরিদ্র হয়ে না যায়। তাই যে সকল সম্পদ প্রবৃদ্ধিশীল নয়, সেগুলোর উপর যাকাত ফরয করা হলে ব্যক্তি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।^{১০৯} উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَفَقَةٍ^{১১০}

-‘যাকাত দিলে মূল সম্পদে ঘাটতি পড়ে না।’

যাকাত প্রদানের জন্য হাদীসে কেবল আট প্রকার বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- উট, গরু, ছাগল, গম, যব, খেজুর, স্বর্ণ ও রৌপ্য। এ আট প্রকার ব্যতিত অন্যান্য বর্ধনশীল বস্তুর উপর যাকাত ফরয কি-না? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. ইব্ন হাজম (র)-এর মতে, হাদীসে উল্লিখিত শুধু আট প্রকার বস্তুর উপর-ই যাকাত ফরয। এমনকি সহীহ হাদীসে কিশমিশের কথা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাতে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলেননি। তাঁর মতে, ব্যবসার পণ্যের উপরও যাকাত ধার্য হবে না।^{১১১}

খ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, জমিতে যা-ই উৎপন্ন হবে, তার উদ্দেশ্য যদি প্রবৃদ্ধি সাধন হয় তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এজন্য তিনি নিসাবের শর্তও আরোপ করেননি। এমনকি তিনি ঘোড়া ও অলংকারে যাকাত এবং খারাজী জমিতে উশর ধার্য হওয়ার পক্ষেও মত ব্যক্ত করেছেন।^{১১২}

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বর্ধনশীল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সম্পদ কম ছিল বিধায় তিনি মাত্র আট প্রকার বস্তুর জন্য যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে উক্ত আট প্রকার বস্তু ব্যতিত অন্যান্য বর্ধনশীল বস্তুর উপরও যাকাত ধার্য হবে।

২.৪ স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এ শর্তটির ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম মালিক (র)-এর মতে, প্রত্যেক সম্পদে যাকাত ফরয, চাই তা বর্ধনশীল হোক বা না হোক কিংবা স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হোক বা না হোক। তিনি কুরআন মাজীদ ও হাদীসের ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য করে বলেন, সেখানে সম্পদের কোন শ্রেণিবিদ্যাস করা হয়নি; বরং সাধারণভাবে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে।^{১১৩} যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾^{১১৪}

-‘আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।’ অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ - لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^{১১৫}

-‘এবং তাদের ধন-সম্পদে যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতের নির্ধারিত হক রয়েছে।’

খ. কতিপয় ফকীহ উক্ত শর্তটি এড়িয়ে গিয়ে বর্ধনশীলতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দ্রব্যাদি সাধারণত বর্ধনশীল হয় না। যেমন- বসবাসের ঘর, চলাচলের জন্তু বা যানবাহন, পরিধানের কাপড়, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পড়ার বই, কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।^{১১৬}

গ. হানাফী ফকীহগণের মতে, সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য তা স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত। কেননা এর দ্বারাই ধনাঢ্যতা ও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। আর ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা মনের খুশির সাথে আদায় করা সহজসাধ্য। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তির নিকট নিম্নতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকে বিধায় তা দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করাই সম্ভব হয় না। তার কৃতজ্ঞতা আদায় তো দৈহিক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়। এমতাবস্থায় কিছু দিতে হলে তা মনের খুশি ও আনন্দের সাথে দেয়া হয় না। আর এরূপ দান করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসেরও পরিপন্থী।^{১১৭}

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

﴿أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ﴾^{১১৮}

-‘তোমরা মনের সুখ ও সন্তুষ্টি সহকারে তোমাদের সম্পদের যাকাত দাও।’

এ হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, উপর্যুক্ত ব্যক্তি যাকাত প্রদান করলে তার যাকাত আদায় হবে না।

‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন সাহাবীগণকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, তখন একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমাদের সম্পদ থেকে কতটুকু ব্যয় করব? তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾^{১১৯}

-‘আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, তারা যেন তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল খরচ করে।’

‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা), ইবন ‘উমার (রা) (১০ হি.পূ.-৭৩ হি.), মুজাহিদ (র), ‘আতা (র), ‘ইকরামা (র), সা‘ঈদ ইবন যুযায়র (র) (৪৬-৯৫ হি.), মুহাম্মাদ ইবন কা‘ব (র) (৪০-১০৮ হি.), হাসান (র), কাতাদা (র) (৬০-১১৭ হি.), সালিম (র), ‘আতা আল-খুরাসানী (র) (৬০-১৩৫ হি.) প্রমুখের মতে, পরিবারের সকল ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই (العَفْو) তথা অতিরিক্ত।

হাসান (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এটা এজন্য যে, তুমি যেন তোমার মাল ব্যয় করার পর অপরের নিকট ভিক্ষা চাইতে বাধ্য না হও।’^{১২০}

আব্দুল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক এরূপ বিষয় উল্লেখ করার কারণ হলো, নিজের প্রয়োজন অপর লোকদের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রাধিকারের দাবীদার। আর পরিবারের প্রয়োজন নিজের প্রয়োজনের মধ্যেই গণ্য। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا^{১২১}

-‘তোমরা নিজেকেই প্রথমে রাখবে। এর জন্যই ব্যয় করবে। অতিরিক্ত কিছু হলে তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। পরিবারের জন্য ব্যয় করার পর কিছু অতিরিক্ত থাকলে তা তোমাদের নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে। তারপরও অতিরিক্ত কিছু থাকলে এরূপ এরূপ।’

ইমাম বুখারী (র) তাঁর “সহীহুল বুখারী” গ্রন্থের “যাকাত অধ্যায়ে” এ সম্পর্কে একটি বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন যে, اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا^{১২২} অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত সাদকা না করা। উক্ত শিরোনামে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাদকা করতে চায়; অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য সাদকা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা অধিক কর্তব্য। আর এরূপ সাদকা আব্দুল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই।^{১২২}

মোটকথা, স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল থেকেই দান-খায়রাত করতে হয়। যদিও উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নফল দান-খায়রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে; তবে ফরযের ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

২.৫ ঋণ মুক্ত মাল হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মাল ঋণমুক্ত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তবে এ শর্তের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। এ মতপার্থক্য মূলত যাকাত সংক্রান্ত ধারণার বিভিন্নতার দরুণই দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যাকাত কি শুধু নিছক ইবাদত? নাকি সম্পদে দরিদ্র লোকদের আরোপিত অধিকার?

যারা যাকাতকে নিছক ইবাদত হিসেবে মনে করেন তাদের মতে, যার হাতে মাল রয়েছে তাকেই যাকাত দিতে হবে। কেননা এই ইবাদতের শর্ত হলো মাল বর্তমান থাকা। সে ঋণী কি-না? তা এখানে অবাস্তব প্রশ্ন। আর যারা শেষোক্ত মত গ্রহণ করেছেন তাদের মতে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিতে হবে না। কেননা দরিদ্রদের অধিকারের পূর্বেই তার উপর পাওনাদারের অধিকার আরোপিত। অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যে সম্পদ রয়েছে তার প্রকৃত মালিক মূলত ঋণ প্রদানকারী। এখানে আসলে দুটি অধিকারের দ্বন্দ্ব। একটি

আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার এবং অন্যটি মানুষের অধিকার।^{১২৩} নিম্নে এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত উল্লেখ করা হলো। যেমন-

ক. ইবন রুশদ (র)-এর মতে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর থেকে যাকাত প্রদানের দায়িত্ব তুলে নেয়াই ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য। কেননা শরীয়তের দলীলাদি, অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তার সাধারণ মৌলনীতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়। যেমন-

- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মালিকানা দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। কেননা ঋণদাতা তার ঋণ বাবদ দেয়া অর্থ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ঋণগ্রহিতাকে অনবরত চাপ প্রদান করে থাকে। সে তার পাওনা অবশ্যই নিয়ে যাবে।
- ঋণদাতা তার মালের যাকাত দিতে বাধ্য। কেননা ঋণ বাবদ দেয়া অর্থ তার মালিকানাভুক্ত। সুতরাং ঋণদাতা ও ঋণগ্রহিতা উভয়ে-ই যাকাত প্রদান করলে একই মালের দুবার যাকাত দেয়া হবে। যা শরীয়ত সম্মত নয়।
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ যদি নিসাব পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে তার নিজের জন্যই যাকাত গ্রহণ করা বৈধ। সুতরাং তার জন্য যাকাত প্রদান করা সমীচীন না হওয়াই স্বাভাবিক।
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আর যাকাত ফরয হয়েছে ধনীদেবের উপর। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয নয়। তার কর্তব্য হলো ঋণ পরিশোধ করা।
- অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন স্বরূপ যাকাত ফরয হয়েছে। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র শ্রেণি কিংবা তদপেক্ষা অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিধায় তার উপর যাকাত প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।^{১২৪}
- সাইব ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। 'উছমান (রা) (মৃ. ৩৫ হি.) বলেন,

هَذَا شَهْرُ زَكَاةِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهُ الزَّكَاةَ.^{১২৫}

- 'এটা তোমাদের যাকাত প্রদানের মাস। সুতরাং যার ঋণ রয়েছে সে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করো। অতঃপর স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করো।'

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তারপর অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান করতে হবে। আর তা আদায় করা ফরয।

- খ. ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম আওযা'ঈ (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর একটি মতানুসারে, প্রকাশমান সম্পদের যাকাতের জন্য ঋণ কোন প্রতিবন্ধক নয়। কেননা খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সরকারি আদায়কারীরা প্রকাশমান সম্পদের যে যাকাত পেত, তা-ই তাঁরা গ্রহণ করত। তার উপর কোন ঋণ চাপানো আছে কি-না? তা তাঁরা জিজ্ঞাসা করত না।
- গ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ঋণ ফসল ও ফলমূলের যাকাত ব্যতিত অন্য সকল যাকাতের প্রতিবন্ধক।
- ঘ. ইবন 'আব্বাস (রা) (৩ হি.পূ.-৬৮ হি.)-এর মতে, ফসলের ঋণ শোধ করার পর অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে।
- ঙ. ইবন 'উমার (রা)-এর মতে, ফসল থেকে ঋণ ও পরিবারবর্গের ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে।^{১২৬}

২.৬ মাল পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া

নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের নিকট পূর্ণ এক চন্দ্র বছর বা বার মাস স্থিতিশীল হলে যাকাত ফরয হবে। অর্থাৎ পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত মালিকের নিসাবের উপর যাকাত ফরয হবে না। এ শর্ত নগদ সম্পদ, পশু ও ব্যবসায়ের পণ্যের উপর আরোপিত। কিন্তু কৃষি ফসল, ফলমূল, মধু, গচ্ছিত ধন প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। এরূপ পার্থক্য সম্পর্কে ইমাম ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, প্রথম পর্যায়ের সম্পদ বর্ধনশীল বিধায় এক্ষেত্রে এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপিত হয়েছে। কেননা প্রবৃদ্ধি লাভের জন্য অন্তত এ সময়টা প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পদে এক বছর সময় শর্ত না করার কারণ হলো, মূলত কৃষি ফসল ও ফলমূল স্বতঃই বর্ধিষ্ণু। তা থেকে যাকাত আদায় করার সকল শর্তই বিদ্যমান থাকে। কাজেই এগুলোর যাকাত তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা সম্ভব।^{১২৭}

এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তের বিষয়টি হাদীসেও বিবৃত হয়েছে। ‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ^{১২৮}

‘বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালে যাকাত ফরয হয় না।’

আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত বছর দ্বারা চন্দ্র বছর গণনা উদ্দেশ্য। সুতরাং সৌর মাস গণনা ধর্তব্য নয়। কেননা চন্দ্র বছর হয় ৩৫৪ দিনে এবং সৌর বছর হয় ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে।^{১২৯} তবে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছরের পুরো সময় নিসাব বিদ্যমান থাকতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

- ক. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, বছরের দুই প্রান্তে অবশ্যই পূর্ণ নিসাব বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি বছরের মাঝখানে কখনো পূর্ণ নিসাব বিদ্যমান না থাকে; অর্থাৎ বছরের শুরুতে কোন ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ মাল ছিল; কিন্তু ঘটনাক্রমে বছরের মাঝে তা হ্রাস পেয়ে বছরের শেষে পুনরায় নিসাব পূর্ণ হলে তার উপর যাকাত ফরয। তবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তটি ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।^{১৩০}
- খ. ইমাম মালিক (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন, ক্ষেত-খামার, জমি থেকে উৎপাদিত ফল-ফসল ব্যতিত অন্যান্য বস্তুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি বছরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের মালিক হয় এবং বছরের মাঝখানে তা থেকে কিছু হ্রাস পায়, আবার বছরের শেষাংশে বৃদ্ধি পায় তবে উক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্যের সবটুকুর উপর-ই যাকাত ফরয।^{১৩১}
- গ. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। তবে বছর পূর্ণ হওয়ার কিছুদিন অবশিষ্ট থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। এ শর্তটি শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য, জীব-জন্তু এবং ব্যবসায় সম্পদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং ফল-ফসল, খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। কারণ এগুলোতে বছর অতিক্রান্ত হওয়া ব্যতিতই যাকাত ফরয হয়। তিনি আরও বলেন, বছরের মাঝে বর্ধিত মালের যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি বছরের শুরুতে সম্পদ নিসাবের চেয়ে কম থাকে এবং বছরের মাঝে বৃদ্ধি পেয়ে নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে নিসাব পরিমাণ হওয়ার সময় থেকে পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যিক। আর বছরের শুরুতে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের মাঝে কোন সময় তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বর্ধিত সম্পদ সহ সম্পূর্ণ মালের যাকাত প্রদান করতে হবে।^{১৩২}

ঘ. ইমাম শাফি'ঈ (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া একটি সীমাবদ্ধ শর্ত। সুতরাং বছর পূর্ণ হতে যদি সামান্য পরিমাণও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। তবে উক্ত শর্তটি ফল-ফসল, উৎপাদিত শস্য, খনিজ দ্রব্য ও ব্যবসার লভ্যাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর বছরের শুরুতে যদি কারও নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের মাঝখানে তা হ্রাস পায়, আবার বছরের শেষে পূর্ণতা লাভ করে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। কারণ তার সম্পদের উপর পূর্ণ বছর অতিবাহিত হয়নি।^{১৩৩}

মোটকথা, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য উক্ত শর্তটির ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। সকলেই এ শর্তটির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। কারণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এমন একটি সময় নির্ধারণ প্রয়োজন, যেন সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ পায়। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত উক্ত সময়কে পূর্ণ এক বছর হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

৩. চতুস্পদ জন্তুর সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

পশুজগত বিশাল ও বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক পশু মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। বান্দার জন্য এ পশুজগত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ - وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ)^{১৩৪}

-‘আর চতুস্পদ জন্তুকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতবস্ত্রের উপকরণ, খাদ্য ও আরও বহু উপকার। সেসবের মধ্যে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য রয়েছে, যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছাতে পার না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু, পরম দয়ালু।’

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ)^{১৩৫}

-‘আর তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়।’

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ)^{১৩৬}

-‘আর আল্লাহ তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা করে দিয়েছেন এবং চতুস্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমাদের জন্য সফর ও একস্থানে অবস্থান- উভয় অবস্থাতেই খুব হালকা থাকে। আর যিনি ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা তোমাদের জন্য অসংখ্য আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী বানিয়ে দিয়েছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে আসে।’

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ - وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ - وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾^{১৩৭}

-‘এ লোকেরা কি দেখে না যে, আমি আমার হাতে তৈরী করা জিনিসগুলো দিয়ে তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি। আর এখন তারা এসবের মালিক? আমি এগুলোকে তাদের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছি যে, এগুলোর কোন একটির উপর তারা আরোহণ করে এবং কোনটির গোশত তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বহু উপকার ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না?’

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সকল আয়াতে দুই শ্রেণির জন্তুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণির জন্তুর যাকাত রয়েছে এবং অন্য শ্রেণির উপর যাকাত নেই। আর যে সকল জন্তুর উপর যাকাত ফরয সেগুলোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতিপয় শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। নিম্নে এ সকল শর্তাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

৩.১ গৃহপালিত হালাল পশু হওয়া

চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে, গৃহপালিত হালাল পশু হওয়া। যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুগা এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী। সুতরাং বন্য পশুর উপর যাকাত আবশ্যিক নয়।^{১৩৮}

৩.২ নিসাব পরিমাণ হওয়া

গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিককে নিসাব পরিমাণ পশুর মালিক হতে হবে। সুতরাং পশুর সংখ্যা নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত না পৌঁছলে তাতে যাকাত আবশ্যিক নয়। কেননা ইসলামী শরীয়ত শুধু ধনী ব্যক্তিদের উপর যাকাত ফরয করেছে। তাই উটের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫টি, গরুর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩০টি এবং ছাগলের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৪০টি বিদ্যমান থাকলে তাতে যাকাত আবশ্যিক হবে।^{১৩৯} পশুর নিসাবের সংখ্যা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উটের যাকাতের নিসাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ^{১৪০}

-‘পাঁচ ওয়াসাক-এর কম পরিমাণ সম্পদে যাকাত ফরয হয় না। পাঁচটি উটের কমেও যাকাত ফরয হয় না এবং পাঁচ উকিয়ার কমেও যাকাত ফরয হয় না।’

মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা) বর্ণিত হাদীসে গরুর যাকাতের নিসাব বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَسْنَةً^{১৪১}

-‘নবী করীম (সা) আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে পূর্ণ এক বছরের একটি ষাড় বা গাভী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছরের একটি গাভী (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করি।’

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে ছাগলের যাকাতের নিসাব উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) তাকে বাহরাইনে প্রেরণের সময় এ বিধানটি লিখে দেন, ...

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا^{১৪৮}

‘আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে; সাইমাহ বকরী ৪০টি থেকে ১০০ পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশি হলে ২০০টি পর্যন্ত দুটি বকরী। ২০০ এর অধিক হলে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি বকরী। ৩০০ এর অধিক হলে প্রতি একশতে একটি বকরী। কারো সাইমাহ বকরী ৪০ থেকে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে।’

৩.৩ পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া

পশুর মালিকের অধীনে পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত। নবী করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও অনুরূপ বিধান বিদ্যমান ছিল। তাঁরা যাকাত আদায়কারী কর্মচারীকে পশুর যাকাত আদায়ের জন্য বছরে মাত্র একবার প্রেরণ করতেন।^{১৪৯} ‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ^{১৪৮}

‘বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালে যাকাত ফরয হয় না।’

৩.৪ সাইমাহ (سَائِمَةٌ) বা বিচরণশীল পশু হওয়া

সাইমাহ (سَائِمَةٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে سَوَانِمُ। এর শাব্দিক অর্থ বিচরণশীল, মুক্তভাবে বিচরণকারী পশু। শরীয়তের পরিভাষায়, যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চারণভূমিতে প্রতিপালিত হয়, তাকে সাইমাহ (سَائِمَةٌ) বলা হয়। অধিকহারে দুগ্ধ, পনির ও মাখন লাভ করাই এর লক্ষ্য। সুতরাং যে পশুকে মালিক ঘাস সংগ্রহ করে খাওয়ায় বা যে পশু ভার বহন, যানবাহন ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় বা গোশত খাওয়ার জন্য লালিত-পালিত হয়, তা সাইমাহ (سَائِمَةٌ) হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা এ বৃদ্ধি ব্যক্তিগত উপকার লাভের জন্য। আর ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে সকল পশু প্রতিপালিত হয়, তাতে ব্যবসার পণ্য হিসেবে যাকাত ফরয হবে; সাইমাহ (سَائِمَةٌ) হিসেবে যাকাত ফরয হবে না।^{১৪৫}

সাইমাহ (سَائِمَةٌ) হওয়ার জন্য বছরের সমস্ত দিনগুলোতে চারণভূমিতে বিচরণ করা শর্ত নয়; বরং যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে বিচরণ করে, তা-ই সাইমাহ (سَائِمَةٌ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে পশু বছরের অর্ধেক সময় চারণভূমিতে বিচরণ করে, তাকে (سَائِمَةٌ) সাইমাহ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।^{১৪৬}

চতুস্পদ পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সাইমাহ (سَائِمَةٌ) বা বিচরণশীল হওয়ার শর্তটি হাদীসেও বিবৃত হয়েছে। বাহয ইব্ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ، لَا يَفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَخَذُوهَا، وَشَطَرُ إِبِلِهِ عَزْمَاتٍ رِبْتًا، لَا يَحِلُّ لَالٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ^{১৪৭}

-‘আমি নবী করীম (সা)-কে প্রত্যেক অবোধে বিচরণকারী উটের ব্যাপারে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এই হিসাব থেকে কোন উট বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যতে তা প্রদান করবে তাকে তার সাওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা প্রদানে অস্বীকার করবে, আমি-ই তার থেকে তা আদায় করে নেব এবং তার আরো অর্ধেক মাল আদায় করে নেব। এটি আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহের একটি। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।’

সাইমাহ (سَائِمَةٌ) হওয়া শর্তারোপের কারণ হচ্ছে, যাকাত এমনভাবে ফরয হয়েছে, যেন তা প্রদান করা মালিকের পক্ষে সহজ হয়। কিন্তু যে জম্বকে ঘাস এনে খাওয়াতে হয়, তাতে মালিকের বেশি কষ্ট হয়। সুতরাং এরূপ পশুকে যাকাত হিসেবে প্রদান করলে মানসিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।^{১৪৮}

৩.৫ কাজ-কর্মহীন পশু হওয়া

চতুষ্পদ জম্বর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কাজ-কর্মহীন পশু হওয়া শর্ত। তবে এ শর্তটির ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফি‘ঈ (র), ইবরাহীম (র), মুজাহিদ (র), ‘উমার ইব্ন ‘আদিল ‘আযীয (র), ছাওরী (র) (৯৭-১৬১ হি.), লায়ছ (র) (৯৪-১৭৫ হি.) প্রমুখের মতে, পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কাজ-কর্মহীন পশু হওয়া শর্ত। অর্থাৎ যাকাত আদায়যোগ্য পশু জমি চাষ, ক্ষেত-খামারের সেচ, গাড়ি টানা, ভার বহন প্রভৃতি কাজ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। উট এবং গরুর ক্ষেত্রে এ শর্তটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং যে সকল পশু কাজ-কর্মে নিয়োজিত সেগুলোর উপর যাকাতের বিধান আরোপিত হবে না।^{১৪৯} ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ^{১৫০}

-‘কাজে নিয়োজিত গরুর কোন যাকাত নেই।’

জাবির ইব্ন ‘আদিল্লাহ (রা) বলেন,

لَيْسَ عَلَى الْحَرَّائِةِ صَدَقَةٌ^{১৫১}

-‘কৃষি কাজে নিয়োজিত জম্বর যাকাত নেই।’

খ. ইমাম মালিক (র)-এর মতে, কাজে নিয়োজিত হোক বা না হোক গরু ও বলদের উপর অবশ্যই যাকাত ফরয হবে। তবে মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ পূর্বোক্ত মতকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। কেননা পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়া ও অনুরূপ অন্যটিতে যাকাত ফরয না হওয়া পরস্পর বিরোধী।^{১৫২}

উপসংহার

যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক ইবাদত। এর সাথে মানবজীবনের অন্যতম একটি উপাদান তথা অর্থনীতি জড়িত। মূলত যাকাত একটি আর্থিক ইবাদত হলেও এর উপযোগিতা ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এজন্য যাকাতের বিধানকে ইসলামে ফরয হিসেব সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিধান ধনী-গরীব নির্বিশেষে

সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়; বরং নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কেবল বিত্তবান মুসলমানদের উপর ফরয। যাকাতের সে সকল শর্তসমূহ তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্ত হলো, মুসলিম, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। সম্পদের সাথে সম্পর্কিত শর্ত হলো, পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকা, নিসাব পরিমাণ হওয়া, প্রবৃদ্ধিশীল হওয়া, স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া, ঋণ মুক্ত হওয়া এবং পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। আর চতুস্পদ জন্তু হলে অতিরিক্ত শর্ত হলো গৃহপালিত হালাল পশু হওয়া, বিচরণশীল হওয়া এবং কাজ-কর্মহীন পশু হওয়া। যাকাতের উপর্যুক্ত শর্তাবলী যে সকল ব্যক্তি ও তাদের সম্পদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যাকাত প্রদান করা আবশ্যকীয় কর্তব্য।

তথ্যনির্দেশ

- ১ লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-উলূম (বৈরুত: আল-মাতবা'আতুল-কাছলীকিয়াহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা (বৈরুত: দারুল-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।
- ২ ইবন মানযুর আল-ইফরীকী, লিসানুল-'আরব, ১৪শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৮; হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (বৈরুত: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; আশ-শরীফ আল-জুরজানী, আত-তা'রীফাত (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; সম্পাদনা পরিষদ, আরবী-বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭।
- ৩ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699.
- ৪ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.
- ৫ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আ'লা, ৮৭ : ১৪।
- ৬ আল-মাওয়ারদী বলেন, যাকাত-ই সাদাকা এবং সাদাকা-ই যাকাত। নাম পার্থক্যপূর্ণ হলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ফিক্‌হু-য়াকাত, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৪০।
- ৭ সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
- ৮ সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৫৮; এছাড়া অত্র সূরার ৬০ নং আয়াতেও (صَدَقَاتٍ) সাদাকাতুন শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।
- ৯ 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, আল-ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল আরব' আহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬।
- ১০ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩।
- ১১ বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত-তুরাখিল 'আরবী, তা.বি.), পৃ. ৯৫।
- ১২ লিসানুল-'আরব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ২৬০।
- ১৩ আরবী-বাংলা অভিধান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী] (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৪শ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৫৯৮।
- ১৪ *Dictionary of islam*, p. 572.
- ১৫ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 465.

- ১৬ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরুত: দারুল ইবন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল বুয়ু', বাবুল বায়'ই ওয়াশ'-শিরাই মা'আন-নিসাই, হাদীস নং ২১৫৫।
- ১৭ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুল-আকদিয়াহ, বাবুন ফিস-সিলহি, হাদীস নং ৩৫৯৪।
- ১৮ *লিসানুল-আরব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
- ১৯ মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিকহ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫।
- ২০ ড. ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (মিসর: মাকতাবাতুশ-শুন্নক আদ-দাওলিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭৯; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ২৬০।
- ২১ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪৭৯; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ২৬০।
- ২২ *ফিকহু-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ২৩ পূর্বোক্ত।
- ২৪ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন্-নাবিয়্য (সা): বুনিয়াল ইসলামু 'আলা খামসিন, হাদীস নং ৮।
- ২৫ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ২৬ সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৩।
- ২৭ সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৫৪।
- ২৮ *ফিকহু-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।
- ২৯ সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
- ৩০ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয-যাকাত, বাবু যাকাতিল-গানামি, হাদীস নং ১৪৫৪।
- ৩১ ইবন 'আবিদীন আদ-দিমাশকী, *রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ-দুররিল মুখতার*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫৯।
- ৩২ নিযামুদ্দীন আল-বালখী, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৩১০ হি.), পৃ. ১৭১।
- ৩৩ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; *রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ-দুররিল মুখতার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯।
- ৩৪ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল-মুসাকাত, বাবুর রাজুলি ইয়াকুন্ লাহু মামাররু আও শিরবুন ফী হাইতিন আও ফী নাখলিন, হাদীস নং ২৩৭৯।
- ৩৫ মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুরায়শী আন-নায়সাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত-তুরাখিল-'আরাবী, তা.বি.), কিতাবুয-যাকাত, বাবু লা যাকাতা 'আলাল-মুসলিমি ফী 'আবদিহী ওয়া ফারাসিহী, হাদীস নং ১০ (৯৮২)।
- ৩৬ মুদাঝ্বার: যে গোলামকে তার মালিক জীবনের শেষ পর্যায়ে মুক্ত করে তাকে মুদাঝ্বার বলে। আর মুদাঝ্বার মুতলাক হচ্ছে, মালিকের মৃত্যুর সাথে যে গোলামের মুক্ত হওয়া শর্তযুক্ত। যেমন- মনিবের এ কথা বলা, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন।' দ্র. *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১২; *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, পৃ. ৪৭৪।
- ৩৭ উম্মু ওয়ালাদ: এমন দাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়, যার গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মগ্রহণ করার কারণে সে মুক্তি পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে। দ্র. *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩।
- ৩৮ মুকাভাব: এমন দাসকে মুকাভাব বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ। দ্র. *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০; *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, পৃ. ৫০২।
- ৩৯ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।
- ৪০ *ফিকহু-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫-১০৬।
- ৪১ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ৪২ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

- ৪৩ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
- ৪৪ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।
- ৪৫ সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল-হুদুদ, বাবুন ফিল মাজনুনি ইয়াসরিবু আও ইয়ুসীবু হাদদান, হাদীস নং ৪৪০৩।
- ৪৬ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।
- ৪৭ যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত। যাকাত আদায় করার সময় বা অন্য মাল থেকে যাকাতের মাল পৃথক করার সময় যাকাত আদায়ের নিয়ত করতে হবে। নিয়ত করার শর্তটি শুধু যাকাতের ক্ষেত্রে নয়; বরং সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। ‘উমার ইব্নুল খাতাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ**’- ‘প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভ অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।’
- দ্র. সহীছুল-বুখারী, বাবু বাদইল ওয়াহী, হাদীস নং ১।
- যাকাতের মাল প্রদান করার সময় যাকাতদাতা যদি যাকাতের নিয়ত না করে তাহলে তার করণীয় হলো, যাকে যাকাতের মাল প্রদান করেছে তার মালিকানায় উক্ত মাল থাকাবস্থায় যাকাতের নিয়ত করা। নিয়তের ক্ষেত্রে অন্তরের ইচ্ছাই ধর্তব্য হবে। সুতরাং কেউ যদি অন্তরে যাকাতের নিয়ত করে তা বস্তুনিষ্ঠ সময় মুখে অন্য কোন শব্দ যেমন- হেবা, ঋণ ইত্যাদি উচ্চারণ করে, তবুও তার যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হবে। দ্র. আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; সম্পাদনা পরিষদ, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৮০।
- ৪৮ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ৪৯ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।
- ৫০ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
- ৫১ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-১০৯।
- ৫২ সহীছুল-বুখারী, কিতাবু-যাকাত, বাবু ওজুব-যাকাত, হাদীস নং ১৩৯৫।
- ৫৩ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত (কায়রো: দারুল হারামায়ন, ১৪১৫ হি.), বাবুল-‘আইন, মিন ইসমিহী ‘আলী, হাদীস নং ৪১৫২।
- ৫৪ মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত্-তিরমিযী, সুনানু-তিরমিযী (বৈরুত: দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), আবওয়াবু-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী যাকাতিল মালিল ইয়াতীম, হাদীস নং ৬৪১।
- ৫৫ আবু ‘আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ্-শাফি’ঈ, মুসনাদুল ইমামিশ্-শাফি’ঈ (কুয়েত: শিরকাতু গিরাস লিন্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী’, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবু-যাকাত, বাবু যাকাতিল আমওয়ালিল ইয়াতামা ওয়াল ইবতিগাই ফী-হা, হাদীস নং ৭১৩; আবু বকর আল-বায়হাকী, আস্-সুনানুল কুবরা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), কিতাবু-যাকাত, বাবু মান তাজিবু ‘আলায়হিস্-সাদাকাতি, হাদীস নং ৭৩৩৮; হাদীসটি মুরসাল হলেও ইমাম শাফি’ঈ (র) অন্যান্য সাধারণ দলীলের ভিত্তিতে এ হাদীসটিকে অধিক শক্তিশালী করে তুলেছেন।
- ৫৬ মালিক ইব্ন আনাস, আল-মুওয়াত্তা (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত-তুরাখিল ‘আরাবী, ১৪০৬ হি./১৯৫৮ খ্রি.), কিতাবু-যাকাত, বাবু যাকাতিল আমওয়ালিল ইয়াতামা ওয়াত্-তিজারাতিল লাহুম ফীহা, হাদীস নং ১২।
- ৫৭ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১।
- ৫৮ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ৫৯ আরবী-বাংলা অভিধান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৯; আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু’জামুল ওয়াফী], পৃ. ৮৬১।
- ৬০ A Dictionary of Modern Written Arabic, Pp. 931-932.
- ৬১ সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৩।
- ৬২ সূরা আত্-তাগাবুন, ৬৪ : ১৫।

-
- ৬৩ লিসানুল-‘আরব, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৬৩৫।
- ৬৪ আল-মুজামুল ওয়াসীত, পৃ. ৮৯২।
- ৬৫ ইবন নুজায়ম আল-মিসরী, আল-বাহরুর রাইক শারহ কানযুদ-দাকাইক, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল কিতাবিল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২১৭; ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।
- ৬৬ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।
- ৬৭ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।
- ৬৮ আল-বাহরুর রাইক শারহ কানযুদ-দাকাইক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২।
- ৬৯ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।
- ৭০ সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৩।
- ৭১ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৪।
- ৭২ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৮।
- ৭৩ সূরা আত্-তাগাবুন, ৬৪ : ১৫।
- ৭৪ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।
- ৭৫ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।
- ৭৬ আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২; ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।
- ৭৭ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।
- ৭৮ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
- ৭৯ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।
- ৮০ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ৮১ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬।
- ৮২ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৭।
- ৮৩ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।
- ৮৪ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
- ৮৫ ড. মীর মোঃ আনোয়ার হোসেন, দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৭৬।
- ৮৬ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯।
- ৮৭ সহীহুল-বুখারী, কিতাবু-যাকাত, বাবু যাকাতিল ওয়ারাকি, হাদীস নং ১৪৪৭; আহমাদ ইবন শু‘আয়ব আন-নাসাঈ, সুনা-নু-নাসাঈ (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবু-যাকাত, বাবু যাকাতিল-ইবিলা, হাদীস নং ২৪৪৬।
- ৮৮ সহীহ মুসলিম, কিতাবু-নিকাহ, বাবু-সাদাকি ওয়া জাওয়াযি কাওনিহী তা‘লীমা কুরআনি ওয়া খাতমা হাদীদিন ..., হাদীস নং ৭৮ (১৪২৬)।
- ৮৯ সুনানু-তিরমিযী, আবওয়াযু-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী সাদাকাতি-যার‘ই ওয়াত্-তামরি ওয়াল-হুবুবি, হাদীস নং ৬২৮।
- ৯০ দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা, পৃ. ১৬৮।
- ৯১ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; সাযিদ সাবিক, ফিক্‌হু-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩৫২; ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০।
- ৯২ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।
- ৯৩ সূরা আল-আন‘আম, ৬ : ১৪১।

- ৯৪ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিয়াতুহু, ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্‌র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৪০।
- ৯৫ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুস-সগীর (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, দারু 'আম্মার, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), বাবুল মীম, মান ইসমুহু মানসূর, হাদীস নং ১০৮৮।
- ৯৬ ফিক্‌হুস-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
- ৯৭ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুস-যাকাত, বাবু লায়সা ফীমা দুনা খামসি যাওদিন সাদাকাতুন, হাদীস নং ১৪৫৯; সুনানুন-নাসাঈ, কিতাবুস-যাকাত, বাবু যাকাতিল ওয়ারাকি, হাদীস নং ২৪৭৪।
- ৯৮ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।
- ৯৯ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুস-যাকাত, বাবুল-‘উশরি ফীমা ইয়ুসকা মিন মা-ইস-সামাই ..., হাদীস নং ১৪৮৩; সুনানুত-তিরমিযী, আবওয়াবুস-যাকাত, বাবু মা জাআ ফিস-সাদাকাতি ফীমা ইয়ুসকা বিল-আনহারি ওয়া গায়রিহা, হাদীস নং ৬৪০।
- ১০০ সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।
- ১০১ সূরা আর-রুম, ৩০ : ৩৯।
- ১০২ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
- ১০৩ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।
- ১০৪ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুস-যাকাত, বাবু লায়সা ‘আলাল-মুসলিমি ফী ফারাসিহী সাদাকাতুন, হাদীস নং ১৪৬৩।
- ১০৫ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১।
- ১০৬ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাবু মা ইয়ুতা‘আওয়াযু মিনাল জুবনি, হাদীস নং ২৮২৩।
- ১০৭ সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল-আকদিয়াহ, বাবুর রাজুলি ইয়াহলিফু ‘আলা হাক্কিহী, হাদীস নং ৩৬২৭।
- ১০৮ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১।
- ১০৯ পূর্বোক্ত।
- ১১০ আল-মু'জামুল আওসাত, বাবুল আলিফ, মিন ইসমুহু আহমাদ, হাদীস নং ২২৭০।
- ১১১ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫-১৪৬।
- ১১২ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬।
- ১১৩ ‘আলাউদ্দীন আল-কাসানী, বাদাই‘উস-সানাই‘ ফী তারতীবিশ-শারাই‘, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১১।
- ১১৪ সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
- ১১৫ সূরা আল-মা‘আরিজ, ৭০ : ২৪-২৫।
- ১১৬ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫২।
- ১১৭ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
- ১১৮ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্ন তায়মিয়াহ, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), বাবুস-সোয়াদ, আসাদ ইব্ন ওয়াদা‘আহ ..., হাদীস নং ৭৬২২।
- ১১৯ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৯।
- ১২০ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
- ১২১ সহীহ মুসলিম, কিতাবুস-যাকাত, বাবুল ইবতিদাই ফিন-নাফাকাতি বিন-নাফসি ছুমা আহলিহী ছুম্মাল কারাবাতি, হাদীস নং ৪১ (৯৯৭)।
- ১২২ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুস-যাকাত, বাবু লা সাদাকাতা ইল্লা ‘আন যাহরি গিনা।
- ১২৩ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

- ১২৪ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
- ১২৫ আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুস-যাকাত, বাবুস-যাকাত ফিদ-দায়ন, হাদীস নং ১৭।
- ১২৬ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
- ১২৭ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২।
- ১২৮ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, সুনানু ইব্ন মাজাহ (মিসর: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়াহ, তা.বি.), কিতাবুস-যাকাত, বাবু মানিসতাফাদা মালান, হাদীস নং ১৭৯২।
- ১২৯ আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা' আহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৯।
- ১৩০ পূর্বোক্ত।
- ১৩১ পূর্বোক্ত।
- ১৩২ পূর্বোক্ত।
- ১৩৩ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪০।
- ১৩৪ সূরা আন্-নাহল, ১৬ : ৫-৭।
- ১৩৫ সূরা আন্-নাহল, ১৬ : ৬৬।
- ১৩৬ সূরা আন্-নাহল, ১৬ : ৮০।
- ১৩৭ সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭১-৭৩।
- ১৩৮ আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪।
- ১৩৯ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪; ফিক্‌হুস-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।
- ১৪০ সুনানুন-নাসাঈ, কিতাবুস-যাকাত, বাবু যাকাতিল ইবিলা, হাদীস নং ২৪৪৫।
- ১৪১ সুনানুন-তিরমিযী, আবওয়াবুস-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী যাকাতিল বাকারি, হাদীস নং ৬২৩।
- ১৪২ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুস-যাকাত, বাবু যাকাতিল-গানামি, হাদীস নং ১৪৫৪।
- ১৪৩ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫; ফিক্‌হুস-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।
- ১৪৪ সুনানু ইব্ন মাজাহ, কিতাবুস-যাকাত, বাবু মানিসতাফাদা মালান, হাদীস নং ১৭৯২।
- ১৪৫ আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫; ফিক্‌হুস-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।
- ১৪৬ আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬।
- ১৪৭ সুনানুন-নাসাঈ, কিতাবুস-যাকাত, বাবু 'উকূবাতি মানি'ইস-যাকাত, হাদীস নং ২৪৪৪।
- ১৪৮ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।
- ১৪৯ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২; আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫।
- ১৫০ আল-মু'জামুল কাবীর, বাবুল 'আইন, তাউস- 'আন ইব্ন 'আব্বাস, হাদীস নং ১০৯৭৪; আবুল হাসান 'আলী ইব্ন 'উমার আদ-দারা কুতনী, সুনানুদ-দারা কুতনী (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুস-যাকাত, বাবুল লায়সা ফিল-'আওয়ামিলি সাদাকাতুন, হাদীস নং ১৯৩৯।
- ১৫১ ইব্ন যানজুইয়াহ, আল-আমওয়াল (সৌদি আরব: মারকাযুল মুলক ফায়সাল লিল-বুহুছি ওয়াদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), কিতাবুস-সাদাকাতি ওয়া আহকামিহা ওয়া সুনানিহা, বাবুস-সুন্নাতু ফী 'আওয়ামিলিল বাকারি আন্নাহু লা সাদাকাতা ফীহা, হাদীস নং ১৪৭৬।
- ১৫২ ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের নীতিমালা ও উৎসাবলী

বজলুর রশীদ*

Abstract: Islam is a complete code of life and Islamic Economy is an important part of Islam. Islamic economic system is a divine source and wholesomely based on Qur'an, Hadith, Ijma, Ijtihad and Qiyas. In Islamic Economic System; All economic activities and life are done within the framework of Halal and Haram (Lawful and Unlawfulness). The revenues of individuals, partnerships and the state are regulated in the same methods. The main sources of livelihood and income are clearly defined in the Holy Qur'an. Other livelihood and income types; circumcision is determined according to Hadith, Ijma, Ijtihad and Qiyas based on Holy Qur'an. All these types of income have been applied by some other societies and governments, either directly or by adaptation. Nowadays, although some of the names or formats change, other than a few types of these types of revenues are still in use. In this study; firstly, the legal sources of the Islamic religion and economy are based briefly explained. Secondly, the basic principles of the Islamic economics are summarized. We will try to discuss about the Income System in Islamic Economy inshaallah.

ভূমিকা

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ জীবিকা নির্বাহের উপর নির্ভরশীল। আর জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে মানুষকে তার মৌলিক চাহিদা পূরণে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে হয়। অর্থ-সম্পদ উপার্জন যেমন বৈধ পন্থায় করা যায় তেমনি অবৈধ পন্থায়ও করা যায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করে চলা অত্যন্ত জরুরী। কেননা তিনি বান্দার ইচ্ছাশক্তির অধীনে বৈধ-অবৈধ সবকিছুকে উন্মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে এটা দেখতে চান যে, কে বৈধ গ্রহণ ও অবৈধ বর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত হয় আর কে অবৈধ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাঁর সীমালঙ্ঘন করে? ইসলামে নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নিজ হাতে উপার্জনকে সর্বোত্তম রিযিক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণও স্বয়ং নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন এবং নিজ পরিবার পরিচালনা করতেন। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা) ব্যবসায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছেন। নূহ (আ) মিস্রির কাজ করেছেন। দাউদ (আ) কর্মকারের কাজ করেছেন। মূসা (আ) নিজেও শু'আয়ব (আ)-এর বাড়িতে দীর্ঘ দশ বছর শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন জীবিকা নির্বাহে শ্রম দিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন তখন তাঁদের অনুসারীদের যে শ্রম বিমুখ হওয়ার সুযোগ নেই তা সহজেই অনুমেয়। ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে এর অর্থব্যবস্থাও অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ ও সার্বজনীন। ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জনের বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। আল-কুরআনে ইসলামী আয়ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বহু আলোচনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহয় আরো বিস্তারিতভাবে এ আয় ব্যবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোন কোন পন্থায় আয় বৈধ অথবা অবৈধ হবে, কোন কোন পেশা উপার্জনের জন্য উত্তম বা অনুত্তম, হালাল বা হারাম ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী অর্থনীতিতে বৈধ আয়ের নীতিমালা ও উৎসসমূহ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

* এম.ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী অর্থনীতির পরিচয়

ইসলামী অর্থনীতি একটি যৌগিক শব্দ। প্রথমত ইসলাম (الإسلام) শব্দটি আরবী। এটি বাবে إفعال -এর মাসদার, যা ভিত্তিগতভাবে সিলমুন (سلم) ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা, নত হওয়া^১, শান্তির পথে চলা, মুসলিম হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। যেমন- أسلم فَلَمَّا أَسْلَمًا وَتَلَّهُ, 'যখন তারা উভয়ে নিজেদেরকে সমর্পণ করল এবং (ইবরাহীম) জবাই করার জন্য তাকে শুয়ে দিল।'^২ এর আরেকটি অর্থ হলো, 'শান্তিতে প্রবেশ করা। সুতরাং أسلم অর্থ হলো, সে শান্তিতে প্রবেশ করল।'^৩ এছাড়া ইসলাম শব্দটি الإيْمَان 'বিশ্বাস স্থাপন', الطاعات 'আনুগত্য' ও الإنقياد 'অনুগত হওয়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।^৪ আল কুরআনের আট জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।^৫

আর অর্থনীতির আরবী প্রতিশব্দ হলো الاقتصاد। আরবী الاقتصاد শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে قصد মাদ্দাহ হতে। এর অর্থ হলো التوسط তথা মধ্যমপন্থা, الاعتدال তথা পরিমিত অবস্থা বা সামঞ্জস্যতা। এ শব্দটির মাঝে ইসলামের গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মধ্যমপন্থীদেরকে আল্লাহ তা'আলা মূল্যায়ন করেছেন।^৬ তাই الاقتصاد শব্দটি দ্বারা অর্থনীতিকে বুঝালেও এটি বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষা থেকে অনেক কারণেই ভিন্নতর ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা আরবী পরিভাষাগুলো তুলনামূলকভাবে অন্তর্নিহিত ভাবগাম্ভীর্যের অধিকারী। তাই বাংলা 'অর্থনীতি' ও ইংরেজি 'ECONOMICS' শব্দ দুটি থেকে আরবী الاقتصاد শব্দটি অর্থের গভীরতার দিকে থেকে উচ্চতর।

ড. মুহাম্মাদ শাওকী আল-ফানজিরী বলেন,

هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية

- 'এটা অর্থনীতির কার্যক্রমকে নির্দেশ করে এবং একে ইসলামী মূলনীতি ও রীতিনীতির আলোকে শৃঙ্খলিত করে।'^৭

ড. মুহাম্মাদ আল-আরাবী বলেন,

الاقتصاد الإسلامي بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي تستخرجها من القرآن والسنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمة على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وعصر.

- 'ইসলামী অর্থনীতি হলো অর্থ সংক্রান্ত সাধারণ কিছু রীতিনীতি, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্গত হয়েছে। আর অর্থনীতির ভিত্তি সকল পরিবেশ ও যুগে এসকল নীতির আলোকেই প্রতিষ্ঠিত।'^৮

আয়ের পরিচয়

আয় শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত একটি শব্দ। এর অপরাপর অর্থ, উপার্জন, কামাই, রোজগার। আয় শব্দের আরবী প্রতিশব্দ الكَسْبُ ও الْاِكْتِسَابُ। বহুপূর্ব থেকে অর্থনীতিতে আয়কে বুঝাতে الكَسْبُ শব্দটি ব্যবহৃত হতো। এ শব্দটি দিয়ে অর্থনীতি বিষয়ক বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। আয় শব্দের অপর দুটি প্রতিশব্দ الْمِهْنَةُ ও الْحِرْفَةُ; এ শব্দ দুটি যথাক্রমে الكَسْبُ ও الْاِكْتِسَابُ-এর সমার্থক। অনুরূপভাবে الْاِمْتِهَانُ ও الْاِحْتِرَافُ শব্দ দুটিও এদের সমার্থক অর্থ প্রকাশ করে। তাই الْاِحْتِرَافُ ও الْاِمْتِهَانُ-এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই; উভয় শব্দই রোজগার করা, উপার্জন করা ও পেশা গ্রহণ করা বুঝায়। الْمِهْنَةُ ও الْحِرْفَةُ এমন কিছুকে বুঝায়, যাতে মানুষ আত্মনিয়োগ করে এবং যার মাধ্যমে পরিচিতি পায়। الْعَمَلُ ও الصَّنَاعَةُ শব্দ দুটিও কখনো الْاِحْتِرَافُ তথা পেশা ও কাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ভাষাবিদগণের দৃষ্টিতে الصَّنَاعَةُ-এর

বিশেষত্ব হলো, কোন আকৃতিকে কেন্দ্র করে কাজের ধারাবাহিক অগ্রসরতা। এতে যন্ত্রের ব্যবহারটাও গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে কারিগরি ও নির্মাণের বিষয়টিও সম্পর্কিত। আরবীতে বলা হয়, **الصَّنَاعَةُ مَا كَانَ بِأَلِيَّةٍ**, তথা **صَانَعٌ** তথা কারিগর বলা হয়; কিন্তু **تَاجِرٌ** তথা ব্যবসায়ীকে **صَانَعٌ** তথা কারিগর বলা হয় না। আবার **الْعَمَلُ** শব্দটি সমভাবে এমন কাজকে বুঝায়, যাতে ব্যক্তি দক্ষ হোক আর না হোক, পেশা হিসেবে গ্রহণ করুক আর না-ই করুক। এছাড়াও **الدُّخْلُ** শব্দটিও আয়, রাজস্ব, অর্থোপার্জন, ধনাগম অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপর্যুক্ত শব্দগুলো ইসলামী অর্থনীতির আয় ও উপার্জনের সাথে ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত শব্দ।^{১০}

পৃথিবীতে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আয় করে। মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য শ্রম ব্যয় করে আয় করে এবং নিজের ঘাম ঝড়িয়ে উপার্জন করে। নিজের উপার্জন থেকে মানবিক মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দরকার। নিরাপদ থাকার জন্য চিকিৎসা দরকার। বসে থাকলে, এমনিতেই খাবার এসে পেট ভর্তি হয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে দিবে না, পোষাক এসে শরীরকে ঢেকে দিবে না। কোন চাহিদাই এমনি এমনিই পূরণ হয়ে যাবে না। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। সেই কষ্টে উপার্জিত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে ও চাহিদা পূরণ করতে হবে। আর এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে। তাই আয় করা বলতে সাধারণত অর্থ, ধন-সম্পদ আয় করাকে বুঝায়। আল-কুরআনে অর্থকড়ি ও ধন-সম্পদকে বুঝাতে **الْكُسْبُ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ-সম্পদ ও ফসলাদি থেকে খরচ করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো।’^{১১} ইবন মাস‘উদ (রা) ও মুজাহিদ (র)-এর মতে, ব্যবসা, শিল্প-কারখানার উপার্জনও-এর অন্তর্ভুক্ত।^{১২}

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আরেক ধরনের আয় ও উপার্জনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ তার নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে ভালো কাজ করে, সেই ভালো কাজ তারই উপার্জন বা আয়। পরকালীন মুক্তির জন্য, রবের সন্তুষ্টির জন্য, নিজে সৎ থাকার জন্য যে কল্যাণকর কাজগুলো করে, সেগুলোও তার উপার্জিত কর্ম। আবার মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষ অসৎ কর্মও সাধন করে থাকে, সেগুলোও তার উপার্জন। রবের অবাদ্য হয়ে, সীমালঙ্ঘন করে মানুষ যে অন্যায়, অনাচার, অপকর্মগুলো করে সবই তার আয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই ব্যক্তির আয় ও উপার্জন ভালোও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। কোন ব্যক্তির বা কোন জাতির ভালো-মন্দ কৃতকর্ম তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিদের কৃতকর্ম বুঝাতেও **الْكُسْبُ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তাদের কৃত আয়ের কারণে তাদেরকেই পাকড়াও করা হবে, অন্যদেরকে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

-‘তারা ছিল এক সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কী করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।’^{১৩} এখানে উভয় স্থানের **الْكُسْبُ** তথা উপার্জন দ্বারা ভালো-মন্দ ‘আমল বা কর্মসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

নিজ অর্জনের কারণেই মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদে নিপতিত হয়। বন্যা, ভূমিকম্প, অতি বৃষ্টি, অতি খড়া, প্রবল জলচ্ছাস সবধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের নিজ হাতের কামাই স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলার

পরিমিত সৃষ্টিকে মানুষ নিজেরাই বিকৃত করেছে। মানুষ তার ভোগবাদী স্বভাব ও বিলাসিতার কারণে পাহাড় কেটেছে, বন উজাড় করেছে, পানির গতি রোধ করেছে, ময়লা ও বর্জ দিয়ে আবহাওয়াকে বিষাক্ত করেছে। এসব অনিয়ম বিপদকে ত্বরান্বিত করেছে। সেই সাথে মানুষের পাপপ্রবণতাও বিপদ ও দুর্যোগকে অবধারিত করেছে। তাই এসকল কাজ-কর্ম মানুষের **الْكُسْبُ** তথা উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ** - 'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল'।^{১৪} এখানে **الْكُسْبُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **المعاصي** - 'তোমরা যে পাপ উপার্জন কর'।^{১৫} চৌর্যবৃত্তিও এক ধরনের মন্দ আয় বা উপার্জন। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا.

- 'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে'।^{১৬}

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুরজানী (র) (মৃত ৮১৬ হি.) আয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الكسب: هو المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ولا يوصف فعل الله بأنه كسب؛ لكونه منزهاً عن جلب نفع أو دفع ضرر.

- 'কসব বা উপার্জন হলো এমন কাজ, যা মুনাফা অর্জন অথবা ক্ষতি প্রতিহত করাকে বুঝায়। তবে আল্লাহ তা'আলার কাজকে কসব বা উপার্জন বলা যাবে না। কেননা তিনি মুনাফা লাভ করা ও ক্ষতি প্রতিহত করা থেকে মুক্ত ও পবিত্র'।^{১৭}

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মতে,

كل ما يحصل من ريع الارض، أو أجرتها. أو أجره الدار، أو كسب العبد، ونحو ذلك

- 'এমন প্রত্যেক যা জমিনের ফসল, ব্যয়, ঘরের ভাড়া, দাসের উপার্জন এবং অনুরূপ কিছু থেকে অর্জন করা হয়'।^{১৮}

অতএব এ কথা বলা যায় যে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয় শব্দটি ভালো-মন্দ সব ধরনের কর্মকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু প্রয়োগিকভাবে এটি **اكتساب المال** অর্থাৎ সম্পদ আয় বা উপার্জনকে বুঝায়।

আয়-উপার্জনের বিবর্তন

পৃথিবীতে আদম (আ)-এর নেমে আসার মধ্য দিয়ে জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ, বেঁচে থাকার কর্ম-কৌশল ও মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সৃষ্টির পর থেকেই আদম (আ) জান্নাতে অবস্থান করেছেন। জান্নাতের সীমাহীন নিয়ামতের মধ্যে ডুবে ছিলেন। সেখানে আয়-ব্যয় ও জীবনধারণের জন্য কোন উপায় নিয়ে চিন্তার প্রশ্ন আসে না। জান্নাতে উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগেরও কোন বিষয় ছিল না। ঘটনাচক্রে আদম (আ) আল্লাহর আদেশে যখন পৃথিবীতে নেমে আসলেন তখন তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য, শরীর ঢেকে রাখার জন্য পোষাক, সুস্থতার জন্য চিকিৎসা ও অবস্থান করার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন হলো। তখন থেকেই আয় ও উপার্জনের বিষয়টির সৃষ্টি হলো। জমিনে চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য-শস্য উৎপাদন শুরু হলো। আদম (আ) নিজেই ডাল, রসুন, পেঁয়াজের মত দ্রব্যের চাষাবাদ শুরু করলেন; তার স্ত্রী হাওয়া (আ) ও সন্তানরা তাঁকে সাহায্য করলেন। আদম (আ) চাষাবাদের উপকরণ ও সরঞ্জামাদিও তৈরী করে ফেললেন। লজ্জাস্থান ও শরীর ঢাকার জন্য পোষাকও তৈরী করলেন। থাকার জন্য পাহাড়ের গুহাকে আবাসস্থল বানালেন। মানব ইতিহাসে আয়-উপার্জনের সূচনা পর্বটা এভাবেই হলো।^{১৯}

আদম (আ)-এর সন্তানদের থেকে ক্রমান্বয়ে মানব সংখ্যা বাড়তে থাকল। কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত হলো, চাহিদা ও যোগান সমানুপাতে বিস্তৃত হতে থাকল। আয়-উপার্জন এক সময় খাদ্য, বাসস্থান, পোষাকেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে পরিবার থেকে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ে রূপ নেয়। তখন মুদ্রার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সামুদ্রিক বিনুক বা কড়িকেই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। স্থানীয়ভাবে কড়ি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যের সময় কড়ির গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়। এবার ধাতব মুদ্রার প্রচলন হয়। ধাতব মুদ্রার সূত্র ধরে এক সময় স্বর্ণ মুদ্রার উদ্ভব হয় এবং এ স্বর্ণ মুদ্রাই গ্রহণযোগ্য ও সার্বজনীন মুদ্রা ব্যবস্থা হিসেবে গোটা দুনিয়ায় স্বীকৃত হয়। স্বর্ণ হয়ে ওঠে আয়-উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একেক সভ্যতার পরিবর্তন হতে থাকে স্বর্ণকে কেন্দ্র করেই। যে সম্রাট যত বেশি স্বর্ণের অধিকারী সে তত বড় ধনী এবং তার প্রভাব তত বেশি। দেশ হতে দেশান্তরে শুরু হয় স্বর্ণখনির অধিকার ও আহরণ। শুরু হয় স্বর্ণ আহরণের স্বর্ণযুগ। আয়-উপার্জন স্বর্ণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। এভাবে লেনদেন ও বাজার ব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যও আয়-উপার্জনের তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে।^{২০}

প্রাচীনকালের আয়-উপার্জনের সকল ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সেই সময়ের কৃষির তুলনায় আজকের কৃষি ব্যবস্থাপনায় বিশাল নতুনত্ব সংযুক্ত হয়েছে। তখনকার উৎপাদনের তুলনায় বর্তমান উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যও উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থাও আধুনিক হয়ে দেশভেদে নতুন ধারায় প্রচলিত হয়েছে। পোষাক শিল্পের পাশাপাশি অনেক আধুনিক শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। সেই সময়ের পশু নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থায় আজ আকাশ ছোঁয়া বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আয়-উপার্জনের সকল ক্ষেত্র আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় এসেছে। ফলে একালের আয়ব্যবস্থা সেকাল থেকে কল্লনাতিত উন্নত, সর্বাধিক বিস্তৃত, সর্বোচ্চ বিকশিত এবং তুলনাহীন সর্বাধুনিক।

ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের নীতিমালা

ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার নীতিমালাসমূহ অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. আয় ও মুনাফার সম্পর্ক

আয় ও উপার্জন যত বিকাশ লাভ করেছে, আয়ের সাথে মুনাফার সম্পর্ক ততই প্রাসঙ্গিক হয়েছে। জীবনধারণের জন্য, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য এবং জীবনধারণ উন্নতির জন্য আয় করতে হয়। প্রাচীন সময় থেকে মুনাফার বিষয়টি চলে আসলেও তখন যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল এখন তার থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ মূলধন ও শ্রম দিয়ে আয় করে মুনাফা ও লাভের জন্য। সঞ্চয়ও করে থাকে মুনাফার অংশ থেকে। কেউ বিনিয়োগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চায় না। মুনাফার (Profit) বিপরীত ক্ষতি (Loss)। তাই আয়ের সাথে মুনাফার সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রচলিত অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মুনাফা আয় করার স্বাধীনতা অনেক খোলামেলাভাবে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি তার প্রেরণাভিত্তিক ইচ্ছামত মুনাফা অর্জন করতে পারে। সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বৈধ থাকায় এখানে সুদ উন্মুক্ত এবং মানব কল্যাণ উপেক্ষিত। ফলে মুনাফাই হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, উৎপাদন কর্মকাণ্ডে যে প্রেরণা কাজ করে সেটা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রেরণা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা কার্যকর থাকে, তাই তাকে ‘ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা’ বলে। তার অপর নাম হচ্ছে বাজার অর্থনীতি (Market Economy)। এ কারণে এক্ষেত্রে মার্কেটের শক্তি

(Market Forces) অর্থাৎ যোগান ও চাহিদা দ্বারা কাজ আদায় করা হয়।^{২১} মুনাফাকেই মূলত আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে الرِّبْحُ শব্দটি মুনাফা, লাভ, আয় ইত্যাদিকে বুঝায়। আরবীতে الرِّبْحُ, الرِّبْحُ ও الرِّبْحُ শব্দত্রয় ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি, উন্নতি ও বিকাশ বুঝিয়ে থাকে।^{২২} রূপক অর্থে ক্রিয়াটি ব্যবসার সাথেই সম্পর্কিত। যেমন বলা হয়, رِبِحَتْ تِجَارَتُهُ - 'তার ব্যবসায় লাভ হয়েছে।' ^{২৩} শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনেও এসেছে। কাফিররা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে ক্রয় করেছে। তাদের এই নিকৃষ্ট ব্যবসা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ - 'তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি।' ^{২৪} আল-আযহারী (র) বলেন, رِبِحٌ فِي تِجَارَتِهِ إِذَا أَفْضَلَ فِيهَا - 'সে তার ব্যবসায় 'রিবহ' করে, যখন তাতে উদ্বৃত্ত পায়।' ^{২৫} الرِّبْحُ শব্দ থেকেই মুরাবাহা ব্যবসা বলা হয়।

আয়ের ক্ষেত্রে মুনাফার কোন নির্দিষ্ট সীমা বেধে দেয়া নেই। এটা অবস্থা ও অবস্থানভেদে নির্ধারিত হতে পারে। তবে মুনাফা নির্ধারণের শরীয়তের মূলনীতি হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে তা সহজ, দয়ামূলক ও সহানুভূতিপূর্ণ হবে। সুযোগ বুঝে অস্বাভাবিক মুনাফা ধরে ক্রেতাকে চাপে ফেলা উচিত নয়। স্থান ভেদে বাজারের যে স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল মূল্য সেটিই ধরা উচিত। পরিমিত মূল্য ধরে ক্রেতাকে সম্মতির আওতায় আনার চেষ্টা করা উচিত বিক্রেতার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।' ^{২৬}

ফাতাওয়া আল-লাজনাতে দায়িমাহ-তে বলা হয়েছে, 'ব্যবসার ক্ষেত্রে মুনাফা নির্দিষ্ট নেই; বরং তা পণ্য ও চাহিদার অবস্থা অনুসারে কম-বেশি হবে। তবে মুসলিম ব্যক্তির জন্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হওয়া সবচেয়ে ভালো; সে ব্যবসায়ী হোক আর অন্য কেউ হোক। ক্রেতার অজ্ঞতার কারণে সুবিধাবাদী আচরণ করা ঠিক হবে না। এরূপ করলে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রবঞ্চনা করা হবে। তাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অধিকার রক্ষা করতে হবে।' ^{২৭}

২. আয় ও উপার্জনে উৎসাহ

ইসলাম মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য আয় ও উপার্জনের খাত-উপখাত সবিস্তারে বর্ণনা করেছে এবং হালাল উপার্জনে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেছে। উপার্জনের জন্য শ্রম ব্যয় করাকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য উপার্জন করা ও এজন্য শ্রম দেয়াকে ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে। উপার্জন করাকে আল-কুরআনের ভাষায় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তালাশ করা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। অলসতাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বসে না থেকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে রিযিক অন্বেষণের তাকিদ বারবার দিয়েছেন। ইবাদত থেকে অবসর হলেই জমিনে নেমে পড়তে বলেছেন। তিনি বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

- 'অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।' ^{২৮}

আবু লাইছ আস-সামারকান্দী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা ব্যবসা ও উপার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে রিযিক অন্বেষণ করো। তবে এখানে আদেশের বিষয়টি রুখসত হিসেবে গণ্য।' ^{২৯} ইবন মাস'উদ আল-বাগাভী (র) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা যখন সালাত থেকে অবসর হও তখন

তোমরা জমিনে তোমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যবসা ও শ্রম ব্যয় করো এবং রিযিক অন্বেষণ করো। আর এটা বৈধ করণের আদেশ। যেমন অপর আয়াতে বর্ণিত আছে, ‘যখন তোমরা হালাল হবে, তখন তোমরা শিকার করো’ (সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ২)।^{৩৩} আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ‘তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে আহার করো। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবিত হবে।’^{৩৪} আবু হায়্যান আল-আন্দালুসী (র) বলেন, **فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا** অর্থ জমিনে শ্রম ব্যয় করাও উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।^{৩৫} ব্যবসা-বাণিজ্য হলো উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহ তা‘আলা সুস্পষ্টভাবে হালাল ঘোষণা করেছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**, ‘আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।’^{৩৬} তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।’^{৩৭}

আল্লাহর পথে জিহাদ করে জীবন উৎসর্গ করার মর্যাদা অনেক বেশি। যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করে তারা আল্লাহ তা‘আলার একান্ত প্রিয় বান্দা। সেই মর্যাদাবান বান্দাদের সাথে আরেক শ্রেণির বান্দাদের কথা আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ**, ‘আর অন্য কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করে বেড়ায়।’^{৩৮} মুফাস্সিরগণ এই শ্রেণির লোকদের পরিচয়ে বলেন, ‘তারা হলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সফরকারী, যারা রিযিক অন্বেষণের জন্য দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়ায়। আর তারা এই ভ্রমণের সময়ে রাতের তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে পারে না।’^{৩৯} ইবন কাছীর (র) বলেন, যারা **الْمُكَّاسِبِ** তথা আয়-উপার্জন ও **الْمُتَاجِرِ** তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করে।^{৪০} ইসলামে রিযিক অন্বেষণের জন্য দেশ-বিদেশে সফর করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে। সফরের সময় নফল আদায়ে সমর্থ না হলে এতে দোষের কিছু নেই।

আল-কুরআনে নবীগণের জীবনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়েছে। নবীগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রম ব্যয় করতেন। কেউ ছাগল চড়িয়েছেন। কেউ ফসল উৎপাদন করেছেন। কেউ নিজ হাতে নৌকা তৈরী করেছেন। কেউ কামারের কাজ করেছেন। আবার কেউ মিস্ত্রির কাজ করেছেন। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা) নিজেও ছাগল চড়িয়েছেন। অন্যান্য নবীগণও ছাগল চড়িয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمَ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْفَرَارِيطِ.

-‘আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চড়াননি। সাহাবীগণ তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও? তিনি বললেন, আমিও। কয়েক কীরাতের বিনিময়ে আমি মক্কাবাসীদের ছাগল চড়িয়েছি।’^{৪১}

নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার দৃষ্টান্ত নবীগণ নিজে করে দেখিয়েছেন। রাসূল (সা) উপার্জনের জন্য খাদীজা (রা)-এর সাথে ব্যবসা করতেন। দেশ-দেশান্তরে সফর করতেন। ঘাম ঝড়িয়ে শ্রম দিতেন। কেননা ইসলামে সর্বোত্তম উপার্জন হলো নিজ হাতে উপার্জন করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

-‘নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।’^{৮৬}

শ্রম দিয়ে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অপরের কাছে চেয়ে খায় এমন ব্যক্তি থেকে অনেক উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) তিন তিনবার আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাঁকে প্রতিবারই দান করলেন। শেষবারে তিনি বললেন, হে হাকিম! এই মাল তরতাজা মিষ্টি (ফলের মতো)। সুতরাং যে তা নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বরকত দান করা হবে। পক্ষান্তরে যে মনে লোভ রেখে তা গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বরকত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মতো, যে খাবে অথচ তৃপ্ত হবে না। আর উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। এই কথার পর হাকিম কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি এরপর আর কারো কাছে কিছু চাইবেন না। বাস্তবেও করেছিলেন তাই, এমনকি তিনি দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।^{৮৭}

ইসলাম পরমুখাপেক্ষী হওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে এবং শ্রমের মাধ্যমে নিজের জীবিকা উপার্জন করাকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, কতিপয় আনসারী সাহাবী রাসূল (সা)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে যাঞ্ছা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী হয় না, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের তুলনায় উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেয়া হয়নি।^{৮৮}

ইমাম বুখারী (র) ‘الْإِسْتِغْفَارُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ’ শিরোনামে অধ্যায় তৈরী করেছেন। এই অধ্যায়ের অধীনে হাদীসগুলো শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যুবায়র ইব্নুল ‘আওয়াম (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করে। ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাঞ্ছা করার অপমান থেকে) রক্ষা করেন। তা মানুষের কাছে সাওয়াল করার চাইতে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।’^{৮৯}

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাহাবীগণের অনেক ঘটনায় যেমন কাজের নির্দেশনা ও উৎসাহ রয়েছে, তেমনি অন্যের কাছে চাওয়া, অন্যের উপর নির্ভর করা এবং বেকার থাকার ব্যাপারে তিরস্কার করা হয়েছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, ‘এক আনসারী ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল, হ্যাঁ একটি মাত্র কন্ডল আছে, যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকি অর্ধেক বিছিয়ে শয়ন করি। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বললেন, উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়ে আস। রাবী বলেন, সে তা আনয়ন করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা স্বহস্তে ধারণ পূর্বক (নিলামের ডাকের মতো) বললেন, কে এই দুটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলল, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। অতঃপর তিনি বললেন, এক দিরহামের অধিক কে দিবে? তিনি দুই বা তিনবার এরূপ উচ্চারণ করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করব। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে দুটি দিরহাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনদের দাও; আর বাকি এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট আস। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বহস্তে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন, এখন তুমি যাও এবং জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি। অতঃপর সে চলে গেল এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকল। তারপর সে

(পনের দিন পর) আসল। সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম, যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং খাদ্য ক্রয় করল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হতো। ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেণির ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য হালাল নয়। (১) ধূলা-মলিন নিঃশ্ব ভিক্ষকের জন্য, (২) প্রচণ্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং (৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন, এ ধরনের ব্যক্তির যাঞ্ছা করতে পারে।^{৪৩}

রাফি ইবন খিদাজ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, **الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أطيب** - 'সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হলো, যা মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং যা সদুপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়।'^{৪৪} সুতরাং ইসলাম নিজ শ্রমে আয় ও উপার্জন করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

৩. আয়-উপার্জন ও তাওয়াক্কুল

শ্রম দিয়ে আয়-উপার্জন করা, জীবিকা নির্বাহে সময় ব্যয় করা, রিযিক অন্বেষণে ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া ইসলামে অনুমোদিত বিষয়। ইসলাম শুধু উপার্জনকে বৈধতাই দেয়নি; বরং নিজ হাতে উপার্জন করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। নবীগণ নিজ হাতে উপার্জন করে তাঁদের উম্মতকে শ্রমের মর্যাদা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল-কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত শেষান্তে জমিনে নেমে পড়তে বলেছেন ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনে। তাই আয়-উপার্জন তাওয়াক্কুলের বিপরীতে যায় না; যেখানে নবীগণ তাদের মূল্যবান মিশন বাস্তবায়নের মাঝেও নিজের উপার্জন নিজেই করেছেন। নবীগণের তাওয়াক্কুল পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষের তাওয়াক্কুল থেকে উচ্চতর। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগত ও বিশেষভাবে নির্বাচিত বান্দা। তাঁরা কর্ম করা ও ঘাম ঝরিয়ে শ্রম দেয়ার মাধ্যমে তাওয়াক্কুল বিরোধী কিছু করেননি। কেননা আল্লাহর নির্দেশমত বৈধভাবে রিযিক অন্বেষণে ঘাম ঝরানো, ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়াও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

এক শ্রেণির সন্ন্যাসব্রত পালনকারী, আধ্যাত্মবাদী মূর্খ ব্যক্তির উপার্জনের জন্য শ্রম দেয়াকে তাওয়াক্কুলের বিপরীত কর্ম বলেছেন। তারা কর্ম করাকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন। তাদের কথা হলো, 'আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করার জন্য নয়। জমিনে বান্দা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা অগণিত আয়াতে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার আদেশ দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর আকাশেই তোমাদের রিযিক রয়েছে।'^{৪৫} এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, জান্নাতের বিনিময়ে।^{৪৬} তারা মানুষকে পাখির মত কোন কাজ-কর্ম ছাড়াই খালি পেটে বেড়িয়ে পড়তে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে পেট পূর্ণ করে ফিরিয়ে দিবেন। এই শ্রেণির লোকেরা কিছু আয়াত ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করে বিভ্রান্ত হয়েছেন। তারা কাজ-কর্ম ও আয়-উপার্জন সংক্রান্ত আয়াত-হাদীসকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের মন মত ব্যাখ্যা তৈরী করেছেন। তারা নবী করীম (সা)-এর ছাগল চড়ানো, ব্যবসা পরিচালনা, তাঁর সাহাবীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশাল ইতিহাসকে উপেক্ষা করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শ্রম ও উপার্জন বিরোধী এমন মত গ্রহণ করেছেন; যা ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত, অবাস্তব ও বিভ্রান্তিপূর্ণ মত।

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রিযিকদাতা (**الرَّزَاقُ**)। তাই বলে বান্দাকে তিনি অলস অকর্মণ্য হয়ে বসে বসে ইবাদত করতে বলেননি। তিনি বান্দাদের জন্য পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিধি-বিধান দিয়েছেন। সেই বিধানের অনুগত হয়ে তার ইবাদত করার মাঝেই সর্বাধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসব্রত পালন করে নয়। তিনি বলেছেন, 'বান্দার জন্য তাই

রয়েছে যা সে চেষ্টা করে।^{৪৭} তাই তিনি প্রচেষ্টাকারী বান্দাকে তাঁর ইচ্ছামত রিযিক দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা (الْخَالِقُ)। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তিনি বাবা-মায়ের মিলন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি শিশুর জন্মের বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় মানুষের সৃষ্টি হওয়া স্রষ্টার ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। কারণ তিনিই এ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়-উপার্জন মুমিনের জন্য তাওয়াক্কুলের বিরুদ্ধে যায় না, যদি তা শরীয়তের নির্দেশ মেনে হয়ে থাকে। তবে অবিশ্বাসীদের বিষয়টি ভিন্ন। তারা দুনিয়াবী উপায়-উপকরণকেই একমাত্র রিযিকের উৎস মনে করে। বস্তুবাদ ও ভোগবাদ তাদেরকে সৃষ্টির পূজায় অন্ধ করে রাখে। ফলে তারা সেই সৃষ্টির স্রষ্টার প্রতি নির্ভরতাকে অস্বীকার করে থাকে।^{৪৮}

৪. আয় বা উপার্জনে হালাল-হারামের ধারণা

মানবজাতি সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গঠনগতভাবেও মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চ সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্টিকে মানবজাতির অনুগত করে দিয়েছেন। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো তিনি তাদের জন্য তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে পবিত্র ও উত্তম জিনিসগুলোকে হালাল আর নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর জিনিসগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এই হালাল-হারামের ব্যবস্থা প্রাণীকুলের জন্য নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'^{৪৯} অত্র আয়াতে উত্তম ও পবিত্র জীবনোপকরণ হলো হালাল বিষয়সমূহ; যে খাদ্য-পানীয় উপকারী ও স্বাদে অনন্য।^{৫০} জামালুদ্দীন ইবনল জাওয়াযী (র) বলেন, 'এখানে الطَّيِّبَاتِ দ্বারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য। এক. হালাল, দুই. স্বাদে উৎকৃষ্ট।'^{৫১}

দয়াময় আল্লাহ বান্দাদের উপর অনুগ্রহশীল হওয়ার কারণে উপকারী ও হালাল বিষয়গুলো গ্রহণের আদেশ দেয়ার মাধ্যমে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে বান্দাদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তিনি হালালকে সম্ভবসমূহে গ্রহণ করা ও হারামকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করাকে অত্যাৱশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তাই হালাল, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যে বিষয়ে নিশ্চয় থেকেছেন সেগুলো অনুগ্রহ স্বরূপ। অতএব আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে বরণ করে নেয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু ভুলে যান না।^{৫২} আল্লাহ তা'আলার এই হালাল-হারামের সীমারেখাগুলোকে আল-কুরআনের ভাষায় 'হুদুদুল্লাহ' বলা হয়; যা অতিক্রম করা পাপের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে 'হুরমাত'ও বলা হয়; যা লঙ্ঘনের মাধ্যমে শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا - 'এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না।'^{৫৩} অপর আয়াতে তিনি বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ - 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হলো এবং তাঁর সীমারেখাগুলোকে লঙ্ঘন করল, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে স্থায়ী থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।'^{৫৪} রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.

- 'আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা তোমাদের আদেশ করেছি, তা থেকে যা সম্ভব তা পালন করো। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে তাদের প্রশ্নের আধিক্য এবং নিজ নবীদের সাথে বিরোধের কারণে।'^{৫৫}

নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত (সরকারি) চারণভূমির আশপাশে পশু চরায়, আশঙ্কা রয়েছে সে পশু তার অভ্যন্তরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো 'কালব' বা হৃদয়।'৫৬

এই হালাল-হারাম নির্ধারণের একমাত্র ক্ষমতা কেবল আল্লাহ তা'আলার। তিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সকল সৃষ্টির ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের খবর রাখেন। কোন ব্যক্তির পক্ষে হালাল-হারামের বিধান দেয়া সম্ভব নয়। হালাল-হারামের বিধান দেয়ার অর্থই হলো আল্লাহ তা'আলার উপর অপবাদ আরোপ করা। তিনি বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنْتُكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلَحُونَ.

'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।'৫৭ তিনি আরো বলেন,

أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلِ اللَّهُ أُزِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

- 'আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ তো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ?'৫৮

জাহিলী যুগের লোকেরা কতিপয় বস্তু খেত এবং কতিপয় বস্তুকে খারাপ মনে করে পরিহার করত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করেন, আর তাঁর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম নির্ধারণ করে দেন। ফলে তিনি যা হালাল করেন তা হালাল এবং যা হারাম করেন তা হারাম হিসেবে সাব্যস্ত। আর তিনি যে সম্পর্কে চুপ থাকেন, তা ক্ষমার যোগ্য। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, ৫৯

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَلْهِ لِيغَيِّرَ اللَّهُ بِهٖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

- 'আপনি বলুন! আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে; তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে, সেটা আলাদা বিষয়। নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'৬০

অর্থনীতিতেও হালাল ও হারামের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, চুরি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ইত্যাদি ইসলামে স্পষ্টভাবে হারাম। হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য

খুবই মন্দ ফল বয়ে আনে। বস্তুবাদী অর্থব্যবস্থায় হালাল-হারামের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল-হারাম মেনে বিশুদ্ধ উপার্জন আবশ্যকীয় একটি বিষয়। হারাম উপার্জনের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। তাই উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমারেখা জানা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. বৈধ আয়ের গুরুত্ব

বৈধ আয় ব্যতীত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ হতে পারে না। ইসলাম আয়ের বৈধ ক্ষেত্রসমূহকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। বৈধ উপার্জনই হলো সম্মানজনক রিযিক। শরীয়ত সম্মত বৈধ পথে উপার্জন উপার্জনকারীর সম্মান বৃদ্ধি করে, দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে নিরাপদ করে, আমলকে গ্রহণযোগ্য করে, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখে, রিযিকে বরকত নিয়ে আসে, হৃদয়কে আলোকিত ও প্রশস্ত করে, অন্তরের প্রশান্তি বাড়িয়ে দেয়, বান্দাকে আল্লাহর অনুগত করে দেয়, দু'আ কবুলের পথকে প্রশস্ত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত কল্যাণ নিয়ে আসে। অন্যদিকে হারাম উপার্জন জীবনকে সংকীর্ণ করে দেয়, হৃদয়ে পচন ধরায় ও সকল ইবাদতকে বিনষ্ট করে দেয়। হারাম উপার্জনকারীর কোন দান-সাদাকাহ ও ভালো কর্ম আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয় না। সা'দ (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

يَا سَعْدُ! أَطْبَبُ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْفِظُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

-‘হে সা'দ! তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল করো তাহলে তোমার দু'আ কবুল করা হবে। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! বান্দা তার পেটে এক লোকমা হারাম খাদ্য দিলে তার চল্লিশ দিনের আমল কবুল করা হবে না।’^৬

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন তিনি রাসূলগণকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সৎকর্ম করো, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত’ (সূরাহ আল-মুনীন, ২৩ : ৫১)। তিনি আরো বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার করো’ (সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৭২)। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে, যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধূসরিত সে আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তাঁর শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তাঁর দু'আ কীভাবে কবুল করা হবে?’^৭

আবু বকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام -‘হারাম দিয়ে লালিত-পালিত হয়েছে এমন শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’^৮

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে হালাল খাদ্য গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। হারাম খাওয়ার মাধ্যমে এ আদেশ লঙ্ঘন করা কবীর গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। জমিনে হারামের তুলনায় হালালের সংখ্যা অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

-‘হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।’^৯

হালাল ও উত্তম রিযিক গ্রহণের আদেশ দিয়ে তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার করো, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই গোলামী করে থাক।’^{৫৫}

আল্লাহ তা‘আলা হালাল ও পবিত্র জিনিস থেকে দান করার আদেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ

-‘হে মুমিনগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো। আর এমন নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয়ের ইচ্ছা করো না; যা তোমরা নিজেরাই কখনও গ্রহণ করবে না।’^{৫৬} ইবন মাস‘উদ (রা) বলেন, ‘উৎকৃষ্ট বস্তু হলো হালালগুলো আর উপার্জন হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। এখানে উপার্জনের বৈধতা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি এটাও প্রমাণিত হয় যে, উপার্জন উৎকৃষ্ট (طَيِّب) ও নিকৃষ্ট (خَبِيث) এ দুভাগে বিভক্ত।’^{৫৭}

ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের উৎসসমূহ

ইসলামী অর্থনীতি একটি কার্যকরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় আয়ের উৎসসমূহ অত্যন্ত বিস্তৃত হলেও অবৈধ কোন উৎস থেকে আয়ের ব্যবস্থা এ অর্থব্যবস্থায় অনুপস্থিত। এজন্য ইসলামী অর্থনীতিতে কেবল সে সকল উৎসকে বৈধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে সকল উৎস থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ উপকৃত হতে পারে। নিম্নে ইসলামী অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. কৃষি

মানব সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যতম প্রধান উৎস হলো কৃষি। পৃথিবীতে মানুষ আগমনের সূচনা থেকেই কৃষির উৎপত্তি হয়েছে। প্রথম মানব আদম (আ) যখন জান্নাত থেকে জমিনে নেমে আসেন, তখন তিনি কৃষির মাধ্যমেই জীবন পরিচালনা করা শুরু করেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষির গুরুত্ব অব্যাহত রয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কোন কালেই কৃষি ব্যবস্থা মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। বর্তমান সময়ে মানুষের পাশাপাশি অধিকাংশ রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হলো কৃষি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ রয়েছে, যেখানে কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। বর্তমান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো, যেমন- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা প্রভৃতি দেশও নিঃসন্দেহে এক সময় কৃষি নির্ভর দেশ হিসেবে বহুল পরিচিত ছিল। কৃষি কর্মকাণ্ডের উন্নতির ফলশ্রুতিতে তারা আজ শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

সাধারণ অর্থে কৃষি (Agriculture) হলো ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। উদ্যান পালন (Horticulture), পশুপালন (Livestock), সামুদ্রিক শিকার (Marine resources), মৎস্য শিকার (Fishing) ইত্যাদি সবগুলোই কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।^{৫৮} অধ্যাপক জিমারম্যানের (মৃ. ১৯৫১ খ্রি.) মতে, কৃষিকাজ মানুষের এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও একটি উৎপাদনমুখী কাজ। প্রকৃতির আপন নিয়মে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের যে জন্ম ও বৃদ্ধি, স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষ যখন তার সুযোগ নিয়ে নিজের প্রয়োজন মোটাতে সক্ষম হয়, সেই আহরণধর্মী, ভূমিকেন্দ্রিক ও উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডকে কৃষি, চাষ বা

আবাদ বলে। পশুপালন, উদ্ভিদের রক্ষণাবেক্ষণ, বনসৃজন, জলসেচ, মৎস্য প্রতিপালন, পশম উৎপাদন, এমনকি জলে সার মিশ্রিত করে মৃত্তিকাবিহীন চাষ বা হাইড্রোপনিক্স (Hydroponics) কৃষির অন্তর্গত। ওয়াটসন (মৃ. ১৯৫০ খ্রি.) মনে করেন যে, শুধু মৃত্তিকার উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যেই কৃষিকাজ সীমাবদ্ধ নয়। কৃষির বৃহত্তর সীমার মধ্যে শস্য উৎপাদন এবং পশুচারণও অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও (FAO)-এর মতে, মৎস্য ও বনজসম্পদ আহরণও কৃষিকাজের অন্তর্গত।^{৯০}

মূলকথা হলো আকাশ-জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ উভয়ের মাঝে বিদ্যমান জড় ও জীব সকল কিছুর নিয়ন্তা। জগতের সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একমাত্র তাঁর অনুগত; কেবল মানুষ ছাড়া। কেননা মানুষকে তিনি ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। সকল জীবের জন্ম-মৃত্যু তাঁর আদেশেই সংঘটিত হয়। মানুষের কল্যাণের জন্য জমিনের উপরের সকল সৃষ্টিকে তিনি নিজ হাতে সাজিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি অবতীর্ণ করেছেন, তা দিয়ে মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তন এবং মেঘমালা, যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে। নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।'^{৯০}

মূলত কৃষক কৃষিকাজের প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করার মাধ্যমে জমিনে বীজ বপন ও রোপন করেন। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই সেই বীজকে উদগত করে শাখা-প্রশাখায় রূপ দেন। তাই কৃষি ব্যবস্থাপনার মূলে রয়েছেন দয়াময় আল্লাহ। তিনি বলেন,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.

-‘তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা হয়ে যাবে বিস্ময়াবিষ্ট।’^{৯১}

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

-‘যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।’^{৯২}

২. ব্যবসা বাণিজ্য

ইসলামে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানব সমাজের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উৎস হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে উত্তম রিযিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষের সর্বোত্তম আয়ের উৎস বা পেশা কোনটি? এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের অনেকেই কৃষি, আবার অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্যবসা হলো লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদের পরিবর্তন ও রূপান্তর।^{৯৩} ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (র) বলেন, **التَّجَارَةُ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلِبًا لِلرِّبْحِ** -‘লাভের আশায় মূলধনকে বিনিয়োগ ও ব্যবহার করা।’^{৯৪} আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহতে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু বিবরণ এসেছে। হাদীস গ্রন্থসমূহে ব্যবসা সম্পর্কিত অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যবসার বিধি-বিধান ও শ্রেণি-বিন্যাস সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আল-কুরআনে ব্যবসাকে বুঝাতে **التَّجَارَةُ** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্পত্তিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।’^{৭৫}

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের বহু বর্ণনা হাদীসে এসেছে। ইবন ‘উমার (রা) বলেন, আমরা এক সফরে নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমি আমার পিতা ‘উমার (রা)-এর একটি আবাত জওয়ান উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। ‘উমার (রা) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী করীম (সা) ‘উমার (রা)-কে বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আপনারই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি করো। তখন তিনি সেটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বিক্রি করে দিলেন। নবী করীম (সা) বললেন, হে ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা ইচ্ছা তা করো।^{৭৬}

সততা ও দয়াদ্রুতার সাথে ব্যবসা করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ, যা পরকালীন মুক্তির কারণ হয়ে যায়। আবু হুযায়ফা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির কাছে মালাকুল মাউত রুহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ার জীবনে তুমি কোন বিশেষ নেক আমল করেছ কি? সে বলল, আমার স্মরণ নেই, তবে একটি আমলের কথা স্মরণ হচ্ছে; আর তা হলো দুনিয়ার জীবনে আমি লোকদের সাথে ব্যবসা করতাম। ব্যবসা ক্ষেত্রে আমি লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতাম। আমার খাতক ধনী হলে আমি তাকে সময় দান করতাম। আর খাতক গরীব হলে আমি আমার প্রাপ্য মারফ করে দিতাম। ঐ আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাত দান করেছেন।^{৭৭} রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة

-‘বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।’^{৭৮}

৩. খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ ইসলামী অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস। আল্লাহ তা‘আলা আকাশ থেকে বান্দাদের যেমন রিযিক দিয়ে থাকেন, অনুরূপভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকেও রিযিক দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহর আরেকটি বিশেষ নিয়ামত হলো খনিজ সম্পদ; যা দিয়ে বান্দাদের রিযিক দিয়ে থাকেন। খনিজ পদার্থ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রতুল সম্পদ। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সব দেশ ব্যাপকভাবে খনিজ সম্পদ আহরণ করছে। এই খনিজ সম্পদের অবস্থান হলো জমিনের নিচে। খনন বলতে সাধারণভাবে ভূ-ত্বক থেকে ব্যবহারিক গুণাগুণসম্পন্ন খনিজ পদার্থ আহরণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। ভূ-গর্ভস্থ খনি ও ভূ-পৃষ্ঠে উন্মুক্ত খনি, দুই স্থানের খনন প্রক্রিয়াকে বুঝাতে পারে। আল-কুরআনে খনিজ সম্পদের উৎস, এর উৎপাদন এবং এর উত্তোলনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ সম্পর্কে বহু তথ্য বিবৃত হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) লোহা দিয়ে বর্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করতেন। আল্লাহ তা‘আলা নিজেই এ শিল্প তাঁকে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخَصِّنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ.

-‘আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?’^{৭৯} এখানে لَبُوس বলতে এমন সব কিছুকে বুঝানো হয়েছে, যা পরিধান করা হয় এবং অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। দাউদ (আ) হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বর্ম ও পোষাক সেলাইয়ের সূচনা করেন।^{৮০} অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِىِّيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ.

-‘আর আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পাখিরা! তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করেছিলাম।’^{৮৬}

পৃথিবী টিকে থাকার জন্য এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে খনিজ পদার্থ লোহার রয়েছে বিশাল ভূমিকা। লোহাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি, যা থেকে মানবজাতি উপকৃত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

-‘আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।’^{৮৭} সম্রাট যুলকারনায়ন লোহার ব্যবহার করেছিলেন, যখন এক সম্প্রদায় তাঁর নিকট ইয়া‘জুজ ও মা‘জুজের আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা কামনা করেছিল। সেই জাতির আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরী করে দেন। তার বক্তব্য আল-কুরআনে এভাবে এসেছে,

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا.

-‘তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন করো।’ অতঃপর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তপ দুই পর্বতের সমান হলো, তখন সে বলল, ‘তোমরা হাফরে দম দিতে থাকো।’ পরিশেষে যখন ওটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করল, তখন সে বলল, ‘তোমরা গলিত তামা আনয়ন করো, আমি ওটা ওর উপর ঢেলে দিই।’^{৮৮}

মানুষেরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতনামা যথাযথ মেনে চলত এবং তাঁর কাছে সঠিকভাবে আত্মসমর্পণ করত তাহলে তিনি জমিনের নিচের মূল্যবান সম্পদকে অতি সহজে অব্যাহত করে দিতেন। তিনি খনিজ সম্পদের অবস্থান সম্পর্কে আল-কুরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ.

-‘আর তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত।’^{৮৯} কেউ কেউ বলেন, وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ দ্বারা খনিজ সম্পদ উদ্দেশ্য।

৪. কাজ ও শ্রম

জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করা ও শ্রম ব্যয় করার বিকল্প নেই। মানুষ উপার্জন করার জন্য যে পেশাই গ্রহণ করুক না কেন, তাকে শ্রম ব্যয় করতে হয়। শ্রম ব্যয়ের আরেকটি ক্ষেত্র হলো শ্রমিক হিসেবে শ্রম দেয়া, মজুরীর বিনিময়ে কাজ করা। আয় উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এটি। ইসলাম মজুরী ভিত্তিক কর্মের অনুমোদন দিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালাও বলে দিয়েছে। প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে তার সকল উন্নতি-অবনতি। পরকালের মুক্তির জন্যও চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। মানুষ তা-ই পায়, যা সে চেষ্টা করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ.

-‘আর মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে, তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।’^{৯০} অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ -‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।’^{৯১} তিনি আরো বলেন, ‘আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলিমরাও। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা তোমরা করতে।’^{৯২}

নিজের জন্য, সন্তান, পরিবার ও বাবা-মায়ের জন্য কাজ করে উপার্জন করা আল্লাহর জন্য ইবাদতের মতই মর্যাদাপূর্ণ। কতিপয় সাহাবী এক যুবককে তার কাজে অত্যন্ত পরিশ্রমী দেখে মন্তব্য করেন, যদি সে আল্লাহর রাস্তায় এমন পরিশ্রম করত! তাদের প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) বলেন, ‘তোমরা এমনটা বলো না। কেননা সে যদি তার ছোট সন্তানদের জন্য শ্রম দিতে বের হয়, সেটাও আল্লাহর পথে গণ্য হবে। আর সে যদি বড় ও বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য শ্রম দিতে বের হয়, সেটাও আল্লাহর পথে। আর সে যদি লোক দেখাতে ও গর্ব করতে বের হয়, তবে সে শয়তানের পথে বের হয়।’^{৮৮}

শ্রমিকদের প্রতি ইসলাম সর্বোচ্চ সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, **أَعْطُوا عِرْفَهُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ** - ‘শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দাও।’^{৮৯}

মূসা (আ)-এর শ্রমিক হিসেবে কাজ করার ঘটনা আল-কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, ‘যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। আর তাদের পশ্চাতে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন, তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালেরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা (আ) তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। তারপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি আমাদেরকে যে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, বাবা আপনি তাকে সেবক নিযুক্ত করুন। কেননা আপনার সেবক হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহে তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হলো। দুটি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোনো একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহর উপর ভরসা।’^{৯০}

৫. শিল্পকর্ম ও কারিগরি দক্ষতা

শিল্পকর্ম, উৎপাদন, হস্তশিল্প, কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি আয়-উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কর্মের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণও এ জাতীয় বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। আল-কুরআনে নূহ (আ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, ‘আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।’^{৯১} সুলায়মান (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘আর আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক বর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আন্বাদন করাব।’^{৯২}

হযরত দাউদ (আ) ছিলেন একজন দক্ষ কর্মকার। বিশেষ করে শত্রুকে মোকাবিলার জন্য উন্নত মানের বর্ম নির্মাণে তিনি ছিলেন একজন কুশলী কারিগর। যা বিক্রি করে তিনি সাংসারিক ব্যয় যাত্রা নির্বাহ করতেন।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছুই নিতেন না। যদিও সেটা নেওয়া কোন দোষের ছিল না। এখানে লোহাকে বাস্তবে মোমের মত নরম করার প্রকাশ্য অর্থ নিলে সেটা হবে তাঁর জন্য মু'জিয়া স্বরূপ, যা মোটেই অসম্ভব নয়। অবশ্য নরম করে দেওয়ার অর্থ লোহাকে সহজে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া ও উন্নতমানের নির্মাণ কৌশল শিক্ষাদানও হতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?'^{৯৩}

হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, 'আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পক্ষী সকল! তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। এবং তাকে আমি বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি।'^{৯৪}

৬. গনীমত

গনীমতের সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ও ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে ইসলাম বিশেষ প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে। গনীমতের মাল হচ্ছে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ, যা বিজয়ী দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়া হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝানোর জন্য **النَّفْل** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; যার অর্থ হলো অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল সালাত, রোযা, সাদাকাহ প্রভৃতিকে এ কারণেই নফল বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। শব্দটির বহুবচন হলো **الأنفال**; যে নামে আল-কুরআনে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আল-কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- (১) আনফাল (**الأنفال**), (২) গনীমত (**الغنيمة**) এবং (৩) ফায় (**الفِيء**)। আল্লাহ তা'আলা গনীমত ভোগ করার বৈধতা দিয়ে বলেন, 'আর তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।'^{৯৫}

বদরের যুদ্ধে গনীমতের সম্পদ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্যের সূচনা হয়। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে কাফিররা পালিয়ে গেলে তাদের বহু জিনিসপত্র গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং বন্দি হয় অনেক কাফির। সাহাবীগণ সে সময় তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সাহাবী সা'দ ইব্ন মা'আয (রা) সহ কেউ কেউ নবী করীম (সা)-এর তাঁবুর চারদিকে পাহারায় ছিলেন। 'আলী (রা) সহ কেউ কেউ কাফির নিধনে মশগুল ছিলেন। আর কেউ কেউ গনীমতের মাল জমা করতে ব্যস্ত ছিলেন। একদল মুজাহিদ মনে করেন যে, তারা যুদ্ধ করাতেই জয় এসেছে বলে গনীমতের পুরো মাল তাদেরই প্রাপ্য। আবার যারা গনীমত সংগ্রহ করছিলেন তারাও একই ধারণা করছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে যে, 'এইসব মাল বা গনীমত কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।' তাই তাঁরা যাকে যতটা যোগ্য মনে করেন তাকে ঠিক ততটাই গনীমতের অংশ দেবেন। আল্লাহ তা'আলা গনীমতের সম্পদের হুকুম সম্পর্কে বলেন, 'তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হলো আল্লাহর এবং রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করো, যদি ঈমানদার হয়ে থাক।'^{৯৬}

যুদ্ধে অর্জিত গণীমতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ মুজাহিদদের প্রাপ্য এবং এটা তাদের কষ্ট ও পরিশ্রমের আংশিক প্রতিদান। বাকি এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে ‘খুমুস’; যার ব্যবহারের খাতগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট করে বলেন, ‘আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গণীমত হিসাবে লাভ করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।’^{৯৭}

ফায় (الْفَيْءُ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিভ্রাটীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।’^{৯৮}

৭. ইকতা ও ইজারাহ

আল-ইকতা (الإِقْطَاع) ও আল-ইজারাহ (الإِجَارَةُ) ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও জীবিকা নির্বাহের উৎস হিসেবে বিবেচিত। ইকতা হলো, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি তার সেবার বিনিময়ে অথবা তার উপকার সাধনের জন্য রাজস্ব সুবিধা দেয়া।^{৯৯} ইকতা বা ভূমি বন্দোবস্ত অঞ্চলে রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি ছিল ফার্মিং ও জরিপ ব্যবস্থার মিশ্রণ। এ ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়কারী ও মুকাদ্দমগণ ইকতা দারের এবং কৃষকদের থেকে বর্ধিত হয়ে খাজনা আদায় করতেন। বাংলায় তুর্কি শাসনের প্রথমদিকে ব্যক্তি বিশেষকে ইকতা দেওয়া হতো। সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক এই ব্যবস্থা চালু রাখেন এবং ইকতা মঞ্জুর করেন। তিনি ভূমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি বাতিল করে ফসলের অংশে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা চালু করেন। এটি মুঘল আমলের ‘জায়গির’-এর সমার্থক। ইকতা দেয়ার ব্যবস্থা এবং দিল্লি ও বাংলার প্রাথমিক সুলতানি আমলে প্রদেশসমূহে ইকতা শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কারণ নদীয়া বিজিত হওয়ার পর বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলার মুসলিম রাজ্যকে কয়েকটি প্রশাসনিক অংশে বিভক্ত করেন। এর প্রত্যেকটি অংশকে বলা হতো ইকতা। ইকতার শাসনকর্তাকে বলা হতো মুকতি। দিল্লি এবং বাংলায় সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন নতুন বিজিত অঞ্চল যথার্থ নিয়ন্ত্রণে আনার সহজ পন্থা ছিল এগুলোকে ইকতায় বিভক্ত করা। ইকতা গ্রহণকারীকে বলা হতো ইকতা দার বা আকতাদার। তিনি এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব পালন করতেন।^{১০০}

আর ইজারা হলো এমন বিনিময়মূলক চুক্তি, যা মুনাফা লাভের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ইজারার বিষয়টি আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মুসা (আ) শু‘আয়ব (আ)-এর সাথে ইজারা চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে- ‘বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, বাবা! আপনি তাকে সেবক নিযুক্ত করুন। কেননা আপনার সেবক হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা মুসাকে বললেন, ‘আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা।’^{১০১} রাসূলুল্লাহ (সা) ইজারার মজুরী প্রসঙ্গে বলেন, ‘শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দাও।’^{১০২}

৮. শিকার

শিকার মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন পেশা। জীবিকা নির্বাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো শিকার। জীবিত কোন পশু-পাখি ধরা কিংবা হত্যা করার লক্ষ্যে অনুসরণ করার উপযোগী কলাকৌশল হলো শিকার। মানুষ তার নিজের ও পরিবারের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বিনোদন কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করার

লক্ষ্যেই সাধারণত বন্যপ্রাণী শিকার করতে শুরু করে। এছাড়া পশু-পাখিও নিজেদের জীবন ধারণের জন্যে তার আহার উপযোগী অন্যান্য প্রাণী শিকার করে থাকে। শিকারের জন্যে নির্দিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র কিংবা সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন পড়ে। যিনি বন্য পশু-পাখি শিকার করেন তিনি শিকারী নামে পরিচিত হয়ে থাকেন। ইসলাম শিকারকে বৈধ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশেষ করে হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের ইহরামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার, যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক।'¹⁰⁷

শিকারের সময় আল্লাহকে ভয় করা শিকারীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে, যাতে আল্লাহ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে? অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'¹⁰⁸

কোন প্রাণীর মাধ্যমেও শিকার করানো বৈধ; যেমন- প্রশিক্ষিত কুকুর। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কী বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু, যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।'¹⁰⁹ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না।'¹¹⁰ প্রাণী খাওয়া অবৈধতার নীতিমালা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কুষ্ঠ রোগে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ তা ব্যতীত। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়, এসব গোনাহের কাজ।'¹¹¹

'আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে তীরের ফলকের আঘাতের দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তীরের ধারালো অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি অকীয- (অর্থাৎ খেতলিয়ে যাওয়া মৃতের অন্তর্ভুক্ত)। আমি তাকে কুকুরের দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা কুকুরের ঘায়েল করা যবাহের হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশঙ্কা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার পাকড়াও করেছে এবং হত্যা করেছে, তাহলে তা খেও না। কেননা তুমি তো কেবল নিজের কুকুর ছাড়া কালে বিসমিল্লাহ বলেছ। অন্যের কুকুরের ক্ষেত্রে তা বলনি।'¹¹²

৯. উত্তরাধিকারের সম্পদ

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ জীবিকা নির্বাহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টিত হবে। প্রথমে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, আল্লাহর ঋণ তথা যাকাতও এ খাত থেকে আদায় করতে হবে। ঋণ আদায়ের পর মৃত ব্যক্তির বৈধ অসিয়ত অনুযায়ী

তা আদায় করতে হবে। এই তিন খাতে ব্যয় করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তার জীবিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। কে কত অংশ পাবে? এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিস্তারিত বলেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা-পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী? তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের এক ভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নেই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'১০৯

ইসলাম আসার পর্বে একটি যুলুম ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা হতো। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হতো, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হতো। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

-‘পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।’১১০

১০. দান ও সাদাকাহ্

দান ও সাদাকাহ্ ইসলামী অর্থনীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিভবানদের পক্ষ থেকে দুর্বলদের প্রতি যে অর্থ-সম্পদ দেয়া হয় তা দানের অন্তর্ভুক্ত। অভাবীদের প্রতি দান-সাদাকাহ্ আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে আসে, বিপদাপদ দূর করে, হৃদয়কে আলোকিত করে, অন্তরে প্রশান্তি নিয়ে আসে এবং পরকালে মুক্তির পথ সুগম করে। কিয়ামতের দিন এমন এক শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে, যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদাকাহ্ করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জনতে পারে না।^{১১১} প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! দাতাকে তার

দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।’^{১১২} সাদাকাহ্ গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।^{১১৩} রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ‘দান করলে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন।’^{১১৪} তিনি আরো বলেন, ‘কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ হতে দান করলে, বস্ত্রত আল্লাহ হালাল ছাড়া গ্রহণ করেন না। রহমান তা ডান হস্তে গ্রহণ করবেন। যদি তা একটি খেজুরও হয়, তবে তা রহমান আল্লাহর হাতে লালিত হবে। ফলে তা পাহাড়ের চাইতেও বড় হবে। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবককে পালন কর।’ অন্যের জন্য দান করা মূলত নিজেরই কল্যাণ সাধন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো। শুন, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো; এটা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।’^{১১৫}

১১. যাকাত

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত জীবিকা নির্বাহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং রাষ্ট্রের অন্যতম বড় আয়ের ক্ষেত্র। যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তির একটি। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হলো সালাত ও যাকাত। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে সালাত ও যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ সাওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে, গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করাকে যাকাত বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

‘আর তোমরা সালাত আদায় করো এবং যাকাত প্রদান করো। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন।’^{১১৬}

যাকাত অনাদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। আর বলা হবে, এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে স্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।’^{১১৭}

যাকাত গরীবের দ্রব্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ফলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এতে করে যোগান বৃদ্ধি পায়। যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে ওঠে নতুন কারখানা। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় ও বেকারত্ব হ্রাস পায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কাজেই সম্পদও বৃদ্ধি পায়। ফলে যাকাতও বেড়ে যায়। এভাবেই পুরো অর্থনীতিতে যাকাতের প্রভাব সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

ইসলামী অর্থনীতিতে আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। আয় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন- ব্যক্তিগত আয়, জাতীয় আয়, ব্যয়যোগ্য আয়, হস্তান্তরযোগ্য আয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আয় হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে। আয়ের কোন অংশ যদি সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তা হারাম হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ সুদের মাধ্যমে আয় করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। সুদের আয়কারীই শুধু নয়, সুদের লেখক, সাক্ষ্যদাতা সকলের উপর আল্লাহর লা‘নত অবধারিত হয়ে যায়। ইসলাম মানুষের পুঁজি ও শ্রমকে

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও ব্যক্তি জীবনে দারিদ্র দূরীকরণের বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। মানুষের আয় হালাল হলে তার ব্যক্তি জীবন, পরিবার ও তাঁর উত্তরসূরীরা শুদ্ধ পাটাতনের উপর গড়ে উঠে। তার রিযিকে আল্লাহ তা'আলা বরকত দেন, তার দু'আ কবুল করেন এবং তার অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন। পক্ষান্তরে হারাম উপার্জনকারীর কোন ইবাদতই আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। তাই মুমিন ব্যক্তির উচিত সর্বাত্মে তার উপার্জনকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করা।

তথ্যনির্দেশ

- ১ ইবন মানযুর আল-ইফরীকী, *লিসানুল 'আরাব*, ১২শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ খ্রি.), পৃ. ২৯৩; 'আব্দুল কাদির আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়াহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৬২।
- ২ *লিসানুল 'আরাব*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৩।
- ৩ সূরাহু আস-সাফ্যাত, ৩৭: ১০৩।
- ৪ আল-হুসায়ন ইবন মাস'উদ আল-বাগাজী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়াউত তুরাখিল 'ইলমী, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪২১; আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ আর-রাগিব আল-ইম্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৪২৩।
- ৫ আহমাদ ইবন ফারিস, *মাকাইসুল লুগাহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৯০।
- ৬ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১২।
- ৭ আল্লাহ তা'আলা বলেন,
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِنَّكَ اللَّهُ تَعَالَى الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
- 'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।' দ্র. সূরাহু ফাতির, ৩৫ : ৩২।
- ৮ ড. মুহাম্মাদ শাকী আল-ফানজিরী, *আল-ওয়াজীযু ফিল ইকতিসাদিল ইসলামী* (মিসর: দারুশ শুরুক, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১২।
- ৯ পূর্বোক্ত।
- ১০ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২২৮; *লিসানুল 'আরাব*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪২৪; মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আয-যুবায়দী, *তাজুল 'আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, ২৩শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল হিদায়াহ, তা.বি.), পৃ. ১৩৪; আল-হাসান ইবন 'আদিল্লাহ আল-আসকারী, *আল-ফুরকুল লাগউইয়্যাহ* (কায়রো: দারুল 'ইলমি ওয়াছ ছাকাফাহ, তা.বি.), পৃ. ১৩৫; যায়নুদ্দীন ইবন ইবরাহীম আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রাইক শারহ কানযুদ-দাকাইক*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ১৪৩।
- ১১ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।
- ১২ *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।
- ১৩ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৩৪।
- ১৪ সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ৩০।
- ১৫ জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ 'আব্দুর রহমান ইবন 'আলী আল-জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), পৃ. ৬৬।
- ১৬ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৩৮।

-
- ১৭ ‘আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, *আত-তা’রীফাত* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১৮৪।
- ১৮ সা’দী আবু হাবীব, *আল-কামুসুল ফিকহী* (দিমাশক: দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ২৭৭।
- ১৯ আহমাদ মুরাদ, “আদম: প্রথম কৃষক যিনি জমিনে চাষাবাদ করেন এবং কাজের সহায়ক সরঞ্জামাদি তৈরী করেন”, আল-ইত্তিহাদ, কায়রো, বুধবার, ২৪ জুলাই, ২০১৩ খ্রি.।
- ২০ ড. এ. কে. এনামুল হক, “স্বর্ণ মুদ্রা থেকে রহস্যমুদ্রা পরিবর্তনের ইতিকথা”, দৈনিক বণিকবার্তা, ঢাকা, সোমবার, পহেলা জানুয়ারি, ২০১৮।
- ২১ মুফতী তাকী উছমানী, *ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৮।
- ২২ লিসানুল ‘আরাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২।
- ২৩ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসু’আতুল ফিকহিয়াতুল কুয়তিয়াহ*, ২২শ খণ্ড (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শু’উনিল ইসলামিয়াহ, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৮৩।
- ২৪ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৬।
- ২৫ লিসানুল ‘আরাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯।
- ২৬ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ২৯।
- ২৭ আল-লাজনাহুদ দায়িমাতুল লিল বুহুছিল ‘ইলমিয়াতি ওয়াল ইফতা, *ফাতাওয়া আল-লাজনাহুদ দায়িমাহ*, ১৩শ খণ্ড (রিয়াদ: দারুল মুআইয়িদ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী’, তা.বি.), পৃ. ৯১।
- ২৮ সূরাহ আল-জুমু’আহ, ৬২ : ১০।
- ২৯ নাসরুদ্দীন ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দী, *বাহরুল ‘উলুম*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৪৮।
- ৩০ মা’আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৩।
- ৩১ সূরাহ আল-মুলক, ৬৭ : ১৫।
- ৩২ আবু হায়ান মুহাম্মাদ আল-আন্দালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফিত-তাফসীর*, ১০ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২০ হি.), পৃ. ২২৫-২২৬।
- ৩৩ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৫।
- ৩৪ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ২৯।
- ৩৫ সূরাহ আল-মুযাম্মিল, ৭৩ : ২০।
- ৩৬ যাদুল মাসীর ফী ‘ইলমিত তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; ‘আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাওয়ারদী, *আন-নাকতু ওয়াল ‘উয়ূন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ১৩৩; নাসিরুদ্দীন ‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার আল-বায়দাতী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা’বীল*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহুইয়াইত-তুরাছিল ‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ২৫৮।
- ৩৭ ইসমা‘ঈল ইব্ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, ৮ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুল তাযিয়বাতুন লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী’, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), পৃ. ২৫৮।
- ৩৮ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল ইহুইয়াইল কুতুবিল ‘আরাবিয়াহ, তা.বি.), হাদীস নং ২১৪৯, পৃ. ৭২৭।
- ৩৯ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল তাওকুন নাজাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), হাদীস নং ২০৭২, পৃ. ৫৭।
- ৪০ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৫০২৭।

৪১ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৬৪৭০।

৪২ আরবী ভাষ্য:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

দ্র. পূর্বোক্ত, হাদীস নং ১৪৭১।

৪৩ সুলায়মান ইব্নুল আস‘আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ‘আসরিয়াহ, তা.বি.), হাদীস নং ১৬৪১, পৃ. ১২০।

৪৪ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ২৫শ খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি.), হাদীস নং ১৫৮৩৬, পৃ. ১৫৭।

৪৫ সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১ : ২২।

৪৬ সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ১১১।

৪৭ সূরাহ আন-নাযম, ৫৩ : ৩৯।

৪৮ ‘উপার্জন তাওয়াফুল বিরোধী কি-না? এ সম্পর্কে বহু বিদ্বান তাঁদের গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান আশ-শায়বানী (র) (মৃ. ১৮৯ হি.) তাঁর *الْكُسْبُ* গ্রন্থে তাওয়াফুল সংক্রান্ত সন্ন্যাসীদের মতামতকে বিশ্লেষণ করেছেন। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-হাম্বলী (র) (মৃ. ৩১১ হি.) তাঁর *الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار* (র) (মৃ. ৩১১ হি.) তাঁর *الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار* নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও আল-হারিছ ইব্ন আসাদ আল-মাহাসিবী (র) (মৃ. ২৪৩ হি.) কর্তৃক লিখিত *المكاسب والورع والشبهة وبيان* কঠক লিখিত *المكاسب والورع والشبهة وبيان* নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

৪৯ সূরাহ বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৭০।

৫০ মা‘আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৫১ যাদুল মাসীর ফী ‘ইলমিত তাফসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

৫২ আবু ‘আদিল্লাহ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক ‘আলাস সহীহায়ন*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.), হাদীস নং ৩৪১৯, পৃ. ৪০৬।

৫৩ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৭।

৫৪ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১৪।

৫৫ মুসলিম ইব্নুল হুজ্জাজ আন-নায়াসাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত-তুরাখিল ‘আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং ১৩৩৭, পৃ. ৯৭৫।

৫৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৪৯।

৫৭ সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ১১৬।

৫৮ সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৫৯।

৫৯ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৮১২।

৬০ সূরাহ আল-আন‘আম, ৬ : ১৪৫।

৬১ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তাবারানী, *আল-মু‘জামুল আওসাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: দারুল হারামায়ন, তা.বি.), হাদীস নং ৬৪৯৫, পৃ. ৩১০; বিদ্বানগণ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৬২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২১৮।

- ৩৩ আবু উছমান সাঈদ আল-খুরাসানী, আত-তাফসীর মিন সুনানি সাঈদ ইব্ন মানসূর, ৪র্থ খণ্ড (রিয়াদ: দারুস সামী'ঈ লিন-নাশরি ওয়াত তাওয়াহীহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১৫৮৫।
- ৩৪ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৬৮।
- ৩৫ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৭২।
- ৩৬ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।
- ৩৭ মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।
- ৩৮ <https://bit.ly/34EupNw>
- ৩৯ <https://bit.ly/31wFOwx>
- ৪০ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৬৪।
- ৪১ সূরাহ আল-ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৬৩-৬৫।
- ৪২ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ২২১৮৯।
- ৪৩ তাজুল 'আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামূস, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; আল-মাউসু'আতুল ফিকহিয়াতুল কুয়তিয়্যাহ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
- ৪৪ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ১৬৪।
- ৪৫ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ২৯।
- ৪৬ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ২০১৫।
- ৪৭ আরবী ভাষ্য:
 أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فِقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا - قَالَ يَا رَبِّ أَتَيْتَنِي مَا لَكَ فَكُنْتُ أَبَايَغِ النَّاسِ وَكَانَ مِنْ خَلْقِي الْجَوَارِ فَكُنْتُ أَتَيْسَرُ عَلَى الْمُسِيرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ . فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي
- দ্র. পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৩৮৫১।
- ৪৮ সুনানুত-তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৯।
- ৪৯ সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮০।
- ৫০ মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।
- ৫১ সূরাহ সাবা, ৩৪ : ১০।
- ৫২ সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ২৫।
- ৫৩ সূরাহ আল-কাহফ, ১৮ : ৯৬।
- ৫৪ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৬৬।
- ৫৫ সূরাহ আন-নাজম, ৫৩ : ৩৯-৪১।
- ৫৬ সূরাহ আল-বালাদ, ৯০ : ০৪।
- ৫৭ সূরাহ আত-তাওয়াহ, ৯ : ১০৫।
- ৫৮ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ, তা.বি.), হাদীস নং ১৬৯২, পৃ. ১৪১।
- ৫৯ সুনানু ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৪৪৩।
- ৬০ সূরাহ আল-কাসাস, ২৮ : ২৩-২৮।
- ৬১ সূরাহ হূদ, ১১ : ৩৭।

৯২ সূরাহ সাবা, ৩৪ : ১২।

৯৩ সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮০।

৯৪ সূরাহ সাবা, ৩৪ : ১০-১১।

৯৫ সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৬৯।

৯৬ সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ১।

৯৭ সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪১।

৯৮ সূরাহ আল-হাশর, ৫৯ : ৭।

৯৯ আরবী ভাষা: **يُطْلَقُ عَلَى مَا يُقْطَعُ الْإِمَامُ، أَيِ يُعْطِيهِ مِنَ الْأَرْضِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ**

দ্র. আল-মাউসু' আতুল ফিকহিয়াতুল কুয়তিয়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮০।

১০০ <https://bit.ly/3hBC9TO>

১০১ সূরাহ আল-কাসাস, ২৮ : ২৫-২৬।

১০২ সুনানু ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৪৪৩।

১০৩ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৯৬।

১০৪ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৯৪।

১০৫ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪।

১০৬ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ১।

১০৭ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৩।

১০৮ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫০৮০।

১০৯ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১১-১২।

১১০ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৭।

১১১ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৩৪০।

১১২ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ১৩৫৮।

১১৩ সুনানুত-তিরমিযী, হাদীস নং ৬১২।

১১৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩৫৬।

১১৫ সূরাহ আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১৬।

১১৬ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১১০।

১১৭ সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৩৪-৩৫।

‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থ সংকলন ও বিন্যাস পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মাদ মুনাওয়ার হুসাইন*

Abstract: The book Jami'ul Masanid Was-Sunan was compiled by Hafiz Imaduddin Ibn Katheer, the best Muhaddith of the age. The book occupies a unique place in Hadith. It can be called the Encyclopedia of Hadith. The book is very useful for the researchers of Hadith. This book is the result of a long period of devotion of Ibn Katheer. Its compilation method is unique and extraordinary. This book has exceptional features and compared to other books on Hadith. It has compiled ten Hadith books, including Sihah Sittah. According to compilation method, the format of the book is also outstanding. The book is arranged in two parts. In the first part, the Hadiths of Muqillin and in the second part, there have been compiled the Hadiths of Muqthirin and the Hadiths of eminent Companions. The book is highly esteemed by the muhaddiths as well as the general readers. The main purpose of this article is to discuss in details the method of compiling and arranging such important books of Hadith.

ভূমিকা

হাদীছ হলো ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎসমূল। হাদীছের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার পুণ্যময় একটি কাজ। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজের প্রতি বারংবার উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে সাহাবীগণ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি যুগে যুগে ইসলামী মনীষীগণ হাদীছ সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার, বোধগম্যকরণ, সহজিকরণ ও হাদীছ গ্রন্থসমূহ একত্রিকরণসহ বিভিন্নভাবে হাদীছের খিদমাত অঞ্জাম দিয়ে নিজেদেরকে ধন্য করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে আবুল-ফিদা হাফিয ‘ইমাদুদ্দীন ইসমা‘ঈল ইব্ন কাছীর (র) অন্যতম। তিনি হাদীছের প্রচার-প্রসারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন হাদীছের এক বিশল ভাণ্ডার, যা ‘জামি’উল মাসানীদ’ নামে পরিচিত। যুগে যুগে মনীষীগণের কর্মবহুল জীবন ও তাঁদের রচিত গ্রন্থের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়ে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় বিশিষ্ট মনীষী ইব্ন কাছীর (র) কর্তৃক রচিত ‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থটির সংকলন পদ্ধতি ও বিন্যাস রীতি সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

জামি’উল মাসানীদ গ্রন্থ পরিচিতি

ইব্ন কাছীর^১ (র)-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘জামি’উল মাসানীদ ওয়াস্-সুনান’ গ্রন্থটি যুগান্তকারী সৃষ্টিকর্ম ও অনবদ্য এক রচনা। এটিকে হাদীছ বিষয়ক বিশ্বকোষ বলা যায়। এতে মুসনাদ পদ্ধতিতে হাদীছসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ্রন্থটির নামকরণ

গ্রন্থকার হাফিয ইব্ন কাছীর (র) স্বয়ং নিজেই গ্রন্থটির নামকরণ করেন। তিনি গ্রন্থটির ভূমিকাতে বলেন, ‘আর আমি আমার এ গ্রন্থটির নামকরণ করেছি **جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن** (জামি’উল মাসানীদ ওয়াস্-সুনানি আল-হাদী লি-আক্ওয়ামি সুনান)।^২

* পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থটির নামে মোট ৬টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলো হলো ১. جامع ২. المسانيد ৩. السنن ৪. الهادي ৫. السنن ৬. أقوم।

নিম্নে এ শব্দগুলোর পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. جامع: শব্দটি একবচন, বহুবচনে جوامع, যা جمع ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। শব্দটির অর্থ একত্রিত করা, সংকলন করা। পরিভাষায় جامع বলা হয় এমন হাদীছ গ্রন্থকে, যাতে দ্বীনের আটটি অধ্যায় সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সন্নিবেশিত হয়। ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,

الْجَامِعُ فِي إصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ: هُوَ كِتَابُ الْحَدِيثِ الْمُرْتَبِ عَلَى الْأَبْوَابِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ أَحَادِيثُ فِي جَمِيعِ مَوْضُوعَاتِ الدِّينِ وَأَبْوَابِهِ، وَعَدَدُهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ رِئِيسِيَّةٍ^৩

-‘মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায়, জামি’ এমন হাদীছের গ্রন্থ, যা এমন সকল বাব নিয়ে বিন্যস্ত যাতে দ্বীনের সকল বিষয় ও অধ্যায়ের হাদীছ সন্নিবেশিত হয়। এমন প্রধান প্রধান অধ্যায়ের সংখ্যা আটটি।’

‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থটি শাব্দিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থেই جامع। কেননা এতে একাধিক হাদীছ গ্রন্থ একত্রিত করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রন্থটিতে দ্বীনের প্রতিটি অধ্যায়ই সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে শব্দটি গ্রন্থের নামের জন্য উপযুক্ত হয়েছে।

২. المسانيد: শব্দটি বহুবচন, একবচনে المُسْنَدُ, শব্দটি বাবুল-ইফ’আল (باب الإفعال)-এর মাসদার এবং الإسناد ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ সনদসহ বর্ণনা করা ও সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীছসমূহ একত্রিত করা। মুহাম্মাদ আবু যাহ্ন বলেন,

أَنْ يَجْمَعَ الْمُحَدِّثُ فِي تَرْجُمَةٍ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا يَرْوِيهِ عَنْهُ سَوَاءً كَانَ صَحِيحًا أَمْ غَيْرَ صَحِيحٍ وَيَجْعَلُهُ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ^৪

-‘মুহাদ্দিছ এক একজন সাহাবীর প্রসঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সকল হাদীছকে একসাথে উল্লেখ করেন, তা সহীহ কিংবা সহীহ নয়, তার কোন পার্থক্য করেন না এবং হাদীছসমূহের বিষয়বস্তুও হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ধরনের গ্রন্থকেই মুসনাদ বলা হয়।’

‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থটি এ দিক থেকে আল-মুসনাদ গ্রন্থের পর্যায়াভুক্ত। কেননা গ্রন্থটিতে মুসনাদ গ্রন্থ ও সনদসহ বর্ণিত হাদীছ গ্রন্থ একত্রিত করা হয়েছে। ফলে শব্দটি গ্রন্থের নামকরণের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

৩. السنن: শব্দটি বহুবচন, একবচনে سُنَّةٌ। যার অর্থ, তরীকা, নিয়ম, ধর্মে প্রচলিত নিয়ম-কানুন। উসূলুল হাদীছ এর পরিভাষায় সুনা বলা হয় এমন এমন হাদীছ গ্রন্থকে, যাতে হাদীছসমূহ ফিকহী তারতীব অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ সুনানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

هِيَ كُتُبٌ تَكْتَفِي بِذِكْرِ الْأَحَادِيثِ وَتَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَلَا تَذْكُرُ شَيْئًا مِنَ الْأَثَرِ، وَتُلْتَزِمُ غَالِبًا التَّرْتِيبَ عَلَى أَبْوَابِ الْأَحْكَامِ^৫

-‘যে হাদীস গ্রন্থে কেবল আছার ব্যতীত হাদীছসমূহ উল্লেখের সীমাবদ্ধতা করা হয়েছে এবং আহকামের ধারাবাহিকতার আলোকে সাজানো হয়েছে তাকে সুনা বলা হয়।’

‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থটিতে ফিকহী তারতীব অনুযায়ী বিন্যস্ত গ্রন্থসমূহ তথা সুনানুত-তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থ অত্র গ্রন্থে একত্রিত করা হয়েছে, বিধায় গ্রন্থটির নামে সুনা শব্দটির ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে।

৪. **الْهَادِي**: শব্দটি **اسم فاعل**, যা **الْهَادِي** মাসদার বা ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পথ প্রদর্শন করা, গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। গ্রন্থটি তার পাঠককে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে দেয় এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে। বিধায় শব্দটি ‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থের নামে ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে।
৫. **أَقْوَمُ**: শব্দটি **اسْمُ التَّفْصِيلِ** এর সীগাহ; যার অর্থ সঠিক, অধিকতর সঠিক, সঠিকতর, অধিকতর উপযোগী ইত্যাদি।^৬ গ্রন্থটি সঠিক পথ প্রদর্শন করে বিধায় শব্দটি গ্রন্থের নামে ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে।
৬. **السُّنَنُ**: শব্দটি **اسْمُ**, যার অর্থ তরীকা, পদ্ধতি, ধরণ ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে, **بَنَوْا بُيُوتَهُمْ عَلَى اسْتِقَامٍ فَلَانَ** - ‘তার সাকলে একই পদ্ধতিতে বাড়ি বানিয়েছে।’^৭ আরো বলা হয়ে থাকে, **عَلَى سُنَنِ وَاحِدٍ** - ‘জনৈক ব্যক্তি একই পদ্ধতির উপর অটল আছে।’^৮

গ্রন্থটির পূর্ণনামের অর্থ হলো মাসানীদ ও সুনান গ্রন্থের এমন সংকলন, যা অধিকতর বিশুদ্ধ পদ্ধতির প্রতি পথ প্রদর্শনকারী। যেহেতু গ্রন্থটিতে মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ একত্রিত করা হয়েছে এবং গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে গ্রন্থটি তার পাঠককে হাদীছের প্রতি সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এজন্য গ্রন্থটিকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

তবে কোন কোন মনীষী গ্রন্থটির নাম কিছুটা পার্থক্যসহ উল্লেখ করেছেন। যেমন- তাযকিরাতুল হুফফায় গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ‘উছমান আয-যাহাবী (র) গ্রন্থটিকে **كِتَابُ الْهَدْيِ وَالسُّنَنِ فِي أَحَادِيثِ** (কিতাবুল হুদা ওয়াস-সুনান ফী আহাদীছিল মাসানীদি ওয়াস-সুনান) নামে অভিহিত করেছেন। অনুরূপ মত প্রদান করেছেন আবুল মাহাসীন মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী ইবনুল হাসান আল-হুসায়নী আদ-দিমশকী (র), মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আশ-শাওকানী (র), শায়খ মুহাম্মাদ ‘আব্দুর রায়যাক্ব হামযাহ (র) প্রমুখ মনীষী। মূলত এ সকল নাম তাঁরা মূল নাম থেকে সংক্ষিপ্ত করে রেখেছেন।

জামি’উল মাসানীদ গ্রন্থের উৎসসমূহ

হাফিয ইবন কাছীর (র) তাঁর ‘জামি’উল মাসানীদ’ গ্রন্থে প্রধানত ১০টি বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ থেকে হাদীছ সংকলন করেছেন। গ্রন্থগুলো হলো ১. সহীহুল-বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. জামি’উত-তিরমিযী, ৪. সুনানু আবী দাউদ, ৫. সুনানুন-নাসাঈ, ৬. সুনানু ইবন মাজাহ, ৭. মুসনাদু আহমাদ, ৮. মুসনাদু বাযযার, ৯. মুসনাদু আবী ইয়া’লা ও ১০. আল-মু’জামুল কাবীর।

এছাড়াও প্রয়োজনে তিনি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ থেকেও অল্প সংখ্যক হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায় বিবরণ প্রদান করে বলেন, ‘আমি এ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য ইসলামী গ্রন্থাবলী থেকে সংকলন করেছি’। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, সহীহায়ন তথা সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সুনানুল ‘আরাবা’আহ্ তথা সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত-তিরমিযী, সুনানুন-নাসাঈ ও সুনানু ইবন মাজাহ। আরো রয়েছে মুসনাদু আহমাদ, মুসনাদু আবী বাক্র আল-বাযযার, মুসনাদু হাফিয আবী ইয়া’লা আল-মুসীলী এবং আল-মু’জামুল কাবীর লিভ-তাবারানী। উক্ত ১০টি গ্রন্থ থেকে তিনি হাদীছসমূহ সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি আমার এ গ্রন্থে উক্ত ১০টি গ্রন্থে যা আছে তার সবকিছুই উল্লেখ করব এবং দ্বিনি প্রয়োজনে উক্ত ১০টি গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও কিছু হাদীছ গ্রহণ করব’।^৯

জামি’উল মাসানীদ গ্রন্থ রচনার সময়কাল

গ্রন্থটি রচনার সময়কাল সম্পর্কে বিস্তারিত ও নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। কেননা এ বিষয়ে গ্রন্থকার কোন তারিখ ও সাল উল্লেখ করেননি। তবে সমাপ্তিকাল সম্পর্কে জানা যায়। কেননা স্বয়ং গ্রন্থকার এ

বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে মুকছিরীন ও বিশেষ সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীছ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের এ প্রধান অংশের সমাপ্তিকাল হলো রবিবার, ১০ রবী'উছ-ছানী, ৭৬৩ হিজরী।^{১০} আর দ্বিতীয় অংশে মুকছিরীন ও অন্যান্য বিশেষ সাহাবী তথা খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ সংকলন করা হয়েছে, যার সমাপ্তিকাল ৭৬৯ হিজরী।

জামি'উল মাসানীদ গ্রন্থ সংকলন পদ্ধতি

প্রত্যেক গ্রন্থকারের গ্রন্থ রচনার নিজস্ব কিছু অনুসৃত পদ্ধতি থাকে। যে পদ্ধতিগুলোর বিষয়ে গ্রন্থকার নিজে কিছু লেখেন না, তবে তাঁদের গ্রন্থসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে সে পদ্ধতিসমূহ পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে হাফিয ইবন কাছীর (র) কর্তৃক প্রণীত 'জামি'উল মাসানীদ' গ্রন্থটি পাঠ করলে কতিপয় সংকলন ও অনুসৃত পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

১. ইবন কাছীর (র) 'জামি'উল মাসানীদ' গ্রন্থটি রচনায় ইবনুল আছীর^{১১} (র)-এর 'উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফতিস-সাহাবাহ'^{১২} গ্রন্থকে অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে সাহাবী^{১৩} অতঃপর তাঁর হাদীছসমূহ একত্রিত করেছেন।
২. এ গ্রন্থে সাহাবীগণের নাম আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
৩. সাহাবী থেকে বর্ণনাকারী তাবি'ঈ^{১৪}-এর ক্ষেত্রেও আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।
৪. হাদীছ উল্লেখের পূর্বে বিশিষ্ট সাহাবীগণের ক্ষেত্রে তাঁদের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- চার খলীফা^{১৫} ও মুকছিরীন^{১৬} সাহাবীগণের ক্ষেত্রে।
৫. মুতাওয়াসসিতীন^{১৭} ও মুক্বিলীন^{১৮} সাহাবীগণের ক্ষেত্রে তাঁদের নাম, বংশ পরিচয় ও বিশেষ ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- তাঁর গ্রন্থের প্রথম সাহাবীর নাম আবিল-লাহম আল-গিফারী^{১৯} (রা) (أَبِي الْحَمِّ الْغِفَارِي); তাঁর থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত। আবিল-লাহম অর্থ যিনি গোশত আহার করেন না। এটি তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়ায় তাঁর মূল নাম ও তিনি কেন গোশত আহার করতেন না তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।^{২০} অতঃপর তাঁর হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।^{২১}
৬. মুকছিরীন ও মুক্বিলীন সাহাবীগণের হাদীছ পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম ১৬ খণ্ডে মুতাওয়াসসিতীন ও মুক্বিলীন সাহাবীগণের মুসনাদ ও পরবর্তী ২১ খণ্ডে বিশিষ্ট সাহাবী ও মুকছিরীন সাহাবীগণের মুসনাদ উল্লেখ করেছেন।
৭. কোন সাহাবীর ব্যাপারে যদি মতপার্থক্য থাকে যে, তিনি সাহাবী কি-না? তাহলে সে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন- খালিদ ইবন 'আদিল্লাহ ইবন হারমালাহ আল-মুদলিজী^{২২} (রা) (خَالِدُ بْنُ حَرْمَةَ الْمُدَلْجِيِّ)। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি সুনির্দিষ্টভাবে কোন হাদীছ বিশাদরদের মতামত থাকলে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।^{২৩} যেমন-
ক. مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ (তার সাহাবী হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে)।
খ. فِي صُحْبَتِهِ مَقَالٌ (তিনি সাহাবী কি- না? এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে)।
গ. قِيلَ: لَا صُحْبَةَ لَهُ (বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সাহাবী নন)।

ঘ. قَالَ ابْنُ مَنْدَةَ: لَا يَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ. (ইবন মান্দা (র) বলেন, তিনি সাহাবী হওয়ার বিষয়টি বিস্ময় নয়)।

৮. সাহাবী নন, বরং তাবি‘ঈ এমন ব্যক্তির বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন তাবি‘ঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ফলে পরবর্তীকালে অনেকে তাঁকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তিনি সাহাবী নন; বরং তাবি‘ঈ। এক্ষেত্রে তিনি মনীষীগণের মতামতও উল্লেখ করেছেন। যেমন- মু‘আয আবু যুহরাহ্। কেউ কেউ বলেন, মু‘আয ইবন যুহরাহ্^{২৪} (রা)। তাঁর সম্পর্কে ইবন কাছীর (র) বলেন,

هو تابعي. ذكره ابن حبان في الثقات وقد ذكره بعضهم في الصحابة لأنه روى أبو داود في سننه من طريق حصين بن عبد الرحمن عنه. قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت^{২৫}

‘তিনি একজন তাবি‘ঈ। ইবন হিব্বান (র) তাঁর আছ-ছিকাত গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ করেছেন। কোন কোন মুহাদ্দিছ তাঁকে সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা ইমাম আবু দাউদ (র) স্বীয় সুনান গ্রন্থে হুসায়ন ইবন ‘আদ্রির রহমান (حصين بن عبد الرحمن) সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন এ দু‘আ পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ। এই বর্ণনার কারণে অনেকে তাঁকে সাহাবী মনে করেছেন এবং সাহাবী হিসেবেই তাঁর আলোচনা করেছেন।

৯. কোন হাদীছের সনদে বা মতনে দুর্বলতা থাকলে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। যেমন- মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল-মিসরী আন-নাসরী^{২৬} (রা)। তাঁর নাম উল্লেখের পর তিনি বলেন, إسناده له حديث واحد مختلف في إسناده। ‘তাঁর থেকে একটি মাত্র রিওয়ায়াত পাওয়া যায় এবং তাঁর সনদেও রয়েছে মতানৈক্য’।

১০. যে সকল সাহাবী থেকে একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখের পর তিনি তা উল্লেখ করেছেন। যেমন- অত্র গ্রন্থের প্রথম সাহাবী আবিল-লাহম আল-গিফারী (রা) (أبي اللحم الغفاري)। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখের পূর্বেই তিনি বলেন, له حديث واحد। ‘তাঁর থেকে একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত।’

১১. এ গ্রন্থে তিনি পুরুষ সাহাবী, মহিলা সাহাবী, উপনাম যেমন- আবু ‘আদিল্লাহ্, ইবন ‘আদিল্লাহ্, উম্মু হাবীবাহ্ এবং মুবহাম^{২৭} ও মাজহুল^{২৮} তথা অস্পষ্ট ও অজানা সাহাবী প্রত্যেককে পৃথকভাবে পৃথক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন- প্রথমে পুরুষ সাহাবী যারা নিজ নামে পরিচিত, এমন সাহাবীগণের বর্ণনা ১-১২ খণ্ডে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর যারা উপনামে পরিচিত, প্রথমে আবু অতঃপর ইবন উপনাম, অতঃপর মুবহাম পুরুষ সাহাবী, অতঃপর নিজ নামে পরিচিত মহিলা সাহাবী, অতঃপর প্রথমে উপনাম উম্মু, অতঃপর বিন্ত, অতঃপর মুবহাম মহিলা সাহাবীগণের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

১২. এ গ্রন্থে তিনি হাদীছের সনদ (سَنَدٌ)^{২৯} ও মতন (مَتْنٌ)^{৩০} উভয়ই উল্লেখ করেছেন। তবে অধিক দীর্ঘ হাদীস তাকরারের (تَكَرَّرَ)^{৩১} ক্ষেত্রে তা উল্লেখ না করে বরং সেদিকে শুধু ইঙ্গিত করেছেন। যেমন- এই- لَا تَذَرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ -এর মুসনাদে (রা)-ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-এর মুসনাদে

হাদীছ বর্ণনার পর তিনি বলেন, **وأصل الحديث قد تقدم بطوله**, ‘এ হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে’।

১৩. যে সকল সাহাবী থেকে কোন বর্ণনা নেই; কিন্তু হাদীছের মাঝে তাঁদের নামের উল্লেখ রয়েছে এমন সাহাবীগণের নামও তিনি (নামের আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে) পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের নামের সাথে ক্রমিক নং লিখেননি।

১৪. সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যৌথ বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, ‘শায়খায়ন’^{৩২} অথবা ‘জামা’আহ’^{৩৩} হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে সনদটিও উল্লেখ করেছেন।^{৩৪} যেমন- **لا يزال من** - **أمتي قوم ظاهرين على الناس، حتى تأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون** এই হাদীছটি বর্ণনার পর তিনি বলেন,

أخرجاه الشيخان في الصحيحين: عن إسماعيل بن أبي خالد به، منها البخاري: عن عبد الله بن موسى عن إسماعيل به

-‘হাদীছটি শায়খায়ন তাঁদের সহীহায়নে ইসমাঈল ইবন খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (র) হাদীছটি ‘আব্দুল্লাহ ইবন মুসা ‘আন ইসমাঈল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।’

১৫. যখন হাদীছটি ‘সুনানু আবী দাউদ’ বা ‘জামি‘উত্-তিরমিযী’ অথবা অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তখন তিনি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, **رواه أبو داود والترمذي والنسائي**, যেমন তিনি বলেন, **من حديث شعبة** - ‘হাদীছটি ইমাম আবু দাউদ (র), ইমাম তিরমিযী (র) এবং ইমাম নাসাঈ (র) শু‘বা থেকে বর্ণনা করেছেন।’^{৩৫}

১৬. মুসনাদু বাযযার ব্যতীত যখন মুসনাদু আহমাদ, তুহফাতুল আশরাফ, তাবারানীর ‘আল-মু‘জামুল কাবীর’-এর কোথাও হাদীছটি পাওয়া যায়নি, তখন হাদীছটিকে বাযযারের দিকে সম্বোধন করেছেন।^{৩৬} যেমন- আবান আল-মুহারিবি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح: الحمد لله لا أشرك به شيئاً، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلا ظلَّ تُغفر له ذنوبه حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى ظلَّ تُغفر له ذنوبه حتى يصبح

হাদীছটি উল্লেখের পর তিনি বলেন,

رواه البزار، عن محمد بن السكن الأيلي، عن سعيد بن عامر، عن أبان بن أبي عياش

-‘হাদীছটি বাযযার মুহাম্মাদ ইবনুস-সাকান আল-আয়লী থেকে তিনি সাঈদ ইবন ‘আমির থেকে তিনি আবান ইবন আবী ‘আয়্যাশ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৭. যৌথভাবে হাদীছটি এসে থাকলে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। যেমন- তাবারানী, বাযযার, মুসনাদু আবী ইয়া‘লা ইত্যাদি।^{৩৭} যেমন- আসাদ ইবন কুরায়য (রা) থেকে বর্ণিত,

المريضُ تَحَاتُّ خطايَاهُ كما يتَحَاتُّ ورقُ الشجر

হাদীছটি বর্ণনার পর তিনি বলেন,

رواه البزار والطبراني من حديث أبي قتيبة سلم بن قتيبة به

-‘হাদীছটি বাযযার ও তাবারানী (র) আবু কুতায়বাহ সাল্ম ইবন কুতায়বাহ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন’।

১৮. কোন কোন সাহাবীর ক্ষেত্রে ক্রমানুসারে নাম উল্লিখিত হলেও তাঁর বিবরণ ও বর্ণনা উপস্থাপন না করে তিনি বলেছেন, ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে এর বিবরণ ও বর্ণনা আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে তিনি কখনো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোথায় তার আলোচনা আসবে আবার কখনো অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।^{৮৮}
১৯. কোন সাহাবীর নাম ও তাঁর বর্ণনা পূর্বে আলোচিত হলে বিষয়টি তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত সাহাবীর আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।^{৮৯}
২০. কোন কোন হাদীছ ও সনদের ক্ষেত্রে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। এমন সমালোচনার সংখ্যা অনেক। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক. চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৪-৪৩৫ নং পৃষ্ঠায় মুসনাদু য়ায়দ ইবন আরকামে ইয়াহইয়া ইবন জা’দাহ্ য়ায়দ ইবন আরকাম থেকে বর্ণিত হাদীছ (হাদীছ নং ২৮২৬) ও উক্ত সনদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ:

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ الَّذِي عَاشَ النَّبِيُّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ

হাদীছটি উল্লেখের পর তিনি প্রথমে হাদীছের অতঃপর সনদের সমালোচনা করে বলেন, ‘হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল। দুর্বলতার কারণ এই যে, উক্ত হাদীছের ভাষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে ‘ঈসা (আ)-এর বয়স হওয়া উচিত ১২৬ বছর, যা প্রসিদ্ধ হাদীছ বিরোধী। কেননা ‘ঈসা (আ)-এর পরের নবী হলেন আমাদের নবী এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইত্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। সে হিসেবে তাঁর পূর্বের নবী অর্থাৎ ‘ঈসা (আ)-এর বয়স হওয়া উচিত এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১২৬ বছর। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, ‘ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা’আলা মাত্র তেরিশ (৩৩) বছর বয়সে এ পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।^{৯০} আর এভাবেই যদি প্রত্যেক নবীর বয়স তাঁর পরবর্তী নবীর বয়সের দ্বিগুণ করা হয় তাহলে শেষ সংখ্যা কততে গিয়ে পৌছবে? ... এক পর্যায়ে তিনি বলেন, সুতরাং হাদীছটি না মতন বিবেচনায় বিশুদ্ধ, না সনদ বিবেচনায় বিশুদ্ধ! কেননা এ হাদীছের সনদে রয়েছে ‘উবায়দ ইবন ইসহাক (র), যাকে জমহূর মুহাদ্দিছ য’ঈফ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আর পরবর্তী মুহাদ্দিছগণও তাকে য’ঈফ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন’।^{৯১}

খ. দশম খণ্ডে (পৃষ্ঠা নং ৩৮০-৩৮১, হাদীছ নং ৭৮৬১) ক্বাতাদাহ ইবনুন-নু’মান (রা)-এর মুসনাদের শেষ হাদীছটি উল্লেখের পর তিনি হাদীছের সনদ ও মতন উভয়েরই সমালোচনা করেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا قَضَىٰ خَلْقَهُ اسْتَلْقَىٰ، فَوَضَعَ إْحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي أَنْ يَفْعَلَ هَذَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا جَرَمَ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا.

হাদীছটি উল্লেখের পর তিনি বলেন, এই হাদীছের সনদটি একেবারেই দুর্বল। আর সম্ভবত হাদীছটি ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোন রাবী ভুলবশত মারফু’ হাদীছ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর মতনের দুর্বলতার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ হাদীছে এর বিপরীত কর্ম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।^{৯২}

গ. একাদশ খণ্ডে (পৃষ্ঠা নং ৬০৪, হাদীছ নং ৮৯৫২) মু’আবিয়াহ (রা)-এর মুসনাদে ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাওহিব মু’আবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখের পর অল্পভাষায় হাদীছটির মতন ও সনদ

উভয়েরই সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘হাদীছটি মুনকার। অত্র হাদীছের বর্ণনা সূত্রে রয়েছেন আবু কুবায়েল। তাঁর অধিকাংশ হাদীছই মুনকার।’^{৪৩} আরো অসংখ্য স্থানে গ্রন্থকার এমন সমালোচনা করেছেন।

২১. গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থে তুহফাতুল আশরাফ গ্রন্থের অনুকরণ করলেও হাদীছ তাখরীজকারী বিবরণের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থের অনুকরণ করেননি। কেননা উক্ত গ্রন্থে তিনি তাখরীজকারীগণের নাম সৎক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন- সহীহুল বুখারীর জন্য ‘খা’, সহীহ মুসলিমের জন্য ‘মীম’, জামি’উত-তিরমিযীর জন্য ‘তা’, সুনানু আবী দাউদ-এর জন্য ‘দাল’ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইবন কাছীর (র) তাখরীজকারীদের এবং গ্রন্থের পূর্ণ নাম উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে পূর্ণ সনদও তিনি উল্লেখ করেছেন।

২২. কখনো কখনো গ্রন্থকার অধিক গুরুত্ব থাকায় তুহফাতুল আশরাফ গ্রন্থ থেকে তাখরীজের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি قَالَ شَيْخُنَا ‘আমার শায়খ’ অর্থাৎ ‘হাফিয আল-মিযযী (র) বলেন’ এমন বাক্য ব্যবহার করেছেন। তিনি এ ধরনের বিস্তারিত বিবরণ কোন হাদীছের ইখতিলাফের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছেন। যেমন- অত্র গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৮ নং পৃষ্ঠায় উবাই ইবন কা’ব (রা)-এর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।^{৪৪} এমন প্রায় দুইশত স্থানে তিনি বিবরণ প্রদান করেছেন।

২৩. হাফিয ইবন কাছীর (র) তাঁর এ গ্রন্থে পূর্বোক্ত দশটি গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন-

ক. নবম খণ্ডে ‘উরওয়াহ্ আল-বারিককী^{৪৫} (রা)-এর মুসনাদে ৬৫২০ নং হাদীছটি (পৃষ্ঠা নং ১১৭)। এ হাদীছটি তিনি মুসনাদুত-তয়ালিসী^{৪৬} থেকে আহরণ করেছেন।

খ. পঞ্চম খণ্ডে সা’দ ইবন তামীম^{৪৭} (র)-এর মুসনাদে ৩১৪৮ নং হাদীছটি (পৃষ্ঠা নং ৮৭)। এ হাদীছটি তিনি মুস্তাদরাকে হাকিম^{৪৮} থেকে আহরণ করেছেন।

গ. গ্রন্থকার শামাইলে তিরমিযী^{৪৯} থেকেও বেশ কিছু হাদীছ তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন- দ্বিতীয় খণ্ডে বারা ইবন ‘আযিব^{৫০} (রা)-এর মুসনাদে ৫০৬ নং হাদীছটি (পৃষ্ঠা নং ৪৬)। এ হাদীছটি তিনি শামাইলে তিরমিযী থেকে আহরণ করেছেন।

২৪. গ্রন্থকার হাদীছ গণনার ক্ষেত্রে অনেক সময় সংক্ষেপন করেছেন। যেমন- হাফিয আল-মিযযী^{৫১} (র) তুহফাতুল আশরাফ^{৫২} গ্রন্থে চার স্থানে ইসহাক ইবন ‘আদিল্লাহ্ আনাস (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যথা-

ক. ‘আব্দুর রহমান ইবন ‘আমর আল-আওয়া’ঈ ‘আন ইসহাক ইবন ‘আদিল্লাহ্ ‘আন আনাস (রা)।

খ. ‘ইকরিমাহ ইবন ‘আম্মার আল-ইয়ামামী ‘আন ইসহাক ইবন ‘আদিল্লাহ্ ‘আন আনাস (রা)।

গ. ইমাম মালিক ‘আন ইসহাক ইবন ‘আদিল্লাহ্ ‘আন আনাস (রা)।

ঘ. হুমাম ইবন ‘আদিল্লাহ্ ইবন ইয়াহইয়া আল-‘আওয়ী আল-বাসরী ‘আন ইসহাক ইবন ‘আদিল্লাহ্ ‘আন আনাস (রা)। হাফিয মিমযী (র) এগুলোকে চারটি হাদীছ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবন কাছীর (র) জামি’উল মাসানীদে এগুলোকে একটি হাদীছ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২৫. এ গ্রন্থে মাঝে মাঝে বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের প্রচার করেছেন বা এ বিষয়ে তিনি পৃথক গ্রন্থ রচনা করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য এভাবেই তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের নামের সন্ধান পাওয়া যায়, যা বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

জামি’উল মাসানীদ গ্রন্থ বিন্যাস রীতি

হাফিয ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এ গ্রন্থটিকে প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. এ অংশে গ্রন্থকার মুকছিরীন সাহাবী তথা অল্পসংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নাম, তাঁদের বংশ পরিক্রমা, বিশেষ পরিচিতি ও জীবনের উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা উল্লেখপূর্বক তাদের বর্ণিত হাদীছ সংকলন করেছেন। এ অংশের হস্তলিখিত কপিটি ১-৪ খণ্ডে বিস্তৃত। বৈরুতের ‘দারুল ফিকর’ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি ১-১৬ খণ্ডে বিস্তৃত।

২. এ অংশে গ্রন্থকার মুকছিরীন তথা অধিকসংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীগণের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এ অংশের হস্তলিখিত কপিটি ৫-৭ খণ্ডে বিস্তৃত এবং বৈরুতের ‘দারুল ফিকর’ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি ১৭-৩৭ খণ্ডে বিস্তৃত।

উল্লেখ্য যে, মুকছিরীন সাহাবীগণের তালিকায় তিনি এমন কতিপয় সাহাবীর নাম ও তাঁর বর্ণিত হাদীছও উল্লেখ করেছেন, যাদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা হাজারের চেয়েও কম। যেমন- ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) (মৃত ৬৩ হি.)। তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৮৭৯টি। হাজার বা তার কাছাকাছি সংখ্যাকেও তিনি হাজার হিসেবে গণ্য করেছেন।^{৫৩} এছাড়া তিনি চার খলিফাকেও তাঁদের মর্যাদা বিবেচনায় মুকছিরীন সাহাবীগণের সাথে উল্লেখ করেছেন। চার খলীফার কারোরই বর্ণিত হাদীছ হাজার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বিষয়টি এভাবেও বলা যায় যে, মুসনাদুল খুলাফাহ আল-আরবা’আহ নামে তিনি পৃথক মুসনাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা মুসনাদুল মুকছিরীন এর পূর্বে বিন্যস্ত হয়েছে।

জামি’উল মাসানীদ গ্রন্থের প্রথম অংশ পুনরায় ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. এ অংশে নিজ নামে পরিচিত পুরুষ সাহাবীগণের নাম, পরিচিতি ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের এই প্রথম অংশই হলো সর্ববৃহৎ, যা বৈরুতের ‘দারুল ফিকর’ থেকে ১-১২ খণ্ডে প্রকাশিত। গণনা করে যতটুকু পাওয়া গেল তাতে গ্রন্থটির এ অংশে সর্বমোট ২০০২ (দুই হাজার দুই) জন সাহাবীর নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।

২. এ অংশে উপনামে (যথা- আবু ইবরাহীম, আবু ‘আদিল্লাহ ইত্যাদি) পরিচিত ও প্রসিদ্ধ পুরুষ সাহাবীগণের উপনাম, যথাসম্ভব তাঁদের মূল নাম অনুসন্ধান, তাঁদের বংশ পরিচিতি এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডের অধিকাংশ অংশ (পৃষ্ঠা নং ১-৭৫৪) জুড়ে রয়েছে এ সকল সাহাবীগণ ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছের বিবরণ, যাদের সংখ্যা গবেষণায় সর্বমোট ৩০৭ (তিনশত সাত) জন পাওয়া যায়।

৩. এ অংশে উপনামে (যথা- ইবন ‘আদিল্লাহ, ইবন মাস’উদ ইত্যাদি) পরিচিত ও প্রসিদ্ধ পুরুষ সাহাবীগণের উপনাম যথাসম্ভব তাঁদের মূল নাম অনুসন্ধান ও বংশ পরিচিতি এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। চতুর্দশ খণ্ডের শেষাংশে (পৃষ্ঠা নং ৭৫৫-৭৮৫) এ সকল সাহাবীগণ ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে, যাদের সংখ্যা গবেষণায় সর্বমোট ২৪ (চব্বিশ) জন পাওয়া যায়।

৪. এ অংশে মুবহাম তথা অজানা ও অস্পষ্ট সাহাবী থেকে কোন সাহাবী বা তাবি’ঈ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব মুবহাম সাহাবীগণের পরিচয় উদ্ধারের সর্বাঙ্গক চেষ্টা করা হয়েছে। অত্র গ্রন্থে এমন মুবহাম পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর সংখ্যা গবেষণায় সর্বমোট ১০৩ (একশত তিন) জন

পাওয়া যায়। পঞ্চদশ খণ্ডের প্রথম অংশে (পৃষ্ঠা নং ১-১৯৬) এসকল সাহাবী, তাঁদের বিবরণ ও বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

৫. এ অংশে নিজ নামে পরিচিত মহিলা সাহাবীগণের নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। পঞ্চদশ খণ্ডের শেষাংশে (পৃষ্ঠা নং ১৯৭-৬২৫) ও ষষ্ঠদশ খণ্ডের প্রথমাংশে (পৃষ্ঠা নং ১-১৫৫) এসকল মহিলা সাহাবীগণের নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। অত্র গ্রন্থে এমন মহিলা সাহাবীর সংখ্যা গবেষণায় সর্বমোট ১৬৬ (একশত ছেষটি) জন পাওয়া যায়।
৬. এ অংশে উপনামে (যথা- উম্মু ‘আদ্দিল্লাহ, উম্মু হাবীবাহ্ ইত্যাদি) পরিচিত ও প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাঁদের মূল নাম উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠদশ খণ্ডের মাঝের অংশে (পৃষ্ঠা নং ১৫৬-৫৯১) এসকল মহিলা সাহাবীগণের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অত্র গ্রন্থে উপনামে প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবীগণের সংখ্যা গবেষণায় সর্বমোট ১০৯ (একশত নয়) জন পাওয়া যায়।
৭. এ অংশে উপনামে (যথা- বিনত ছাবিত ইত্যাদি) পরিচিত মহিলা সাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। ষষ্ঠদশ খণ্ডে (পৃষ্ঠা নং ৫৯২-৫৯৪) এমন একজন মাত্র মহিলা সাহাবীর উপনাম ও তাঁর হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।
৮. এ অংশে মুবহাম তথা অজানা ও অস্পষ্ট মহিলা সাহাবীগণ থেকে অপর কোন সাহাবী অথবা কোন তাবি‘ঈর বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অজানা মহিলা সাহাবীগণকে জানার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠদশ খণ্ডের শেষাংশে (পৃষ্ঠা নং ৫৯৫-৬৬৮) এ জাতীয় অজানা মহিলা সাহাবীগণের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। অত্র গ্রন্থে এরূপ অজানা মহিলা সাহাবীগণের সংখ্যা গবেষণায় সর্বমোট ৫৯ (উনষাট) জন পাওয়া যায়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, হাফিয় ‘ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর (র) ছিলেন একজন উঁচুস্তরের মুহাদ্দিছ। হাদীছ ও উসূলুল হাদীছ বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান পণ্ডিত। তিনি তাঁর কর্মজীবনের সম্পূর্ণ সময়কাল কুরআন ও হাদীছ শিক্ষার প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তিনি রেখে যান ‘জামি‘উল মাসানীদ’ নামক হাদীছ ভাণ্ডারসহ অসংখ্য গ্রন্থ। ‘জামি‘উল মাসানীদ’ গ্রন্থটি হাদীছের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের জন্য বহু উপকারী একটি গ্রন্থ। এতে হাদীছের প্রসিদ্ধ দশটি গ্রন্থ একত্রিত হওয়ায় হাদীছ অন্বেষণ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থটির সংকলনপদ্ধতি ও বিন্যাস রীতি অসাধারণ ও চমৎকার হওয়ায় হাদীছ অন্বেষণে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। গ্রন্থটি বৃহদাকার হওয়া সত্ত্বেও এর উপকারিতা বিবেচনায় পরবর্তী মনীষীগণ গ্রন্থটির তাহকীক, তা‘লীক ও তাখরীজ করেছেন। গ্রন্থটির উপকারিতা সম্পর্কে মনীষীগণ বহু মন্তব্য করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ **ইবন কাছীর:** তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, পিতার নাম ‘উমার, উপাধি ‘ইমাদুদ্দীন, উপনাম আবুল ফিদা। পিতামহ কাছীর ইবন ‘দু’-এর নামানুসারে তাকে ইবন কাছীর বলা হয়। সে যুগে বংশের কোন উর্ধ্বতন বিশেষ ব্যক্তির নামে পরিচিত হওয়ার নিয়ম ছিল। এ কারণে তিনি ইবন কাছীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ: ইসমাঈল ইবন ‘উমার ইবন কাছীর ইবন ‘দু’ ইবন দারা আল-কুরায়শী আল-বসরাবী আদ-দিমাশকী। তিনি ৭০০ হিজরী মতান্তরে ৭০১ হিজরী মেতাবেক ১৩০০ খ্রি./১৩০১ খ্রি. দিমাশকের উপকণ্ঠ ‘বসরা’র পূর্বাঞ্চলের ‘মাজদাল’ নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কিছুদিন পূর্বে তাঁর বড় ভাই ইসমাঈল এক দুর্ঘটনায় ইন্তিকাল করায় বড় ভাইয়ের নামে তাঁর নামকরণ করা হয়। তাঁর পিতা একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। সমকালীন যুগে তিনি একজন বিশিষ্ট খতীব হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। জন্মের তিন বছর পর পিতা ইন্তিকাল করলে বড় ভাই ‘আব্দুল ওয়াহাব (র) (মৃত ৭৫০ হি.) তাঁর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজ পরিবারে বড় ভাই ‘আব্দুল ওয়াহাব (র) (মৃত ৭৫০ হি.)-এর তত্ত্বাবধানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাত্র ছয় বছর বয়সেই তৎকালীন হাদীছের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র দিমাশকে উপনীত হন। এখানেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি তৎকালীন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ বিদ্যাপিঠসমূহে স্থায়ীভাবে পাঠদানসহ অতিথি শিক্ষক হিসেবেও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে কুরআন ও হাদীছের দারস প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনাতে মনোনিবেশ করে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ ও পরিচিত দুটি গ্রন্থ হলো ‘তাকসীরে ইবন কাছীর’ ও ‘জামি’উল মাসানীদ’। অতিরিক্ত অধ্যাপনা ও রচনার কারণে শেষ বয়সে তিনি চেতনার জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে ৭৪ বছর বয়সে (হিজরী বর্ষ অনুযায়ী) ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭৭৪ হিজরীর ২৩ শা’বান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তিকাল করেন। ইবন কাছীর (র)-এর অসিয়্যাত অনুযায়ী দিমাশকের সুপ্রসিদ্ধ কবরস্থান ‘আল-মাকবারাহ আস-সুফিয়াতে’ স্থায়ী শিক্ষক ইমাম ইবন তায়মিয়াহ (র)-এর পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।

দ্র. ইবনুল ‘ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতু-যাহাব*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহুইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, তা.বি.) পৃ. ২৩১; ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, ১ম খণ্ড (লাহোর: ‘আব্দুল তাওয়াব একাডেমী, তা.বি.) পৃ. ৩৭৪; ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন আয-যাহাবী, *আত-তাকসীর ওয়াল মুফাসসিরীন*, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল কুতুবিল হাদীছাহ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ২৪২; ‘আলী ইবন আহমাদ মাওয়ারদী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১১২; ইবন তাগরী বারদী, *আন-নুজুমুয্ যাহিরাহ*, ১১শ খণ্ড (মিসর: আল-মুআসাসাতুল মিসরিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১২৩; মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত-তালি*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১০২।

২ আরবী ভাষা: **وَسَمَّيْتُ كِتَابِي هَذَا (جَامِعَ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ الْهَادِيَةِ لِأَقْوَمِ سُنَنِ)**

দ্র. ইবন কাছীর, *জামি’উল মাসানীদি ওয়াস-সুনানি আল-হাদী লি-আকওয়ামিস্ সুনান*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১১।

৩ ড. নূরুদ্দীন আতার, *মানহাজুন-নাক্দ ফী ‘উলূমিল হাদীছ* (বৈরুত: দারুল মু’আসির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৯৮।

৪ ড. মুহাম্মাদ সাক্বাগ, *আল-হাদীসুন-নববী* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৩৪৮।

৫ মুহাম্মাদ আবু যাহু, *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘আরাবী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৯৮।

৬ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (আল-মু’জামুল ওয়াফী)* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১০১।

৭ ওয়াহিদুজ্জামান কাসিমী ক্যারানাবী, *আল-কামুসুল-ওয়াহীদ*, ১ম খণ্ড (দেওবন্দ: কুতুব খানায়ে হুসায়নিয়াহ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮১১।

৮ আবুল-ফযল ‘আব্দুল হাফীয বালিয়াবী, *মিসবাহুল-লুগাত* (দিল্লি: মাকতাবায়ে বুরহান, তা.বি.), পৃ. ৩৯৯।

৯ *জামি’উল মাসানীদি ওয়াস-সুনানি আল-হাদী লি-আকওয়ামিস্ সুনান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

১০ *মুকাদ্দিমাতু জামি’ইল মাসানীদি ওয়াস সুনান*, পৃ. ২৪৩।

১১ **ইবনুল আছীর:** তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি ‘ইয্ উদ্দীন; তবে তিনি ইবনুল আছীর নামে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম মুহাম্মাদ এবং দাদার নাম ‘আব্দুল করীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল হাসান ‘ইয্ উদ্দীন ‘আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল করীম ইবন ‘আব্দিল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী আল-জায়ারী (র)। তিনি ৫৫৫ হিজরীতে ‘জায়ীরায়

ইবন 'উমর'-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। পরবর্তীতে তিনি মূসলে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষে তিনি পুনরায় মূসলেই ফিরে আসেন এবং সেখানেই ৬৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক, নাসব ও আদব বিষয়ক বিজ্ঞ আলিম ও অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফতিস-সাহাবাহ, আল-কামিল ফিত-তারীখ, আল-জামি'উল কাবীর, তারীখুদ-দাওলাহ আল-আতাবিকিয়াহ, তারীখুল-মূসল ইত্যাদি।

দ্র. ইবন খাল্লিকান, *ওফয়াতুল-আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত-তুরাখিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৫; তাজ উদ্দীন আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়াহ*, ৮ম খণ্ড (কায়রো: দারুল ইহইয়াইল কুতুবিল-'আরাবিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ২৯৯; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকাইস, *মু'জামুল-মাতবু'আতিল-'আরাবিয়াহ ওয়াল-মু'আররাবাহ*, ১ম খণ্ড (কুম: মানসুরাত মাকতাবাতু আয়াতিল্লাহ আল-'আযমী, তা.বি.), পৃ. ৩৫-৩৮।

১২ উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফতিস-সাহাবাহ: গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এমন এক গ্রন্থ যে, পরবর্তীতে যেকোনো লেখক এ বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করলে উক্ত গ্রন্থের মুখাপেক্ষী হবেন। এ গ্রন্থটি সাহাবীগণের জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি প্রায় ৭৫৫৪ জন পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সাহাবীর নাম, উপনাম, বংশ পরিচয়, জন্ম-মৃত্যুর সন ও স্থান, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, মানাক্বি ও তাঁদের জীবন ঘনিষ্ঠ ঘটনাবলী সাধ্যানুযায়ী উপস্থাপন করেছেন।

দ্র. ইবনুল আত্বীর, *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফতিস সাহাবাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.) পৃ. ৫-১২; হাজী খলীফাহ, *কাশফু'য়-য়ুনুন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৮২।

১৩ সাহাবী: সাহাবী (صَحَابِي) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে اصْحَابٌ ও صُحْبٌ। শব্দটি الصَّحَابَةُ মাসদার বা ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। অর্থ সঙ্গ, সাহচর্য, সান্নিধ্য, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, সঙ্গী-সাথী ইত্যাদি। তবে (الصَّحَابَةُ) ক্রিয়ামূলটি اصْحَابٌ অর্থেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। শরী'আতের পরিভাষায় সাহাবী বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি ঈমানের অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন ও ঈমানের অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. ইবন মানযুর আল-আফরিকী, *লিসানুল-'আরব*, ৭ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত-তুরাখিল-'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৮৬; হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *নুযহাতুন-নাযর ফী তাওদীহ নুখবাতিল ফিকার* (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে বেলাল, তা. বি.), পৃ. ৮১; আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী আল-মুকরী আল-ফায্মী, *মিসবাহুল-মুনীর*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৩৩; ড. মাহমুদ আত-তাহাহান, *তায়সীর মুসতাহিল হাদীছ* (দেওবন্দ: ইত্তিহাদ বুক ডিপো, ৭ম সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৮।

১৪ তাবি'ঈ: তাবি'ঈ (تَابِعِي) বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি কোন একজন সাহাবীকে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। খতীব আল-বাগদাদী (রা)-এর মতে, তাবি'ঈ হওয়ার জন্য সাহাবীর সাক্ষাৎ যথেষ্ট নয়; সঙ্গ লাভ করা শর্ত। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সাক্ষাৎ পাওয়াই যথেষ্ট। কেননা হাদীছে এসেছে, طُوبَى لِمَنْ رَأَى رَأْيِي وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى

দ্র. 'উলুমুল হাদীছ, পৃ. ২৪৭; ড. তাক্বী উদ্দীন নদভী, *'ইলমু রিজালিল হাদীছ* (লাঙ্কো: মাকতাবায়ে ফিরদাওস, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৬; আবু 'আদিল্লাহ হাকিম আদ-দাক্বী আন-নায়সাপুরী, *মুস্তাদরাকে হাকিম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.) পৃ. ৯৬।

১৫ চার খলীফা: তাঁরা হলেন, আবু বকর (রা), 'উমার (রা), 'উছমান (রা) এবং 'আলী (রা)। তবে গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থে খলীফাগণের এ ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেননি; বরং প্রথমে আবু বকর (রা), অতঃপর 'উছমান (রা) (১৭ নং খণ্ডে), অতঃপর 'উমার (রা) (১৮ নং খণ্ডে), অতঃপর 'আলী (রা) (১৯-২০ নং খণ্ডে) এর বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

১৬ মুকছিরীন: যে সকল সাহাবী একহাজার বা তার চেয়ে অধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদেরকে মুকছিরীন বলা হয়। এমন পর্যায়ের সাহাবী সর্বমোট সাত জন। তাঁরা হলেন, ১. আবু হুরায়রা (রা) (মৃত ৫৭ হি.), ২. আনাস ইবন মালিক (রা) (মৃত ৯৩ হি.), ৩. 'আযশা সিদ্দীকা (রা) (মৃত ৫৭ হি.), ৪. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) (মৃত ৬৮ হি.), ৫. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) (মৃত ৭৩ হি.), ৬. জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ (রা) (মৃত ৭৪ হি.) এবং ৭. আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) (মৃত ৭৪ হি.)। তাঁদের বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা যথাক্রমে, ৫৩৬৪, ২২৩৬, ২২১০, ১৬৬০, ১৬৩০, ১৫৪০ ও ১১৭০টি।

দ্র. 'উলুমুল হাদীছ, পৃ. ৭৩; মুহাম্মাদ মুনাওয়ার হুসাইন, *আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা): হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান* (রাজশাহী: অপ্রকাশিত এম.এ অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮ খ্রি.) পৃ. ৬০।

১৭ মুতাওয়াসসিফীন: যে সকল সাহাবী পাঁচশত (৫০০)-এর অধিক এবং একহাজার (১০০০)-এর কম সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাঁদেরকে মুতাওয়াসসিফীন বলা হয়। এমন পর্যায়ের সাহাবী সর্বমোট চার (৪) জন। তাঁরা হলেন, ১. ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস’উদ (রা) (মৃত ৩২ হি.), ২. ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) (মৃত ৬৩ হি.), ৩. ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা) (মৃত ৪০ হি.) এবং ৪. ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) (মৃত ২৩ হি.)। তাঁদের বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা যথাক্রমে, ৮৪৮, ৭০০, ৫৮৬ ও ৫৩৯টি।

দ্র. ‘উলুমুল হাদীছ, পৃ. ৭৪; আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা): হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান, পৃ. ৬০।

১৮ মুক্ফিলীন: যে সকল সাহাবী পাঁচশত (৫০০)-এর কম এবং চল্লিশের অধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে মুক্ফিলীন বলা হয়। ইবন হাযম (র) স্বীয় গ্রন্থ ‘ফাদাইলুস-সাহাবাহ্’তে এমন সাহাবীগণের একটি বিরাট তালিকা উল্লেখ করেছেন।

দ্র. ইবন হাযম, ফাদাইলুস-সাহাবাহ্ (মিসর: দারুল মা‘আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৩১৯-৩২৫।

১৯ আবিল-লাহম আল-গিফারী (রা): তিনি একজন প্রবীণ সাহাবী। প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নামের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে তাঁর প্রকৃত নাম ‘হুওয়াইরিছ’, কারো মতে ‘খালাফ’, আবার কারো মতে ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আদিল মালিক। তবে তিনি যে গিফার গোত্রীয় ছিলেন এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। তিনি ও তাঁর আযাদকৃত দাস ‘উমায়র (রা) হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল আবিল-লাহম। তাঁর থেকে একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

দ্র. উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০; জামি’উল-মাসানীদি ওয়াস-সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

২০ আবিল-লাহম: শব্দটির অর্থ, যিনি গোশত আহার করেন না। আবিল-লাহম (রা) গোশত আহার না করার কারণ হিসেবে গ্রন্থকার বলেন, তাঁকে আবিল-লাহম বলা হয় কারণ তিনি গোশত আহার করতেন না। কারো মতে, তাঁর এ নামকরণের কারণ হলো, তৎকালীন আরবে প্রচলিত দেব-দেবীর নামে উৎসর্গকৃত কোন পশুর গোশত তিনি আহার করতেন না (সকল পশুর গোশত উদ্দেশ্য নয়)। আরবী ভাষা:

وهو صحابي قديم الإسلام. وإنما لقب بـ (أبي اللحم) لأنه كان لا يأكل اللحم ويأبى منه. وقيل كان لا يأكل ما ذبح على النصب، له حديث واحد.

দ্র. জামি’উল-মাসানীদি ওয়াস-সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

২১ হাদীছটি এই, وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى عند أحجاز الزيت وهو مفتح يديه يدعو جামি’উত-তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইবন মাজাহ ও মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে (শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ) উদ্ধৃত হয়েছে।

দ্র. জামি’উল মাসানীদি ওয়াস সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

২২ খালিদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন হারমালাহু আল-মুদলিজী (রা): তিনি সাহাবী কি-না? এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবন হাজার আল-‘আসকালানী (র) বলেন, কারো মতে, তিনি তাঁর পিতা ‘আব্দুল্লাহ ও দাদা আবু ‘আব্দিল্লাহ হারমালাহু উভয়েই সাহাবী ছিলেন। ইমাম বাগাবী (র) বলেন, তিনি অর্থাৎ খালিদ (রা) সাহাবী ছিলেন কি-না? তা আমার জানা নেই। ইবন মান্দাহ (র) স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, তিনি সাহাবী ছিলেন না। ইমাম বুখারী (র), আবু হাতিম (র) ও ইবন হিব্বান (র) তাঁকে তাবি‘ঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

দ্র. উসদুল গাবাহ ফী মা‘রিফাতিস সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০; ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফী তামইযিস-সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড (বেরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্, ১৪১৫ হি.) পৃ. ২০৬।

২৩ যেমন- খালিদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন হারমালাহু আল-মুদলিজী (রা)-এর ব্যাপারে ইবন মান্দাহ (র) এর মতামত উল্লেখ করে বলেন, قال ابن مندة: لا يصح له صحبة

দ্র. জামি’উল-মাসানীদি ওয়াস-সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭।

২৪ মু‘আয আবু যুহরাহ বা ইবন যুহরাহ আদ-দাক্বী (রা): তিনি মূলত একজন তাবি‘ঈ এবং নির্ভরযোগ্য (মাক্বুল) রাবী। তিনি ইফতারের দু‘আ বিষয়ে একটি হাদীছ মুরসালভাবে বর্ণনা করায় কেউ কেউ তাঁকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাক্বরীবুত-তাহযীব গ্রন্থকার বলেন, যে ব্যক্তি তাঁকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তার পদস্থলন হয়েছে। উসদুল-গাবাহ গ্রন্থকার হাফিয জা‘ফর (র)-এর মতামত উল্লেখ করে বলেন, তিনি একজন তাবি‘ঈ। যে ব্যক্তি তাকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি ভুল করেছেন।

- ২৯০ দ্র. উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩; ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, *তাকুরীবুত-তাহযীব* (হালব: দারুল রশীদ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৫৩৬; ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, *তাহযীবুত-তাহযীব*, ১০ম খণ্ড (ভারত: দারুল মা‘আরিফ আন-নিয়ামিয়াহ, ১৩২৬ হি.), পৃ. ১৯০; ইবন হিব্বান, *আছ-ছিকাত*, ৭ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দারুল মা‘আরিফ আল-‘উছমানিয়াহ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৪৮২।
- ২৯ জামি‘উল মাসানীদ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২৩।
- ২৬ মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল-মিসরী (রা): তিনি সাহাবী হওয়ার বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই, তবে তাঁর সনদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর আস-সুনানুল-কুবরা গ্রন্থে আবু ইদরীস সূত্রে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাতে তাঁর নামের উল্লেখ নেই। ইবন মান্দাহ (র)-এর মতে এটিই বিসৃদ্ধ মতামত। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর বিষয়ে জানা যায়নি।
- ২৭ দ্র. উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮১; আল-ইসাবাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮-৯; জামি‘উল-মাসানীদি ওয়াস-সুনান, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২৫।
- ২৮ মুবহাম: মুবহাম অর্থ অস্পষ্ট, অবোধগম্য ইত্যাদি। উসূলুল হাদীছ এর পরিভাষায়, কোন হাফিযে হাদীছ কোন ছিক্রাহ রাবীর নাম উল্লেখ করেন অপর হাফিযে হাদীছ অপর এক ছিক্রাহ রাবীর নাম উল্লেখ করেন অথবা একজন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নেয় অপরজন অনির্দিষ্ট কোন শব্দ ব্যবহার করে যেমন বলেন, ফুলান ইবন ফুলান ইত্যাদি তখন এমন রাবীকে বলা হয় মুবহাম রাবী। দ্র. আল-মুফতাহু ফি ‘ইলমি মুসতলাহিল হাদীছ, পৃ. ৫৩; আল-বা‘ইছুল হাছীছ গ্রন্থকার বলেন, মুবহাম হলো এমন রাবী, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি অথবা নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোন তথ্য জানা যায়নি।
- ২৯ দ্র. আহমাদ শাকির, *আল-বা‘ইছুল হাছীছ* (রিয়াদ: দারুল-সালাম, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯৭।
- ৩০ মাজহুল: মাজহুল শব্দের অর্থ হলো অজানা, অজ্ঞাত ইত্যাদি। উসূলুল হাদীছ এর পরিভাষায় মাজহুল বলা হয় এমন রাবীকে, যিনি একাধিক নামে পরিচিত যেমন- নিজ নাম, উপনাম, উপাধি, পেশা, বংশ, নিসবতী নাম, কোন বিশেষ গুণ ইত্যাদি; কিন্তু তিনি অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত এগুলোর মধ্য হতে কোন এক নামে। এমতাবস্থায় কোন বর্ণনাকারী তার অতি প্রসিদ্ধ নাম ব্যতিরেকে যেকোনো উদ্দেশ্যে অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত নামে উল্লেখ করলে উসূলুল হাদীছ এর পরিভাষায় তাকে মাজহুল রাবী বলা হয়।
- ৩১ দ্র. নুখবাতুল ফিকার নুযহাতুন নাযর, পৃ. ৯০।
- ৩২ সনদ: সনদ (سند) শব্দটি একবচন, বহুবচনে أسانيد। এর আভিধানিক অর্থ হলো المعتمد বা বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা। যেমন বলা হয়ে থাকে, فلان أسند এর অর্থ হলো اعتمد عليه। সনদ (سند) কে এই জন্য المعتمد বলা হয়েছে যে, হাদীছের বিশ্বস্ততা একমাত্র এর উপরই নির্ভরশীল। উসূলুল হাদীছ এর পরিভাষায় হাদীছ বর্ণনার পদ্ধতিকে সনদ (سند) বলা হয়। আর মুহাদ্দিহগণ سند এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وهو الطريق الموصلة إلى المتن أي أسماء رواة، ইবন হাজার আল-‘আসকালানী (র) বলেন, الإسناد مرتبة -‘মূল মতনে (ভাষ্য) পৌছানোর বর্ণনা পরম্পরা হলো সনদ।’ ইবন হাজার আল-‘আসকালানী (র) বলেন, الإسناد حكاية عن طريق المتن -‘মতনের পূর্বে বর্ণনা সূত্রকে সনদ বলা হয়।’
- ৩৩ দ্র. ইবরাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল-মু‘জামুল ওয়াসীতু* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল হুসায়নিয়াহ, তা.বি.) পৃ. ৪৫৪; ইবন মানযুর আল-ইফরীকী, *লিসানুল ‘আরাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল সাদির, তা.বি.) পৃ. ২২০-২২১; শায়খ ‘আব্দুল হকু দেহলভী, *মুকাদ্দামাতুশ-শায়খ ‘আব্দুল হকু* (লাহোর: মাকতাবায়ে মুস্তাফাঈ, তা.বি.) পৃ. ৩৮; শিবির আহমাদ ‘উছমানী, *মুকাদ্দামাতু ই‘লাউস-সুনান* (করাচী: আল-মাকতাবাতুস সা‘উদিয়াহ, তা.বি.) পৃ. ২০।
- ৩৪ মতন: মতন (متن) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো متون। এর বহুবচন হিসেবে متان ও ব্যবহৃত হয়। ইবন মানযুর বলেন, المتن ما صلب وارتفع من الأرض -‘মাটির উপরিভাগের কংকর ও উঁচু অংশকে متن বলা হয়।’ মুহাদ্দিহগণের পরিভাষায়, হাদীছের মূল ভাষ্য ও বক্তব্যকে মতন (متن) বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মাহমুদ তাহহান বলেন, المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام -‘যেখানে সনদের ক্রমধারা শেষ হয়, তাকে متن বলা হয়।’
- ৩৫ দ্র. *লিসানুল ‘আরাব*, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯; *তায়সীর মুসতলাহিল হাদীছ*, পৃ. ১৬; *মুকাদ্দামাতু ই‘লাউস-সুনান*, পৃ. ২০।
- ৩৬ তাকরার: তাকরার (تكرار) শব্দটি আরবী। শব্দটি বাবে তাফ‘ঈল এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হলো, পুনরাবৃত্তি, পুনরুক্তি, বারংবারতা ইত্যাদি। উসূলুল হাদীছ এর পরিভাষায়, একই হাদীছ বা হাদীছ এর অংশ বিশেষ একই গ্রন্থে একাধিকবার উল্লিখিত হওয়াকে তাকরার বলা হয়।

৩২ শায়খান: শায়খান (شَيْخَان) বা শায়খান (شَيْخَان) শব্দটি দ্বিচন, একবচনে শায়খ (شَيْخ)। যার শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধ, বয়স্ক লোক, প্রধান ব্যক্তি ইত্যাদি। পরিভাষায় مَاهِرٌ فِي الْفَنِّ অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারীকে শায়খ বলা হয়। যেমন- হাদীছ বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারীকে শায়খুল হাদীছ, তাফসীর বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারীকে শায়খুল তাফসীর বলা হয়। শব্দটি দ্বিচনে অর্থাৎ শায়খান এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের বিশিষ্ট দুজন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকে। যথা- শব্দটি যদি হাদীছ ও উসুলুল হাদীছ বিষয়ক কোন গ্রন্থে ব্যবহার হয় সেক্ষেত্রে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)। শব্দটি যদি সাহাবীগণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আবু বকর (রা) ও ‘উমার (রা)। আর যদি শব্দটি ফিকুহ বা উসুলুল ফিকুহ বিষয়ক কোন গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ইমাম আবু হানীফাহ (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)।

দ্র. মাওলানা মুজীবুল্লাহ, বায়ানুল ফাওয়ায়িদ, ১ম খণ্ড (দেওবন্দ: আমান বুক ডিপো, তা.বি.) পৃ. ৭৫।

৩৩ জামা’আহ (جَمَاعَة): জামা’আহ শব্দটি আরবী, এটি একবচন, বহুবচনে جَمَاعَات। অর্থ (মানুষের) দল, সজ্জ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জামাত ইত্যাদি। পরিভাষায়, একাধিক ব্যক্তির একত্রিত দলকে জামাত বা জামা’আহ বলা হয়। ইবন কাছীর (র) স্বীয় গ্রন্থ জামি’উল মাসানীদি ওয়াস-সুনান গ্রন্থে শব্দটিকে এক বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে কোন হাদীছ বর্ণনা করে থাকলে তিনি এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

দ্র. আল-মু’জামুল ওয়াফী, পৃ. ২৬২।

৩৪ মুকাদ্দিমাতু জামি’উল মাসানীদি ওয়াস-সুনান, পৃ. ২৫১।

৩৫ পূর্বোক্ত।

৩৬ পূর্বোক্ত।

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

৩৮ যেমন- ৫ম খণ্ডের ৩৪৪ নং পৃষ্ঠায় সালামান ইব্ন ‘আমির আদ-দাব্বী (রা)-এর নামের পর তিনি বলেন, ‘উক্ত সাহাবী ও তাঁর বর্ণিত হাদীছের আলোচনা সালামান আল-ফারিসী (রা)-এর আলোচনার পর আসবে ইনশাআল্লাহ।’ ৫ম খণ্ডেরই ৪৬৮ নং পৃষ্ঠায় সালামাহ ইব্ন জারিয়াহ (রা)-এর নামের পরে বলেন, ‘তাঁর আলোচনা সামনে আসবে।’ এরূপ বিবৃতি অসংখ্য জায়গায় এসেছে।

৩৯ যেমন- ১১শ খণ্ডের ৫২৩ নং পৃষ্ঠায় মু’আয ইব্ন সা’দ বা সা’দ ইব্ন মু’আয (রা)-এর নাম উল্লেখের পর গ্রন্থকার বলেন, ‘তাঁর আলোচনা সীন বর্ণের আলোচনায় একবার এসেছে।’

৪০ বর্ণনাটি আল-মুস্তাদরাক ‘আলাস-সহীহায়নসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপ:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: رَفَعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَمَاتَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

দ্র. আবু ‘আদিল্লাহ হাকিম আন-নায়সাপুরী, আল-মুস্তাদরাক ‘আলাস-সহীহায়ন, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩০২।

৪১ জামি’উল মাসানীদি ওয়াস সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫।

৪২ আরবী ভাষা:

هذا إسناد غريب جداً، وفيه نكارة شديدة، ولعله متلقى من الإسرائيليات اشتبه على بعض الرواة فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فعل مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وبعض العلماء كره هذه الضجة لأنها مظنة انكشاف العورة لاسيما لمن ليس عليه سراويل، والله أعلم.

দ্র. পূর্বোক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৩৮১।

৪৩ আরবী ভাষা:

إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين اتخذوا آيات الله دولا وعباد الله خوفاً وكتاباً وغلاً فإذا بلغوا سبعة وسبعين وأربعمئة كان هلاكهم أسرع من الثمرة هذا حديث منكر جداً وأبو قبيل عنده منكر كثيرة فإلله أعلم.

দ্র. পূর্বোক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৬০৪।

৪৪ বিবরণটি নিম্নরূপ:

قال شيخنا : ورواه محمد بن جرير الطبري عن محمد بن مرزوق عن أبي الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن غبادة بن الصامت عن أبي بن كعب. قال: (ما دخل قلبي منذ أسلمت). معناه.

দ্র. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

- ৪৫ ‘উরওয়াহ আল-বারিক্বী: তিনি হলেন ‘উরওয়াহ ইবনুল জা’দ আল-বারিক্বী আল-আযদী (রা)। কারো মতে, তিনি হলেন ‘উরওয়াহ ইবন আবিল জা’দ। তাকে বারিক্বী বলা হয় এজন্য যে, তাঁর পূর্বসূরী আযদ বারিক্ব নামক পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছিলেন। ইবন হিব্বান (র) তাকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি কূফাতে বসবাস করতেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন. শা’বী (র), সাবী’ঈ (র), শাবীব ইবন গুরকুদাহ (র), সিমাক ইবন হারব (র), গুরায়হ ইবন হানী (র) সহ আরো অনেকে।

দ্র. আছ-হিক্বাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪; উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫; আল-ইসাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

- ৪৬ মুসনাদুত-তায়ালিসী: গ্রন্থটির পূর্ণ নাম মুসনাদু আবী দাউদ আত-তায়ালিসী। গ্রন্থটি প্রথমে ভারতের হায়দারাবাদের দারুল-মা’আরিফ আন-নিয়ামিয়াহ থেকে ১৩২১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ড. মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দুল মুহসিন কর্তৃক তাহক্কীকসহ মিসরের ‘দার হিজর’ থেকে ১৪১৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি রচনা করেছেন আবু দাউদ সুলায়মান ইবন দাউদ ইবনুল জারদ আত-তায়ালিসী আল-বাসরী (র)। তিনি মূলত ফারিস এর অধিবাসী ছিলেন। ২০৪ হিজরীতে বসরায় তিনি ইন্তিকাল করেন। জ্ঞান অন্বেষণে তিনি বহু দেশ ও নগর পরিভ্রমণ করেন। তাঁর শিক্ষক ও ছাত্র অসংখ্য। তিনি বলেন, “আমি এক সহস্রাধিক শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীছ লিখেছি। শিক্ষকগণের মধ্যে আছেন, জারীর ইবন হাযিম (র), হাম্মাদ ইবন যায়দ (র), হাম্মাদ ইবন সালামাহ (র), শু’বাহ (র), সুফিয়ান আছ-ছাওরী (র), হিশাম আদ-দুসতুওয়াই (র) সহ আরো অনেকে। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে আছেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র), ‘আলী ইবনুল মাদীনী (র), ‘আমর ইবন ‘আলী আল-ফাল্লাস (র), মাহমুদ ইবন গায়লান (র) সহ আরো অনেকে।

দ্র. আবু দাউদ সুলায়মান আত-তায়ালিসী, মুসনাদু আবী দাউদ আত-তায়ালিসী, তাহক্কীক: ড. মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল মুহসিন আত-তুরকী, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল হিজর, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. তারজুমাতুল মুআল্লিফ; ‘উমর রিয়া কাহ্‌লাহ, মু’জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৭৮৯।

- ৪৭ সা’দ ইবন তামীম: তিনি হলেন সা’দ ইবন তামীম আস-সাকুনী। কারো মতে, তিনি আল-আশ’আরী আশ-শামী আদ-দিমাশকী (রা)। তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। তাঁর উপনাম হলো আবু বিলাল। তিনি দিমাশকের মসজিদে নামায পড়াতেন। তিনি ছিলেন একজন ওয়ায়েয। তাঁর আওয়াজ ছিল গুরু-গম্ভীর। তাঁর ছেলে বিলালও দিমাশকের জামি’ মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাঁর থেকে অধিকাংশ হাদীছ তাঁর ছেলে বিলালই বর্ণনা করেছে।

দ্র. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৩।

- ৪৮ মুস্তাদরাকে হাকিম: গ্রন্থটির পূর্ণ নাম আল-মুস্তাদরাক ‘আলাস-সহীহায়ন। গ্রন্থটি রচনা করেছেন, আবু ‘আব্দিল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামদূইয়াহ ইবন নু’আয়ম ইবনুল হাকাম আদ-দাবকী আত-তাহামানী আন-নায়সাপুরী (র)। তিনি ইবনুল বাযী’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৪০৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর এ গ্রন্থটি প্রথমে ভারতের হায়দারাবাদের দারুল-মা’আরিফ আন-নিয়ামিয়াহ থেকে ১৩৩৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বৈরুতের ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ’ থেকে মুস্তাফা ‘আব্দুল কাদির ‘আতা কর্তৃক তাহক্কীকসহ ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি. চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

দ্র. মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ‘আলাস-সহীহায়ন, তাহক্কীক: মুস্তাফা ‘আব্দুল কাদির ‘আতা, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. তারজুমাতুল মুআল্লিফ।

- ৪৯ আশ-শামাইল: গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন মুহাম্মাদ ইবন ‘ঈসা আত-তিরমিযী (র)। গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ** নামে শুরু করেছেন। এরপর স্থান লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তি জীবন, পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ বিষয়। এ গ্রন্থে ৫৬টি অনুচ্ছেদের অধীনে চারশত হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবয়ব, মোহরে নবুওয়াত, মাথা মুবারকের চুল, খেযাব ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার, মোজা পরিধান, পাদুকা, আংটি, লুঙ্গি, পাগড়ি, আহার পদ্ধতি, আহারের পূর্বে বা পরে দু’আ, খুশবু ব্যবহার, হাস্য, কবিতা, ইবাদত, নামায, রোযা, কিরাআত, শয্যা, বিনয়, চরিত্র মাধুরী, লজ্জাশীলতা, জীবিকা, বয়স, তিরোধান, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। ইমাম তিরমিযী (র)-এর পূর্বে এ ধরনের গ্রন্থ কেউ সংকলন করেননি। গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধি উপলব্ধি করে বহু মনীষী এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অনুবাদ করেছেন। হাফয ইবন হাজার মাক্কী (মৃত ৯৭৩ হিজরী), মুসলিহ উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন সালাহ জালাল (মৃত ৯৭৯ হি.), হাফয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হি.), মোল্লা ‘আলী কারী (মৃত ১০১৬ হি.), শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ‘উমার ইবন হামযা, ‘উছমান উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ (মৃত

৮৪৩ হিজরী), মুহাম্মাদ হানাফী (মৃত ৯২৬ হি.), হাফিয ম’ঈনুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃত ১০১৩ হি.), শায়খ সুলায়মান ইব্ন মানসূর ওজয়লী (মৃত ১২০৪ হি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্র. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা* (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।

- ৫০ বারী ইব্ন ‘আযিব (রা): তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, বারী ইব্ন ‘আযিব ইব্ন হারিছ ইব্ন ‘আদী ইব্ন খুশাম ইব্ন মিজদা’আহ ইব্ন হারিছাহ ইব্ন হারিছ ইব্ন ‘আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস ইব্ন ‘উমরাহ আল-আনসারী আল-আওসী (রা)। ছোট হওয়ায় বদর যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণের অনুমতি পাননি। পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে শরীক হন। তিনি পরবর্তীতে কূফাতে বসবাস করেন। ৭২ হিজরীতে ৮০ বছরের কিছু অধিক কাল অতিবাহিত করে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্র. *আছ-ছিক্বাত লি ইব্ন হিব্বান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬; *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১১৮; *আল-ইসাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১; *আল-ইত্তি’আব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

- ৫১ হাফিয আল-মিযযী (র): হাফিয মিযযী (র) হলেন তৎকালের একজন বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও আসমাউর-রিজাল বিষয়ের পণ্ডিত। তাঁর প্রকৃত নাম ইউসুফ। উপাধি জামালুদ্দীন। বংশ পরিক্রমা হলো, জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন যাকী ‘আদীর রহমান ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘আদিল মালিক ইব্ন ‘আলী ইব্ন আবীয-যাহর আল-কুদা’ঈ আল-কালবী আল-হালবী আদ-দিমশকী আল-মিযযী আশ-শাফি’ঈ (র)। তিনি ১০ রবী’উছ-ছানী ৬৫৪ হিজরীর রাতে মিযযাহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ গ্রামেই সাহাবী দিহইয়া আল-কালবী (রা)-এর কবর রয়েছে। ১২ সফর ৭৪২ হিজরীর দুপুরে তায়াম্মুম করে যোহরের নামায আদায়ের পর আসরের পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরের দিন ১৩ সফর নামাযে জানাযা শেষে মাকুবরায় সূফিয়াতে তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে এবং শায়খ তাক্বী উদ্দীন ইব্ন তায়মিয়া (র) কবরের পশ্চিমে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার ইমামতি করেন কাযী তাক্বী উদ্দীন আস-সুবকী আশ-শাফি’ঈ (র)। তাঁর জানাযায় অসংখ্য লোক সমবেত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হলো তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল ও তুহফাতুল আশরাফ বি মা’রিফাতিল আতুরাফ। তাঁর রচিত এ গ্রন্থ দুটি এমন যে, তৎপরবর্তী সকল মুহাদ্দিছ ও হাদীছ বিশারদ এ গ্রন্থ দুটির মুখাপেক্ষী।

দ্র. *মুকাদ্দিমাতু জামি’ইল মাসানীদি ওয়াস সুনান*, পৃ. ২২৪-২২৫; *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৯১-১৯২।

- ৫২ তুহফাতুল আশরাফ: গ্রন্থটির পূর্ণ নাম তুহফাতুল আশরাফ বি মা’রিফাতিল আতুরাফ। গ্রন্থটি তাখরীজ ও যাওয়ানিদ বিষয়ক হাদীছের আতুরাফ গ্রন্থ। সম্ভবত তৎপূর্বে এমন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আলিমগণ গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন হাজার (র) তাঁর *النكت الظرف* গ্রন্থে বলেন,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مِنَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ الْمُصَنَّفَةِ فِي غُلُومِ الْحَدِيثِ كِتَابٌ "تَحْفَةُ الْأَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ" تَلَفِيفُ شَيْئُونَا الْحَافِظُ أَبِي الْحَجَّاجِ يُونُسُ بْنُ الزُّكَيْيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الْمَرْزِيُّ، وَقَدْ حَصَلَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَتَنَافَسَ بِهِ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْصِيلِهِ بَعْدًا وَقَرَبًا.

-‘হামদ ও সালাতের পর, ‘উলুমুল হাদীছ বিষয়ে রচিত একটি মহান গ্রন্থ হলো তুহফাতুল আশরাফ বি মা’রিফাতিল আতুরাফ। যার রচয়িতা হলেন আমাদের শায়খ আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (র)। গ্রন্থটি দ্বারা পূর্ব-পশ্চিমের সকলে উপকার লাভ করেছে। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকল আলিম গ্রন্থটি সংগ্রহ করার জন্যে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন।’

এ গ্রন্থ থেকে প্রভাবিত হয়েই হাফিয ইব্ন কাছীর (র) জামি’উল মাসানীদি ওয়াস-সুনান গ্রন্থটি রচনা করেন এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থটির অনুসরণ ও অনুকরণ করেন। গ্রন্থটিকে অনেকে সংক্ষেপন ও সজ্জায়ন করেছেন। হাফিয যাহাবী (র) দুই খণ্ডে, আবুল ‘আব্বাস আহমাদ ইবন সা’দ আল-আন্দরাশী (র) (মৃত ৭৫০ হি.) এক খণ্ডে, ‘আলাউদ্দীন মুগালত্বাই (র) (মৃত ৭৬২ হি.), হাফিয ‘ইরাক্বী (র) (মৃত ৮০৬ হি.), তাঁর পুত্র ওয়ালীউদ্দীন আল-‘ইরাক্বী (র) (মৃত ৮২৬ হি.) ইব্ন হাজার আল-‘আসক্বালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) ইত্যাদি।

দ্র. *মুকাদ্দিমাতু জামি’ইল মাসানীদি ওয়াস সুনান*, পৃ. ২৩২।

- ৫৩ আরবী ভাষা:

ومفهوم المكثّر عنده ما زادت روايته عن ألف أو أقل بقليل كما في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه...

দ্র. ‘আব্দুল মু’ত্বী আল-ক্বাল’ঈজী, *আল-মুকাদ্দিমাহ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৫।

বাদনশৈলীতে তবলা ঘরানার নান্দনিকতা

ড. দীনবন্ধু পাল*

Abstract: In tabla playing technique there are several letters or syllables, for their application is of different ‘Gharana’ or school have aesthetical diversities. However, there are different levels of aesthetics in tabla. Accompanying and solo tabla playing among different schools. There are six tabla schools in North-Indian or Hindustani Classical, such as, (i) Delhi (ii) Lucknow (iii) Farrukhabad (iv) Ajrara (v) Banaras and (vi) Panjab school. However, Delhi School is considered as an aboriginal school of Tabla. Because, the other schools are created from Delhi School. There are aesthetical variations in tabla playing style from one school to another. The main reason for the variations are difference in tabla playing style, fingering and application of syllables in compositions. By finger using technique on table-bayan, the melody, beat and rhythm become more elegant and pleasant. Although different school’s expressionism of creativity is notable, like in Delhi and Ajrara School the Kaidas are euphonious and enriched with fine layakari. The use of Kaida, Rela, Peshkar and gat is seen in Farrukhabad and Lucknow School. Complex rhythmic variations are observed in Panjab and Banaras School. Artists from Lucknow School play ‘Laggi’ towards the end of the Tabla Lehra presentation. In Panjab and Banaras School the Tukra, Chakradhar, Chalan, Paran are large in size and the use of syllables from pakhawaj in table are notable. By this characteristics among school, Table playing aesthetics become multidimensional.

ভূমিকা

বিশ্বচরাচরে মানুষ প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে মিশে আছে। মানুষের সৃষ্টিশীল কর্ম, প্রকৃতিকে করেছে নান্দনিক, সুরম্য ও আধুনিকভাবে রূপায়িত। মানুষের আহাৰ, বিহার, নিদ্রা, এককথায় জাগতিক সমগ্র কর্মকাণ্ড শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। শিল্পের ব্যাপক ও বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মধ্যে প্রধান শিল্পমাধ্যমের অন্যতম ‘সংগীত’।

সংগীতের আবার তিনটি শাখা যথা- ক. গীত খ. বাদ্য ও গ. নৃত্য। এই সকল শাখা-প্রশাখার মধ্যে রয়েছে একটা আন্ত সম্পর্ক, রয়েছে স্ব-স্ব শাখায় নিজস্ব ঘরানা বা পরম্পরা।

ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি যে, প্রাগৈতিহাসিক কালে গুহাবাসি মানুষেরা এক প্রকার জাদু বিশ্বাস থেকে গুহাভ্যন্তরে শিকারে সফল হবার নিমিত্তে চিত্রআঁকা, উচ্চ স্বরে চিৎকার করে গীত এবং লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্য করতেন। আর সেখান থেকেই শিল্পের সূচনা। যুগ পরিক্রমায় আজ আমরা আধুনিক যুগের মানুষ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই যুগে বলতে গেলে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। সেই সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধান শিল্পগুলো মানুষের মনোজাগতিক উৎকর্ষতা সাধন করে আসছে। সংগীত ও সেই প্রাচীন রীতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা বা ঘরানার মাধ্যমে বিকশিত হয়ে আসছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে সংগীতের বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্যতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন শৈলী ও ঘরানার মাধ্যমে সংগীত মানব হৃদয়কে ভাবরসে পুষ্ট করে সৃষ্টিশীল ও মানবিক করে তুলেছে। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে ‘ঘরানা’ পরিভাষাটি বিংশ শতাব্দীতেই প্রচলিত হয়। ‘ঘরানা’ শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ‘ঘর’ শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ বহুবিদ যেমন আবাসস্থল, পরিবার, কুটুম্ব, সম্প্রদায়, বংশ-পরম্পরা, বর্গ ইত্যাদি।^১

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রখ্যাত সংগীত শাস্ত্রী ড. বিমল রায় মহাশয় বলেছেন : ঘরানা যে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। ঘরানার পিছনে থাকে ঐকান্তিকতা, সাধনা, সৃজনশীলতা, বিশিষ্টতা এবং অনন্যতা।^২

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলা অন্যতম। তবলা বাদনশৈলীর বেশকিছু ঘরানা রয়েছে। একেক ঘরানার style বা শৈলীতে কিছু সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য রয়েছে। উচ্চ সৃজনশীল ব্যক্তি মাত্রই প্রচলিত ধারায় সম্ভ্রষ্ট হতে পারেন না। তাঁর নিজস্ব সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটান স্বকীয় প্রকাশ রীতিতে। তবলার ক্ষেত্রে কোন গুণীশিল্পী যখন আপন প্রতিভা বলে একটি স্বকীয় বাদন ধারার প্রবর্তন করেন এবং তা যখন তার শিষ্য ও প্রশিষ্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হয় তখন তাকে ঘরানা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তবলার হস্তপাঠ থেকে শুরু করে লহড়া বাদনের যে ধারাবাহিকতা রয়েছে যেমন : কায়দা, রেলা, উঠান, পেশকার, গং, পরণ ও চক্রদার ইত্যাদি। বোলবাণী বাদনক্রিয়ার সময় ঘরানা ভেদে হস্তসঞ্চালনের কারণেই নান্দনিকতারও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রত্যেক ঘরানার বাদনশৈলী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতায় সমুজ্জ্বল।

বিষয় বিবরণ

ঘরানা বলতে সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্যময় রীতিকে বোঝায়, যা প্রচলিত আর দু-একটি রীতি থেকে পৃথক।

প্রকৃতপক্ষে শৈলীর (style) অপর নামই ‘ঘরানা’। কলা সার্থকতা বলতে সুন্দরের আবিষ্কারকে বোঝায়। কোন একটি বিশিষ্ট চণ্ড বা রীতিতে যখন সেই সুন্দর অভিব্যক্ত হয়, তখনই ঘরানার জন্ম হয়। অবশ্যই সেই চণ্ড বা রীতি কয়েক প্রজন্ম যাবৎ অনুসৃত এবং অনুশীলিত হতে হবে।^৩

‘ঘরানা’ কোনো পেশাদার ব্যবসায়িক সংগীতজ্ঞ পরিবারের সংগীত পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য। ঘরানা সাধারণত কোনো সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি, স্থান বা সংগীতজ্ঞ বংশের নামানুসারেই ঘরানা চিহ্নিত হয়ে থাকে। সংগীতের তিন শাখা, যথা- গীত-বাদ্য-নর্তন ভেদে সংগীত ঘরানারও তিন প্রকার ভেদ রয়েছে। যেমন- (ক) গায়ক ঘরানা, (খ) বাদক ঘরানা এবং (গ) নর্তন ঘরানা।^৪

(ক) গীত : গীত অর্থ গান। আমরা বলি সংগীত। সম+গীত (সন্ধি বিচ্ছেদে)। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীত কে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) উচ্চাঙ্গসংগীত (২) লঘুসংগীত। উচ্চাঙ্গসংগীতের আবার কয়েকটি শৈলী রয়েছে যেমন- খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, ঠুমরী, চতুরঙ্গ, দ্রিট, তারানা ইত্যাদি। (২) লঘু সংগীত : লঘুসংগীতকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা হয় যথা- (ক) আধুনিক বাংলা গান বা বাংলা গানের ধারা (খ) লোকসংগীত বা লোকজ সংগীত।

(ক) আধুনিক বাংলাগান : ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক বাংলাগানের এক বিশাল জগৎ রয়েছে। কালজয়ী কবি, সাহিত্যিক গীতিকারের রচনায় এবং সুরকার ও কালজয়ী শিল্পীর কণ্ঠে অন্যান্য ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক বাংলাগানের এই জগতকে আমরা এই ভাবে ভাগ করতে পারি যেমন- পুরাতনী, রবীন্দ্র, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, এবং রজনীকান্ত সেন। সংগীতভূবনে তাঁরা পঞ্চকবির গান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত এবং এক একজন গীতকবির গীতশৈলীর একেকটি ঘরানায় বিস্তৃতি লাভ করেছে।

(খ) লোকসংগীত : লোক মানুষের সহজ সরল মনের কথা, সহজ সাবলীল গীতছন্দে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করে যে সংগীত তাহাই লোকসংগীত। বাংলার লোকসংগীতের ভুবন বিশাল ও বিস্তৃত। লোকসংগীতকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা হয় যথা- ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী, শরিয়তী, মারফতী, গম্ভীরা, কবিগান, আলকাপ, যাত্রাপালা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ভাগেরই রয়েছে নিজস্ব ঘরানা বা পরম্পরা।

বাদ্য : বাদ্য হলো বাদ্যযন্ত্র যা বাজিয়ে সুর, তাল, ও ছন্দের মায়াজাল সৃষ্টি করা হয়। সংগীতে তালযন্ত্রগুলো ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। বাদ্যকে প্রধানত ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা তত, শুষ্ক, ঘন, আনন্দ বা অবনন্দ।

তত : তত অর্থ ধাতব তার। কাঠ, ধাতু, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা তৈরি অবয়বের উপর ধাতব তার শক্ত ও টান টান করে বেঁধে যে যন্ত্র তৈরি করা হয় তাই তারযন্ত্র। তার দ্বারা নির্মিত অনেক ধরনের যন্ত্র রয়েছে। প্রাচীনকালে তত যন্ত্রের মধ্যে সবই বীণা নামে পরিচিত ছিল যেমন- রুদ্রবীণা, শততন্ত্রীবীণা (আধুনিক নাম-সম্বর), কচ্ছপবীণা, মোহনবীণা, নারদবীণা ইত্যাদি।

উত্তরভারতীয় সংগীত ঘরানায় বীণার আধুনিক রূপায়ন হিসেবে দেখা যায়- সেতার, সরোদ, সম্বর, সারেঙ্গী, এশ্রাজ ইত্যাদি। এছাড়া তত যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে- একতারা, দোতারা, সারিন্দা, ইত্যাদি এগুলো আবার বাংলার লোকবাদ্যযন্ত্র। তারযন্ত্রের মধ্যে যত রকমের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির রয়েছে স্বতন্ত্র ঘরানা ও পরম্পরা।

শুষ্ক : শ্বাস প্রশ্বাস বা ফুৎকারের সাহায্যে যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাহাই শুষ্ক বাদ্যযন্ত্র নামে পরিচিত। যেমন- হারমোনিয়াম, পিয়ানো, বাঁশি, ইত্যাদি। বাঁশির মধ্যে বাঁশের বাঁশি, কর্ণেট, ফ্লুট ইত্যাদি সবই শুষ্ক শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র। এই প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রেরই স্ব-স্ব ঘরানা ও পরম্পরা রয়েছে।

ঘন : ধাতুর তৈরি বাদ্যযন্ত্র যার একাধিক অংশ থাকে এবং পরস্পর আঘাতের মাধ্যমে সুললিত সুরছন্দ ধ্বনিত হয় সেই সকল বাদ্যযন্ত্রকেই ঘন শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র বলে পরিচিত। যেমন- করতাল, মন্দিরা, সুরতরঙ্গ, বানবানি বা বাঁঝা ইত্যাদি। সংগীতে তালযন্ত্র হিসেবে স্ব-স্ব ঘরানার এই যন্ত্রগুলো বিভিন্ন সংগীতশৈলীতে সমধিক ব্যবহৃত হয়।

আনন্দ বা অবনন্দ : কাঠ, মাটি, ধাতু নির্মিত অবয়ব খোলের উপর চর্ম আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রগুলোই আনন্দ বা অবনন্দ শ্রেণিভুক্ত। যেমন- তবলা, মৃদঙ্গম, পাখোয়াজ, ঢোল, ঢাক, নাকড়া, শ্রীখোল, ইত্যাদি। আনন্দ শ্রেণির এই বাদ্যযন্ত্রগুলো স্ব-স্ব ঘরানা ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। তবে উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রায় সকল শাখায় তালযন্ত্রের মধ্যে অন্যতম বাদ্যযন্ত্র ‘তবলা’ বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় তালযন্ত্র। সেই সুদূর অতীত হতে তবলা স্বতন্ত্রবাদনশৈলীসহ সংগীতের প্রায় সকল শাখায় তাল সংগীতে সমাদৃত হয়ে আসছে। সংগীতের অন্য সকল শাখায় যেমন স্বকীয় ঘরানা রয়েছে। তেমনি তবলা বাদনশৈলীরও স্বকীয় ঘরানা বা পরম্পরা রয়েছে। আর প্রতিটি ঘরানার বাদনশৈলী স্বীয় নান্দনিকতার মাধ্যমে দর্শক হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

(গ) নৃত্য : নৃত্যেরও তাল, ছন্দ, লয়, এবং লয়ের প্রকারভেদ রয়েছে। রয়েছে নিজস্ব ঘরানা ও পরম্পরা। আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে বিভিন্ন নৃত্যশৈলী গুরুশিষ্য পরম্পরা ও ঘরানা পরম্পরায় বিকাশ লাভ করেছে। উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে শাস্ত্রীয় নৃত্য ও লঘুনৃত্যশৈলী বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্য যথা কথক, ভরতনাট্যম, কথাকলি, ওডিসি ইত্যাদি এবং লঘুনৃত্যশৈলী ও ঘরানা পরম্পরা বিকশিত হয়ে আসছে।

আমরা জানি ঘরানা শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিবার, উত্তর ভারতীয় সংগীতে বা হিন্দুস্থানী সংগীতে ঘরানার একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যদিও বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ফলে বিভিন্ন ঘরানার মিশ্রণ প্রভাব লক্ষণীয় কিন্তু কোনো শিল্পীর যদি একটি ঘরানার বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে অন্য কোন্ ঘরানার তালিম কোন্ মতেই আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। তবে ঘরানা পরিচালিত হয় পারিবারিক ও শিষ্য প্রশিষ্য ভিত্তিক। পারিবারিক সূত্রে ঘরানায় কন্যার চেয়ে পুত্রের প্রভাব বেশি লক্ষণীয়। কেননা পিতৃপুরুষদের পেশায় নিযুক্ত থেকে পুত্র/পুত্রগণ ঘরানা পরম্পরাকে ধরে রাখতে পারেন। অবশ্য অনেক শিল্পী নিজ শিষ্য প্রশিষ্যকে

অনুরূপ তালিম দিয়ে পরম্পরার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। নিজেদের বংশের ভিতর ঘরানার ঐশ্বর্য ধরে রাখার জন্য অনেক সময় শিষ্যকে নিজের পুত্র / কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।^৫

যখনই কোন্ শিল্পী বিশেষ কোন্ ঘরানার তালিমপ্রাপ্ত হবেন সেই ক্ষেত্রে তাঁর অর্থাৎ কণ্ঠসংগীত শিল্পী হলে তাঁর গায়নশৈলী শুনে আমরা সহজেই বলে দিতে পারি, শিল্পী কোন ঘরানার তালিমপ্রাপ্ত। তেমনি যন্ত্রসংগীত শিল্পীর ক্ষেত্রেও তাঁর বাদনশৈলী শুনে বলা যায় যন্ত্রসংগীত শিল্পী কোন ঘরানার তালিমপ্রাপ্ত।

প্রতিষ্ঠিত তবলা ঘরানার সংখ্যা ছয়টি। এই ছয়টি ঘরানার নামকরণ হয়েছে ভৌগলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। যথা— দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, ফারুখাবাদ, বেনারস, আজরাড়া ও পাঞ্জাব। এক ঘরানার বাদনশৈলীর সাথে অন্য ঘরানার বাদনশৈলীর পার্থক্য ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে আগের যুগে এই বাদনশৈলীর প্রভেদ বেশি ছিল তার কারণ এক ঘরানার শিল্পীর বাদনশৈলী অন্য ঘরানার শিল্পী সেইভাবে শুনতে ও দেখতে পেতেন না। কিন্তু বর্তমানকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তির জন্য শিল্পীগণ একস্থান থেকে অন্যস্থানে খুব সহজেই যেতে পারেন এবং একজন শিল্পী অন্য শিল্পীর নান্দনিকতা শুনতে, বুঝতে ও দেখতে পারেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন ঘরানার গুরু বা শিক্ষক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় একজন শিষ্য একাধিক ঘরানার গুরুর কাছে তালিমপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু এই ধরনের গুরুশিষ্য পরম্পরায় বিভিন্ন ঘরানার মিশ্র নান্দনিকতা প্রকাশ পায়। তবলার প্রচলিত যে কোনো ঘরানার বৈশিষ্ট্য যে নান্দনিকতা স্বতন্ত্রতা লাভ করে তা ঘরানাদার শিল্পীর সাধনার সাথে সম্পৃক্ত। একজন তবলাশিল্পীর বাদনক্রিয়া শুনেই যেমন আমরা শিল্পীকে ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, তেমনি সেই ঘরানার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন পেশকার, উঠান, কায়দা, রেলা ইত্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে ঘরানার শিল্পীদের চিহ্নিত করতে পারি। সংগীতের সরগম এর মতো তবলার বাদনক্রিয়ার যে বর্ণ বা বাণী আছে সেগুলোর প্রায়োগিক বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন ঘরানার নান্দনিকতা বিচিত্র। এছাড়া কায়দা, রেলা, উঠান, পেশকার, গৎ, টুকড়া, পরণ, চক্রদার ইত্যাদি পরিবেশনায় ঘরানার বৈশিষ্ট্য সমুন্নত থাকে। এগুলির সংজ্ঞা এবং প্রায়োগিক বিষয় স্বতন্ত্র। আবার বিভিন্ন তালের বাদনক্রিয়া এবং স্বতন্ত্র বাদনেও ঘরানা বিশেষে নান্দনিকতা ভিন্নমাত্রার হয়ে থাকে। যেমন তবলার প্রচলিত ঘরানায় স্বতন্ত্র বাদনে স্থায়ীবিস্তার শ্রেণির রচনা ও বন্দিশ্রেণির রচনার বোলবাণী পর্যায়ক্রমে পরিবেশিত হয়। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে, কোনো কোনো ঘরানায় স্থায়ীবিস্তার শ্রেণির রচনার ব্যবহার বেশি করে, আবার কোনো কোনো ঘরানার স্থায়ীবিস্তার শ্রেণির রচনার থেকে বন্দিশ্রেণির রচনার প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবার কোনো কোনো ঘরানায় স্থায়ীবিস্তার শ্রেণির রচনা এবং বন্দিশ্রেণির রচনার প্রাধান্য সমানভাবে হয়ে থাকে। তবে প্রচলিত তবলা ঘরানার যে শ্রেণির যে রচনার ব্যবহার হোকনা কেন প্রত্যেক ঘরানার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা বাদনশৈলীতে নিজ নিজ গুণে গুণান্বিত।

ঘরানা অনুযায়ী হস্তপাঠের বৈশিষ্ট্য

দিল্লি, আজরাড়া, ফারুখাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার আঙ্গুল সঞ্চালনের কৌশল প্রায় একইরকম। যেমন— তবলার বর্ণ ও বাণীর মধ্যে ‘তা’ বা ‘না’ বাণীটির বাদন ক্রিয়া। এই সকল ঘরানায় অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলদ্বয় তবলার গাবের সাইডে রেখে মধ্যমা আঙ্গুলটি একটু উঁচু করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলটি তবলার পাগড়ির বাইরে রেখে তর্জনী আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে তবলার কিনারে বা কানিতে আঘাত করে ‘তা’ বা ‘না’ বাণীটি উৎপন্ন করা হয়। সে কারণে এই ঘরানার শিল্পীদের তা বা না এর আওয়াজ খুবই শ্রুতিমধুর খোলা ও স্পষ্ট হয়। কিন্তু বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পীদের ‘তা’ বা ‘না’ এর আওয়াজ উপর্যুক্ত ঘরানার শিল্পীদের চাইতে একটু বন্ধ প্রকৃতির হয়। কারণ এই ঘরানার শিল্পীগণ ‘তা’ বা ‘না’ বাজাবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলটি তবলার পাগড়ির উপরে রাখে। কিন্তু অন্যান্য আঙ্গুল সঞ্চালন প্রায় একইরকমের হয়। তবে এই দুই ঘরানার শিল্পীদের তবলার সুর-স্থানের আওয়াজ অন্যান্য ঘরানার চাইতে খুবই শ্রুতিমধুর এবং খোলা। ‘তা’ বা ‘না’

কিংবা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হস্তপাঠ বাণীর সাধনার ক্ষেত্রে ঘরানাগত পরম্পরায় বিশেষভাবে দক্ষ শিল্পীর হাতে নান্দনিকতা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। একজন কণ্ঠসংগীত শিল্পী প্রাথমিকভাবে অলঙ্কার অভ্যাস করেন। এই আলঙ্কারিক অভ্যাসগুলো পরিণত শিল্পীর পর্যায়ে আসতে আসতে বিভিন্ন রাগের মাধ্যমে ভাব-রসে সমৃদ্ধ হয়। তেমনি যন্ত্রসংগীতের তবলার ক্ষেত্রে হস্তপাঠের এইসব বর্ণ বা বাণী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন তালে স্বতন্ত্র বাদনের (তবলা লহড়া) মধ্যে উৎকর্ষতা লাভ করে এবং ঘরানার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রতার পর্যায়ভুক্ত হয়।

কায়দা বাদনে ঘরানার বৈশিষ্ট্য

তবলার বিভিন্ন রচনার মধ্যে যেমন কায়দা বাজাবার সময় প্রায় সকল ঘরানায় তবলার কিনারের বা কানির বাদন ক্রিয়া সর্বাধিক হয়ে থাকে। এখানে জনপ্রিয় একটি কায়দার উদাহরণ দেওয়া হলো, প্রায় সকল ঘরানার শিল্পীগণ এই কায়দাটি বাজিয়ে থাকেন। তবে তা বাদনশৈলীর মাধ্যমেই ঘরানা অনুযায়ী নান্দনিকতা প্রকাশ পায়।

উদাহরণ-১: এই কায়দাটি ত্রিতালে নিবদ্ধ

ধাতেরে	কেটেধে	তেটে	ঘেনে
১	২	৩	৪
ধাতি	ঘেনে	থুনা	কতা
৫	৬	৭	৮
তাতেরে	কেটেধে	তেটে	ঘেনে
৯	১০	১১	১২
ধাতি	ঘেনে	ধিনা	ঘেনা
১৩	১৪	১৫	১৬

উক্ত কায়দাটির বাদনক্রিয়া প্রায় সকল ঘরানায় একই রকম। তবে আমরা যখন কায়দাটি পাঠ করছি তখন বলছি ‘ঘেনে’ কিন্তু বাদন ক্রিয়ার সময় ‘নে’ বাণীটিকে ‘না’ করে নিয়ে তবলার কানিতে বাজাচ্ছি। আসলে যা হওয়ার কথা ছিল ‘নে’ বাণীটি তবলার গাবের সাইডে অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলের দ্বারা। আসলে শুনতে বা পরিবেশনার সুবিধার্থে ‘নে’ বাণীটিকে ‘না’ করে বাজানো হচ্ছে। সেই জন্য কায়দাটি বলতে গেলে বা পাঠ করতে গেলে উচ্চারণটি হতো ‘ঘেনা’ কিন্তু শুনতে ভালো লাগার জন্যই ‘ঘেনে’ বলা হচ্ছে, লিখাও হয়েছে ‘ঘেনে’।

উদাহরণ-২ : কায়দা, দিল্লি ঘরানা, এই কায়দাটি ত্রিতালে নিবদ্ধ।

ধাতে	টেধা	তেটে	ধাধা
১	২	৩	৪
তেটে	ধাগে	থুনা	কতা
৫	৬	৭	৮
তাতে	টেতা	তেটে	তাতা
৯	১০	১১	১২
তেটে	ধাগে	ধিনা	ঘেনা
১৩	১৪	১৫	১৬

এই কায়দাটিও খুবই জনপ্রিয় এবং সকল ঘরানার শিল্পীগণ বাজিয়ে থাকেন। তবে এই কায়দাটি দিল্লি ঘরানার এবং এই ঘরানার শিল্পীদের বাদন ক্রিয়ায় যে নান্দনিকতা প্রকাশ পাবে তা অন্য ঘরানার শিল্পীদের বাদনশৈলীতে নাও প্রকাশ পেতে পারে। কারণ আঙ্গুল সঞ্চালনের মধ্য দিয়েই এর নান্দনিকতা প্রকাশ পায়। যেমন- এই কায়দাটি যদি বেনারস ঘরানার শিল্পীগণ পরিবেশন করেন তাহলে কায়দাটির ‘তেটে’ বাণীটি তাঁরা হাতের চোটো দ্বারা বাজাবেন। কিন্তু আসলে ‘তেটে’ বাণীটি মধ্যমা ও তর্জনির অগ্রভাগ দিয়ে তবলার গাবের মাঝখানে এর বাদন ক্রিয়া করে থাকেন দিল্লি, আজরাড়া, ফারুখাবাদ, ও লক্ষ্মৌ ঘরানার শিল্পীগণ। তবলার বিভিন্ন ধরনের রচনার বাদনক্রিয়া নির্ভর করে আঙ্গুল সঞ্চালনের উপর। মূলত যে ঘরানার যে রচনা সেই ঘরানার শিল্পীদের বাদন ক্রিয়ার মাধ্যমেই বিভিন্ন রচনার নান্দনিকতা প্রকাশ পায়।

রেলা বাদনে ঘরানার বৈশিষ্ট্য

রেলা বাজাবার সময় ফারুখাবাদ, আজরাড়া, লক্ষ্মৌ ও দিল্লি ঘরানার বাদকগণ ‘ধা’ বা ‘তা’ বাজাবার সময় তবলার কিনার বা কানির ব্যবহার অধিক পরিমাণে করে থাকেন। কিন্তু বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার বাদকগণ রেলা বাজাবার সময় তবলার কিনারে না বাজিয়ে সুর-স্থানের ব্যবহার অধিক পরিমাণে করে থাকেন। এখানে একটি ফারুখাবাদ ঘরানার জনপ্রিয় রেলার উদাহরণ দেওয়া হলো, যা অন্যান্য ঘরানায়ও এই রেলার বাদন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ : রেলা ত্রিতাল, ফারুখাবাদ ঘরানার।

ঘেরেনাগ	তাগতেটে	ঘেরেনাগ	ধাতেটে
১	২	৩	৪
ঘেরেনাগ	তাগতেটে	ঘেরেনাগ	ধাতেটে
৫	৬	৭	৮
কেরেনাক	তাকতেটে	কেরেনাক	তাতেটে
৯	১০	১১	১২
ঘেরেনাগ	তাগতেটে	ঘেরেনাগ	ধাতেটে
১৩	১৪	১৫	১৬

উক্ত রেলাটি আমরা যখন মুখে বলছি ‘ঘেরেনাগ’ কিন্তু বাদনক্রিয়ার সময় বাজাচ্ছি ‘ঘেরেতাগ’ যা বাদনক্রিয়াটি হওয়ার কথা তবলার কিনার বা কানিতে তর্জনি দ্বারা, কিন্তু তা না হয়ে বাদনক্রিয়াটি হচ্ছে তবলার গাবে তর্জনি দ্বারা মূলত শুনতে ভাল লাগার জন্য বলছি ‘ঘেরেনাগ’ বাজাচ্ছি ‘ঘেরেতাগ’ || ‘ধাতেটে’ এই বাণীটি তবলার কিনার বা কানিতে বাজানো হয়। কিন্তু বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পীগণ কানির স্থানের পরিবর্তে সুর-স্থানে ‘ধাতেটে’ বাণীর বাদন ক্রিয়া করে থাকেন।

রেলার বাদনক্রিয়ার সময় আঙ্গুল পরিচালনা বা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কিছু রদবদল ঘটে প্রায় সকল ঘরানায়। কারণ বাদনক্রিয়ার নান্দনিকতা ও দ্রুত লয়ে বাদনক্রিয়ার জন্যই আঙ্গুল সঞ্চালনের রদবদল করা হয়ে থাকে। হস্তসাধন বৈশিষ্ট্যে ‘তা’ বা ‘না’ বিষয়ে যে আলোচনা করেছি তা রেলার বাদনশৈলীতে সুস্পষ্ট হয়। এবং যে কোনো কম্পোজিশন পরিবেশনার ক্ষেত্রে বারবার যে ভাবনাটা মনে রাখতে হবে তা হলো কোনো

সময় হাত বা বডি সঞ্চালন শক্ত বা বিকৃতি না ঘটে। শক্ত বা বিকৃতি ঘটলে বাদনক্রিয়ায় নান্দনিকতা ও দ্রুত লয়ে পরিবেশন করা কোনোটাই সম্ভব হবে না। কারণ বাদনক্রিয়ার সময় আঙ্গুল সঞ্চালনের সাথে শারীরিক Moovement এর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে।

রেলার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। ত্রিতালে নিবন্ধ।

ধাতেরে	কেটেঘেরে	ধেড়েধেড়ে	ঘেরেনাগ	
১	২	৩	৪	
ধাতেরে	ঘেরেনাগ	ধাতেরে	ঘেরেনাগ	
৫	৬	৭	৮	
ধাতেরে	কেটেকেরে	তেড়েতেড়ে	কেরেনাক	
৯	১০	১১	১২	
ধাতেরে	ঘেরেনাগ	ধাতেরে	ঘেরেনাগ	
১৩	১৪	১৫	১৬	

উক্ত রেলাটি ‘ধেড়েধেড়ে’ সম্বলিত। ফারুখাবাদ, দিল্লি, আজরাড়া ও লঙ্কো ঘরনায় এই রেলাটির বাদনক্রিয়া প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে। বিশেষ করে ফারুখাবাদ ঘরানার শিল্পীগণ ‘ধেড়েধেড়ে’ সম্বলিত রেলার বাদনক্রিয়ায় উচ্চমার্গের নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটান। কেননা বাঁয়ার মিড় এর কাজ এবং বাঁয়ার আওয়াজের ছোট, বড় পরিমাপ যা ফারুখাবাদ ঘরানার আবিষ্কার বা বৈশিষ্ট্য। যার কারণে এই ঘরানার শিল্পীগণ বিশেষ করে ‘ধেড়েধেড়ে’ সম্বলিত রেলা কিংবা ‘তেরেকেটে’ সম্বলিত রেলার বাদনক্রিয়ায় বাঁয়া এবং তবলার সংমিশ্রণে উচ্চমার্গের নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এক্ষেত্রে ‘ধেড়েধেড়ে’ রেলার বাদনক্রিয়ায় বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পীগণ বেশির ভাগ হাতের তালু দিয়ে বাজিয়ে থাকেন। আঙ্গুলের ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু ফারুখাবাদ, আজরাড়া, দিল্লি ও লঙ্কো ঘরানার শিল্পীগণ ‘ধেড়েধেড়ে’ রেলার বাদনক্রিয়ার হাতের তালু এবং আঙ্গুলের ব্যবহার লক্ষণীয়। ‘ধেড়েধেড়ে’ সম্বলিত রেলার বাদনক্রিয়া সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা ছাড়া কোনো ঘরানার শিল্পীদের ‘ধেড়েধেড়ে’ সম্বলিত রেলার বাদনক্রিয়া বা পরিবেশন করা বিশেষভাবে কষ্টসাধ্য। এই ক্ষেত্রে সঠিক গুরুর সঠিক আঙ্গুল সঞ্চালনার রীতি যদি না থাকে তাহলে সাধনা করলেও দেখা যাবে যে সঠিক আওয়াজ বা নান্দনিকতা প্রকাশ হচ্ছে না।

টুকড়া, গৎ, চক্রদার ও পরণ বাদনে ঘরানাগত বৈশিষ্ট্য এগুলো ত্রিতালে নিবন্ধ।

বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পীগণ গৎ, টুকড়া, পরণ, চক্রদার ইত্যাদি বন্দিশ শ্রেণির রচনা বাজাবার সময় পাখোয়াজের বাদনশৈলীর মতো করে এই রচনাগুলো পরিবেশন করে থাকেন। দিল্লি, আজরাড়া ফারুখাবাদ ও লঙ্কো ঘরানার শিল্পীগণ এই সব বন্দিশ শ্রেণির রচনাগুলো তবলার বাদনশৈলীর অনুসরণে করে থাকেন।

টুকড়া

+

ধাধা তেটে তেটেতেটে ঘেঘেতেটে গদিঘেনে তাকেটে ধা-নেধা তেটেকতা গদিঘেনে |

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

+

ধাতিং ধাতেটে কতাগদিঘেনে ধাতিংধা তেটেকতা গদিঘেনে ধাতিং (ধা) + |

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

উক্ত টুকড়াটি বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পীদের বাদনক্রিয়ার ক্ষেত্রে ‘তেটে’ ‘ঘেঘে’ ‘গদিঘেনে’ এবং তিহাই এর ‘ধা’ বাণীগুলো পাখোয়াজের বাদনক্রিয়ার মতো করে তবলায় পরিবেশন করেন। বাণীগুলো শুনতে খোলা গভীর প্রকৃতির মনে হয় এবং পাখোয়াজ বাদনশৈলীর নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দিল্লি, আজরাড়া, ফারুখাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার শিল্পীগণ উক্ত টুকড়াটি তবলার বাদনক্রিয়ায় অত্যন্ত শ্রুতিমধুর করে তোলেন। তবলার বাদনশৈলীর মাধ্যমে উক্ত ঘরানার শিল্পীগণ আরো উচ্চ মার্গের নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটান। যদিও ‘টুকরা’ কম্পোজিশনে তবলা ও পাখোয়াজের বাণীর সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। তাই তবলার সকল ঘরানায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগত টুকড়া বাদনে নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটে।

পরণ ত্রিতালে নিবন্ধ।

+

ধাগেতেটে তাগেতেটে গদিঘেনে নাগেতেটে কেটেতাগ তাগেতেটে গদিঘেনে নাগেতেটে |

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

+

গদিঘেনে গদিঘেনে ধাধা গদিঘেনে গদিঘেনে ধাধা গদিঘেনে গদিঘেনে (ধা) + |

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ ১

পরণ, পাখোয়াজের বন্দিশ্রেণির রচনার মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন ধরনের পরণের রেওয়াজ পাখোয়াজ ঘরানায় বিদ্যমান। বেনারস, পাঞ্জাব ও লক্ষ্ণৌ ঘরানায় পাখোয়াজের বিভিন্ন ধরনের রচনা বাদনক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। কাজেই এই ঘরানাগুলোর শিল্পীগণ স্বতন্ত্র বাদন এবং সহযোগী বাদনে পাখোয়াজের বিভিন্ন ধরনের রচনা পরিবেশন করে থাকেন। কিন্তু উক্ত ঘরানাগুলোর তুলনায় দিল্লি, আজরাড়া ও ফারুখাবাদ ঘরানার শিল্পীগণ পাখোয়াজের বিভিন্ন রচনা কম পরিবেশন করে থাকেন। তবে বর্তমান পণ্ডিতগণ তবলা এবং পাখোয়াজের বিভিন্ন কম্পোজিশন উভয় শৈলীতেই বহুলভাবে ব্যবহার করছেন বা চলমান, যা এক বিশাল আবিষ্কার বলে আমি মনে করি।

চক্রদার ত্রিতালে নিবন্ধ।

+

ধাগেতেটে তাগেতেটে গদিঘেনে নাগেতেটে কেটেতাগ তাগেতেটে গদিঘেনে নাগেতেটে |

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

+

তাকেটেতা কেটেতাক তেটেতাক গদিঘেনে -ধাধাতিৎধা -ধাধাতিৎধা -ধাধাতিৎ (ধা) |

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ (ধা) +

(মোট অংশটি তিনবার বাজবে)

তবলার সকল ঘরানায় বিভিন্ন ধরনের চক্রদারের ব্যবহার লক্ষণীয়। উক্ত চক্রদারের বাদনক্রিয়া নিজ নিজ ঘরানার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা পরিবেশনের মাধ্যমে নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটান।

গৎ ত্রিতালে নিবদ্ধ

+

ধাগৎ তাকেটে ধাতেরেকেটে ধেতেটে কতা গদিঘেনে নাগে তেরেকেটে তেরেকেটে ধাতেরেকেটে |

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

+

ধাতেটেকতা গদিঘেনে ধাগৎতাকেটে ধাতেরেকেটেধেতেটে কতাগদিঘেনে তাগেতেরেকেটে (ধা) |

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

অন্যান্য ঘরানার চাইতে বিভিন্ন ধরনের ‘গৎ’ এর বাদনক্রিয়া ফারুখাবাদ ঘরানায় বেশি হয়ে থাকে। এই গৎ এর বাদনক্রিয়াও ঘরানাগত পরম্পরায় হয়ে থাকে। যা বাদনশৈলীতে বা উপস্থাপনে একজন তবলা বাদক তা চিহ্নিত করতে পারেন। গৎ-এ অন্য কোনো বাণীর সমাবেশ থাকে না, শুধুই তবলার বোল বাণীর সমাবেশ থাকে। তবে বর্তমানে কিছু কিছু গৎ-এ তবলা এবং পাখোয়াজের বাণীর ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাতে শুনতে যে খারাপ লাগছে বা পরিবেশনে যে কষ্ট হচ্ছে তা কিন্তু না।

তবলার ঘরানাগত পার্থক্য ও নান্দনিকতা

দিল্লি, আজরাড়া, লক্ষ্ণৌ ও ফারুখাবাদ ঘরানার শিল্পীগণ ‘তেটে’ বাণী বাজাবার সময় কেবলমাত্র আঙ্গুলের ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পীগণ পাখোয়াজের অনুকরণে চেটো (হাতের তালু) দ্বারা ‘তেটে’ বাণীর বাদনক্রিয়া করেন। যে-কারণে এই দুই ঘরানার শিল্পীদের হাতের দাপট বেশি। ফলে এই দুই ঘরানার শিল্পীদের বাদন পদ্ধতি নান্দনিকতার দিক থেকে শ্রমসাধ্য এবং পরিশীলিত হয়।

দিল্লি, আজরাড়া, লক্ষ্ণৌ ও ফারুখাবাদ ঘরানার শিল্পীগণ আঙ্গুলের সাহায্যে বাঁয়ার বাদনক্রিয়া পরিচালনা করেন। কিন্তু বেনারস ঘরানার শিল্পীগণ বাঁ হাতের তালুর দ্বারা বাঁয়ার বাদনক্রিয়া করে থাকেন। দিল্লি ও আজরাড়া ঘরানায় কায়দার বাদনক্রিয়ায় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ঘরানার কায়দাসমূহ শ্রুতিমধুর ও সরল হৃন্দের হয়। ফারুখাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ঘরানায় কায়দা একটু বড় আকারের হয়। পাঞ্জাব ঘরানার কায়দার মধ্যে জটিল ছন্দ প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়।

অন্যান্য ঘরানার চেয়ে বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানায় বিভিন্ন তালচর্চার রেওয়াজ লক্ষণীয়। দিল্লি, আজরাড়া, ফারুখাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার শিল্পীগণ আঙ্গুলের সাহায্যে বাঁয়ার বাদনক্রিয়া উপস্থাপন করে থাকেন এবং এই ঘরানার শিল্পীদের বাঁয়ার আওয়াজ খুবই শ্রুতিমধুর। লক্ষ্ণৌ ঘরানার শিল্পীগণ তবলা লহড়া পরিবেশনার শেষ প্রান্তে লগ্নী বাজান। এবং বেনারস ঘরানার শিল্পীগণ স্বতন্ত্র বাদনের শেষে দ্রুত লয়ের ঠেকার বিস্তার বা প্রকার পরিবেশন করেন। সরল গৎ, মাজাদার গৎ, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী গৎ, ফারুখাবাদ ঘরানার সম্পদ। দুপল্লী গৎ ত্রিপল্লী গৎ ও চৌপল্লী গৎ এই ঘরানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ‘গৎ’ এর মতো ‘চক্রদার’ এর অনেক প্রকারভেদ রয়েছে, যেমন- কামালী চক্রদার, আদি চক্রদার, সরল চক্রদার ইত্যাদি। এই সকল চক্রদারগুলো সব ঘরানায় বহুল প্রচলিত।

পাঞ্জাব ও বেনারস ঘরানার টুকড়া ও চক্রদার বড় আকারের হয়। পাঞ্জাব ঘরানার বন্দিশ্রেণির রচনার মধ্যে পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাব রয়েছে। প্রায় বোল বাণীতে নাড়, ধাড়, তাঙধা, দুংগা ইত্যাদি ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা। ফারুখাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ঘরানায় তবলার সাথে পাখোয়াজের কিছু বোলবাণীর মিশ্রণ রয়েছে, যা বন্দিশ্রেণির রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

দিল্লি ঘরানাকে তবলার আদি ঘরানা বলে মানা হয়। দিল্লি ঘরানা থেকেই অন্যান্য ঘরানার সৃষ্টি। যে-কারণে দিল্লি ঘরানার বাদনশৈলী অমিশ্রিত। আমরা প্রায় বলে থাকি বা শুনে থাকি যে দিল্লি ও আজরাড়া ঘরানায় তবলার কিনার বা কানির বোল বাণীর বাদনক্রিয়া বেশি হয়ে থাকে। আবার বেনারস ও পাঞ্জাব ঘরানায় তবলার সুর-স্থানের বোলবাণীর বাদনক্রিয়া বেশি। এইভাবে কোনো ঘরানার বাদনশৈলী বা বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা খুবই মুশকিল। আসলে এটি একটি গতানুগতিক ধারণা।

এই ছয়টি ঘরানাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। দিল্লিবাজ, পুরববাজ ও পাখোয়াজবাজ। দিল্লি ও আজরাড়া একই বাজ, লক্ষ্ণৌ ও ফারুখাবাদ পুরববাজ, বেনারস ও পাঞ্জাব পাখোয়াজবাজ।^৬

দিল্লি ঘরানার শিল্পীদের হাতের আওয়াজ খুব মিঠা ও পরিষ্কার হয়। ওস্তাদ আহমেদ জান বলেন, দিল্লি ঘরানার হাতেরপাঞ্জা বাদনশৈলী ও হাতের আওয়াজ সংগতের জন্য উপযুক্ত।^৭

ফারুখাবাদ ঘরানার কিনারের ব্যবহার শুরু করেন ওস্তাদ মুনির খাঁ।^৮

অনুরূপভাবে লক্ষ্ণৌ ঘরানার কিনারের প্রাচুর্য আনেন খলিফা আবীদ হোসেন খাঁ।^৯

অনবদ্বাদ্যেও ঘরানা সৃষ্টির মূল কথাই হলো আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচিত্রভাবে সুন্দরের প্রকাশ। এরজন্য বাণী-বিন্যাস, পাঠকরণ এমনকি বাদ্যের আকারেরও পরিবর্তন করতে হয়।^{১০}

উপসংহার

অবনন্ধ শ্রেণির বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও তালছন্দ মানুষের হৃদয়ে সুন্দর ও আনন্দের জন্ম দিয়ে থাকে। তবলা ঘরানার মূল বিষয় হলো আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচিত্রভাবে সুন্দরের প্রকাশ ঘটানো। এর জন্য বাণী বিন্যাস, পাঠকরণ এবং বাদনের পরিধির পরিবর্তন ও পরিবর্তন করা আবশ্যিক। তবলা বাদনশৈলীতে ঘরানাগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন প্রত্যেক ঘরানার রয়েছে নিজ নিজ শৈলী রীতি, শ্রুতিমধুরতা, ছন্দ প্রকরণ, সৃজনশীলতা, প্রকাশ ঢং বা ধরন ইত্যাদি, যার ফলে আজো ঘরানাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তবলা স্বতন্ত্র বাদনসহ বিভিন্ন তালযন্ত্রের সাথে বহুলভাবে ব্যবহৃত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। বাদনশৈলীর নান্দনিকতার জন্যই তবলার স্বতন্ত্রবাদন শুনে দর্শক যেমন আনন্দ উপভোগ করে তেমনি বিভিন্ন সংগীতে তবলা সংগত এক মোহময় সুর ও তাল ছন্দের ইন্দ্রোজাল সৃষ্টি করে। কথায় আছে চুন ছাড়া যেমন পান তেমনি তবলা ছাড়া গান। যুগে যুগে শিল্প আন্দোলন হয়েছে ও রেনেসাঁস যুগে শিল্পেরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সংগীতের তথা তবলা ঘরানার শিল্পীরা নব নব উদ্ভাবন ও তাল ছন্দের সৃষ্টি করেছেন এবং তবলা বাদনকে নান্দনিক করেছেন। আমরা ভারতীয় সংগীত ঘরানার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পায় কেবল দর্শক হৃদয় জয় করার জন্য অনেক গুণী তবলাশিল্পী তবলার বোল বাণীতে বিভিন্ন শব্দ যেমন : ওস্তাদ জাকির হোসেন বিভিন্ন সময় বাজিয়ে থাকেন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি মুখে বলেন এবং বাজিয়ে শোনান। আবার তবলায় ট্রেন চলার শব্দ পাখির ডাক, ঝরনার জলপড়ার শব্দ বা বিভিন্ন উপকথা, ছড়া-ছন্দ ইত্যাদি তবলার বাদনশৈলীর নান্দনিকতার একটা দিক যা বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীবৃন্দ বাজিয়ে থাকেন। তবলায় একই বোল-বাণী অনুশীলন, উপস্থাপন ও বাদনশৈলীর দ্বারা শিল্পী ও ঘরানা ভেদে নান্দনিকতার বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সুরছন্দা*, ১৯৭৩, পৃ. ৭৯
২. ড. প্রবীর ভট্টাচার্য্য, *ভারতীয় তাল প্রসঙ্গে* (২য় খণ্ড), অন্বেষণ প্রকাশনী, গ্রাম: দশদ্রোন, পোস্ট: আর গোপালপুর, জেলা: ২৪ পরগণা, ১৯৩৫, পৃ. ৮৪
৩. তদেব, পৃ. ৮৫
৪. মানস দাসগুপ্ত, *তাল অভিধান*, প্রকাশিকা- শ্রীমতী মমতা দাস গুপ্তা, পূর্বাচল হাউজিং এস্টেট, ২জ ব-ক নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৬, Phase-2, সেক্টর ৩, কলিকাতা-৭০০০৯১, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২
৫. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীত কোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৮৫
৬. শংকর ঘোষ, *আনঙ্গ*, প্রকাশক- ১১/এ কবির রোড, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১২৫
৭. তদেব, পৃ. ১২৭
৮. তদেব, পৃ. ১২৬
৯. তদেব, পৃ. ১২৮
১০. ড. প্রবীর ভট্টাচার্য্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

এই প্রবন্ধে ব্যবহারিক উদাহরণগুলো গুরুগণের নিকট ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ। ইং: ১৯৮৪ - ২০০০ সন।

বাবা তাহের হামেদানির কাব্যে প্রেম

ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ*

Abstract: Baba Taher Oryan Hamadani was an 11th-century Persian Sufi and dervish poet from Hamadan, Iran who lived during the reign of Tugril of the Seljuk dynasty over Iran. This is almost all that is known of him as he lived a mysterious lifestyle. Although prefix "Baba" has been thought as part of his name in all known sources, his nickname "Oryan" ("The Naked"). The nickname was probably attributed to him because he seemed to lead a very spiritual and stoic lifestyle. His poetry is written in the Hamadani dialect (Luri) of the Persian language. He is the best known for his *Dobeiti*, quatrains composed not in the standard *Rubai* meter but in a simpler meter still widely used for popular verse. This style of poetry is known as Pahlaviat and it is very ancient. His mysticism, philosophy and sentiments are reflected in his *Dobeiti*. The quatrains of Baba Taher have a more amorous and mystical connotation rather than philosophical. One of the themes of his poetry is the love. His verses allowed his contemporaries and today's readers to appreciate this thoughts and sentiments. Baba Taher's poems are recited to the present day all over Iran accompanied by the setar, the three stringed viol or lute. His tomb, designed by Mohsen Foroughi, is located near the northern entrance of the city of Hamadan in Western Iran, in a park, surrounded by flowers and winding paths. The structure consists of twelve external pillars surrounding a central tower. It was constructed in 1970.

ভূমিকা

প্রেম-ভালোবাসা ও অধ্যাত্মবাদের উপাদানে পরিপূর্ণ সাহিত্যের অপর নাম ফারসি সাহিত্য। বিশ্ব সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের অবস্থান বিশেষকরে ফারসি কাব্য সাহিত্যের অবস্থান শীর্ষস্থানীয়। আর ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-প্রেম-ভালোবাসা ও অধ্যাত্মবাদ। মুসলিম বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষতায় পারস্য বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আরবি সাহিত্য থেকে আধ্যাত্মিকতা তার সঠিক বৈশিষ্ট্য ফারসি সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে। এক পর্যায়ে তা ফারসি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক সাধকগণ অদেখা ও অজানার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রয়াসে আল্লাহর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। আর এ সম্পর্কের অন্যতম মিলন সেতু হলো প্রেম, যা মানব জীবনের এক শাস্ত্র প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ। প্রেমের মাধ্যমেই পৃথিবীতে যে মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল, আজো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রেম এমন এক শক্তি যার প্রভাবে মানুষ জয় করেছে ভয়কে এবং তুচ্ছ করেছে মৃত্যুকে। মোটকথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ ও আনন্দময় করার জন্য প্রেমের বিকল্প নেই। ফারসি সাহিত্যের যে সকল কবি তাদের কাব্যে প্রেমের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন বিশিষ্ট দো-বেইতি (দুই শ্লোক বিশিষ্ট কবিতা) রচয়িতা ফারসি কবি বাবা তাহের হামেদানি। ফারসি সাহিত্যে তাঁর অবদান পরিমাণের দিক বিবেচনায় খুবই অপ্রতুল কিন্তু প্রভাব ব্যাপক। তিনি সর্বসাকুল্যে তিন-চারশত দো-বেইতি, যৎসামান্য কাসিদা ও গযল রচনা করে পারস্যের বড় বড় কবি সাহিত্যিক যেমন ওমর খৈয়াম, শেখ সা'দি ও হাফিজ সিরাজি এঁদের কাতারে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। নিম্নে 'বাবা তাহের হামেদানির কাব্যে প্রেম' বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনা করা হলো:

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাবা তাহের হামেদানির সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়

কবির পূর্ণনাম বাবা তাহের হামেদানি উরইয়ান। বাবা প্রচলিত অর্থে পিতা নয়, এটি তাঁর নামের অংশ বিশেষ। কেউ কেউ বলেন তৎকালীন ধার্মিক প্রবীণদেরকে বাবা বলা হতো। আধ্যাত্মিক কাব্য সাহিত্যে আরো তিনজন বাবার নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন-বাবা আফজাল (কাশান, ১১৮৬-১২৫৬ খ্রি.), বাবা ফরিদ (পাঞ্জাব, ১১৭৩-১২৬৬ খ্রি.) ও রহমান বাবা (পেশওয়ার, ১৬৫২-১৭১১ খ্রি.)।^১ বাবা তাহের হামেদান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করার কারণে হামেদানি আর উপাধি হলো উরইয়ান। উরইয়ান নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। উরইয়ান শব্দের অর্থ উন্মুক্ত, বিবস্ত্র বা ল্যাংটা। কেউ কেউ বলেন, বাবা তাহের পেশায় ছিলেন একজন কাঠুরিয়া। তিনি জীবিকার তাগিদে বহু বছর ধরে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অপর তথ্যানুযায়ী, বাবা তাহেরের শরীরের উষ্ণতা ছিলো অস্বাভাবিক বেশি। কেউই তাঁর পাশে বসতে পারতো না। সেজন্য তিনি জনসমাগম ও লোকালয় এড়িয়ে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন এবং অধিকাংশ সময়ই খালি গায়ে থাকতেন। এজন্য তাঁকে উরইয়ান বলা হয়।^২ তবে ভারতীয় উপমহাদেশে মাযার কেন্দ্রীক যে পির, ফকির বা দরবেশির নামে ল্যাংটা পাগল দেখা যায়, বাবা তাহের হামেদানি উরইয়ান সে ধরনের কোন ল্যাংটা ছিলেন না। যদিও অনুরূপ একটি মতামত পাওয়া যায় যে, বাবা তাহের বলতেন-আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদৃষ্ট হন, তবে কাপড়ের আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে কী লাভ? এ মতবাদে আস্থা রেখে তিনি কাপড় পরিত্যাগ করতেন বলে জনশ্রুতি আছে।^৩ তবে এ বক্তব্য সঠিক নয়; বরং তিনি ছিলেন একজন আল্লাহভীরু, সত্যান্বেষী ও আহলে হক সম্প্রদায়ের অনুসারী। তিনি ছোট বেলায় খুবই সহজ-সরল ও একটু বোকা ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের একটি চমকপ্রদ ঘটনা তাঁর উরইয়ান উপাধির সাথে অনেক সামঞ্জস্যশীল হিসাবে প্রতীয়মান হয়। তিনি মাদ্রাসায় লেখা-পড়াকালীন একদিন ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু বাবা তাহের কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। ক্লাস শেষে তিনি তাঁর এক সহপাঠিকে জিজ্ঞাসা করলেন-আচ্ছা! তুমি এমন কী কাজ করছো যে, ঈমান, সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতের গূঢ় রহস্যের প্রায় অর্ধেকটাই শিখে ফেলেছো। তাঁর সহপাঠি দুষ্টুমি করে বলেছিলেন-আমরা এসব শেখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি, এমনকি প্রচণ্ড শীতের রাতে বরফাচ্ছাদিত হাউজের মাঝখানে দাড়িয়ে থেকেছি। বরফগলা ঐ শীতাত্ত পানিতে সকাল পর্যন্ত এভাবে থেকেছি। বাবা তাহের এতোটাই সহজ-সরল ও বোকা ছিলেন যে, সহপাঠির এ দুষ্টুমিকে তিনি অকপটে বিশ্বাস করেছিলেন। অবশেষে রাত যখন গভীর হয়ে আসলো এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ঘুমিয়ে পড়লো, তখন বাবা তাহের চুপি চুপি তাঁর থাকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাদ্রাসার বরফাচ্ছাদিত হাউজ কেটে সেটার মাঝে দাড়িয়ে গেলেন। সকালে যখন ফজরের নামাজের সময় হলো, তখন এক শিক্ষার্থী ওয়ু করতে হাউজের কাছে এলো। সে শিক্ষার্থী বরফের ভিতরে কাউকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল-কে ওখানে? এ বরফপূর্ণ হাউজে এ সময়ে কী করছো? শিক্ষার্থীটির প্রশ্নের জবাবে বাবা তাহের আরবিতে একটি লাইন বলেছিল। যার বাংলা অর্থ হলো:

‘আমি অশিক্ষিত অবস্থায় রাতে এখানে এসেছি,

আর এ সকাল পর্যন্ত আরবি ভাষা পুরোপুরি শিখে ফেলেছি।’

এ সময়ে নাকি আকাশ থেকে একটি আলোর ছটা এসে বাবা তাহেরের বুকে ঢুকে পড়েছিল। এ বরফাচ্ছাদিত হাউজের ভিতরে অবস্থান করার সময় বাবা তাহেরের পরণে না কি কোন বস্ত্র ছিলো না। সে কারণেই লোকজন তাঁকে উরইয়ান উপাধি প্রদান করেন।^৪ বাবা তাহেরের সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে তিনি সালজুকি শাসনামলের (৪২৯ হিজরি/১০৩৭ খ্রি.-৫৫২ হিজরি/১১৫৭ খ্রি.) কবি ছিলেন। রাশিদ ইয়াসামির মতে, তিনি ৩৯০ হিজরি/৯৯৯ খ্রি. অথবা ৩৯১ হিজরি/১০০০ খ্রিস্টাব্দে হামেদান অথবা লুরেস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইনুল কুযাত হামেদানি (মৃ. ৫২৬ হিজরি/১১৩১ খ্রি.) ও খাজা নাসির উদ্দিন তুসির (মৃ. ৬৭২ হিজরি/১২৭৩-৭৪ খ্রি.) সমসাময়িক।^৫ মাজমাউল ফুসাহা গ্রন্থের প্রণেতা

রেযা কুলি খান হেদায়াত বলেন, বাবা তাহের মহাকবি ফেরদৌসি (মৃ. ৪১৭ হিজরি/১০২৫ খ্রি.), উনসুরি (মৃ. ৪৪২ হিজরি/১০৫০ খ্রি.) ও ইবনে সিনার (৯৮০খ্রি.-১০৩৭ খ্রি.) সমসাময়িক এবং ওমর খৈয়ামের (১০৪৮ খ্রি.- ১১৩২ খ্রি.) সামান্য অগ্রজ ছিলেন। তাঁর মতে, বাবা তাহের ৪১০ হিজরি/১০১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যা অসম্ভব বলেই মনে হয়, কেননা সালজুকি প্রথম বাদশাহ তোঘরোল সালজুকি ৪৪৭ হিজরি/১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাবা তাহেরের সাথে সাক্ষাত করেন।^৬ বলা হয়, সুলতান তোঘরোল বেগ একবার হামাদানে এসেছিলেন। তৎকালীন হামাদানের তিনজন প্রবীণ সাধক বাবা তাহের, বাবা জাফর ও শেখ হামশা এদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁরা খিজর নামক পাহাড়ে দাড়িয়ে ছিলেন। সুলতান তাঁদেরকে দেখতে পেলেন। সুলতান তোঘরোল বেগ সেনাবাহিনীর বহর নিয়ে তাঁদের নিকটে আসলেন, সাথে ছিলেন মন্ত্রী আবু নাসর আল-কাভারি। বাবা তাহের কিছুটা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সুলতানকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে কী করতে চাও? সুলতান বলল: আপনি যা বলবেন। বাবা তাহের পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.^৭

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।’

সুলতান কেঁদে কেঁদে বললেন, আমি তাই করবো। বাবা তাহের সুলতানের হাত ধরে বললেন তুমি কি গ্রহণ করলে? সুলতান বললেন হ্যাঁ।^৮ তিনি ৭৫ বছর মতান্তরে ৮৫ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি ৪৬৫ হিজরি/১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তেহরান-হামেদান মহাসড়কের শেষ মাথায় শহরের উত্তর প্রবেশদ্বারের কাছেই বৃভাকারে বারোটি পিলারের গাঁথুনির উপর বাবা তাহেরের সমাধিস্তম্ভটি অবস্থিত। পিলারগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং মধ্যখানে চতুর্কোণিক একটি গম্বুজ রয়েছে। এ সমাধিস্তম্ভটি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পুনঃনির্মাণ করা হয়।^৯ টাওয়ারের চারপাশে সবুজ ঘাস ও বিচিত্র ফুলের সমারোহে চমৎকার পার্কটি দর্শনীয় স্থানে পরিনত হয়েছে। উদ্যানের ভিতরে ভিতরে হাঁটার পথ, পথের ধারে ধারে বসার আয়োজন। সব মিলিয়ে এক হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ গড়ে উঠেছে।^{১০} বাবা তাহেরের পিতামাতার পরিচয়, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ফারসি সাহিত্যে বাবা তাহের হামেদানির অবদান

ফারসি সাহিত্যে বাবা তাহেরের বিচরণ খুবই স্বল্প পরিসরে। তিনি মূলত দো-বেইতির (Quatrain) রচয়িতা ছিলেন। দো-বেইতি অনেকটা রোবাঈর ন্যায় ফারসি সাহিত্যের একটি প্রকার। প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনায় রোবাঈকেও কখনো কখনো দো-বেইতি (دوبیتی) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।^{১১} দো-বেইতির বাহ্যিক কাঠামো চারটি পঙ্ক্তি নিয়ে গঠিত। এর অন্তর্মিলও অনেকটা রোবাঈর ন্যায়। তবে রোবাঈ ও দো-বেইতির মধ্যে ছন্দের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। রোবাঈর ছন্দের উৎপত্তিস্থল হলো ‘বাহরে হাজায়ে মুশাখখাস আখরাবে মাকফুফ মাহজুব’ ছন্দরীতি। এর ছন্দরীতি হলো-‘মাফউলু (- - - - -), মাফাঈলু (- - - - -), মাফাঈলু (- - - - -), ফাঈল (- - - - -)’।^{১২} রুবাইয়ের অন্তর্মিলের ধরন হলো, ককখক। প্রথম লাইনের সাথে দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের ছন্দের মিল থাকবে এবং তৃতীয় লাইনটি স্বাধীন থাকবে। তবে কখনো কখনো তৃতীয় লাইনটিতেও ছন্দের মিল থাকতে পারে এক্ষেত্রে এরূপ রুবাইকে ‘মুসাররা’ বলা হয়।^{১৩} অপরদিকে দো-বেইতির ছন্দের উৎপত্তিস্থল হলো ‘বাহরে হাজায়ে’ ছন্দরীতি। এর ছন্দরীতি হলো-‘মাফাঈলুন, মাফাঈলুন, মাফাঈল বা ফাউলান। অথবা ‘মাফাঈলুন মাফাঈলান-ফাউলুন বা মাফাঈল।

এছাড়াও দো-বেইতির আরো তিনটি ছন্দরীতি রয়েছে। ছন্দরীতিগুলো হলো-‘মাফাঙ্গিলান মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন ও ফা-লাতুন মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন এবং ফাঙ্গিলাতুন মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন’।^{১৪} ‘মাফাঙ্গিলান মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন’ এটি পাহলাভি কাব্যের সবচেয়ে শ্রুতিমধুর ছন্দ বলে বিবেচিত। বাহরে মাশাকেল নামে খ্যাত ‘ফা-লাতুন মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন’ এ ছন্দটিকে অন্যতম বিকল্প ছন্দ হিসাবে ধরা হয়। জালালউদ্দিন হুমায়ির মতে- ‘মাফাঙ্গিলান মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন’ এ ছন্দটি হলো-সংগীতের বাগানের ছন্দ।^{১৫} মালিকুশ শোআরা বাহারের মতে ‘মাফাঙ্গিলান মাফাঙ্গিলান-ফাউলুন বা মাফাঙ্গিল’ এ ছন্দরীতিটি সামানি আমলের কবিতার ছন্দ প্রকরণসমূহের অন্যতম। পরবর্তীকালে এর মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং বিভিন্নছন্দরীতির রূপ পরিগ্রহ করেছে।^{১৬} ড. খানলারি দো-বেইতির ভাষাতাত্ত্বিক ও আলংকারিক বিষয়টিকে পর্যালোচনা করেছেন একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, দো-বেইতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও হ্রস্ব ধ্বনি সমষ্টির উপর জোর দেয়া ও প্রলম্বিত করা এবং পঙক্তিসমূহের ধ্বনি সমষ্টিগুলোর মাঝে সমতা না থাকা মৌলিক ভূমিকা পালন করে।^{১৭} দো-বেইতি (Couplet) ‘তারানা, পাহলাভি বা পাহলাভিয়াত নামেও পরিচিত। ফাহলাভি পাহলাভি শব্দের আরবি রূপ। ইরানে ইসলাম প্রবেশের পর এ ভাষাটি ইরানের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক কাব্য ভাষা হিসাবে চালু ছিলো। বাবা তাহের অনুরূপ আঞ্চলিক ভাষায় দো-বেইতি রচনা করেছিলেন। তাঁর দো-বেইতির সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় কয়েকজন ইরান-বিশেষজ্ঞ বাবা তাহেরের দো-বেইতিগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সংগ্রহ অনুযায়ী বাবা তাহেরের দো-বেইতির সংখ্যা সর্বমোট আশিটি। তবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ইবনে সিনা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত মরহুম ওয়াহিদ দাস্তগেদীর লেখায় বাবা তাহেরের তিনশত চুয়ান্টি দো-বেইতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বারাদারান শাহরুদীর সম্পাদনায় ইরানের নাশ্রে তুলু প্রকাশনী থেকে বাবা তাহেরের দো-বেইতির একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এতে দুইশত ছিয়ান্টি দো-বেইতি স্থান পেয়েছে।^{১৮} ইকি দোজ নামক ওয়েব সাইটে **ديوان اشعار اباطاهر** নামে বাবা তাহেরের রচনাসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। এতে তাঁর একটি গয়ল, একটি কাসিদা ও দো-বেইতিসমূহকে চারভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।^{১৯} গাঞ্জুরের (ফারসি ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণ ও তাঁদের সাহিত্যকর্মের সর্বশেষ তথ্য বিবরণি সম্বলিত ইরান সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত ওয়েব সাইট) তথ্যমতে তিনি সর্বসাকুল্যে তিনশত ছেষটি দো-বেইতি, একটি কাসিদা ও একটি গয়ল রচনা করেছেন।^{২০} অনেকে বাবা তাহেরের দো-বেইতিগুলোর অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাবা তাহেরের দো-বেইতিগুলোর যারা অনুবাদ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-Paul Smith। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থটি হলো-*Rubaiyat of Baba Tahir*, এটি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বুক হাউসের এর নিউ হিউম্যানিটি বুকস থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ১২০টি বাছাইকৃত দো-বেইতির উল্লেখ পাওয়া যায়।^{২১} E. Heron-Allen’s কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ গ্রন্থটি হলো- *The Laments of Baba Tahir* এটি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। David Pendlebury কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ গ্রন্থটি হলো- *The Ocean in a Jar: The Rubayat of Baba TahirHamadani* এটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। A.J. Arberry’s কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ গ্রন্থটি হলো *Poems of a Persian Sūfi* এটি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। Mehdi Nakhosteen’s কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ গ্রন্থটি হলো *The Rubáiyat of Bába Táhir Oryán* এটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।^{২২} Maryam Dilmaghani কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ গ্রন্থটি হলো *Atonement by Baba Taher, Iranian mystic and poet (১০০০ -১০৬০)* এটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কানাডার নিউ ব্রান্সউইক হতে প্রকাশিত হয়।^{২৩} Dr. Alaeddin Pazargadi কর্তৃক অনূদিত এবং মাসুমা মিরজায়ি কর্তৃক সম্পাদিত ৩৩৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত অনুবাদ গ্রন্থটি হলো *The Poems of Baba Taher Oryan (Bilingual Persian-English)* এটি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি Amazon (অনলাইন ভিত্তিক বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) এর সর্বোচ্চ বিক্রিত ১০০ টি বইয়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।^{২৪} বাবা তাহেরের সর্বাধিক বিখ্যাত রচনাটি হলো দো-বেইতির সংকলনটি, যেটি তাঁর তারানা ও

ফাহলাবিয়্যাতের জন্য বিখ্যাত। এই নামটি এ কারণে ঘটেছিলো যে, এই দো-বেইতিগুলোতে প্রাচীন পাহলাভি ভাষা, ইরানের পশ্চিমা ও কেন্দ্রীয় উপভাষার ধারাবাহিকতা।^{২৫} বাবা তাহেরের ‘কালেমাতে কেসার’ নামক একটি আরবি গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এতে প্রায় ৪০০ টি নীতিবাক্য রয়েছে। এটি আইনুল কুযাত হামেদানি সংকলন করেন। যাতে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, জ্ঞান, মারেফাত, যিকর, ইবাদত, মত্ততা ও প্রেম-ভালোবাসার বর্ণনা বিধৃত হয়েছে।^{২৬} তিনি যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন-মহাকবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০খ্রি.), হাকিম সানায়ি (১০৮০-১১৩১ খ্রি.), খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি (১০০৬-১০৮৮ খ্রি.), মনসুর আল-হাল্লাজ (৮৫৮-৯২২ খ্রি.), আবু সাঈদ আবুল খায়ের (৯৬৭-১০৪৯ খ্রি.) ও বায়েজিদ বোস্তামি (মৃ.৮৪৮-৪৯ অথবা ৮৭৪ খ্রি.)। আর বাবা তাহের কর্তৃক সে সকল সাহিত্যিক প্রভাবিত হয়ে কাব্যচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন-মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), কবি হাফিজ সিরাজি (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.), মাওলানা আব্দুর রহমান জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.) ও হাকিম নিয়ামি গাঞ্জুবি (১১৪১-১২০৯ খ্রি.)।^{২৭} সমকালীন যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা বাবা তাহের কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে কাব্যচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন-মাহদি আখাভানে সালেস (১৯২৯-১৯৯০ খ্রি.), সিয়াউশ কাসরাযি (১৯২৬-১৯৯৫ খ্রি.), কায়সার আমিনপুর (১৯৫৯-২০০৭ খ্রি.), সাইয়েদ হাসান হুসাইনি (১৯৫৬-২০০৪ খ্রি.), আমির হুশাক এবতেহাজ (জন্ম-১৯২৭ খ্রি.) ও আলি রেযা কাজুহ (জন্ম-১৯৬৩ খ্রি.)।^{২৮}

ঐতিহাসিক গতিধারায় বাবা তাহের ছাড়াও আরো অনেকে দো-বেইতি রচনা করেছেন যার ফলে জনগণের মাঝে ব্যাপকহারে দো-বেইতির বিস্তার লাভ করে। দশম শতাব্দীতে আলে বুয়ে দরবারের সভা কবি খাজা কামালুদ্দিন বুন্দার রাযি দো-বেইতি রচনা করেছেন। একাদশ শতাব্দীতে শিরাজের পুর ফারিদুন দো-বেইতি রচনা করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শরফ শাহ আরেফ গিলাকি দো-বেইতি রচনা করেছেন। ইব্রাহিম ফাখরাযি এ দো-বেইতিগুলো সংগ্রহ করেন। আযারি বাচনভঙ্গিতে রচিত মুহাম্মদ মাগরিবি তাবরিযির (মৃত্যু ৮০৯ হি./১৪০৬ খ্রি.) কতিপয় দো-বেইতির সন্ধান পাওয়া যায়। সাফাভি শাসনামলে মোল্লা সাহরি তেহরানি ও সুফি মাযেন্দারানি (মৃত্যু ১০৩৫ হি./১৬২৫ খ্রি.) দো-বেইতি রচনা করতেন। এছাড়াও বিংশ শতাব্দীতে যারা দো-বেইতি রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-নাজমায়ে শিরাজি, হুসাইন সিসতানি, ইক্কানদার ও ফায়েয দাগেস্তানি প্রমুখ।^{২৯}

বাবা তাহের হামেদানির ফারসি সাহিত্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

বাবা তাহেরের দো-বেইতিসমূহের বিষয়বস্তু নেহায়েত সীমিত। তাঁর দো-বেইতিসমূহের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রেমাসক্তিমূলক আর কতিপয় আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পর্কিত। তাঁর কতক দো-বেইতি আল্লাহ তা’য়ালার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সরল কবিতা। তবে তাঁর দো-বেইতিসমূহে ব্যবহৃত অন্যতম উপাদান হলো প্রেম-ভালোবাসার বর্ণনা, যা তাঁর আধ্যাত্মিক আকিদা ও দর্শনের পরিচয় বহন করে। আবার কতক দো-বেইতি তাঁর ব্যক্তিগত ও নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি। যেগুলোতে দরবেশি জীবন পদ্ধতিরই বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। অবশ্য এ দরবেশি জীবন পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁর বর্ণনা খুবই সুন্দর। তিনি বালিশের পরিবর্তে ইটের উপর মাথা রেখে ঘুমান, মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতায় তিনি ভীষণ বেজার। তাঁর দো-বেইতিসমূহে আমরা এমন এক ব্যক্তির মুখোমুখি হই, যিনি এমন গান গেয়ে যান-যা দুঃখ-বেদনায় আকীর্ণ। তবে যে ভাবেই হোক দুঃখ ও দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁর জীবন কাটে। সমকালীন গবেষক পারভেজ আযকায়ি বাবা তাহেরের দো-বেইতিসমূহের বিষয়বলিকে সংকলিত করেছেন। তিনি বাবা তাহেরের দো-বেইতিসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সব বিষয় উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, আত্মপরিচিতি, আল্লাহর দর্শন, প্রেমাসক্তি, প্রেমাস্পদের বর্ণনা, উন্মত্ততা, দিশেহারা অবস্থা, ক্রন্দন, আহাজারি, জ্বলন-দহন, আত্নদান, ক্রোধান্বিত হওয়া ও মৃত্যুচিন্তা প্রভৃতি।^{৩০}

বাবা তাহেরের দো-বেইতিসমূহে ভাষার আবেগময় উপাদানগুলো বিপুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় এবং এগুলোতে সাধারণ জনগণের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ বিধৃত রয়েছে। তিনি তাঁর দো-বেইতিসমূহে হিজরি পঞ্চম শতকের বিশেষ কথ্যরীতির বহু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। মূ (আমি), খোন (বাড়ি), মুন (আমাদের), অ'য়ে (আসুক), শু (রাত)। এতে সাধারণ ও গণমানুষের সংস্কৃতি হতে ভাষার নান্দনিক বিন্যাস গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-রেন্দি, কালান্দারি, অলিতে-গলিতে ঘোরা, ইটের উপর মাথা রাখা প্রভৃতি। এগুলো সাহিত্যরীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। কতিপয় গবেষকের মতে, বাবা তাহেরের ভাষা লুরি বা লুরিস্তানি; তবে কতক গবেষকের মতে, বাবা তাহেরের ভাষা লুরিস্তানের খাস আঞ্চলিক কথ্য ভাষা নয়; বরং বিভিন্ন কথ্য ভাষার মিশ্রণ। কোলম্যান হওয়ার্ড বাবা তাহেরের ভাষা বুঝানোর জন্য 'ইসলামি পাহলাভি' পরিভাষাটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর দো-বেইতিসমূহের মূল ভিত্তি প্রেমময় ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা থেকে উৎসারিত। তিনি সাহিত্যের জটিল শিল্পকর্ম ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাক্যালঙ্কার ও সুন্দর ও বাচনভঙ্গির প্রয়োগ এবং এগুলোকে প্রভাবিত করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।^{৩৩}

বাবা তাহের হামেদানির কাব্যে প্রেম

বাবা তাহেরের রচনায় প্রেম-ভালোবাসা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, জ্ঞান, মারেফাত, যিকর, ইবাদত, মত্ততার চিত্র প্রস্তুত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচনায় প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা তথা ইরানের সুন্দর পাহাড়, সমভূমি ও নদীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মানুষকে স্থায়ী জীবনের মূল্য অনুধাবন করে সিদ্ধি লাভ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।^{৩৪} বাবা তাহের হামেদানির কাব্যের বিষয়-বৈচিত্রের অন্যতম উপাদান হলো প্রেম। নিম্নে 'বাবা তাহের হামেদানির কাব্যে প্রেম' বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা তুলে ধরা হলো—

প্রেমকে ফারসিতে এশক (عشق) আর আরবিতে মোহাব্বাত (محببت) বলা হয়। ইংরেজি প্রতিশব্দ Love, affection, intimacy, pleasure ইত্যাদি। মূলত: প্রেমের অর্থ ভালোবাসা, প্রণয়, প্রীতি, স্নেহ, অনুরক্ত, মন দেয়া, আসক্তি, অনুরাগ, ভক্তি ইত্যাদি। প্রেম হলো মানবের এমন এক অনুভূতি যা দ্বারা পরকে আপন করা যায়।^{৩৫} অন্তর চোখ দিয়ে প্রেমাস্পদের ভেতরের সৌন্দর্য অবলোকন করাই প্রেম। মানব জীবনের এক শাস্ত্র প্রত্যয়ের নাম প্রেম। প্রেমের মাধ্যমেই মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। প্রেম মানব সভ্যতার প্রবাহমান জীবন ধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জগতে সবচেয়ে পুরাতন এবং সবচেয়ে নতুনের নাম প্রেম। মানব জীবনের সাথে প্রেমের সম্পর্কটি অত্যন্ত গভীর। জীবন কিংবা প্রেম কোনটাই বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। প্রেমের মাধ্যমেই নারী ও পুরুষ মিলেছে, সংসার সাজিয়েছে, সন্তান জন্ম দিয়ে সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। প্রেমের জন্যই মানুষ মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে, ভয়কে অতিক্রম করেছে। প্রেম বলতে সাধারণতঃ নর-নারীর হৃদয়ের গভীরের এক অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে বুঝায়।^{৩৬} সামগ্রিকভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আনন্দদায়ক ও অর্থবহ করার জন্য প্রেমের বিকল্প নেই। এ প্রভাবকে কোনভাবে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মানব মানবীর চিরন্তন সম্পর্কই প্রেম।^{৩৭} দু'জন স্বাধীন সার্বভৌম নারী-পুরুষের মানবিক সংশ্লেষণের নাম প্রেম। মানুষিক ও জৈবিক চেতনার দিক থেকে পরস্পরের প্রতি সমতার অনুভবই প্রেম।^{৩৮} যখন নর-নারীর সহজাত যৌনপ্রবৃত্তি; হৃদয়, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও কল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তাকে প্রেম বলে অভিহিত করা হয়। সর্বোপরি, একের প্রতি অন্যের সহৃদয় আকর্ষণই প্রেম।^{৩৯} আল্লামা আলি আকবর দেহখোদা তাঁর বিখ্যাত ফারসি অভিধান *লোগাত নামেয়ে দেহখোদা* গ্রন্থে প্রেমের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন,

عشق شگفت دوست به حسن محبوب، یا در گذشتن از حد در دوستی، و آن عام است که در پارسایی باشد یا در فسق، یا کوری حس از در یافت عیوب محبوب یا مرضی است و سواسی که می کشد مردم را به سوی خود جهت خلط و تسلیط فکر بر نیک پنداشتن بعضی صورتها^{۴۰}

‘প্রেম হলো সেই প্রস্তুতি অনুভূতি যা প্রেমসীর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। প্রেমসীর ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়াদিসহ তাঁর অভ্যন্তরের সকল অজানা বিষয়কে প্রশান্তিময় ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে চিন্তা করা।’

ইবনুল আরাবির দৃষ্টিতে, একমাত্র আল্লাহপ্রেমের মাধ্যমেই মানবাত্মা ও পরমাত্মা তথা আল্লাহর মধ্যে মিলন ঘটে থাকে। একজন আধ্যাত্মিক সাধক যখন পরম সত্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করেন, তখন তিনি তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় নিজের সকল অস্তিত্বকে বিলীন করে দেন। আর এ অনুভবের মাধ্যমেই তিনি কাক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়ে থাকেন।^{৮৬} ফারসি প্রাচীন সাহিত্যে বিধৃত প্রেম মূলত আধ্যাত্মিক প্রেম বা এশকে এলাহি। আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমায় প্রেম সবচেয়ে বড় উপাদান। শুধুমাত্র ইনসানে কামেল তথা পূর্ণাঙ্গ মানুষ পর্যায়ে উন্নীত হলেই এটা উপলব্ধি করা যায়। এ স্তরে উপনীত হলে প্রেমিকের হৃদয়ে এমন এক অবস্থার উদ্বেগ হয় যে, তিনি স্বীয় সত্তা থেকে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে সময় ও কাল সবই ভুলে প্রেমাস্পদের বিরহে ব্যাকুল হয়ে যান। প্রেমিক যখন এ স্তরে উপনীত হন তখন ভালো ও মন্দ সবই তাঁর কাছে একাকার হয়ে যায়। নগদ যা থাকে তাই গ্রহণ করেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন না। আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমায় প্রেম এক বিরাট দুর্গম উপত্যকা, একজন আধ্যাত্মিক সাধক কেবলমাত্র অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তা অতিক্রম করতে সামর্থ্য হয়ে থাকেন। প্রেম এমনি এক শক্তি যা দ্বারা অনুসন্ধানকারী প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে থাকেন। এ পর্যায়ে প্রেমিকের কাছ থেকে বিবেক দুরীভূত হয়ে যায়। কেননা বিবেক প্রেমকে পরিচালনা করতে পারেনা। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেম এমন এক অগ্নিশিখা, যা হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। প্রেম, বিবেক ও দর্শনের বিপরীত শব্দ। প্রেম অগ্নির ন্যায় এবং বিবেক ধৈর্যের ন্যায়। প্রেমের যখন আবির্ভাব ঘটে বিবেক তখন পালিয়ে যায়। বিবেক প্রেমের কল্যাণে পথ প্রদর্শন করতে পারে না। প্রেম সকল কাজে নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করে দেয় যেন এক নতুন জগতে পদার্পণ করতে পারে এবং প্রেমিকের হৃদয়ে এক বিশেষ গুণের সমাহার ঘটে।^{৮৭} বাবা তাহেরের কাব্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেমের ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ সাহিত্য রচনায় প্রেমের বর্ণনা আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রেম ছাড়া কাব্যচর্চা সম্ভবপর নয়। বলা হয়-যার ভিতরে প্রেম নেই তার মাঝে কাব্য-প্রতিভাও নেই। আর কাব্য-প্রতিভা ছাড়া কবিতা রচনা করা যায় না। আল্লাহ পাক স্বয়ং পবিত্র কুরআনে প্রেমিকের জন্য প্রেমের অনেক বিবরণ বিধৃত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.^{৮৮}

‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়ালু।’

আল্লাহ পাক অন্যত্র হযরত ইউসূফ (আ.) ও জুলায়খার প্রেম সম্বন্ধে বলেন,

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.^{৮৯}

‘আর নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযিযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তাঁর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভাষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।’

নবি আকরাম (স.) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.^{৯০}

‘আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হতে পরবে না, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক ভালোবাসার প্রিয় পাত্রের পরিণত না হই।’

প্রেমের অন্তর্নিহিত কামনায় মানুষ চায় অমরত্ব। মানুষ মরণশীল কিন্তু আত্মা কখনও মরে না। মানুষ মারা গেলে আত্মা স্থানান্তরিত হয়ে রুহের জগতে চলে যায় এবং প্রয়োজন মারফিক আবার ফিরে আসে। বাবা তাহের প্রেমকে আত্মার ন্যায় অমর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার দৃষ্টিতে প্রেম ও আত্মা একই সূতায় গাঁথা। তিনি বলেন-

وگر دلبر دل و دلرا چه نام است اگر دل دلبر و دلبر کدام است
دل و دلبر بهم آمیخته وینم ندونم دل که و دلبر کدام است.^{৪৪}

‘আমার আত্মায় যদি আমার প্রেমিকা বাস করে তাহলে এ আত্মা প্রেমিক আমার,
আমার প্রেমাস্পদ যদি আমার এ আত্মার স্বরূপ তাহলে বা আত্মা বলি কেন?
আমি প্রেমাস্পদ-আত্মায় কোন বিভেদ দেখিনা,
আত্মা ও প্রেমাস্পদ এক-এই জানি আমি।’

প্রিয়ার প্রতি মনের তীব্র আকর্ষণের নামই ভালোবাসা। আর এই বাস্তব ভালোবাসার মধ্যে আরো একটি বাস্তব হলো বিরহ বা বিচ্ছেদ। মানুষ যখন কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে তখন তার থেকেও অনুরূপ ভালোবাসা প্রত্যাশা করে থাকে। আর এ প্রত্যাশা পূরণে ঘাটতি হলে তৈরি হয় অভিমান। বাবা তাহেরও তার ভালোবাসার প্রতি প্রচণ্ড আভিমানি। তিনি বলেন-

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی‌وفا ای بیمروت

گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت.^{৪৫}

‘যদি আমার বন্ধুকে নির্জনে দেখতে পাও,
তাকে বলো এই নিষ্ঠুর! এই বিশ্বাসঘাতক!
তোমার তলোয়ারের আঘাতে আমি ক্ষত-বিক্ষত,
আমি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার দিকে তাকাতে চাই না।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

که هجران چون کند با روزگارت نپرسی حال یار دلفکارت

هزارت عاشق با موچه کارت.^{৪৬} ته که روز و شوان در یاد مویی

‘মনমরা বন্ধুর ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না,
যে সর্বদা বিষাদের মধ্যে অবসাদগ্রস্ত থাকে।
যে চুলের স্মরণে রাত-দিন বিভোর থাকে,
হাজারো প্রেমিক চুল নিয়ে কী কাণ্ড করে।’

প্রেমহীন জীবন আত্মবিহীন মানুষের মত। আত্মবিহীন মানুষ যেমন মৃত লাশ, মূল্যহীন তেমনি প্রেমহীন প্রেমিকও সমাজ-সংসারবিহীন ভবঘুরে। ভবঘুরের যেমন থাকা-খাওয়া ও সামাজিকতার কোন বালাই থাকে না। অনুরূপ প্রেমহীন প্রেমিকেরও সংসার-ধর্ম ঠিকঠাক চলে না। অভিশপ্ত জীবনের ন্যায় এক সীমাহীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। বাবা তাহেরের রচনায়ও আমরা অনুরূপ অভিব্যক্তি শুনতে পাই। কবির ভাষায়-

مو آن رندم که نامم بی‌فلندر
 نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر
 چو روج آیو بگردم گرد گیتی
 چو شو آیو به خشتی وانهم سر.^{৪৭}
 ‘আমি সেই রেন্দ নাম আমার কালান্দার,
 আমার না আছে ঘরবাড়ি না কোন ঠিকানা।
 দিবসে ঘুরি তোমার অলি-গলিতে,
 রাত এলে মাথা রাখি ইটের বালিশে।’

বাবা তাহের একজন দরবেশি কবি। তার সমগ্র রচনায় দরবেশি জীবন পদ্ধতির চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তিনি মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতায় ভীষণ অসন্তুষ্ট। তিনি স্বীয় হৃদয়ের অনুভূতি বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে উপস্থাপনের জোর প্রচেষ্টা চাରିয়েছেন। তিনি বলেন-

تن محنت کشی دیرم خدایا
 دل با غم خوشی دیرم خدایا
 زشوق مسکن و داد غریبی
 به سینه آتشی دیرم خدایا.^{৪৮}
 ‘হে প্রভু! আমি কষ্ট পাচ্ছি,
 হে প্রভু! আমার হৃদয় আনন্দে ও দুঃখে পূর্ণ।
 আবাসনের স্বাদ ও অদ্ভুত চিৎকার,
 হে প্রভু! আমার বুকে আগুন লেগেছে।’

বাবা তাহের মনে করেন ভালোবাসা এবং কষ্ট একই সূত্রে গাঁথা, এ কারণেই হৃদয় নামক পোশাকটির মধ্যে প্রেম ও কষ্ট উভয়ই রয়েছে। তিনি বলেন-

دلی دیرم خریدار محبت
 کز او گرم است بازار محبت
 لباسی دوختم بر قامت دل
 زپود محنت و تار محبت.^{৪৯}
 ‘আমার হৃদয় প্রেমের ক্রেতা,
 আর তিনি উষ্ণ প্রেমের বাজার।
 আমি মনে মনে কাপড় বুনন করছি,
 ভালোবাসা ও কষ্টের সুতো দিয়ে।’

তিনি আরো বলেন-

محبت آتشی در جانم افروخت
 که تا دامن محشر بایدم سوخت
 عجب پیراهنی بهرم بریدی
 که خیاط اجل میبایدش دوخت.^{৫০}

‘জ্বলন্ত ভালোবাসা আমার আত্মায় প্রজ্জ্বলিত,
যা আমাকে রুখে মাহশার পর্যন্ত পোড়াবে।
এক আশ্চর্য জামা আমার জন্য কেটেছো,
যাতে দর্জি নির্দিষ্ট সময়েই সেলাই করে।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

ز رنگ روی تو دلخونم ای گل	ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
تو چون لیلی و من مجنونم ای گل. ^{৫১}	من عاشق ز عشقت بیقرارم

‘হে ফুল ! তোমার ছোট ছোট কুণ্ডলের গন্ধে আমি মুগ্ধ,
হে ফুল ! তোমার উপরের রঙে আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত।
আমি তোমার অস্থির ভালবাসার প্রেমিক,
হে ফুল ! তুমি যেমন লাইলি আমিও তেমন মজনু।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

در آن آتش دل و جان سوتہ دیرم	ز عشقت آتشی در بوته دیرم
بمژگان خاک راهش رو ته دیرم. ^{৫২}	سگت ار پا نهد بر چشمم ای دوست

‘তোমার ভালোবাসার কারণে আমার সর্বঙ্গে আগুন লেগেছে,
সেই আগুনে আমার হৃদয় ও প্রাণ জ্বলছে।
হে বন্ধু ! তোমার কুকুরটি আমার চোখের দিকে দাড়িয়ে থাক,
কেননা আমি ময়লা রাস্তায় নিচের দিকে যাচ্ছি।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

وگر نه در جهان بسیار یاره	مو را ای دلبر مو با ته کاره
چو مو بلبل به گلزارت هزاره. ^{৫৩}	کجا پروای چون مو سوتہ دیری

‘চুল, হে প্রিয়তমা ! চুল নিচে চলে গেছে,
অন্যথায়, এটি জগতের খুবই সহায়ক।
তোমার চুল লম্বা হওয়ার কারণে তুমি কি ভয় পাও ?
কেননা বুলবুলের চুল তোমার হাজারো পুষ্পোদ্যানে।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

سرم سودای گیسوی ته دیره	دلَم میل گل روی ته دیره
نظر بر طاق ابروی ته دیره. ^{৫৪}	اگر چشمم بمه نو کره میل

‘আমার হৃদয় ফুলের জন্য আকুল,

আমার অন্ধকার কালো চুলের নিচে ।
আমার চোখ যদি নতুন চাঁদ দেখতে চায়,
তাকাও ! নিচের দ্রুত খিলানের দিকে ।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

مرا سرگشته و رسوا ته دیری	مرا دیوانه و شیدا ته دیری
همیدونم که دردی جا ته دیری. ۴۴	نمیدونم دلم دارد کجا جای

‘তুমি আমাকে তোমার প্রেমে পাগল ও দিশেহারা করেছে,
তুমি আমাকে বিভ্রান্ত ও অপমান করেছে ।
আমার হৃদয় কোথায় আমি তা জানি না,
আমি জানি তুমি ব্যথিত হয়েছে ।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

کجا آواره و در خانه کیست	نمیدانم دلم دیوانه کیست
اسیر نرگس مستانه کیست. ۴۵	نمیدونم دل سرگشته مو

‘আমার পাগল হৃদয় কে ? আমি জানি না,
কোথায় শরণার্থী এবং কার বাড়িতে ?
আমি জানি না আমার লোমশ হৃদয়,
নারগিস ফুলে বন্দি, মাতাল কে ?’

বাবা তাহের আরো বলেন-

زرد و محنت آزادی میناد	دلم بی وصل ته شادی میناد
الهی هرگز آبادی میناد. ۴۶	خراب آباد دل بی مقدم تو

‘আমার হৃদয় কখনও সুখের দেখা পায় না,
স্বাধীনতার বেদনা ও কষ্টের দেখা পায় না ।
তোমার নষ্ট হৃদয় নষ্ট হয়ে গেছে,
আমার প্রভু কখনও কোন জগৎ দেখেন না ।’

ধৈর্য একটি মহৎ ও উত্তম গুণাবলি সম্পন্ন কাজ । প্রবাদ আছে-“সবুরে মেওয়া ফলে ।” ধৈর্য্য ঈমানদারের ভূষণ, উত্তম চরিত্রের বিশেষ গুণ ও সফলতার চাবিকাঠি । ধৈর্য্যশীলতা অর্জন করা যত কঠিন, এর পুরস্কারও ততো বড় । মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি আসাটা স্বাভাবিক । যারা তখন আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের অগণিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন । কিন্তু প্রেমিক হৃদয় বড়ই উতলা, সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না । সে প্রেমিকের বিরহে বিবেকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দেয়, অবশেষে সে ধৈর্যহারা হয়ে যায় । বাবা তাহেরের ভাষায়-

غم عشقت بیابان پرورم کرد	فراقت مرغ بی‌بال و پررم کرد

صبری طرفه خاکی بر سرم کرد. ۴۷ بمو واجی صبری کن صبری

‘তোমার ভালোবাসার দুঃখ আমাকে মরুভূমিতে লালন-পালন করেছে,
তোমার বিরহে আমি পাখা ও পালকবিহীন মোরগে পরিণত হয়েছি।
আমাকে বলা হয়েছিল-ধৈর্য ধর, ধৈর্য,
ধৈর্য আমাকে ধূলায় পরিণত করেছিল।’

প্রেম-ভালোবাসা মানুষের মানবীয় গুণাবলির মধ্যে অন্যতম। যার মধ্যে প্রেম নেই সে স্বার্থপর। প্লেটোর মতে, প্রেম মহাজাগতিক শক্তি এবং সর্বত্র সক্রিয়। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে প্রেমের আকর্ষণ রয়েছে। আকাশের দৃশ্যমান বিবর্তনের মূলে নিহিত রয়েছে প্রেমের শক্তি। প্রেম শক্তিই সব প্রয়াস, সব গতি ও বিবর্তনকে সম্ভব করে তুলেছে। প্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই অনির্দিষ্ট জড় পদার্থ নানা আকার ধারণ করে এবং সৌন্দর্যের স্তরে উচ্চ থেকে উচ্চতর রূপ লাভ করে। ৫০ বাবা তাহেরের কণ্ঠে সেই অকুতোভয় প্রেমের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন-

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپان نترسد. ۵۰

‘যে প্রেমে পড়ে সে জীবনের ভয় করে না,
সে বন্ধনে বিশ্বাসী জেলখানাকে সে ভয় পায় না।
হৃদয় ক্ষুধার্ত নেকড়ে মত প্রেমে পড়েছিলো,
নেকড়ে রাখালের হেই হেই কে ভয় পায় না।’

এই কবিতাটির সামান্য কিছু পরিবর্তন করে ‘আবুল কাসেম লাহুতি’ (জন্ম: ১৮৮৭-মৃত্যু: ১৯৫৭, যিনি একজন ইরানি কবি পরে তিনি তাজিকিস্তানে বসবাস করতেন) একটি কবিতা রচনা করেন। যেটি ইরানি, আফগানি ও তাজিক গায়কদের দ্বারা বহুবার আবৃত্তি হয়েছে। ‘আবুল কাসেম লাহুতি রচিত কবিতাটি নিম্নরূপ:

کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باریک
دل عاشق مثال گرگ گرسنه است که گرگ از هی هی چوپان نترسد کمر باریک. ۵۱

‘যে প্রেমে পড়ে সে জীবনের ভয় করে না,
সে ভালোবাসা কাটা ও কারাবন্দি ভয় পায় না।
হৃদয় ক্ষুধার্ত নেকড়ে মত প্রেমে পড়েছিলো,
নেকড়ে রাখালের হেই হেই কে ভয় পায় না।’

বাবা তাহের আরো বলেন-

خوشا آنان که با ته همنشینند همیشه با دل خرم نشینند
همین بی رسم عشق و عشقبازی که گستاخانه آیند و ته بینند. ۵۲

‘ধন্য তারা যারা নিচে বসে থাকে,

সর্বদা সুখি মন নিয়ে বসে থাকুন।
এটি হলো অপ্রচলিত প্রেম ও ভালোবাসা,
যে তারা অভদ্রভাবে আসে নিচের দিকে দেখে।’

বাবা তাহের পার্থিব প্রেমের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, উভয় জগতের প্রেমের পরিণতি দুঃখ ও অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কেউ আল্লাহর ভালোবাসার সন্ধান করেন তবে তাকে অবশ্যই সবকিছু সংযতভাবে করতে হবে। তিনি বলেন-

به عشقت ای دلارا نگرستم نوید وصل تو تا نشنوستم
بدل تخم وفایت کشتم آخر بجز اندوه و خواری ندروستم^{৩৩}

‘হে প্রিয়তমা ! তোমার ভালোবাসার জন্য কিছু লিখিনি,
যতক্ষণ না আমি তোমার মিলনের সুসংবাদ শুনেছি।
অবশেষে একটি ডিমের বিনিময়ে তোমার বিশ্বাস হারিয়েছি,
আমি দুঃখ ও অপমান ছাড়া কিছুই খাইনি।’

উপসংহার

সমগ্র ফারসি সাহিত্যে বাবা তাহের উরইয়ান হৃদয়গ্রাহী প্রেমিক ও দরবেশি কবি হিসাবে পরিচিত। এদিক থেকে অন্যান্য কবিদের চেয়ে প্রায় হাজার বছর পূর্ব হতে অদ্যবধি ফারসি সাহিত্যঙ্গনে হৃদয়গ্রাহী প্রেম-ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিক কবি হিসাবে স্থায়ী আসন অলংকৃত করে রেখেছেন। এই প্রখ্যাত প্রাচীন কবি স্থায়ী রচনায় কখনও সাহিত্যিক জটিলতা ও গুরু গম্ভীর সাহিত্যিক অলংকারের ব্যবহার করেননি। তিনি খুবই সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় স্থায়ী কবিতাসমূহ আবৃত্তি করেছেন। বাবা তাহেরের সুন্দর ও সাবলিল ভাষার কবিতাগুলো পাঠকের হৃদয়ের গভীরে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তিনি ফারসি সাহিত্যে খুব বেশি অবদান রেখেছেন তা নয়; তবে যা রচনা করেছেন তাতেই তিনি স্বর্ণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। তিনি সর্বসাকুল্যে তিন-চারশত দো-বেইতি, কাসিদা ও গয়ল রচনা করে পারস্যের বড় বড় কবিসাহিত্যিক যেমন ওমর খৈয়াম, শেখ সা’দি ও হাফিজ সিরাজি এদের কাতারে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। যারা ওমর খৈয়াম, শেখ সা’দি ও হাফিয়কে জানে তারা বাবা তাহেরকেও জানে। তিনি যদি ফারসি দারি (প্রাচীন ফারসি) বা স্থানীয় লুরি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন কিন্তু তার প্রভাব ব্যাপকারে সমগ্র ফারসি সাহিত্যকে নাড়া দিয়েছে। এই মহান দরবেশি কবির কবিতাসমূহ যারাই পাঠ করেছে হোক সে শহরবাসি বা নিতান্ত পল্লিনিবাসি সকলের হৃদয়ে সমভাবে নাড়া দেয়। বাবা তাহেরের দো-বেইতির ব্যাপারে বলা হয়-যারা ফারসির বর্ণ পরিচয়ও জানতো না এমন অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষও তাঁর কবিতাসমূহ শুনে শুনে মুগ্ধ হয়ে হৃদয়ের আবেগ দিয়ে আবৃত্তি করতেন। বর্তমানেও ইরানের বিখ্যাত গায়ক-গায়িকগণ হাজার বছর পূর্বের বাবা তাহেরের প্রেম বিষয়ক দো-বেইতিগুলো আবৃত্তি করে চলেছেন।^{৩৪}

তথ্যনির্দেশ

- ১ <https://www.newhumanitybooks.com>,
- ২ <http://www.iranchamber.com/literature/babataher/babataher.php>
- ৩ আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইমলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৮।
- ৪ <http://bangla.trib.ir/2010-04-21-08-15-03/safar-iran/item/2463>-ইরান-ঐতিহ্য-১-৪০।
- ৫ Jan Rypka, *History of Iranian Literature* (Holland: Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1968.), P.357.
- ৬ মোহাম্মদ বিন আলি বিন সোলাইমান, *রাহাতুস সদুর ওয়া আয়াতুস সারুর ফি তারিখুদ্দোওলাতেস সালজুকিয়া* (কায়রো: আল জাজিরা ওপেরা হাউজ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৯৮-৯৯।
- ৭ পবিত্র কুরআন, ১৬ নং সূরা আন-নাহল, আয়াত-৯০।
- ৮ মোহাম্মদ বিন আলি বিন সোলাইমান, *রাহাতুস সদুর ওয়া আয়াতুস সারুর ফি তারিখুদ্দোওলাতেস সালজুকিয়া* (কায়রো: আল জাজিরা ওপেরা হাউজ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৯৮-৯৯।
- ৯ <http://www.farsinet.com/hamadan/babatahir.html>
- ১০ <https://www.farsinet.com/hamadan/>
- ১১ আব্দুল হুসাইন যাররিনকুব, *শেরে বি দুর্গ, শেরে বি নেকাব* (তেহরান: এস্তেশারাতে এলমি, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১৪৫।
- ১২ সিরুস শামিসা, *শেরে রোবাই দার শেরে ফারসি* (তেহরান: অন্তিয়ানি প্রেস, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৭।
- ১৩ হুসাইন বিন আলী আল-ওয়ায়েজ কাশেফি, *মাখতুতাতু বাদায়েউল আফকার ফি সানায়েল আশআর* (তেহরান: শাবকাতুল আলুখা, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৭২।
- ১৪ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন কায়স আর-রাযি, *আল-মুজামু ফি মাআয়িরে আশআরিল আযাম* (তেহরান: নাশরে এলমি, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১১২-১৩।
- ১৫ সিরুস শামিসা, *শেরে রোবাই দার শেরে ফারসি* (তেহরান: অন্তিয়ানি প্রেস, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩০৯।
- ১৬ মোহাম্মদ গুলবুন, *বাহার ওয়া আদাবে ফারসি*, ২য় খণ্ড (তেহরান: শেরকাতে সাহামে কিতাবহায়ে জিবি, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৭২
- ১৭ ড. পারভেজ নাতেল খানলারি, *ভাযনে শেরে ফারসি* (তেহরান: বুনিয়াদে ফারহাঙ্গে ফারসি, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৭১
- ১৮ পারভেজ আযকায়ি, *বাবা তাহের নামে* (তেহরান: তাহরি বুস্ত, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৩২।
- ১৯ <http://www.wikidory.com/057X.ashx>
- ২০ <https://ganjoor.net/babataher/>
- ২১ <https://www.amazon.com/DIVAN-BABA-TAHIR-Naked-Sufi-ebook/dp/B084KY63V2>
- ২২ <https://www.britannica.com/biography/Baba-Taher-Oryan>
- ২৩ <https://www.facebook.com/persianpoetryenglish/posts/atonement-by-baba-taher-iranian-mystic-and-poet-1000-1060https://www.wikipedia.org/wiki/23133330326849/>
- ২৪ <https://www.amazon.com/Poems-Taher-Oryan-Bilingual-Persian-English/dp/9643670716>
- ২৫ ড. সাইয়েদ আলি আসগার মির বাকেরি ফারদ, ড. মাহমুদ বারাতি ও ড. হুসাইন অগা হুসাইনি, *তারিখে আদাবিয়াত ইরান-২*, (তেহরান: দানেশগাহহায়ে সামত, ২০১৫ খ্রি.) পৃ. ১৪২।
- ২৬ ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ২য় খণ্ড, (তেহরান: এস্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৯৯৪ খ্রি.) পৃ. ৩৮৪।
- ২৭ https://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Tahir

- ২৮ ড. নাসের নিকুবাখত, *তাহলিলে শেরে ফারসি* (তেহরান: দানেশগাহহায়ে সামত, ২০১৪ খ্রি.) পৃ. ২১।
- ২৯ Ahmad Tamimdari, A history of Persian Literature (Trans: Ismail Salami), (Tehran: Alhoda Publishers, 2002), pp.147-151.
- ৩০ পারভেজ আযকায়ি, *বাবা তাহের নামে* (তেহরান: তাহরি বুক, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৫৫।
- ৩১ Ahmad Tamimdari, A history of Persian Literature (Trans: Ismail Salami), (Tehran: Alhoda Publishers, 2002), pp.147-151.
- ৩২ <https://www.beytoote.com/scientific/scientist/babataherhamedani-biography.html>
- ৩৩ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৭।
- ৩৪ আলহাজ্ব ছৈয়দ আহমদুল হক, *মসনবী শরীফের পয়গাম ও তাফসীর বাণী ও ভাষ্য* (চট্টগ্রাম: আব্বাস রুমী সোসাইটি, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৫।
- ৩৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক সাহিত্য* (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ১৬৩।
- ৩৬ মাহমুদ সামসুল হক, *নারী কোষ* (ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৮৬।
- ৩৭ সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণণ, *ধর্ম ও সমাজ* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৬।
- ৩৮ আলি আকবর দেহখোদা, *লোগাত নামেয়ে দেহখোদা*, ৩৪তম খণ্ড (তেহরান: দার চাপাখানেয়ে মুয়াসসেসেয়ে এস্তেশারাত ওয়া দানেশগাহে তেহরান, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ২৬৫।
- ৩৯ *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, পৃ. ৪৩৬-৩৭।
- ৪০ বদিউয্যমান ফেরুয়ানফার, *শারহে আহওয়াল ওয়া নাখদ ওয়া তাহলিলে আসারে শেখ ফরিদ উদ্দিন মোহাম্মাদ আব্বাস নিশাবুরি* (তেহরান: এস্তেশারাতে আনজুমানে আসার ওয়া মাফাখেয়ে ফারহাদি, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৮৩।
- ৪১ *আল কুরআনুল কারিম*, ৩ নং সূরা আলে এমরান, আয়াত: ৩১।
- ৪২ *আল কুরআনুল কারিম*, ১২ নং সূরা ইউসূফ, আয়াত: ৩০।
- ৪৩ *আল মাকতাবাতুশ শামেলা*, *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ১৪, পৃষ্ঠা. ২৪।
- ৪৪ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh8/>
- ৪৫ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh3/>
- ৪৬ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh7/>
- ৪৭ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh50/>
- ৪৮ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh2/>
- ৪৯ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh5/>
- ৫০ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh6/>
- ৫১ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh90/>
- ৫২ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh120/>
- ৫৩ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh236/>
- ৫৪ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh242/>
- ৫৫ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh331/>
- ৫৬ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh13/>
- ৫৭ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh26/>
- ৫৮ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh33/>

৯৯ ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৭ খ্রি.), পৃ.৪৫৪-৫৫।

১০০ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh37/>

১০১ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh37/>

১০২ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh48/>

১০৩ <https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh99/>

১০৪ <https://www.youtube.com/watch?v=DbWs8shOrv8>

পারস্য কবি নাযিরী নিশাপুরী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা

ড. মো. শফিউল্লাহ*

Abstract: Naziri Nishapuri is one of the most Prominent Persian Poets of Mughal Period. The exact date of his birth is not known but he was Indo-Persian Poet of the late 16th and early 17th Centuries. The real name of the Poet is Mohammad Hussain. Naziri left his native city of his Nishapur as a young man after the death of his father. He began to compose Poetry from the very child-hood. He was an accomplished Poet when he migrated to India, as the first Persian-Born Poet to join the court of the Mughal statesman and literary patron Abdur Rahim Khan Khanan. Naziri composed Panegyrics in his patron's honour. He later settled in Gujarat. In Gujrat, Naziri Prospered in agricultural and commercial enterprises and became a wealthy man. He built himself a princely mansion and contributed to the support of the poor. He remained in demand as a poet and wrote panegyrics not only for his previous patron, but also wrote for prince murad and Jahangir. He was also an active literary patron, receiving poets newly arrived from Persia. The Qasidas and Ghazals of Naziri are preserved in the Memoirs. But his greatest achievement is in Composing Ghazals. Features of his Ghazal Compositions are found in the characteristics of great Ghazal Composers. For example, the features of the Ghazal of the best Ghazal Writer of Iran, the Poet Hafiz are found in his Ghazals. Naziri Nishapuri and his Poetic genius have been discussed in this article.

ভূমিকা

পারস্যের মোগল আমলের বিখ্যাত কবি হলেন নাযিরী নিশাপুরী। তিনি ফারসি কাব্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লিখনি চালিয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছোট বেলা থেকেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। কাব্যচর্চা স্পৃহা তাঁকে কাব্য রচনার অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে ব্যাকুল করে তোলে। ফলে তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ইরানের নিশাপুর থেকে তৎকালীন ভারতের মোগল দরবারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছে করেন। এখানে এসেই তৎকালীন সময়ের মোগল দরবারের বিখ্যাত ফারসি কবি আব্দুর রহিম খানে খানানের দরবারে কাব্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।^১ এ সময় তিনি মোগল দরবারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কবি-সাহিত্যিক, সম্রাট ও শাহজাদাদের শানে কাসিদা কবিতা লিখেন। মোগল সম্রাটদের মধ্যে বিশেষত সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে তিনি বিশেষ স্থান লাভ করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে উপহার-উপঢৌকন ও পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করেন।^২ এই প্রতিশ্রুতি কবির কাব্যিক জীবন আরম্ভ হয় মূলত তাঁর কাসিদা রচনার মাধ্যমে, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি গজল রচনায় সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।^৩ ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত গজল রচয়িতা কবি শেখ সা'দী ও কবি হাফিজের পরের সারিতে যারা গজল রচনায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি নাযিরী নিশাপুরী। তিনি তাঁর গজল কাব্যে প্রেম-ভালবাসা, প্রিয়সীর সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিরহ-বিচ্ছেদ, মদ, বসন্ত ও শরৎকালীন প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সূফীবাদসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াবলি বর্ণনা করেছেন। তিনি কবিতার ছন্দমিল ও অন্ত্যমিল ঠিক রেখে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যে তাঁর কবিতা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নাযিরী পরিচিতি

কবি নাযিরীর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ হোসাইন। নাযিরী তাঁর উপাধি এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল নিশাপুর।^৪ তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে জানা যায় না, তবে ধারণার ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কেও তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে জানা যায় যে, তিনি ছোট থেকেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি শিশুকাল থেকেই কোরআন ও হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভের পাশাপাশি কাব্য জ্ঞানও অর্জন করেন এবং সে সময় থেকেই কবিতা রচনার প্রতি ঝোঁকে পড়েন। পরবর্তীতে নিশাপুর থেকে তিনি কাশান^৫ শহরে গমন করেন। কাশান শহরে এসে তিনি কাব্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ পান। পরবর্তীতে ভারতে গমন করে তিনি যে সকল কবি সাহিত্যিক দ্বারা কাব্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আব্দুর রহিম খানে খানান ও কবি ফয়জি^৬ ছিলেন অন্যতম।^৭ সমগ্র ভারতব্যাপীই তাঁদের কবিত্বের খ্যাতি ও যশের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছিল। মূলত নাযিরী তাঁদের দু'জনের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্বীয় দেশ পারস্যের সীমানা অতিক্রম করে ভারতে আগমন করেন। আরো জানা যায় যে, তিনি কাব্য চর্চার অনুকূল পরিবেশের প্রত্যাশার পাশাপাশি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও গুজরাটের আহমদাবাদে অবস্থান করেন।^৮ এক সময় তিনি প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হন এবং অনেক অর্থ-সম্পদ গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন। তাই দাতা-দানবীর হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। অবশেষে তিনি গুজরাটে ১০২১ হিজরী মোতাবেক ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।^৯ যে মহল্লায় তাঁর কবর রয়েছে তার নাম হলো তাজপুরা। তাঁর কবরের উপর একটি গম্বুজ রয়েছে।^{১০}

কাব্য চর্চা

নাযিরী নিশাপুরী তাঁর জন্মস্থান নিশাপুরে ছোটবেলা থেকেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। কবিতা রচনায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন এবং কাব্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ পাবার প্রত্যাশায় ছিলেন। এর ফলে তিনি ছোটবেলায় পারস্যের নিশাপুর থেকে কাশান শহরে গমন করেন। তৎকালীন সময় কাশান শহর কাব্য চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। সেখানে কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হতো। সেই প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। সে সময় ভারতীয় ফারসি কবি আব্দুর রহিম খানে খানানের কাব্য প্রতিভার পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি ভারতের সীমানা পেরিয়ে পারস্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে কাব্য রচনায় নাযিরী নিশাপুরীর তেমন কোন অবস্থান ছিল না।^{১১} তাই তিনি ৯৯১ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহিম খানে খানানের সাথে সাক্ষাত করেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁর একটি কবিতা তাঁর শানে পাঠ করে শুনান। কবিতাটি শুনা মাত্রই কবি আব্দুর রহিম খানে খানান তাঁর কাব্য প্রতিভা গুণে খুশি ও মুগ্ধ হয়ে অন্যান্য কবিদের সারিতে তাঁর স্থান করে দেন।^{১২} তখন থেকেই তিনি আব্দুর রহিম খানে খানানের দরবারে অন্যান্য কবিদের সাথে কাব্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। আব্দুর রহিম খানে খানানের মাধ্যমে একবার সম্রাট আকবরের দরবারে তাঁর স্বরচিত কাসিদা আবৃত্তির সুযোগ হয়েছিল; কিন্তু সম্রাটের দরবারে তখন কবি ফয়জির যশ ও খ্যাতি চলছিল। এর কারণে সম্রাট আকবর কবি নাযিরী নিশাপুরীর প্রতি খুব একটা আগ্রহ পোষণ করেননি। এর ফলে কবি নাযিরী নিশাপুরীর সম্রাট আকবরের দরবারে যাবার আকাঙ্ক্ষা অনেকটা কমে যায়। এক পর্যায়ে তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে যাতায়াত বন্ধ করে আব্দুর রহিম খানে খানানের দরবারে কাব্য চর্চা অব্যাহত রাখেন।^{১৩}

কাব্যকর্ম

নাযিরী নিশাপুরীর রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থের সংখ্যা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না, এমনকি তাঁর রচিত শ্লোক সংখ্যা সম্পর্কেও জানা যায় না। তবে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর দীভান গ্রন্থের নাম ও অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়।^{১৪} তাঁর সাহিত্যিক জীবন অতিবাহিত হয় মূলত কবি-সাহিত্যিক, শাহজাদা ও সম্রাটদের

শানে কাসিদা কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। তবে তাঁর প্রসিদ্ধির মূল পুঁজি হলো গজল রচনা। গজল রচনায় তিনি সবচেয়ে বেশি কাব্য নৈপুণ্যতার স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হন।^{১৫} এ প্রসঙ্গে শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল মন্তব্য করেন যে, “গজল কবিতায় তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।”^{১৬}

নাযিরীর কাব্য প্রতিভা

সঙ্গীতের সুর

নাযিরী নিশাপুরী ভারতে গমন করে আব্দুর রহিম খানে খানানের দরবারে স্থান পান। তাঁর দরবারে একদিকে যেমন কাব্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল তেমনি অপরদিকে ছিল বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীতচর্চা। তাই আব্দুর রহিম খানে খানানের দরবারে স্থান পেয়ে তিনি একদিকে যেমন কাব্য চর্চার পরিবেশ পান, তেমনি অপরদিকে তিনি সঙ্গীত শিল্পীদের সংস্পর্শ লাভে সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পান।^{১৭} এর ফলে তাঁর কাব্যে সঙ্গীতের সুরের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তাই তাঁর কাব্যকর্মে সঙ্গীতের সুর বিরাজমান। তাই পাঠকমহল তাঁর কাব্য পাঠে সঙ্গীতের ন্যায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যে একই সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সঙ্গীতের সুর এবং বিষয়বস্তুতে কবিত্বের সূক্ষ্ম চেতনা সমৃদ্ধ কবিতা রচনাতে নতুনত্ব সৃষ্টি করেন।^{১৮} নমুনাস্বরূপ তাঁর গজল কবিতার কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো :

ای صبا از گل عطار نشانی بمن آر * وز گلستان نیشاپور خزانی بمن آر

خط تر خانی جاوید بعالم ندهند * بگذر راز عالم و منشور امانی بمن آر

فرصتم نیست که از سنگ قضا سر خارم * گرمائی نبود تاب و توانی بمن آر^{১৯}

ওহে প্রভাত সমীরণ! আমাকে সুগন্ধময় ফুলের ঠিকানা দাও,

শরৎকালীন নিশাপুরের ফুলবাগিচা থেকে আমার নিকট ফুল নিয়ে এসো।

চিরস্থায়ী ঔষধী গাছের চিহ্ন বা সমাধান পৃথিবীতে কেউ রেখে যায়নি,

জগতের রহস্য ও নিরাপত্তার ঘোষণাপত্র আমাকে দাও।

ভাগ্যের নির্মম-নিষ্ঠুর পাথরের আঘাত থেকে আমার শিরকে রক্ষা করার সুযোগ আমার নেই,

যদি কোথাও নিরাপত্তা না থাকে সে ক্ষেত্রে সেগুলো সহ্য করার শক্তি-সামর্থ্য আমাকে দাও।

গজলকাব্যে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা

গজল কবিতায় কবিদের সাধারণত দেখা যায় যে, বিচ্ছিন্নভাবে কোন প্রিয়সীর সৌন্দর্য বর্ণনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান-শৌকতের বর্ণনা, বিরহ-বিচ্ছেদের বর্ণনা, বুলবুলি পাখি, আলো ও প্রজাপতি, মেঘমালা, মদ, বসন্ত ও শরৎকালীন প্রাকৃতিক দৃশ্য, সূফীবাদ ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়, এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো কবিতায় ছন্দমিল ও অন্ত্যমিল ঠিক রেখে বর্ণনা করে থাকেন। নাযিরী নিশাপুরী এ বিষয়গুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গজল কবিতা ইরানী বিখ্যাত কবি হাফিজ শিরাজী ও ভারতের বিখ্যাত কবি আমীর খসরুর গজল কবিতার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার সাথে মিলে যায়।^{২০} সাধারণত গজলের প্রতিটি শে’র বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়ের সাথে অপর বিষয়ের মিল থাকে না। যদি দু’টি শে’র বা ততোধিক শে’রের বিষয়বস্তুতে মিল থাকে তাহলে এ কবিতাগুলোকে কেত’আ অথবা কেত’আবান্দ বলা হয়ে থাকে।^{২১} ফারাসি সাহিত্যের কতিপয় কবি তাঁদের গজল কবিতাগুলো ব্যতিক্রমী পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যে লিপিবদ্ধ করার নিমিত্তে তাঁরা গজল রচনায় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ধরনের গজলকে ‘গজলে মুসালসাল’

বলে।^{২২} ‘গজলে মুসালসাল’ রচনায় ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত গজল রচয়িতা কবি শেখ সা’দী ও কবি হাফিজ শিরাজীর পাশাপাশি কবি নাযিরী নিশাপুরীকে লক্ষ্য করা যায়।^{২৩} নমুনাস্বরূপ নাযিরী নিশাপুরীর গজল কবিতার কয়েকটি শ্লোক:

شرم از میان بر خاسته مهر از دهان برداشته * گفتار بی پرسش ببین رفتار بی باکش نگر
از کوئی معشوق آمده شوریدگان در حلقه اش * از صید آهو می رسد شیران بفتراکش نگر
دل برده در دل باختن معشوق عاشق پیشه بین * بگرفته در انداختن بازوئی چلاکش
نگر
وحشی غزالی کز صیادم در بیابان می خورد * رام نظیری می شود و در هوش داد را کش نگر^{২৪}

ভালবাসার কথা মুখ থেকে বের হয়ে লজ্জা-শরম অন্তর থেকে চলে গেল,

তখন লক্ষ্য করো জিজ্ঞাসাবিহীন কথা-বার্তা ও ভয়-ভীতিহীন আচার-আরচণ পর্যবেক্ষণ করো।

প্রিয়সীর গলিপথ দিয়ে উন্মাদগণ তার আন্তানায় এসেছে,

যেমনটি লক্ষ্য করো যে একটি হরিণ তাঁর শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা পেয়ে শিংহ দলের সামনে পড়েছে।

লক্ষ্য করো প্রেমিক তার মন হরণকারী প্রেমাস্পদের ছলনায় পড়ে পরাস্ত হয়েছে,

আরো লক্ষ্য করো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের বাহুর ভঙ্গিমায় গ্রেফতার হয়েছে।

বন্য হরিণ যেটি আমার শিকার থেকে রক্ষা পেয়ে মরুভূমিতে চারা করছে,

সে হরিণটির প্রতি নাযিরী বশীভূত হলো স্বজ্ঞানে,

আর লক্ষ্য করো ন্যায়বিচার তার সখা হলো।

শব্দে ভাবার্থের নতুনত্ব ও তাৎপর্যবহ শব্দ গঠনে অভিনবত্ব

নাযিরী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলো ভাবার্থের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে এবং তিনি অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলো গঠনের দিক থেকেও সম্পূর্ণরূপে নতুন। তিনি তাঁর কবিতায় কিছু সাধারণ শব্দকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেগুলো নতুন ভাবার্থ প্রকাশ করেছে।^{২৫} উদাহরণস্বরূপ তাঁর কবিতার দুটি লাইন :

از کف نمی دهد دل آسان ربوده را دیدیم زور بازوئی نا آزموده را^{২৬}

কমল হৃদয় হরণকারীকে প্রেমাস্পদ তাঁর হাতের তালুটুকুকেও স্পর্শ করতে দেয়নি,

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এমন অদক্ষ বাহুবল আমরা অবলোকন করেছি।

উপরোক্ত কবিতায় "دل آسان ربوده" এ অংশটুকু শব্দের নতুন মিশ্রণে গঠিত যুক্ত শব্দ এবং উপরোক্ত কবিতার দ্বিতীয় পংক্তিতে "زور بازوئی نا آزموده" এ অংশটুকুতে ভাবার্থের ক্ষেত্রে শব্দের গঠনটা ব্যতিক্রমধর্মী বলে প্রতীয়মান হয়।

উপমা ব্যবহার

কবিদের কাব্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে মূলত তাঁদের কবিতায় উপমা ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। উপমা ছাড়া কবিতা সাজ-সজ্জাবিহীন যৌন্দর্যের ন্যায়।^{২৭} কবিতায় উপমা ব্যবহার কবিতার সেরা অলঙ্কার। অলঙ্কার ছাড়া সৌন্দর্য যেমন ফুটে উঠেনা; তেমনিভাবে উপমা ছাড়া কবিতার সৌন্দর্য ফুটে উঠে না। নাযিরী নিশাপুরী

কবিতায় উপমা ব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।^{২৮} উদাহরণস্বরূপ তাঁর কবিতার একটি লাইন উপস্থাপন করা হলো :

محبت در دل غم دیده الفت بیشتر گیرد * چراغی را که دودی هست در سر زود تر گیرد^{২৯}

দুঃখ-কষ্ট বিজড়িত ভালবাসার হৃদয়ে দ্রুত প্রেম-প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়,

যে বাতিটির সলিতায় ধোঁয়া রয়েছে সে বাতিটি দ্রুত প্রজ্জ্বলিত হয়।

উপরোক্ত কবিতায় বুঝানো হয়েছে যে, যে লোকটির হৃদয় প্রেম-ভালবাসার আনলে দক্ষ; সে লোকটির হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিকতর সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি তিনি ঐ বাতির সাথে তুলনা করেছেন যে বাতিটি নিভু নিভু পর্যায় জ্বলছে। সে বাতিটি যেমন পড়ে থাকা অন্যান্য বাতির তুলনায় দ্রুত জ্বলে উঠে; ঠিক তেমনিভাবে যে হৃদয়টি প্রেমদক্ষ সে হৃদয়ে প্রেম দ্রুত অনুভূত হয়।

হৃদয় স্পর্শী কবিতা

নাযিরী নিশাপুরী স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কাব্যে যে ভাষা যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার সে ভাষা সেভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি যে স্থানে দুঃখ-কষ্ট বিজড়িত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, সে স্থানের দুঃখ-কষ্ট বিজড়িত অবস্থার চিত্র পাঠে মনে হয় যেন, তিনি সেই দুঃখ-কষ্ট বিজড়িত অবস্থায় আবদ্ধ হয়েছেন।^{৩০} আবার যখন তিনি আনন্দময় অবস্থা বা পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তখন সে আনন্দময় অবস্থা পাঠে মনে হয় যেন, তিনি সেই আনন্দঘন পরিবেশে বিরাজমান রয়েছেন।^{৩১} তাই পাঠকমহল ও সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর কবিতাগুলো হৃদয় স্পর্শী। উদাহরণস্বরূপ তাঁর কবিতার দু'টি লাইন তুলে ধরা হলো :

برده برداشته ام از غم پنهانی چند * بزیان می رور امروز گریبانی چند

زان ضعیفان که وفا داشت دراین شهر اسیر * قفی چند بجا مانده و زندانی چند^{৩২}

গোপনে কিছু দুঃখ-কষ্টের পর্দা উঠিয়ে লক্ষ্য করলাম,

বর্তমানে কিছু লোক ক্ষতির দিকে যাচ্ছে।

এ বন্দী শহরে কিছু কৃতজ্ঞ লোক রয়েছে,

এর কতিপয় লোক নিজ অবস্থানে রয়েছে,

আর কতিপয় লোক বন্দীদশায় জীবন-যাপন করছে।

কবিতায় সূক্ষ্ম দর্শন

নাজিরীর কবিতায় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় দর্শন বিষয়ের অবতারণা অনেক কম; কিন্তু যতটুকু দর্শন বিষয়ের আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নাজিরীর দর্শন বিষয়ের নৈপুণ্যে আব্দুস সাত্তার মন্তব্য করেন- “নাজিরীর কবিতার সূক্ষ্ম দর্শন সত্যি ভাবিয়ে তোলে”।^{৩৩} এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে নাজিরীর সূক্ষ্ম দর্শন বিষয়ের চারটি পুংক্তির অনুবাদ তুলে ধরেনঃ

“আমার আকাঙ্ক্ষা শুধু অতি ক্ষুদ্র এমন পৃথিবী

সেখানের অধিবাসী আমি তুমি, আর কেউ নয়।

আঘাত দেইনি আমি পৃথিবীর কোনোও হৃদয়ে

কেননা সে হৃদয়েতে তোমার এ ভালবাসা আছে।”^{৩৪}

সাব্কে হিন্দীর বেশিষ্টে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

সাব্কে হিন্দীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, কবিগণ তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও কাল্পনিক চিন্তা-চেতনাগুলো প্রকাশের জন্য যে উপমাগুলো ব্যবহার করে থাকেন তা বস্তুসামগ্রী জাতীয় ও অনুভবযোগ্য বিষয়াবলী।^{৩৫} সাব্কে হিন্দীর এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি তাঁর অধিকাংশ কবিতায় পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর কবিতা থেকে একটি লাইন :

یکی بگور عزیزان شهر سیری کن * به بین که نقش اهل ها باطل افتاده است ۳۵

প্রিয় শহরবাসীদের গোরের প্রতি লক্ষ্য করো,

যেমনটি শহরবাসীদের চিত্র ধ্বংসে পরিণত হয়েছে।

উপরোক্ত কবিতায় বুঝা যায় যে, যে কবি নাযিরী ‘প্রিয় শহরবাসীদের কবর’কে তুলনা করেছেন শহরবাসীদের ধ্বংসে পরিণত হওয়া চিত্র ও স্মৃতির সাথে। এ ধরনের অনেক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনাগুলো তিনি তাঁর অসংখ্য কবিতায় সহজবোধ্য উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর উপমাগুলো সহজে বোধগম্য ও অনুভবযোগ্য যা অনুভূতিকে শানিত করে। ‘সাব্কে হিন্দী’ পদ্ধতিতে সাফাভী যুগের ও মোগল যুগের কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। নাযিরী নিশাপুরী শুধু সে পদ্ধতিটি অনুসরণই করেননি বরং এ পদ্ধতিটির পূর্ণতা দান করেছেন।^{৩৬}

ইরানের বিখ্যাত গজল রচয়িতা কবি হাফিজ ও নাযিরীর মাঝে গজল রচনায় তুলনামূলক পর্যালোচনা

কবি হাফিজের গজল রচনায় যে জ্বলন্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সে প্রতিভার অনেকাংশে মিল পাওয়া যায় কবি নাযিরীর গজল রচনায়। কবি হাফিজ পরকালমুখী চিন্তা-চেতনা নিয়ে গজল রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কবি হাফিজ পার্থিব যাবতীয় ব্যস্ততাকে ফেলে রেখে নির্জনে নিরিবিলিতে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যেমনটি গজল রচনা করেছেন। এ দিক বিবেচনায় কবি নাযিরী নিশাপুরীও শেষ জীবনে ঘরকুনো হয়ে পার্থিব ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরমাত্মার সাথে মিলনের প্রত্যাশায় পরকালীন চিন্তা-চেতনা নিয়ে গজল রচনা করেছেন। কবি হাফিজ এশ্কে মাজাযীর (عشق مجازی) এর তুলনায় এশ্কে হাকীকী (عشق حقیقی) কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। নাযিরী নিশাপুরীও তাঁর গজলে এশ্কে হাকীকীকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।^{৩৭} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসার চিত্র নাযিরীর কবিতায় অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।^{৩৮} হাফিজের দীভান (دیوان) এর সর্বপ্রথম গজলের প্রথম এবং শেষ ছত্র (مصراع) আরবী। নাযিরী নিশাপুরীরও সর্বপ্রথম গজলের প্রথম এবং শেষ ছত্র (مصراع) আরবী ভাষায় রচিত। উদাহরণস্বরূপ কবি হাফিজ ও নাযিরী নিশাপুরীর চারটি করে ছত্র উপস্থাপিত হলো:

কবি হাফিজের গজলঃ

الا يا ايها الساقی ادر کا سا و نا ولها * که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

حضورى گر همى خواهى ازو غائب مشو حافظ * متى ما تلقى من تهوى دع الدنيا و اهلها ۸۰

“দাও গো সাকী পান-পিয়লা, ঘুরে ফিরে মাতাল দলে,

প্রথমে প্রেম আসান ভেবে পড়েছি আজ কি মুশকিলে!

মিলন যদি চা‘স তাহারি, রস্ নে দূরে, হাফিজ ওরে!

পাবি যখন পরাণ সখা, দিস দুনিয়া ছুড়ে ফেলে।”^{৪১}

নাযিরী নিশাপুরীর গজলঃ

إذا ما شئت ان تحيى حيوۃ حلوة المحيا * بر سوای بر اور سر ز مستوری بردن نه پا
نظیری گر طمع داری که مقبول مغان باشی * فلا تحد و لا تبخل و لا تحرص علی الدنيا ۸ۨ

ওহে তুমি যদি জীবনে বেচে থাকার স্বাদ পেতে চাও,

তাহলে নির্জন অবস্থা থেকে মাথা সরিয়ে নেওয়াটা মূল্যহীন হবে এবং টেকসই হবে না।

নাযিরী তুমি যদি আকাঙ্ক্ষা রাখো যে, তুমি গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব হবে,

তাহলে তুমি সীমালংঘন করো না, কৃপণতা করো না এবং পার্থিব লোভ-লালসা করো না।

ইরানী সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে নাযিরী নিশাপুরীর কাব্য প্রতিভা

ইরানী সাহিত্য সমালোচকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। যেমনটি তাঁরা ভারত ও পাকিস্তানের ফারসি কবিদের সাহিত্য প্রতিভা ও যশ-খ্যাতির বিষয়টি যথার্থতার সাথে মেনে নিতে চান না। আর যারা স্বীয় জন্মভূমি ইরান ছেড়ে ভারত ও পাকিস্তানে এসে কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে খ্যাতি ও যশ অর্জন করেছেন; এমন খ্যাতনামা কবিদের স্বীকৃতি প্রদান করেন না।^{৪৩} তবে নাযিরী নিশাপুরী ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান কবিদের কাতারে স্থান পেয়েছেন যাদের সম্পর্কে ইরানী সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ নিজেদের গ্রন্থাবলীতে স্থান দিয়ে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। ইরানী ঐতিহাসিক লুতফুল্লাহ তাঁর রচিত গ্রন্থ *অতেশ কাদে* এবং ইরানী ঐতিহাসিক রেযাকুলি হেদায়াত তাঁর রচিত *মুজমাউল ফুছাহা* নামক গ্রন্থে নাযিরী নিশাপুরীকে স্বীয় গ্রন্থাবলীতে শুধু স্থানই দেননি; বরং তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।^{৪৪}

কবি-সাহিত্যিক, সম্রাট ও ফারসি সাহিত্যবিদদের দৃষ্টিতে নাযিরীর কাব্য প্রতিভা

নাযিরী নিশাপুরীর সুপ্ত কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে মূলত কবি-সাহিত্যিক, শাহজাদা ও সম্রাটদের শানে কাসিদা রচনার মাধ্যমে। এছাড়াও তিনি কবি মহলে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুপরিচিত হয়েছেন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর যখন শাহজাদা সেলিম সিংহাসন আরোহণ করেন, তখন কবি নাযিরী নিশাপুরী মোগল দরবারে মর্যাদা ও স্থান লাভের সুযোগ পান। এ সময় তিনি একটি কাসিদা লিখে সম্রাটের শানে উপস্থাপন করেন। সম্রাট কাসিদা শুনে খুশি ও মুগ্ধ হয়ে এক হাজার রূপী, একটি বিশেষ উপহার ও পুরস্কারস্বরূপ একটি ঘোড়া প্রদান করেন। যে বিষয়টি সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর *তুয়ক-ই-জাহাঙ্গীর*^{৪৫} এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।^{৪৬} সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে তিনি প্রচুর পরিমাণে উপহার-উপটোকন ও বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। জানা যায় যে, তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ও উপহার-উপটোকনে ধন্য হন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে অনেক জমি-জায়গা ও প্রচুর অর্থ লাভ করেন।^{৪৭} মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী স্বীয় গ্রন্থ *আদাব নামেয়ে ইরান* এ উল্লেখ করেন যে, সম্রাট তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিন হাজার বিঘা জমি তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছিলেন।^{৪৮} তবে এ ক্ষেত্রে শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল তাঁর *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে প্রাসাদের গায়ে খোদাই করার জন্য কবি নাযিরী একটি কবিতার দু'টি লাইন রচনা করেন। কবিতার সে দু'টি লাইনের কাব্যিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট কবি নাযিরীকে উপহারস্বরূপ তিন হাজার একর জমি দান করেন।^{৪৯} নাযিরীর কাব্য প্রতিভা প্রসঙ্গে *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* গ্রন্থ প্রণেতা আব্দুস সাত্তার বিশিষ্ট ফারসি সাহিত্যবিদ শিবলী নোমানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- “শিবলী নোমানী তাঁর *শিরুল আজম* গ্রন্থে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর যে সাতজন কবিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন নাজিরী তাঁদের অন্যতম।”^{৫০} অধ্যাপক

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে বলেন- “নজিরীর কাব্য প্রতিভা তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।”^{৫৫}

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, কবি নাযিরী নিশাপুরী ভারতের মোগল আমলের একজন খ্যাতনামা ফারসি কবি। তাঁর জ্বলন্ত কাব্য প্রতিভার আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়েছে ফারসি কাব্য সাহিত্য। তিনি ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় গজল রচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।^{৫৬} তাঁর গজলে অনেক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি গজলে প্রেম-ভালবাসা, প্রিয়সীর সৌন্দর্য বর্ণনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিরহ-বিচ্ছেদের বর্ণনা, শরাব, এশুক ও এশুকে হাকীকী, বসন্ত ও শরৎকালীন প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য, সূফীবাদ ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয় সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি অন্যান্য গজল রচয়িতাদের ন্যায় এ বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা না করে বিষয়গুলোর বর্ণনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে যখন তিনি যে বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন সে বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ গজলের বেইৎ (بيت) রচনা করতে হবে; ঠিক সে পরিমাণ গজলের বেইৎ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর গজলগুলো অন্যান্য কবিদের তুলনায় অনেক বড় আকারের প্রতীকীয় হয়।^{৫৭} তাঁর গজলে সঙ্গীতের সুর বিরাজমান। তিনি তাঁর গজলকে একই সঙ্গে সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ করে তোলেছেন; অপরদিকে সঙ্গীতের সুর সংযোগ করে গজল কাব্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছেন।^{৫৮} ইরানের বিখ্যাত গজল রচয়িতা কবি হাফিজ ও শেখ সা‘দীর গজল রচনার বৈশিষ্ট্যও তাঁর গজলে বিদ্যমান। তিনি কাসিদা রচনাতেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর কাসিদা রচনায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবরের দরবারের খ্যাতনামা কবি আব্দুর রহিম খানে খানান তাঁর দরবারে তাঁকে স্থান দেন; পরবর্তীতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর কাসিদা রচনায় খুশী ও মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনেক উপহার-উপঢৌকন ও প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন।^{৫৯} তাঁর কবিতাগুলোতে অন্তর্মিল রয়েছে ও তাঁর কবিতাগুলো ছন্দবদ্ধ। তাৎপর্যবহু শব্দ গঠন ও শব্দে ভাবার্থের নতুনত্ব, কবিতায় উপমা ব্যবহারে পারদর্শিতা, হৃদয় স্পর্শী কবিতা রচনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতাগুলো ‘সাবকে হিন্দী’ এর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ ধরনের অনেক কাব্য বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায় বিরাজমান এবং তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যময়। তাঁর সৃজনশীল কাব্য প্রতিভার আলোকে আলোকিত হয়েছে ফারসি সাহিত্য জগত। তাই সব শেষে একথা বলা যায় যে, কবি নাযিরী নিশাপুরীর বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর একটি ‘দীভান’ গ্রন্থের নাম ও বিভিন্ন কবিতা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তাঁর অন্য কোন কাব্য গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের সংখ্য পাওয়া যায় না; এমনকি তাঁর কবিতার শ্লোক সংখ্যা সম্পর্কেও সঠিক তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সাহিত্য সমালোচকগণ ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর বিভিন্ন কবিতা তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়ে তাঁর জ্বলন্ত কাব্য প্রতিভার বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। তাই তাঁর রচনার সংখ্যা কম হলেও রচনাগুলো তাঁর সৃজনশীল কাব্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে।^{৬০} সুতরাং স্বল্প সংখ্যক কবিতার রচয়িতা হয়েও তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভা বলে ফারসি কাব্য সাহিত্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

- ১ মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, তা.বি.), পৃ. ৬৫২; আযিমুল হক জোনাইদী, মোহাম্মদ তাহের ফারুকী, *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি* (পেশাওর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ২য় সংস্করণ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৩২৩-২৩৩; অধ্যাপক মুহাম্মাদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৭।
- ২ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫২।
- ৩ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫৫; শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা : শ্রী জগদেশ প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৩৬০), পৃ. ১৬৩।
- ৪ *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, পৃ. ২৩২।
- ৫ **কাশান** : কাশান মধ্য ইরানের উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও প্রধান শহর। প্রাচীনকাল থেকেই শহরটি কারুনৈপুণ্য ও বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। শহরটির চারি পার্শ্ব জুড়ে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লিলাভূমি। তাই শহরটি প্রকৃতিগত পণ্যসমূহের জন্য বিখ্যাত। ডালিম, আঙ্গুর ও তরমুজসহ নানা রকমারি ফল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় শহরটির চারি দিকে। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৪৮৮।]
- ৬ **ফয়জি** : ভারতবর্ষের ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে কবি ফয়জি এক অনন্য প্রতিভা। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ফারসি কবি ও সাহিত্যিক। আমীর খসরুর পর পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ফয়জি। তিনি সম্রাট আকবরের দরবারের সভা কবির পদ মর্যাদা এবং সম্রাট আকবর কর্তৃক মালেকুশ-শোআরা বা কবিসম্রাট উপাধি লাভ করেন। তিনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষার একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। [মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৬৩৬; *বাংলাপিডিয়া*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১১৩-১১৪; আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৭৭।]
- ৭ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫২।
- ৮ **তদেব**।
- ৯ **তদেব**, পৃ. ৬৫৫।
- ১০ *ইরানের কবি*, পৃ. ২৫৩।
- ১১ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫২।
- ১২ **তদেব**।
- ১৩ **তদেব**।
- ১৪ *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৩।
- ১৫ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫৬।
- ১৬ *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৩।
- ১৭ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫৬।
- ১৮ **তদেব**, পৃ. ৬৫৭।
- ১৯ **তদেব**।
- ২০ **তদেব**।
- ২১ প্রফেসর মোহাম্মদ মুঈয়ুদ্দীন, *রাহনুমায়ে সুখান* (ঢাকা: কোরআন মঞ্জিল, বাবু বাজার, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০ খ্রি.) পৃ. ৫৬।
- ২২ **তদেব**, পৃ. ৫৬।
- ২৩ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৬৫৭।
- ২৪ **তদেব**, পৃ. ৬৫৮।
- ২৫ **তদেব**।

-
- ২৬ তদেব।
- ২৭ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৯০।
- ২৮ ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৭৯-৮০।
- ২৯ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৬।
- ৩০ তদেব; মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি, পৃ. ২৩৩।
- ৩১ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৭।
- ৩২ তদেব।
- ৩৩ মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি, পৃ. ২৩৪।
- ৩৪ ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৮০।
- ৩৫ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৬; মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি, পৃ. ২৩৩।
- ৩৬ তদেব।
- ৩৭ তদেব।
- ৩৮ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৮।
- ৩৯ মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি, পৃ. ২৩৩।
- ৪০ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৮।
- ৪১ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দীওয়ানে হাফিয (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ৩।
- ৪২ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৯।
- ৪৩ তদেব, পৃ. ৬৫৪।
- ৪৪ তদেব।
- ৪৫ তুজক-ই- জাহাঙ্গীর: এটি একটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। গ্রন্থটি সশাট জাহাঙ্গীর রচনা করেন। [দ্রষ্টব্য: ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৯৪]
- ৪৬ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫২।
- ৪৭ তদেব, পৃ. ৬৫৩।
- ৪৮ তদেব।
- ৪৯ পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৬৪।
- ৫০ ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৭৯।
- ৫১ ইরানের কবি, পৃ. ২৫৭।
- ৫২ আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ৬৫৫।
- ৫৩ তদেব, পৃ. ৬৫৭।
- ৫৪ তদেব, পৃ. ৬৫৬।
- ৫৫ তদেব।
- ৫৬ ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৭৯; ইরানের কবি, পৃ. ২৫৭।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি : সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব

ড. সেরিনা সুলতানা*

Abstract: In ancient India the modern sentiment of nationalism had hardly taken root. Writers speak of rājya (state) and of rāṣṭra (territory) as an element of rājya. They had no sense of nationality, nor did they seriously work for national unity. The modern idea of a nation is more a question of feeling and sentiment rather than of objective fact. India offers nothing that can be regarded as a serious theory of politics in the wider sense of that term. But there was intensive study of the practical aspect of government and of relations between state. In this article, an attempt has been taken to describe the excellences of the constituent elements of a state i.e. the king, the minister, the country, the fortified city, the treasury, the army and the ally.

রাজ্য, রাষ্ট্র, দেশ, জনপদ এই শব্দগুলো দিয়েই প্রাচীন ভারতবর্ষে State বোঝানো হয়েছে। রাজ্য শব্দটিই State এর সবচেয়ে প্রচলিত শব্দ। রাজা এবং রাজ্য দুটি শব্দের উৎপত্তি রনজ্ ধাতু থেকে যার অর্থ খুশি করা, রাঙিয়ে দেয়া। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্যে বলেছেন- রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাং। রাজা বা রাজন্ শব্দের সঙ্গে ষণ্ড প্রত্যয় যোগ করলেই রাজ্য শব্দটি নিস্পন্ন হয়। রাজার ভাব এবং কর্ম যে বস্তুর মধ্যে নিহিত তাকেই বলে রাজ্য। রাজ্য বলতে রাজা, তাঁর প্রশাসন এবং শাসিত প্রজাদের একই সঙ্গে বোঝানো যায়।

রাষ্ট্র শুধুমাত্র বন, পাহাড় আর নদীর অচেতন সমষ্টিমাত্র নয়, সচেতন সমাজের ভাবনায় রাষ্ট্রকেও সম্পূর্ণ সচেতন এক নতুন সংজ্ঞায় সজ্জিত করা যায় সেই ভাবনায় পরবর্তী রাজশাস্ত্রের মূলধন। সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা, মাৎস্যন্যায় এবং বিপরীত দিকে সকলের সুরক্ষার তাগিদ থেকেই পৃথিবীতে ঐশ্বরিকভাবে পৃথু কিংবা মনুর মতো রাজার আবির্ভাব হয়।

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেছেন, পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন দেশসমূহ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহনক্ষত্রের মতো একান্ত পৃথক এবং সম্বন্ধহীন হতো তাহলেই হয়ত রাষ্ট্রগত সামাজিক তত্ত্বগুলোর বিকাশ ঘটত একইভাবে। কিন্তু এক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে যেহেতু অন্য মানবগোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে এবং সেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভাবনাচিন্তা এবং প্রয়োজন যেহেতু বিভিন্ন ; সেহেতু তাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাও পরস্পর ভিন্ন ধরনের। সামাজিক এবং রাষ্ট্রতত্ত্বও তাই পরস্পর ভিন্ন। মহাভারত, রামায়ণ, ধর্মসূত্রসমূহ এবং অর্থশাস্ত্র সর্বত্রই এমন এক অরাজকতার আতঙ্ক আছে যে, তাতে প্রজার সুরক্ষার ব্যাপারটাই রাজা বা রাজ্যসৃষ্টির প্রথম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে, একটি নির্দিষ্ট জনপদের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী না থাকে তবে রাজ্য বা জনপদ আপন সংজ্ঞা লাভ করে না- “ন হ্যজনো জনপদো রাজ্যং জনপদং বা ভবতীতি কৌটিল্যঃ”^১ রাষ্ট্র বলতে একটি নির্দিষ্ট জনপদ এবং সেই জনপদভুক্ত মানুষগুলোকে বোঝায়- অর্থশাস্ত্রের নানা আলোচনা থেকে একথাই অনুমিত হয়।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য মনুষ্যবতী ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন- এ থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কৌটিল্যের বক্তব্যের মধ্যে নিহিত হয়। পণ্ডিতদের মতে, কৌটিল্য যে রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তার আয়তন খুব বড় নয়। একটি রাজ্যের আশেপাশে সামনে পিছনে যে রাজমণ্ডলের কথা কৌটিল্য লিখেছেন তার সংখ্যা অন্তত

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বারোটি হওয়ায় পণ্ডিতদের ধারণা একটি রাজ্যের আগে পরে কমপক্ষে বারোটি রাজ্য আছে সে রাজ্যের আয়তন খুব বড় হতে পারে না। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যদি একটি সাম্রাজ্য কল্পনা করা যায় কৌটিল্য তার নাম দিয়েছেন চক্রবর্তিক্ষেত্র।^২ একটি অধিকৃত রাজ্যের আগে পরে শত্রু মিত্র মিলে যে দ্বাদশ রাজমণ্ডলের কল্পনা করা হয়েছে তাতেই কৌটিল্যের অভীষ্ট রাজ্য ছোট হয়ে যাবে এ ধারণা করাও সমীচীন নয়।

রাজ্যের সগুপ্ত বিবেচনার সময় মনু, মহাভারতকারের মতো কৌটিল্য রাষ্ট্র শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি ব্যবহার করেছেন জনপদ শব্দটি। প্রাচীন বেদ-ব্রাহ্মণের যুগে এক একটি জন জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলকেই জনপদ বলা হতো। জনপদ শব্দটিও ছোট একটি রাষ্ট্রের ইঙ্গিত দেয়। কৌটিল্য জনপদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এইজন্য যে, তাঁর কথিত রাষ্ট্র শুধু ভূখণ্ডমাত্র নয়, সেটি মনুষ্যসমৃদ্ধ একটি রাজা বা রাজ্য। রাজা যা করেন, করবেন অথবা রাজার যা করা উচিত তাই আসলে রাষ্ট্রের কাজ বলে কৌটিল্যের দর্শনে চিহ্নিত। তাই সগুপ্ত রাষ্ট্রের আলোচনার শেষে কৌটিল্য বলেছেন- “রাজা রাজ্যম্ ইতি প্রকৃতিসংক্ষেপঃ”।

কৌটিল্য, মনু, অথবা মহাভারতকার এককথায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে রাজি নন। রাষ্ট্রকে তারা মানবশরীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানবশরীরের যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে সেইরকম কয়েকটি অঙ্গের সমূহই রাষ্ট্রশরীর। মহাভারতকার এবং মনু একে সগুপ্ত বলেছেন এবং অর্থশাস্ত্রে সগুপ্তকৃতি বলা হয়েছে। এই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতি যথাক্রমে স্বামী (রাজা বা সার্বভৌম নৃপতি), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (রাষ্ট্র এবং প্রজা), দুর্গ (সংরক্ষিত নগর অথবা রাজধানী), কোশ (রাজকোশ, অর্থসঞ্চয়), দণ্ড (স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র শাসনের শক্তি তথা উপায়) এবং মিত্র (নিজের অনুকূল পররাষ্ট্রসমূহ)। মানবশরীরের হাত, পা, মাথা, যেমন রাষ্ট্রের পক্ষে স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি তেমনই।^৩ কানের দুল বানাতে হলে সোনার যে ভূমিকা, সেই সোনা যেমন কুণ্ডলের প্রকৃতি তেমনই স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি ছাড়া রাজ্যের উৎপত্তি হয় না, যদি বা উৎপন্ন হয় তবে স্বামী অমাত্য ছাড়া রাজ্য স্থায়ী হয় না। এ কারণেই স্বামী, অমাত্য, এগুলো হল রাজ্যের অঙ্গ। শূক্ৰাচার্য শূক্ৰনীতিসারে রাজ্যের সাতটি অঙ্গকে একটি মানবশরীরের সঙ্গে মিলিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় রাজ্যের মাথা হলেন রাজা, চোখ হলেন মন্ত্রীরা, রাজার মিত্রস্থানীয়েরা হলেন রাজার কান, রাজকোশ হলো মুখ, মন হচ্ছে দণ্ড (বল), দুর্গ হলো হাত আর পা হলো জনপদ।^৪

মহাভারতেই প্রথম রাজ্যের সগুপ্ত তত্ত্বের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। মহারাজ জনকের সঙ্গে এক বিদুষী রমণীর কথা হচ্ছিল। রমণী বলেছিলেন একটি রাজ্যের রাজা হওয়ার সমস্যা অনেক, দুঃখও অপার। এমন দুঃখজনক রাজ্য কে চায়? আর কেই বা রাজ্যলাভ করেও শান্তি পায়। পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোশ, অমাত্য এগুলোকে কি কোনো রাজা শুধু নিজের বলে ভাবতে পারবেন- মমেদমিতি যচ্ছেদং পুরং রাষ্ট্রং চ মন্যসে? অর্থাৎ তুমি রাজা এই ব্যক্তিবিশেষ না থাকলেও রাজ্য থেকেই যাবে এবং সেখানে রাজাও একজন কেউ প্রতিষ্ঠিত হবেন। কারণ রাজ্যমাত্রই রাজা থাকে, কিন্তু রাজা না থাকলেও পুর, রাষ্ট্র, অমাত্য এই রাজ্যসমূহ থেকে যায় বলে রাজ্যও ঠিক থেকে যায়।^৫ রাজ্যলাভের দুঃখের কথা বলেই দার্শনিক রমণী জনককে বললেন রাজ্য মানেই হলো সগুপ্ত রাজ্য। এই সগুপ্ত রাজ্য সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ডের মতোই দাঁড়িয়ে আছে- “সগুপ্তস্যস্য রাষ্ট্রস্য ত্রিদণ্ডস্যেব তিষ্ঠতঃ”। রাজ্যের প্রত্যেকটি অঙ্গের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য পৃথক হলেও এই অঙ্গগুলো প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি জড়িয়ে আছে।

প্লেটো একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানবশরীরের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে দেখিয়েছেন- একটি আঙুলে ব্যথা লাগলে যেমন সমস্ত শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়, তেমনি রাষ্ট্রবাসী একজনের ক্ষতি হলে সকলেরই একভাবে ক্ষতি হয়। প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটল কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো অংশ বা অঙ্গের ভাবনা করতে গিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন অংশী বা অবয়বকে।

সপ্তাঙ্গের সাতটি উপাদানের স্বরূপ :

স্বামী : শাসকবিহীন রাজ্য কখনই সম্ভব নয়। শাসকের গুণাবলির উপর নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের উৎকর্ষ ও শক্তি। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক রাজাকে স্বামী বা প্রভুরূপে গণ্য করে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সপ্তাঙ্গের প্রথম অঙ্গটিকে মনু অথবা মহাভারতকার, কৌটিল্য অথবা যাজ্ঞবল্ক্য সকলেই বললেন স্বামী। স্ব কথার অর্থ সম্পত্তি অর্থাৎ ভূসম্পত্তি। ‘স্বামী’ শব্দটির তিনটি অংশ- স্ব+আম+ইন্। ইন্ প্রত্যয় অন্ত্যার্থে ব্যবহৃত হয়। ‘আম’ শব্দটি কাঁচা বা raw-material বোঝাতে পারে। তাহলে স্বামী শব্দের পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো- একটি রাষ্ট্রের সমস্ত অপরিণত বস্তু বা সম্পত্তির অধিকার যার আছে তিনিই স্বামী। স্বামী অর্থ সার্বভৌম নৃপতি।

কৌটিল্যের মতে রাজা এবং রাজ্যই সংক্ষেপে রাজপ্রকৃতি। কৌটিল্য বংশানুক্রমিক ও উচ্চকুলোদ্ভব রাজতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন, অধিষ্ঠিত রাজবংশসম্বৃত রাজা শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও রাজপ্রতিষ্ঠানের পূর্বপ্রবর্তিত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন এবং সহজেই প্রজাবর্গের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেন। সুতরাং একজন ব্যাধিযুক্ত রাজা নূতন রাজা অপেক্ষা এবং একজন দুর্বল অথচ উচ্চকুলোদ্ভব রাজা অপেক্ষা শ্রেয়তর। উচ্চবংশগত রাজতন্ত্রের প্রতি কৌটিল্যের অনুরক্তি তাঁর রাষ্ট্রনীতির রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনা এমন একটি সময়ে যখন ভারতবর্ষে সবেমাত্র আলেকজান্ডারের সমরাভিযান শেষ হয়েছে। দেশ একটি প্রচণ্ড রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে অজস্র ছোট বড় রাষ্ট্রে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কতগুলো আর্য় রাষ্ট্র- রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্রও বেশিসংখ্যক অরণ্যচারী আদি অনার্যরাষ্ট্র। এদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার সুবিপুল পার্থক্য ছিল। সে যুগে ধর্ম ছিল সমাজের ভরকেন্দ্র। ধর্মকে কেন্দ্র করেই সমাজ ও রাষ্ট্র আবর্তিত হতো। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর বিভিন্নতার জন্য ভারতে, বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। এ কারণে বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ বার বার বিপর্যস্ত হচ্ছিল। কৌটিল্য উপলব্ধি করেছিলেন ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতি ও উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য মনে করেছিলেন একমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রই দ্রুত বিভিন্নতা ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে রাজনৈতিক সংহতি ও সংস্থিতি আনয়ন করতে সম্ভব।

কৌটিল্যের দৃষ্টিতে রাজা সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত। তিনি সমগ্র শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র এবং সকল কর্তৃত্বের উৎস। একজন আদর্শ রাজার প্রধান কাজ হলো, প্রজাকে সবধরনের সুরক্ষা দেওয়া এবং রাষ্ট্রবাসী সর্বসাধারণের হিত চিন্তা করা। কৌটিল্যের মতে- রাজার নিজের সুখ বা নিজের ভালো বলে কিছু নেই, প্রজার সুখ বা প্রজার ভালোটাই রাজার সুখ, রাজার ভালো।^{১৬} একটি মানুষ তার সাধারণ জীবনে বিয়ে থা করবে, সুখে থাকবে অথবা জীবিকা নির্বাহ করবে এমন কথা রাজ্যে রাজা না থাকলে ভাবা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, মানুষ যদি পুত্র-পরিবার নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চায় তাহলে তাঁকে রাজার কথা আগে ভাবতে হবে।^{১৭} তা না হলে গৃহ, বিত্ত, দারা কিছুই থাকবে না, যে মাথা তুলে থাকতে চায় সে পর্যন্ত দাসে পরিণত হবে।^{১৮} নবলব্ধ রাজ্যের দেবতা, সমাজ, উৎসব এবং ভোগবিলাস সম্পর্কে রাজা যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখবেন। সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে রাজাই হচ্ছেন মধ্য কেন্দ্র, কূটস্থানীয়। মহাভারতকার বলেছেন, রাজা রাজ্যের হৃদয়।

অমাত্য : সপ্তাঙ্গ রাজ্যের দ্বিতীয় প্রকৃতি বা অঙ্গ হচ্ছে অমাত্য। এর পর্যায়বাচক শব্দ হলো সচিব এবং মন্ত্রী। ‘মন্ত্রী’ শব্দটি এসেছে মন্ত্ৰ ধাতু থেকে যার অর্থ মন্ত্রণা করা, পরামর্শ করা অথবা আলোচনা করা। বলা যায়

মন্ত্রী হলেন রাজার পরামর্শদাতা (Adviser), অমাত্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিব (Personal Secretary) এবং সচিব হলেন সহায় (Helper)।

রাজ্য সুপরিচালনার জন্য সুসংগঠিত রাষ্ট্রকৃত্যক বা আমলাতন্ত্র একটি আবশ্যিক শর্ত ছিল। এইসব প্রশাসকগণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। বৈদিকযুগের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণযুগে এদের বলা হতো রত্ন। রাজসূয় যজ্ঞকালে রাজাকে এদের গৃহে নানা উপঢৌকন পাঠাতে হতো। এঁরা রাজাকে শাসনকার্যের ব্যাপারে মন্ত্রণা দান করতেন। ভাগধুক, অক্ষবাপ, সেনানী, গ্রামণী, সংগ্রহিতা ইত্যাদি নামে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। মহাভারতে এই পদাধিকারিগণ ‘অষ্টাদশতীর্থ’ নামে পরিচিত ছিলেন। জাতকগ্রন্থে অমাত্য, দণ্ডনায়ক, পুরোহিত ইত্যাদি নামধারী প্রশাসকের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি আমলাতন্ত্র রাজাকে শাসনকার্যে সহায়তা করত।

‘অধ্যক্ষপ্রচার’ নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে কৌটিল্য এইসকল পদাধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের মতে—

“সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ততে।

কুর্বাতি সচিবাংস্তস্মাং তেষাঞ্চ শৃণুয়াং মতম্ ॥”

অর্থাৎ, একটি চক্র একাকী আবর্তিত হতে পারে না। রাজত্বও সহায়তা ব্যতীত পরিচালনা করা যায় না। সুতরাং রাজা মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন এবং তাঁদের মতামত শুনবেন। কৌটিল্য এক্ষেত্রে নতুন পথপ্রদর্শক নন। মনুস্মৃতিতেও রাজার প্রধান সহায় হিসেবে মন্ত্রী অমাত্যের কথা বলা হয়েছে। মনু বলেছেন, যে কাজটা সহজেই করা যায়; সে কাজও একা করতে কষ্ট হয় অথবা একা করতে ভালে লাগে না। সেখানে সতত সমৃদ্ধিকামী একজন রাজার পক্ষে একটি রাষ্ট্রের সমস্ত কাজ কি করে মন্ত্রী অমাত্যের সাহায্য ছাড়া করা সম্ভব? সুতরাং রাজা মন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং তাঁদের সাথে সন্ধি, বিগ্রহ, দণ্ড, কোষ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন—

“তৈঃ সার্কং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।

স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ॥”

মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন— পাঁচরকমের বল আছে মহারাজ! আপনি ক্ষমতা বা রাজশক্তির মাধ্যমে বাহুবলকে যে প্রকৃত বল বলে ভাবছেন ঐ বলটা সব বলের মধ্যে কমজোরি— “যত্ন বাহুবলং নাম কনিষ্ঠং বলমুচ্যতে।” রাজাকে বাদ দিলে রাজার দ্বিতীয় বল হলো অমাত্যলাভ— “অমাত্যলাভো ভদ্রং তে দ্বিতীয়ং বলমুচ্যতে।”^৯ বিশ্বস্ত অমাত্যনিয়োগের ব্যাপারে অনেক উপদেশ দেওয়ার পর বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলেছিলেন— বিপদে পড়লে বামুন যেমন বামুনকে চেনে, গিনি যেমন চিনতে পারেন স্বামীকে, তেমনি রাজা চিনতে পারে অমাত্যকে।^{১০}

শুক্ৰাচার্য গুহ্যনীতিসারে বলেছেন— একজন রাজার পক্ষে সব জানা সম্ভব নয়— “ন হি তৎ সকলং জ্ঞাতুং নরৈর্নেকেন শক্যতে।” রাজা যদি তাঁর রাষ্ট্রাঙ্গভূত মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজকার্য চালান, তবে তাঁর রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব রাজার উচিত ভালো মন্ত্রী নিয়োগ করা।^{১১}

কৌটিল্য পরিষ্কারভাবে বলেছেন— রাজার কার্যপ্রণালি তিনটি উপায়ে সিদ্ধ হয়— প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অনুমেয়— “প্রত্যক্ষপরোক্ষানুমেয়া হি রাজবৃত্তিঃ।”^{১২} করণীয় বিষয়ে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অনুমেয় জ্ঞান ছাড়া একা রাজার পক্ষে রাজকার্যের নিষ্পত্তি সম্ভবপর নয়। কৌটিল্যের মতে সমস্ত কাজের আরম্ভেই মন্ত্রণা করতে হবে— “মন্ত্রপূর্বাঃ সর্বারম্ভাঃ।” একারণেই মন্ত্রীদের প্রয়োজন। মন্ত্রীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে রাজা

নীতিনির্ধারণ ব্যাপারে আলোচনা করেন তাঁদেরকে রাজার ধীসচিব বা মতিসচিব বলা যায়। তাঁর মতে মন্ত্রণার বিষয় পাঁচ রকমের হতে পারে “পঞ্চগঙ্গো মন্ত্রঃ”।

কৌটিল্য মন্ত্রগুপ্তির বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আরোপ করেছেন। প্রাচীনরা বলেছেন— রাজার হৃদ্র যেন কেউ না জানতে পারে। পরের বা শত্রুর হৃদ্র জানবার জন্য রাজা সবরকম চেষ্টা করবেন কিন্তু নিজের বিবরটুকু ঢেকে রাখবেন।

মন্ত্রীদের সংখ্যা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মনু বলেছেন মন্ত্রীর সংখ্যা হবে সাতটি অথবা আটটি— “সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুবীত পরীক্ষিতান্।”^{১৩} এমন কাজ যেটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে অথচ কাজটাও ভীষণ কঠিন এবং সমস্যাসংকুল এমন কাজকে বলে আত্যয়িক কর্ম। আত্যয়িক কার্যে সমবেত মন্ত্রীদের অধিকাংশ যে মত পোষণ করবেন রাজা সে কাজই করবেন। রাজার সঙ্গে মন্ত্রীদের আলোচনার গুরুত্ব যেহেতু কৌটিল্য সর্বদাই মেনে নিয়েছেন— সহায়সাধ্যং রাজত্বম্। অতএব, সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মূলভূত রাজার সঙ্গে সপ্তাঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ অমাত্যের সম্পর্ক মানবদেহের শারীরিক সম্বন্ধের মতোই স্বতঃসিদ্ধ।

জনপদ : রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান জনপদ। জনপদ বলতে ভূখণ্ড এবং অধিবাসী উভয়কেই বোঝায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধিকরণে বলেছেন ভূখণ্ড, পর্বতসংকুল অথবা উষর মরুযুক্ত হবে না। আদর্শ ভূখণ্ড উর্বর ভূমি, গোচারণের উপযুক্ত স্থান, প্রচুর অরণ্যসম্পদ ও খনিজসম্পদ সম্পন্ন হবে। জনপদের আরেক নাম রাষ্ট্র। P.V Kane মন্তব্য করেছেন— “The word rāṣṭra occurs even in the R̥gveda IV.42.1 ‘mama dvitā rāṣṭram kṣatriyasya’ mine is the kingdom on both sides (or in both spheres) says king Trasadasyu.”^{১৪}

রাষ্ট্র, বিষয়, দেশ এই শব্দগুলো একের পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহৃত হলেও জনপদ শব্দটির একটি তাৎপর্য আছে। মহাভারত, মনুস্মৃতি অথবা অন্যান্য রাজনীতিবিষয়ক শাস্ত্রগুলোতে যেখানেই জনপদের উল্লেখ আছে সেখানে জনপদবাসী মানুষের কথা আগে বলা হয়েছে। কামন্দকীয় নীতিসারে বলা হয়েছে— রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব যেখানে উদ্ভূত হয়েছে, সেটা হল রাষ্ট্র। অতএব রাজা যেন রাষ্ট্র বা জনপদের উন্নতিসাধনে যত্ন নেন।^{১৫}

কৌটিল্য বলেছেন, যারা চাষের জমির জন্য রাজকর দেয় এবং যাদের জমি চাষের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে, রাজা সেইসব কৃষকদের সেই তৈরি জমি দিয়ে দেবেন, অন্তত এক পুরুষ ভোগের জন্য। আর যেসব জমি চাষের উপযোগী হয়নি অর্থাৎ প্রাচীন ভাষায় যেগুলো অকৃত ভূমি বা খিল ভূমি সেগুলোকে যে কৃষকেরা কৃষিকর্মের উপযোগী করে তুলছে, রাজা তাদেরকে সেই জমির মালিকানা দিয়ে দেবেন। সে জমি আর তিনি ফিরিয়ে নেবেন না।

যাকে বর্তমানে ‘ইরিগেশন ওয়ার্ক’ বলা হয়ে থাকে সেদিকে কৌটিল্যের নজর ছিল যথেষ্ট। যেসব নদীতে সর্বদা জল থাকে সেগুলোর সঙ্গে নালা বা ক্যানাল তৈরি করে অথবা বর্ষার সময় নতুন নতুন জলাধার তৈরি করে কৃষিকর্মের সুবিধা সৃষ্টি করবেন রাজা। এই জলাধার তৈরি করার নাম সেতুবন্ধনির্মাণ। সেতুবন্ধ বা জলাশয়ে উৎপন্ন মাছ, জলচর পক্ষী, বা আশেপাশে যে শাকসবজি তৈরি হবে তার ওপরে অধিকার থাকবে রাজার।^{১৬}

ব্যবসা—বাণিজ্যের সুবিধার জন্য জলপথ, স্থলপথ ছাড়াও জনপদের বিভিন্ন জায়গায় ক্রয় বিক্রয়ের উপযোগী হাটবাজার বা পণ্ডন স্থাপন করবেন রাজা।^{১৭}

কৃষিকর্মসংক্রান্ত, শিল্পসংক্রান্ত এবং বাণিজ্যিক পরিকল্পনাগুলোর পেছনে কৌটিল্যের যুক্তি হলো নট, কুশীলব, নর্তক, গায়ক, বাদক— যারা অভিনয় বা চিত্তবিনোদনের জন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, এঁরা যেন গ্রামে একদম না

থাকেন। কারণ, এঁদের ক্রীড়া অভিনয় মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং কৃষক শ্রমিকদের কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে। অতএব প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চ গ্রামের মধ্যে বানানোই যাবে না।

নতুন জনপদ স্থাপনের সময় নিষ্কর জরিমানাহীন ভূমিদানের ব্যাপার থেকে বোঝা যায় অন্য জমিজায়গার জন্য কর এবং জরিমানার ব্যবস্থা ছিল এবং তাতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সিদ্ধ হয়। বর্তমানে যেমন উচ্চ বা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের থাকার জন্য কোয়ার্টার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তেমনি কৌটিল্যও দশগ্রামাধিপতি গোপ বা স্থানিকদের জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা রেখেছেন। অর্থশাস্ত্রে ‘ক্ষেত্রিক’ বলে একটা শব্দ আছে যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে খেতের মালিক বা ক্ষেত্রস্বামী। তিনি ক্ষেত্রস্বামী হলেও কর্ষক বা চাষিকে ঠকানোর উপায় তার ছিল না।

সেনাবাহিনিকে পররাজ্যজয়ে উৎসাহিত করার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাজা তাঁদের সঙ্গে একাত্মক মনোবৃত্তিতে বলবেন দেখ, আমিও তোমাদের মতো একরকমই বেতন পাই— অর্থাৎ রাজ্যজয় করলে তোমাদের যা লাভ আমারও তাই। আর এই রাজ্য যদি জয় করতে পারি তবে তোমাদের সঙ্গে একত্র ভোগ করব।^{১৮}

শত্রুরাষ্ট্র যাতে জনপদের ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য সামরিক সুরক্ষা ছাড়াও দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চোর-ডাকাত এমনকি পশুপাখির উপদ্রব সম্পর্কেও রাজাকে সর্বদা সজাগ থাকতে হতো, নইলে জনপদের বিনাশে সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গের হানি ঘটবে বলে কৌটিল্যের বিশ্বাস।

দুর্গ : দুর্গ রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদান। দুর্গনিবেশ নামক অধ্যায়ে কৌটিল্য বলেছেন রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে এবং চারদিকে দুর্গ তৈরি করতে হবে। দুর্গের ভাবনার মধ্যে নগরপরিকল্পনার একটা ব্যাপার আছে বলেই মনু সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের এই অঙ্গটিকে পুর বলে অভিহিত করেছেন।^{১৯}

রাজার দিক থেকে দুর্গনির্মাণের প্রথম প্রয়োজন রাষ্ট্রের সুরক্ষা। প্রয়োজনটা প্রধানত সামরিক। তাই কৌটিল্য প্রথমেই বলেছেন- “সাম্পরায়িকং . . . দুর্গং কারয়েৎ।” নিজের তথা রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং অধিক শত্রুনিধনের জন্যই দুর্গনির্মাণ করা প্রয়োজন।

পণ্ডিতদের ধারণা গ্রিক ‘পোলিস’ এর মধ্যে একটি সুরক্ষিত দুর্গের কল্পনা মেশানো ছিল যাকে বলা যায়— “Citadels and castles as well as stronghold.” কৌটিল্যের মতে চতুর্দিকে জনপদের প্রান্তভাগে যুদ্ধের উপযোগী দুর্গ তৈরী করতে হবে।

কৌটিল্য চারপ্রকার দুর্গের কথা বলেছেন- ঔদক বা জলদুর্গ, পর্বত বা গিরিদুর্গ, ধান্বন দুর্গ এবং বনদুর্গ। মনুস্মৃতি এবং মহাভারতে আরও দুরকম দুর্গের কথা বলা হয়েছে। তার একটি হলো পাষাণ বা ইটের তৈরি মহীদুর্গ আর দ্বিতীয়টি হলো চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী রক্ষিত নৃদুর্গ, অস্ত্রধারী মানুষই এখানে দুর্গমত্ব তৈরি করে। মনু বলেছেন- প্রত্যেক রাজার উচিত, দুর্গ তৈরি করে সৈন্যাদির সাথে সেখানে বাস করা। কারণ, দুর্গ প্রাকারের মধ্যস্থিত একজন ধনুর্ধারী যোদ্ধা একাই বাইরের একশ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ। রাজা যে দুর্গকে আশ্রয় করবেন, সেটি অস্ত্র-শস্ত্র, শস্য, ঘোটকাদি নানা বাহন, ব্রাহ্মণ, নানা শিল্পী, বহুপ্রকার যন্ত্র, হাতিঘোড়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস ও জল- এইসব দ্রব্যযুক্ত হবে। বস্তুত দুর্গ হলো রাজার যুদ্ধকালীন শেষ আশ্রয়। দুর্গনির্মাণের মূল উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে যাঙ্বল্ক্যস্মৃতি। সেখানে বলা হয়েছে- রাজার কাছে দুর্গের প্রয়োজন নিজে বাঁচার জন্য, রাষ্ট্রস্থিত মানুষকে বাঁচানোর জন্য এবং রাজকোশ বাঁচানোর জন্য।^{২০}

দুর্গনিবেশের দ্বিতীয় প্রকরণে কৌটিল্য একটি সুপরিকল্পিত নগরের প্রস্তাবনা করেছেন যার মধ্যে বাণিজ্যিক পথ, সামরিক পথ, হস্তিপদ ইত্যাদি রাজকীয় সমস্যার সমাধানই শুধু নেই, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী

রাজবাড়ির কাছাকাছি এবং দূরবর্তী অঞ্চলে একটি নগরের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠবে। চতুর্বর্গের সমস্ত মানুষের জীবিকার ব্যবস্থাপনা বা পরিকল্পনাও সেখানে সুচিন্তিত।^{২১} নগর পরিকল্পনার শেষ উদ্দেশ্য যেহেতু দুর্গে পর্যবসিত, তাই বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু এবং খাবার-দাবারের স্টোরেজ নিয়ে কৌটিল্য কিছু চিন্তা করেছেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে, রাজা তাঁর রাজপুরী বা দুর্গে সুস্থিত হয়ে বসে তিনটি বিষয়ে গভীরভাবে ভাববেন। সেই তিনটি হল রাজকোশ, দণ্ড এবং মিত্র। দুর্গনগরস্থিত রাজা আইনকানুন প্রণয়ন করে পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের সমস্ত সমস্যা যখন লঘু করে ফেলতে পারেন তখন এই তিনটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কোশ : সপ্তাঙ্গ রাস্ত্রের পঞ্চম প্রকৃতি হল রাজকোশ। রাজকোশের প্রথম গুরুত্ব নির্ণয় করেছে মহাভারত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন কোশ বলে একটা কিছু থাকলেই হলো না, কোশ বাড়ানোটাই হলো শক্তি।^{২২} মহাভারতে বলা হয়েছে, যেখানে জলের কোনো চিহ্ন নেই সেখানেও যেমন জীবনের জন্যই মানুষ জল খুঁজে বের করে, তেমনই রাজাকে যেভাবে হোক কোশ তৈরি করতে হবে।^{২৩} কারণ রাজার রাজত্বের মূলে আছে রাজকোশ এবং তাঁর সমৃদ্ধির মূলেও তাই।

কামন্দক ঋষিও মহাভারতের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। পরবর্তীতে নীতিবাক্যামৃতপ্রণেতা সোমদেবও বলেছেন কোনো রাজা অনেক দিন বেঁচে থেকে রাজত্ব করলেন- এই জীবন রাজাকে কোনো স্থায়িত্ব দেয় না, তাঁকে স্থায়িত্ব দেয় রাজকোশ। তাঁর মতে, কোনো রাজাই আসলে রাজা নন, আসল রাজা হলো রাজকোশ।

কৌটিল্যের বৈশিষ্ট্য হলো অনেকসময়েই তিনি রাজকোশকে দণ্ড বা বলের সঙ্গে একত্রে পরস্পরের পরিপূরক অঙ্গনিবেশ করেছেন। মনু কোশ এবং জনপদকে একত্রে নিবেশ করে এই দুটি অঙ্গকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজার অধীন করে দিয়েছেন- “নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ।” কৌটিল্য পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যাকালে তিনপ্রকার শক্তির উল্লেখ করেছেন প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং উৎসাহশক্তি। প্রভুশক্তির দুটি উপাদান হলো কোশ এবং দণ্ড একত্রে। কোশ এবং দণ্ডের পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সময় দণ্ডকে সর্বদা পাশাপাশি রেখেছেন কৌটিল্য।

কৌটিল্যের পূর্বাচার্য কোণপদন্তের (ভীষ্ম) মতে, দণ্ডের অভাবে কোশের সর্বনাশ সুনিশ্চিত। কৌটিল্যের মতে, দণ্ড বা সেনার মূলে আছে কোশ। টাকাপয়সার জোর না থাকলে এক রাজার সেনা অন্য রাজার হস্তগত হয়ে তার অধীন হয়ে যায়। রাজকোশের অভাবে দুর্গত সেনারা রাজাকেও মেরে ফেলে। রাজকোশ এমন জিনিস যা রাজকল্পিত সমস্ত ভাবনা রূপায়িত করে, তাঁর ঈঙ্গিত সমস্ত প্রকল্পের সাফল্য বয়ে নিয়ে আসে। স্থান, কাল এবং বিশেষ কোনো কর্মের সার্থকতায় কোশ এবং দণ্ডের মধ্যে একটি বেশি প্রাধান্য পেতে থাকে। দণ্ড পূর্বলব্ধ কোশের রক্ষক হয়, আবার কোশ স্বয়ং কোশের এবং দণ্ডের রক্ষক হয়ে থাকে। কৌটিল্যের মতে আকরদ্রব্য থেকেই প্রধানত কোশ তৈরি হয় এবং এই কোশ থেকেই দণ্ড বা সেনার উন্নতি ঘটে। কোশভূষিতা পৃথিবী কোশ ও দণ্ডের সাহায্যেই একমাত্র লাভ করা সম্ভব।^{২৪}

প্রকৃতপক্ষে রাজার সমস্ত রাজকীয় পরিকল্পনার মূলে আছে রাজকোশ। কৌটিল্য তাই বলেছেন, কোশের অবস্থা দেখেই রাজা যে কোনো কাজ আরম্ভ করবেন- “কোশপূর্বাঃ সর্বরম্ভাঃ। তস্মাৎ পূর্বং কোশমবেক্ষত।”^{২৫} কোশবৃদ্ধির অন্যতম সাধন হলো কর। রাস্ত্রের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কর নিতেই হবে। প্রজাদের কিছু পীড়ন উপস্থিত হলেও রাজাকে কোশবৃদ্ধি করতেই হবে।^{২৬} মনু, মহাভারতকার, কৌটিল্য এবং কামন্দক সকলেই এই করগ্রহণের নীতির পিছনে প্রজাসাধারণের সুরক্ষার দায়িত্ব পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে বলে স্বীকার করেছেন।

প্রজাদের কাছ থেকে কীভাবে কেমন ব্যবহার করে কর আদায় করতে হবে, সে-ব্যাপারে মহাভারতকার এবং মনু একমত পোষণ করেন। মহাভারতকার একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি পশু উপমা ব্যবহার করে, করগ্রহণের মৃদুতা বা অতীক্ষ্ণতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। বলেছেন রাজা রাষ্ট্রকে দোহন করবেন এমনভাবে যেন ভ্রমর মধু খাচ্ছে ফুল থেকে, যেন গোবৎস দুগ্ধ পান করছে গাভীমাতার। মধুকরের মধুপানে যেমন ফুলের ক্ষতি হয় না, বাছুর দুধ খেলে যেমন গাভীর স্তনে একটুও ক্ষতসৃষ্টি হয় না, রাজা সেভাবেই জনগণকে কষ্ট বুঝতে না দিয়ে করগ্রহণ করবেন- “মধুদোহং দুহেৎ রাষ্ট্রং ভ্রমরা ইব পাদপম্।”^{২৭}

কৌটিল্য বাস্তবের নিরিখে বলেছেন জনপদ এবং নগর থেকে কি পরিমাণ আয় হতে পারে তার একটি প্রাথমিক ভাবনা করাই করগ্রহণের দায়িত্বে নিযুক্ত রাজকর্মচারী সন্নিধাতার প্রধান কাজ। রাষ্ট্রীয় আয়ের আসল কাজ করেন সমাহর্তা। তিনিই চিফ এক্সিকিউটিভ এবং রেভিনিউ অফিসার।

দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, সেতু, বন, ব্রজ এবং বণিকপথ এই সাত উপায়ে রাজার রাজকোশে যে বস্তু জমা পড়ে তাকে বলে আয়শরীর। রাজার নিজের পিছনে খরচা, কর-ছাড় ইত্যাদি নানা বিষয়ে যে ব্যয় হবে তা হলো ব্যয় শরীর। সমাহর্তার কাজ সমস্ত ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচার প্রত্যেক বছর হিসেব করে বাজেট তৈরি করা।

অন্য দেশ থেকে যে পণ্য রাজ্যের ভিতরে ঢুকত, সেখানে বস্তাবন্দি পণ্যটি মুদ্রাক্ষিত বা সিল্ড হওয়াটা জরুরি ছিল। সরকারি রাস্তা ব্যবহার এবং সংরক্ষণের জন্য একটা টোল ট্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল। নদী পারাপারের জন্য ছিল ফেরি ট্যাক্স।

কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অনাবাদী জমি চাষ করার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে বীজধান, বলদ এমনকি নগদ টাকা পয়সার সাহায্য তো তিনি দেবেনই, তেমনই উৎপন্ন ধানের এক চতুর্থাংশও টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। নতুন বিয়ের পর কনে যখন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তখন যেসব পণ্য বিয়েবাড়িতে যাচ্ছে সেগুলোর উপর কোনো কর লাগবে না। স্ত্রীলোকের প্রসবের জন্য যেসব ঔষধ লাগবে তাতে কোনো কর চাপানো চলবে না।^{২৮} প্রজাপীড়নের আতিশয্য থাকলেও উৎপাদনশীলতা সফল হলে কৌটিল্যের করনির্ধারণনীতিও সযৌক্তিক হয়।

দণ্ড : দণ্ড বা বল অর্থাৎ সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজা, অমাত্য, দুর্গ, রাজকোশ- এই অনুক্রমে দণ্ডের একমাত্র অর্থ হওয়া উচিত সেনাবল। একটি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ভাবনা যদি অন্তরে থাকে তবে সেই রাষ্ট্রের শিষ্টের পালন তথা দুষ্টের নিগ্রহ, আইনশৃঙ্খলা, অন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান সবকিছুই রাজদণ্ডের ওপর নির্ভর করে। তাই কৌটিল্যও বলেছেন, কোশবল থেকেই সৈন্যবলের জন্ম। অন্তঃরাষ্ট্রীয় তথা পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাজার যে সর্বব্যাপক শাসন, যাতে শারীরিক এবং আর্থিক দণ্ডই প্রধানভাবে বলপ্রদর্শনের তাৎপর্য বহন করে সেই দণ্ডই আসলে দণ্ড শব্দের অর্থ। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে দণ্ডকে রাজশক্তির প্রতীক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভগবদ্গীতাতে বিভূতিযোগে দুষ্ট শক্তিকে দমন করার মধ্যেই দণ্ডের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।^{২৯} কামন্দকীয় নীতিসারে দণ্ডের সঙ্গে রাজাকে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। সেখানেও দমননীতির মধ্যেই দণ্ডের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মনু বলেছেন, পরমেশ্বর রাজা সৃষ্টির অনেক আগে সকলের রক্ষার জন্য নিজের শরীর থেকে ধর্মস্বরূপ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডের সৃষ্টি করেছেন এবং তা সৃষ্টি করেছেন একান্তভাবেই রাজার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। মনুর মতে, দণ্ডই হলো আসল রাজা, দণ্ডের বলেই রাজার রাজকর্ম- “স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।”^{৩০} কৌটিল্য বলেছেন, আশীক্ষিকী, ত্রয়ী এবং বার্তার যোগক্ষেমের সাধন করে দণ্ড। অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেওয়াটাই কৌটিল্যের মত।

রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি তত্ত্বের আলোচনায় দণ্ড অনেকটা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অঙ্গ হিসেবে এসেছে। দণ্ডনীতি যেহেতু অলঙ্কার লাভ, লব্ধবস্তুর সুরক্ষা, সুরক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি এবং বর্ধিত বস্তুর উপযুক্ত বিনিয়োগ ঘটায়; তাই এই

চারটি ব্যাপারেই সাহায্য করে রাজার দণ্ড। এই দণ্ডকে সামরিক শক্তিও বলা যায়। কৌটিল্য বলেছেন, সেনাবাহিনী হতে পারে ছয়রকমের- মৌল, ভূতক, শ্রেণি, মিত্র, অমিত্র এবং অটবী বল। এদের মধ্যে মৌল বলই শ্রেষ্ঠ।

হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি মিলিয়ে বিভিন্ন সেনাবাহিনীর অধিকর্তাদের নাম বলার সময় কৌটিল্য তিনটি পদের কথা বলেছেন- পদিক (পতিক), সেনাপতি এবং নায়ক। সমস্ত রকমের যুদ্ধবিদ্যা এবং সমস্ত অস্ত্রের গ্রহণবিদ্যা সেনাপতি জানবেন। সেনানিবাসে সৈনিকদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ, মদ্যপান, নাটক, কৌতুক, জুয়াখেলা একদম চলবে না। খাবার-দাবার, যুদ্ধের উপকরণ শ্রমিকদের দিয়ে বইয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সঞ্চয়ও করে রাখতে হবে। সেনাছাউনিতে প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য রাজার মুদ্রাঙ্কিত ছাড়পত্র নিতে হবে। সেনাবাহিনীর পিছনে থাকবেন চিকিৎসকেরা। থাকবে শল্যচিকিৎসার যন্ত্র, ওষুধ, নানারকম রোগহারী তেল, ক্ষতে লাগাবার ব্যানডেজ ইত্যাদি। আর সৈন্যসামন্তদের অনুপান জোগানোর জন্য সেনাদলের ঠিক পিছনেই অবস্থান করবে বেশ্যা রমণীরা, যারা সৈন্যদের উৎসাহ দেওয়ার কাজটাও করে যাবেন সমান দক্ষতায়।^{৩১} বিদ্যা, প্রজ্ঞা এবং অশীক্ষাসমন্বিত এই যে দণ্ড, এই দণ্ডকেই ইংরেজিতে বলে ‘Legitimate force’ যা সমস্ত সমাজের সমন্বয় করে তোলে এবং যা সমগ্র রাষ্ট্রের সুস্থিতি সুনির্দিষ্ট করে।

মিত্র : সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের শেষ অঙ্গ হলো মিত্র। মিত্র অর্থ একটি রাষ্ট্রের বন্ধুসংগ্রহই শুধু নয়। রাষ্ট্রের এই অঙ্গের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পররাষ্ট্রনীতি তথা কূটনীতি।

মহাভারতে বলা হয়েছে, কেউ কারও বন্ধু নয়, আবার কেউ কারও শত্রু নয়। এক রাজা যে আরেক রাজার শত্রু বা মিত্রে পরিণত হয় তার কারণ হলো স্বার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন।^{৩২} কামন্দক বলেছেন, রাজনৈতিক কারণেই কেউ বন্ধু কেউ বা শত্রু।^{৩৩} বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের মতে, কেউ কারও জন্মশত্রুও নয় বা জন্মবন্ধুও নয়। রাজার ক্ষমতা-সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ কারও বন্ধু বা শত্রু। মহাভারতের মন্ত্রী কণিক উপদেশ দিয়েছেন যে সামর্থ্য না থাকলে শত্রুকে কাঁধে করেও বইবে, কিন্তু সময় সামর্থ্য এলে তাঁকে মাথা থেকে নামিয়ে মাটির ঘেঁটের মতো আছাড় মেরে ভেঙে ফেলবে।^{৩৪}

মনু মিত্র সংগ্রহের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যে রাজা নিজের সমৃদ্ধির কারণে যুদ্ধে গিয়েছেন। শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ, উপটোকন, নিজ রাজ্যের খানিকটা বিজয়ী রাজাকে দিয়ে দিতে পারেন।^{৩৫}

কৌটিল্যের কাছে ভূমিলাভই রাজার কাছে পরম প্রাপ্য। এই নিরিখে ভূমিলাভকে উপেয় কিংবা সাধ্যবস্ত্র বলা যেতে পারে। শুক্রাচার্য বলেছেন একজন সাহসী, উদ্যমী এবং রাজনীতিজ্ঞ রাজার কোনো বন্ধু থাকতে পারে না। তাঁর সব বন্ধুরাই ওপর ওপর বন্ধুত্ব দেখান, এবং অন্তরে গভীর শত্রুতা নিয়ে নিজের সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। বন্ধুত্ব চালানোর জন্য দরকার ডিপ্লোম্যাচি বা পলিসি যাকে বলা হয় নয়।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে রাজা আত্মপ্রভাব বিস্তার করতে চান তাঁকে প্রবক হিসেবে নিয়ে কৌটিল্য তাঁর সার্থক নাম দিয়েছেন বিজিগীষু। যে রাজা নিজের জয়েচ্ছায় রাজ্যবিস্তার করতে চান, তাঁর মিত্রবর্গের চরিত্র চাররকমের হতে পারে। মহাভারতে উক্ত হয়েছে- বন্ধুরাজারা চাররকম হতে পারেন- (১) সহজ- মামা মাসির ছেলে, (২) মিষ্টি মধুর বাক্যে তুষ্ট অন্য রাজা, (৩) টাকা পয়সা বা সম্পত্তির বিনিময়ে পাওয়া বন্ধু এবং (৪) আপন শক্তিমত্তায় বশীভূত বন্ধু।^{৩৬} কামন্দকীয় নীতিসার এই বন্ধুদের নমুনা দিয়েছেন আরও পরিষ্কার করে। তিনি বলেছেন প্রথম বন্ধু হলেন ঔরস যেমন পিতামহ, পিতামহী এরা। দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধের মাধ্যমে যাঁরা বন্ধু হন। তৃতীয় বংশক্রমে নেমে আসা বন্ধু। চার কোনো সময়ে যাকে বিপদে সাহায্য করা হয়েছে।^{৩৭} কৌটিল্য বলেছেন, বিপদই বন্ধুত্বের স্থিরতা সম্পাদন করে, বিপদই বন্ধুত্ব দৃঢ় করে।^{৩৮} ড. ভাণ্ডারকরের মতে-

“The modern political thinkers think of the state statically and not dynamically. Their definition describes the state rather internally than externally. Hindu policy on the other hand, looks at the composition of the state as a whole, that is perceives it not as a thing in itself but as one political entity among in relation to many. This is evident from the fact that one of the constituents of the state is Mitra or ally, who can figure only in the international sphere.”^{৩৯}

উপসংহার : পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন আদর্শবাদ বা ভাববাদ (Idealist Theory), জৈব মতবাদ (Organic Theory), মার্কসীয় মতবাদ (Marist Theory) ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রে রাষ্ট্রের কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। কৌটিল্য পরবর্তীযুগে কামন্দকীয় নীতিসার, শুক্লনীতিসার এবং তামিল মহাকবি তিরুবল্লুবরই রচিত তামিল মহাকাব্য কুরালে এই সংজ্ঞা তত্ত্বের আলোচনা মেলে। কৌটিল্য পূর্ববর্তী স্মৃতিযুগেও এই সংজ্ঞা মতবাদ অজ্ঞাত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত সরস্বতী বিলাস নামক গ্রন্থে গৌতমস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে সংজ্ঞা মতবাদের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্য পরবর্তী সময়ে আনুমানিক পঞ্চম শতকে রচিত বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণেও রাজ্যের সাতটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার থেকে বলা যায় প্লেটোর দার্শনিক অভিভাবক philosopher guardian কৌটিল্যের স্বামী, প্লেটোর যোদ্ধা Warrior কৌটিল্যের দণ্ড, প্লেটোর কারিগর ও কৃষক (Artisan and husbandmen) কৌটিল্যের জনপদের সঙ্গে তুলনীয়। এয়ারিস্টটল বলেছেন পরিবার ও নাগরিকদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। কিন্তু প্লেটো বা এয়ারিস্টটল রাষ্ট্রের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা এবং সকল উপাদানের উল্লেখ করেননি। সংজ্ঞা মতবাদ যথার্থই একটি জৈব মতবাদ।

তথ্যনির্দেশ

- কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., ২য় খণ্ড (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১ খ্রি.), ১৩.৪.১, পৃ. ৬০৬।
- “দেশঃ পৃথিবী। তস্যাং হিমবৎ-সমুদ্রান্তরমুদীচীনং যোজনসহস্রপরিমাণং তির্যক চক্রবর্তিক্ষেত্রম্।”- তদেব, ৯.১.৬, পৃ. ৪১৩।
- (ক) “স্বাম্যমাত্যজনপদদুর্গকোশদণ্ডমিত্রাণি প্রকৃতয়ঃ”- কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৬.১.১, পৃ. ১৬৭।
(খ) “স্বাম্যমাত্যো জনো দুর্গং কোশো দণ্ডস্তথৈব চ। মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ॥”- যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারায়ণ রাম আচার্য সম্পা. (বোম্বে : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪৯ খ্রি.), ১.৩৫৩, পৃ. ১১৯।
(গ) “স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রং চ দুর্গং কোশো বলং সুহৃৎ। পরস্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে ॥”- কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯ খ্রি.), ৪.১, পৃ. ১৩।
- “সপ্তাঙ্গমুচ্যতে রাজ্যং তত্র মূর্ধা নৃপঃ স্মৃতঃ।
দৃগমাত্যঃ সুহৃচ্ছোত্রং মুখং কোশঃ বলং মনঃ ॥
হস্তৌ পাদৌ দুর্গ-রাষ্ট্রৌ রাজ্যঙ্গানি স্মৃতানি হি ॥”- শুক্ল, শুক্লনীতিসার, ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস সম্পা. (বম্বই : ১৮৭৭ শকাব্দ), ১.৬১-৬২, পৃ. ৬।
- “কো রাজ্যপদমভিপদ্যেত প্রাপ্য চোপশমং লভেৎ।
মমেদমিতি যচ্ছেদং পুরং রাষ্ট্রঞ্চ মন্যসে ॥

- বলং কোশমমাত্যাংষ্ট কসৈত্যানি ন বা নৃপ ।
 মিত্রামাত্যপুংং রাষ্ট্রং দণ্ডঃ কোশো মহীপতিঃ ॥
 নাস্ত্যসাধারণো রাজা নাস্তি রাজ্যমরাজকম্ ।
 রাজ্যেহসতি কুতো ধর্মো ধর্মেহসতি কুতঃ পরম্ ॥
 যোহপ্যত্র পরমো ধর্মঃ পবিত্রং রাজরাজ্যয়োঃ ॥”- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, পঞ্চগনন তর্করত্ন সম্পা., ২য় খণ্ড
 (কলিকাতা : বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্র, ১৮৩০ শকাব্দ), ১২.৩২০.১৫৩- ৫৪, ১৫৮-১৫৯, পৃ. ১৭৮৩ ।
৬. “প্রজাসুখে সুখং রাজঃ প্রজানাম্ হিতে হিতম্ ।
 নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্ ॥”- কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.,
 ১ম খণ্ড (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ), ১.১৯.৫, পৃ. ৭৪ ।
৭. “এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ কৃচিৎ ।
 কুর্যু রাজানমেবাগ্নে প্রজানুগ্রহকরণাং ॥”- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, ১২.৬৭.৩৩. পৃ. ১৪৪৩ ।
৮. “অদাসঃ ত্রিযতে দাসো ত্রিযন্তে চ বলাৎ ত্রিযঃ”- *তদেব*, ১২.৬৭.১৫, পৃ. ১৪৪৩ ।
৯. বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ৫.৩৭.৫৩, পৃ. ৬৬৮ ।
১০. “ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণো বেদ ভর্তা বেদ ত্রিযং তথা ।
 অমাত্যং নৃপতির্বেদ রাজা রাজানমেব চ ॥”- *তদেব*, ৫.৩৮.২৮, পৃ. ৬৭০ ।
১১. “বিনা প্রকৃতিসংমন্ত্রাং রাজ্যানাশো ভবেৎ ফ্রবম্ ।
 রোধনংতু ভবেত্তস্মাদাজ্ঞস্তে স্যুঃ মন্ত্রিণঃ ॥”- শুক্ল, *শুক্লনীতিসার*, ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস সম্পা., *প্রাগুক্ত*, ৫.৮, পৃ. ৬২ ।
১২. কৌটিল্য : *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.৯.৩, পৃ. ২৮ ।
১৩. মনু, *মনুস্মৃতি*, গঙ্গানাথ ঝাঁ সম্পা., ২য় খণ্ড (কলিকাতা : রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৯ খ্রি.), ৭.৫৪, পৃ. ১৭ ।
১৪. P.V. Kane, *History of Dharmashastra*, Vol. 3 (Poona : Bhandarkar oriental Research Institute, 1946 A.D.), p.132.
১৫. “রাজ্যঙ্গানাম্ চ সর্বেষাং রাষ্ট্রাদ্ ভবতি সম্ভবঃ ।
 তস্মাৎ সর্বপ্রথমে রাজা রাষ্ট্রং প্রসাধয়েত্ ॥”- কামন্দক, *কামন্দকীয় নীতিসার*, *প্রাগুক্ত*, ৬.৩, পৃ. ২৫ ।
১৬. “মতস্যপ্পবহরিতপণ্যানাং সেতুযু রাজা স্বাম্যং গচ্ছেত্ ॥”- কৌটিল্য : *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ২.১৪, পৃ. ৯২ ।
১৭. “আকরকর্মানুদ্রব্যহস্তিবনব্রজবর্ণিপথপ্রচারান্ বারিষ্টলপথপণ্যপত্তনানি চ নিবেশয়েত্ ॥”- *তদেব* ।
১৮. “তুল্যবেতনো হস্মি, ভবন্তিঃ সহ ভোগ্যমিদং রাজ্যং, ময়াভিহিতঃ পরো হভিহন্তব্যঃ ইতি ॥”- *তদেব*, ২য় খণ্ড, ১০.৩.৬, পৃ. ৪৯২ ।
১৯. “স্বাম্যমাতৌ পুংং রাষ্ট্রং কোশদগৌ সুহন্তথা ।
 সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে ॥”- মনু, *মনুস্মৃতি*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ৯.২৯৪, পৃ. ১১৯ ।
২০. “রম্যং পশব্যমাজীব্যাং জাদলং দেশমাবসেৎ ।
 তত্র দুর্গাণি কুর্বাতি জনকোশাত্রাণ্ডয়ে ॥”- যাজ্ঞবল্ক্য, *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ১.৩২১, পৃ. ১১১ ।
২১. “The capital city is to be laid out on an elaborate plan with streets of different width and with the king’s residence serving as a focal point around which are . . . administrative offices . . . social classes.”- U.N. ghoshal, *A History of Indian Political Ideas* (London : 3rd ed. 1959 A.D.), p. 137.
২২. “অন্যৎ বলং কোশবৃদ্ধিরপম্”- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.১২১.৪৩ (নীলকণ্ঠটীকা), পৃ. ১৪৯৪ ।
২৩. “কোশমূলা হি রাজানঃ কোশো বৃদ্ধিরো ভবেৎ ॥”- *তদেব*, ১২.১১৯.১৬, পৃ. ১৪৯০ ।
২৪. “আকরপ্রভবঃ কোশঃ কোশাদণ্ডঃ প্রজায়েত্ ॥”- কৌটিল্য : *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ২.১২.১৫, পৃ. ২০৮ ।

২৫. তদেব, ২.৮.১, পৃ. ১৪০।
২৬. “অকার্যমপি যজ্ঞার্থং ক্রিয়তে যজ্ঞকর্মসু। এতস্মাৎ কারণাৎ রাজা ন দোষং প্রাপ্তুমর্হতি ॥”- বেদব্যাস, মহাভারতম্, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১২.১৩০.৩৭, পৃ. ১৫০২।
২৭. তদেব, ১২.৮৮.৪, পৃ. ১৪৬৪।
২৮. “যজ্ঞকৃত্যপ্রসবনৈমিত্তিকং দেবেজ্যচৌলোপনয়নগোদানব্রতদীক্ষণাদিষু ক্রিয়াবিশেষেষু ভাণ্ডমুচ্ছুকং গচ্ছেত্।”- কৌটিল্য : কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ২.২১.৬, পৃ. ২৭৩।
২৯. “দণ্ডো দময়তামস্মি।”- বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পা. (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ১০.৩৮, পৃ. ২৫২।
৩০. মনু, মনুস্মৃতি, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৭.১৭, পৃ. ৫।
৩১. “চিকিৎসকাঃ শস্ত্রযজ্ঞাগদস্লেহবস্ত্রহস্তাঃ স্ত্রিয়শ্চান্নপানরক্ষিণ্যঃ পুরুষাণামুদ্বর্ষণীয়াঃ পৃষ্ঠতন্তিষ্ঠেয়ুঃ।”- কৌটিল্য : কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১০.৩.১০, পৃ. ৪৯৫।
৩২. “ন কশিৎ কস্যচিন্নিগ্রহং ন কশিৎ কস্যচিৎ রিপুঃ। অর্থতস্ত নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবন্তথা ॥”- বেদব্যাস, মহাভারতম্, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১২.১৩৮.১১০, পৃ. ১৫০৯।
৩৩. “কারণেনৈব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবন্তথা।”- কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, প্রাগুক্ত, ৮.৫২, পৃ. ৩৪।
৩৪. “বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ কালস্য পর্যায়ঃ। ততঃ প্রত্যাগতে কালে ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মানি ॥”- বেদব্যাস, মহাভারতম্, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১.১৪০.২১-২২, পৃ. ১৪৪।
৩৫. “মিত্রং হিরণ্যং ভূমিং বা সম্পশংস্ত্রিবিধং ফলম্।”- মনু, মনুস্মৃতি, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৭.২০৬, পৃ. ৬৪।
৩৬. “বদন্তি মিত্রং সহজং বিচক্ষণান্তথৈব সান্না চ ধনেন চার্জিতম্। প্রভাপতশ্চোপনতঞ্চতুর্বিধং তদন্তি সর্বং তব পাণ্ডবেষু চ ॥”- বেদব্যাস, মহাভারতম্, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৮.৮৮.২৮, পৃ. ১২৫৭।
৩৭. “ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতম্। রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জেয়ং চতুর্বিধম্ ॥”- কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, প্রাগুক্ত, ৪.৭৪, পৃ. ১৭।
৩৮. “আপদ্ হি সৌহৃদং স্থৈর্যমুৎপাদয়তি।”- কৌটিল্য : কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৭.৯.৩, পৃ. ২৬৮।
৩৯. D.R. Bhandarkar, *Some Aspects of Ancient Hindu Polity* (Banaras : Banaras Hindu University, 1929 A.D.), pp. 88-89.

রামায়ণে পতিপ্রেমের আদর্শ প্রতিমূর্তি সীতা: একটি পর্যালোচনা

ড. জয়শ্রী দাশ*

Abstract: The Ramayana is one of the great Sanskrit epics of ancient India. The epic, traditionally ascribed to Maharishi Valmiki, narrates the life of Rama. It is divided into seven kandas. Rama is the hero of this epic. The Ramayana is not seen as just a literary monument, but serves as an integral part of Hinduism. Sita is the central female character of Ramayana and she is described as the daughter of the Earth goddess. She follows her husband into exile and is abducted by the Lanka's king Ravana. At last, Sita returns to the womb of her mother, the Earth, as a testimony of her purity. In this article, it has been tried to portray Sita as the epitome of dedication, self-sacrifice, courage and purity.

রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি মহাকাব্য। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি। রামায়ণ আদিকাব্য এবং বাল্মীকি আদিকবি। বাল্মীকি হঠাৎ একদিন নিষ্ঠুর ব্যাধের হাতে নিহত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি কৈশিক শোকাহত দেখতে পেয়ে শোকের আবেগে উচ্চারণ করলেন,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তুমগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চঃ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥^১

অর্থাৎ রে ব্যাধ, তুই এই ক্রৌঞ্চযুগলের কামমুগ্ধ পুরুষপাখিকে মারিয়া ফেলিলি। অনন্তকালেও তোর প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না।

রামায়ণের বস্তুমূল্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্র, ভ্রাতা-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।... রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিতেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।... আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।... বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শাস্ত রসাম্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া, তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।... ইহাতে যে সৌভ্রাত্য, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।”^২

রামায়ণে যেমন আমরা কাব্যরস আনন্দন করি, তেমনি তৎকালীন বর্ণ ও সমাজ ব্যবস্থার চিত্র দেখতে পাই। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষী Winternitz বলেছেন,

“It has been property of the whole Indian people and as scarcely any other poem in the entire literature of the world has influenced the thought and poetry of a great nation for centuries.”^৩

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অযোধ্যার রাজা দশরথ। রাম দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত। তাঁর বৈমাত্রেয় তিন ভাই অপেক্ষা রাম সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, সত্যবিক্রম, সর্বজনপ্রিয় ও চন্দ্রের ন্যায় নির্মল।

তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।

ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ ॥^৪

সীতা মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। সীতা রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর অমর মহাকাব্য রামায়ণে যে সব নারী চরিত্র রচনা করেছেন সেসব চরিত্র যেন সীতা চরিত্রেরই মূর্ত প্রতীক এবং সীতা চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই তাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সীতার আকৃতি অতিশয় মনোহর। রামায়ণের বহু স্থানে তাঁহার সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।

ধর্মপত্নী প্রিয়া নীত্যং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।

সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা।

তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোভুঙ্গপয়োধরাম্ ॥^৫

রাক্ষস সীতার বর্ণনা করে বলেছেন

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাক্সরা ন চ পল্লগী।

তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ ॥^৬

দেবী, গন্ধর্বী, অক্ষরা, নাগিনী কোনো নারীই সীতার সমকক্ষ নয়, মানুষী বা কেমন করে তাঁর তুল্য হয়?

মিথিলায় সীতার স্বয়ংবর সভায় রাম ধনুতে গুন যোজনা করে এবং ধনু ভেঙ্গে ফেলে। এরপর সীতার সাথে রামের বিয়ে হয়। বিয়ের পর সীতা রামের সাথে অযোধ্যায় গমন করেন। রামের রাজ্যাভিষেকের ঠিক পূর্বে রামের বিমাতা কৈকেয়ী তার দাসী মম্বরার পরামর্শে ভরতকে রাজা করার জন্য দশরথকে বলেন এবং রামকে চৌদ্দ বছরের বনবাসে যাবার জন্য বাধ্য করেন। সীতা রামের অভিষেকের পরিবর্তে বনগমনের খবর পেলে তখনই মনস্ত্রি করলেন তিনিও বনে যাবেন। সীতা বলেছেন-

ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোপি হি ন মে মতঃ

স্বর্গোপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব

তৃয়া বিনা নরব্যাস্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥^৭

হে রাঘব, আপনাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও বাস করতে চাই না। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনাকে ছেড়ে স্বর্গেও আমার ভাল লাগবে না।

তৃয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া।

তৃদ্বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্ ॥^৮

আমি গুরুজনের অনুমতি নিয়ে আপনার সঙ্গে যাব। আপনার বিচ্ছেদে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করব।

পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্।

উজ্জিতায়াস্তৃয়া নাথ তদৈব মরণং বরণং বরম্ ॥^৯

প্রাণনাথ, আমাকে ত্যাগ করে আপনি চলে গেলে পরে দুঃখে আমার মৃত্যুই যখন অবধারিত, তবে আগে থেকে আমার এখনই মরা ভাল। তিনি আরও বলেছেন-

ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে ।

কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চঃ দুঃখিতা ॥^{১০}

চৌদ্দ বৎসর কি, মুহূর্তের জন্যও এই শোক আমি সহিতে পারবো না ।

এ বিষয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, “এসব কথা প্রেমের, অদর্শন বিচ্ছেদ সহ্য করার সম্ভাবনার চেয়ে যে প্রেম মৃত্যুকে বরণীয় জ্ঞান করে। এ সীতা প্রাচীনতর উপাখ্যানের নায়িকা, যিনি পতিব্রতা বলে নয়, রামকে ভালবাসতেন বলেই স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, কর্তব্য বা পতিব্রতাদর্শ পালন করছেন বলে নয়।”^{১১} সীতার প্রেমের পরম ও চরম অভিব্যক্তি রামকে অবলম্বন করে। এই প্রেম অলৌকিক, প্রগাঢ় এবং তুলনাহীন। এ প্রেমের চরিতার্থতা ত্যাগে। সীতা বলেছেন-

শুদ্ধাত্মান্ প্রেমভাবাদ্ভি ভবিষ্যামি বিকলুষা ।

ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি মমদৈবতম্ ॥^{১২}

আপনার আত্মা শুদ্ধ। প্রেমের সঙ্গে আমি যদি পতির সঙ্গে যাই, তাহলে আমার পাপ চলে যাবে। স্বামীই যে আমার দেবতা।

ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ ।

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥^{১৩}

পিতা, পুত্র, মাতা, সখী এমনকি আত্মাও নারীর সদাতিবিধান করতে পারে না। ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদাই পতিই হল নারীর একমাত্র গতি।

প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহাহস গতেন বা ।

সর্বাবস্থাতিতা ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে ॥^{১৪}

প্রাসাদের শীর্ষে অবস্থান, কিংবা আকাশপথে বিমানে ভ্রমণ অপেক্ষা সকল অবস্থাতেই পতির পদচ্ছায়াই নারীর পক্ষে প্রশস্ত। বিদায় কালে সীতা কৌশল্যাকে বলেছেন-

নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা নাচক্ৰো বিদ্যতে রথঃ ।

নাপতিঃ সুখমেধতে যা স্যাদপি শতাত্মজা ॥^{১৫}

তন্ত্রীহীন বীণা বাজেনা, চক্রহীন রথ হয় না। পতিহীনা নারী শতপুত্রের জননী হলেও সুখ পায় না। আবার রামকে সীতা বলেছেন-

গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়ো গতিরাত্মজাঃ ।

তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥^{১৬}

নারীর একটি গতি স্বামী, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় আত্মীয়রা, চতুর্থ কোনো গতি তার নেই। সীতা রামের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করে একের পর এক যুক্তি প্রদর্শন করতে লাগলেন। রাম অরণ্যের ভীষণতা ও অরণ্যবাসে দুঃখকষ্টের উল্লেখ করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সীতা কিছুতেই নিরস্ত হলেন না। অবশেষে রাম বললেন,

অনুগচ্ছস্ব মাং ভীৰু সহধর্মচরী ভব ।^{১৭}(২.৩০.৪০)

প্রিয়ে, আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে সম্মত হলাম। তুমি আমার অনুগমন কর ও সহধর্মচারিণী হও। রামের চরিত্রমাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ। মনস্বী রাম সীতার হৃদয় জয় করলেন এবং লক্ষ্মীরূপিনী সীতাও রামের হৃদয় জয় করলেন। সীতা নিজের ইচ্ছায় রাজ্য সুখ ত্যাগ করে রামের সাথে বনে গমন করেন। এর মধ্য দিয়ে সীতার আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বনবাসের কঠিন জীবনযাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বনবাসে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন তাঁর আপনজনেরা কিন্তু সীতা সাহসিকতার সাথে বনবাস জীবন বেছে নিয়েছেন। রাজ্যসুখ বাদ দিয়ে তিনি বনবাসীর পোশাক পরিধান করতে কুণ্ঠিত হননি। রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন তখন সীতা সাহসিকতার সাথে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

অরণ্যকাণ্ডে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে এলেন তখন সীতা তাকে প্রেমে ও স্বামীগর্বে প্রত্যাখ্যান ও তিরস্কার করে যে কথা বলেছেন তা রামের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও গর্বের কারণেই বলেছেন, শুধুমাত্র পতিব্রতাদর্শ থেকে বলেননি। সীতা বলেছেন—

নৃসিংহং সিংহসংকাশমহং রামমনুব্রতা ।^{১৮}

আমি সিংহসদৃশ সেই নরসিংহ রামের অনুব্রতা। সীতা রাবণকে প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—

রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যত্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস ।^{১৯}

তুমি রামের প্রিয় বধূকে চাইছ, রাক্ষস।

সীতাকে হরণ করে রাবণ যে নিজের মৃত্যুকে ডেকে বরণ করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সীতা বলেছেন,

আশীবিষস্য বদনাদদংষ্ট্রমাদাতুমিচ্ছসি ।

কালকূটং বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গত্তুমিচ্ছসি ॥

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ চৌভৌ পাণিভ্যাং হত্বুমিচ্ছসি ।

অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্টা বস্ত্রেণাহত্বুমিচ্ছসি ॥^{২০}

অর্থাৎ সাপের মুখ থেকে দাঁত নিতে চাইছ; কালকূট বিষপান করে স্বস্তিতে চলে যেতে চাইছ; সূর্য ও চন্দ্রকে হাত দিয়ে হরণ করতে চাইছ, জ্বলন্ত আগুনকে বস্ত্র দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ?

এই কথার মধ্যে দিয়ে রামের প্রতি সীতার গভীর প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। রামের সঙ্গে রাবণের পার্থক্য করে সীতা বলেন—

যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে.....

যদন্তরং কঞ্চনসীসলোহয়োঃ.....

যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়োঃ.....^{২১}

অর্থাৎ বনে সিংহ এবং শৃগালের যে পার্থক্য। সোনার সঙ্গে সীসা-লোহার যে পার্থক্য, গরুড়ের সঙ্গে কাকের যে পার্থক্য। তাই—

অপহৃত্য শচীং ভার্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুন্ম ।

ন হি রামস্য ভার্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ ॥^{২২}

ইন্দ্রের ভার্যা শচীকে অপহরণ করেও বাঁচা সম্ভব কিন্তু রামের ভার্যা আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বস্তি পাবে না।

এই হল জনকনন্দিনী সীতা। রামকে নিয়ে তাঁর ছিল অহংকার। স্বামীগর্বে গর্বিত ছিলেন তিনি। কিন্তু রাম সীতার সেই বিশ্বাসের মূল্য দিতে পারেননি। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ জয় করার পর সীতাকে উদ্ধার করে রাম

সীতাকে অপমানজনক কথা বলেছেন। দীর্ঘদিন অদর্শনের পর রামচন্দ্র যখন সীতাকে প্রথম দেখলেন, তখন তাকে বললেন-

ন ত্বদর্থং ময়া কৃতং।^{২৩}
যুদ্ধ করে যে জয়লাভ করেছি সে তোমার জন্য নয়।
প্রখ্যাতস্যাশ্রবণশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জিতা।^{২৪}
নিজের বিখ্যাত বংশের কলঙ্ক মোচনের জন্য করেছি।

এই কথার মধ্য দিয়ে সীতার প্রতি রামের ভালবাসা প্রকাশ্য পায় না, রাম শুধুমাত্র নিজের বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছেন সেটা বোঝায়। ভবভূতি উত্তররামচরিতে বলেছেন, কুলগুরু বশিষ্ঠের বার্তা পেয়ে রাম সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন,

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥^{২৫}

অর্থাৎ প্রজাদের সন্তোষ বিধানের জন্য স্নেহ, দয়া, সুখ এমন কি আমার জীবনসর্বস্ব সীতাকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি।

রাম সীতাকে বলেছেন,

প্রাপ্তঃ চারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিত।
দীপো নেত্রাতুরসেব প্রতিকূল্যসি মে দৃঢ়া ॥
তদ গচ্ছ ত্বানুজানে'দ্যে যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে তৃয়া ॥
কঃ পুমাংস্ত্বকূলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহেষিতাম।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাং সুহৃল্লোভেন চেতসা ॥
রাবণাক্ষপরিব্রিষ্টাং দুষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিমন্মহং ॥
যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সো'য়মাসাদিতং ময়া।
নাস্তি মে ত্বয়্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥^{২৬}

তোমার চরিত্রে (আমার) সন্দেহ, আমার সামনে তুমি আছ এতে আমি (তোমার প্রতি) প্রতিকূল বোধ করছি যেমন চোখের রোগীর সামনে দীপ থাকলে (তার কষ্ট) হয়। অতএব এই দশদিকের যেখানে ইচ্ছা তুমি যাও, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমাতে আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। সংদ্বন্দ্বজাত কোন্ তেজস্বী পুরুষ পরগৃহে বাস করেছে এমন নারীকে বন্ধুত্বের লোভে পুনর্বীর গ্রহণ করবে? রাবণের অন্ধকলঙ্কিতা, তার দুষ্ট দৃষ্টিতে দূষিতা যে তুমি সেই তোমাকে কেমন করে আমি পুনর্বীর গ্রহণ করব আমার মহৎ বংশকে দূষিত করে? যে কারণে তোমাকে উদ্ধার করেছি সে উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; তোমাতে আমার আর কোনো আসক্তি নেই। যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।

এই কথাগুলো বলেও রাম ক্ষান্ত হয়নি। সীতাকে ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে রাম বলেছেন-

তদস্য ব্যাহতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥^{২৭}

আজ সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে তোমাকে বলে দিলাম, ভদ্রে, লক্ষ্মণ অথবা ভরত যাতে তোমার সুখ হয় তাকেই বরণ করো।

রামসীতার বনগমনের সময় লক্ষ্মণ যখন রামসীতার সঙ্গে বনে আসতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তখন লক্ষ্মণ মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকামত্নজাম্ ।

অযোধ্যামটবীংবিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥২৮

রামকে দশরথ বলে মনে করো, সীতাকে মনে করো আমি, অরণ্যকে অযোধ্যা জ্ঞান করো, যথাসুখে চলে যাও বৎস।

রাবণ যখন সীতাকে বিমানে করে লঙ্কায় নিয়ে যায় তখন সীতা বিমান থেকে তার নিজের অলঙ্কারগুলো ছুড়ে ফেলে দেন। রাম লক্ষ্মণ সীতাকে খুঁজতে বের হলে লক্ষ্মণ শুধুমাত্র সীতার পায়ের অলঙ্কার ছাড়া আর কোন কিছু চিনতে পারেননি, কারণ প্রণাম করার সময় লক্ষ্মণ শুধু সীতার পা-ই দেখতে পেতেন। যে লক্ষ্মণ মায়ের মতো সীতাকে দেখেছেন সেই লক্ষ্মণকে অপমান করতেও রাম কুষ্ঠাবোধ করলেন না আর সীতাকে তো চূড়ান্তভাবে অপমান করলেনই। রাম আরও বলেছেন-

গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্যং তন্ময়া কৃতম্ ॥

মামাসাদ্য পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবেশুনি ।

জরাং ব্রজেথা ইতি মে নিহতো'য়ং নিশাচরঃ ॥

কথং হ্যস্মদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্মবিনিশ্চয়ম্ ॥

পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্তমপি ধারয়েৎ ॥

সুবৃত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি ।

নোৎসাহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা ॥২৯

যাও, বৈদেহি, তুমি মুক্ত। যা করণীয় ছিল তা আমি করেছি। আমাকে স্বামীরূপে পেয়ে, ভদ্রে, তুমি রাক্ষসের গৃহে জরাগ্রস্ত যাতে না হও তাই আমি রাক্ষসকে বধ করেছি। আমার মত লোক, যে ধর্মাধর্ম বিনিশ্চয় জানে সে পরহস্তগতা নারীকে কেমন করে এক মুহূর্তের জন্যও ধারণ করবে? তুমি সচরিত্রই হও বা দুশ্চরিত্রই হও, মৈথিলি, তোমাকে আমি আজ ভোগ করতে পারি না, তুমি (এখন) সেই ঘিয়ের মত যা কুকুর লেহন করেছে।

লক্ষ্মণ নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বনবাসে অগ্রজ রামের অনুগমন করেছিলেন, সেই লক্ষ্মণকে বারবার অপমান করতে একটুও বাধেনি রামের। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী “বাল্মীকীর রাম ও রামায়ণ” গ্রন্থে লিখেছেন-

“সমুদ্র বন্ধন, রাবণবধ, এত যে সব দুষ্কর কর্ম করেছি তা তোমার জন্য নয় সীতা! সে শুধু আপন কুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য। তোমাকে উদ্ধার করেছি। তুমি এখন যেখানে খুশি যেতে পার-যথেষ্টং গম্যতামিতি, যাকে মনে ধরে তাকেই বিয়ে করতে পার বিভীষণ সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যাকে মনে ধরে। ‘নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ।’ বাস্তবিক তোমার চরিত্রেই আমার সন্দেহ হয়। চোখ-খারাপ লোকের সামনে আলো রাখলে যেমন তার কষ্ট হয়, তেমনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি আমার কষ্টই দিচ্ছ-দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূল্যসি মে দৃঢ়ম্। এই একটি মাত্র উপমা দিয়েই বাল্মীকি বুঝিয়ে দিয়েছেন বাল্মীকি রামের দলে নন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আসলে রামের চোখেই সন্দেহের রোগ ধরেছে, সীতা আলোকবর্তিকার মত পবিত্র।”^{৩০}

রাম সুবুদ্ধিসম্পন্ন। রাম সীতাকে অবিশ্বাস ও অপমান করবে সেটা সীতা সহ্য করতে পারেননি। রামকে বলেছেন, “অসভ্য ছোটলোকেরা অসভ্য মেয়েদের সঙ্গে যেমন করে কথা বলে তুমি সেই রকম বলছ, প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব। অসভ্য মেয়েরা যা করে সেই কথা ভেবেই তুমি সমস্ত স্ত্রীজাতিকে এই রকম করে সন্দেহ করছ-“পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে।” এতকাল একসঙ্গে থেকে আমাদের মধ্যে যে প্রেমের মধু জমা হয়েছিল, সেই তুমিও যদি আমাকে না বোঝ, তাহলে আমার মরণ ছাড়া আর কি গতি আছে-‘যদি তে’হং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাস্বতম্ ॥’^{৩৬} কারণ রামের প্রতি সীতার ছিল অগাধ প্রেম। তাই রাবণ যখন রামের মৃত্যু ঘোষণা করলেন ছল করে, তখন সীতা ভাবলেন,

নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাত্মজঃ।

দেবলোকমিতো যাতস্ত্যজ্ঞা দেহং মহীতলে ॥^{৩৭}

নিশ্চয়ই আমারই শোকে বীর রামচন্দ্র দেহত্যাগ করে দেবলোকে চলে গেছেন। রামের এই ব্যবহারে জীবনের প্রতি সীতার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। তাই সীতা লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন আত্মাহুতি দেবার জন্যে।

অপ্রীতেন গুণৈর্ভদ্রা ত্যক্তয়াঃ জনসংসদি।

যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্য হব্যবাহনম্ ॥^{৩৮}

স্ত্রীর গুণে যে প্রীত নয় এমন স্বামী যখন জনসভায় স্ত্রীকে ত্যাগ করে তখন সেই স্ত্রীর যে পথে যাওয়া সম্ভব তাই করব। অগ্নিপ্রবেশ করব।

সীতার অগ্নিপ্রবেশের সিদ্ধান্তে সবাই মনে করেছিল রাম সীতাকে বাধা দিবে। কিন্তু রাম তা করেননি।

ন হি রামং কদা কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্।

অনুনেতুমথো বজ্রং দ্রষ্টুং বাপ্যশকং সুহৃৎ ॥^{৩৯}

অর্থাৎ রামকে তখন কাল অন্তক ও যমের মত দেখাচ্ছিল, তাঁকে অনুন্নয় করা, তাঁকে কিছু বলা বা (এমনকি) তাঁর দিকে চেয়ে দেখার সাধ্যও কোনো বন্ধুর ছিল না।

রামের এই নৈতিক আত্মতুষ্টি ও দুষ্কৃতিকারীর শাস্তিবিধান তখনকার সমাজের আপেক্ষিক মূল্যবোধকে বুঝিয়েছে। রাম সীতার কাছে তার অপরাধের কথা শোনার প্রয়োজনই বোধ করেননি। নিরাপরাধ সীতাকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। সীতাকে পরিত্যাগ করেছে শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই। এর পরে সীতা বললেন,

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসপতি রাঘবাৎ।

তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥

কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।

রাঘবং সর্বধর্মভক্তং তথা মাং পাতু পাবকঃ ॥

আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।

অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যো রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা ॥

যথান্যে’পি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্ ॥^{৪০}

যেহেতু আমার হৃদয় রামচন্দ্র থেকে কখনো সরে যায়নি, অতএব লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্বদিকে রক্ষা করুন। কাজে মনে, কথায় যেহেতু সর্বধর্মজ্ঞ রামকে কখনো লঙ্ঘন করিনি সেহেতু অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান আদিত্য বায়ু, দিকগুলি এবং চন্দ্র, দিন, সন্ধ্যা, রাত্রি ও পৃথিবী এবং অন্যেরাও, যেহেতু জানেন আমি এই রকম চরিত্রবতী।

সীতা এই শপথ করে অগ্নিপ্রবেশ করে যখন দক্ষা হলেন না তখন ধর্ম এবং রাষ্ট্রের বিচারের দৃষ্টিতে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হল। রাম সীতাকে বললেন, জানকী পবিত্র সেই ধারণা আমার ছিল।

কিন্তু বহুদিন তিনি রাবণের গৃহে ছিলেন। পরীক্ষা না করে তাঁকে গ্রহণ করলে লোকে বলত, দশরথপুত্র রাম অত্যন্ত কামুক লোক। “বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরাথাত্মজঃ।”

সীতাকে নিয়ে রাম অযোধ্যায় গেলেন। ভরতের কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু সীতাকে নিয়ে রাম অযোধ্যায় প্রজাদের কাছ থেকে নানা কথা শুনতে পেলেন।

কীদৃশং হৃদয়ে তব সীতাসম্ভোগজং সুখম্।

অক্লমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্ ॥৩৬

রাবণ যাকে অঙ্কে আরোপণ করে সবলে হরণ করেছিল সেই সীতার সম্ভোগে তোমার হৃদয়ে কেমন সুখ হয়? লক্ষণীয়, সীতার অগ্নিপরীক্ষার সাক্ষী অন্তত দুজন ছিলেন রাম এবং লক্ষ্মণ। দেবতারা বিশেষত ব্রহ্মা, এসে সীতার শুচিতা ঘোষণা করেছিলেন এসব কিছুই উল্লেখ করা হল না। প্রজাদের শ্লেষযুক্ত বাক্য শুনে রাম বিচলিত হলেন, কারণ প্রজারা বলল—

অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।

যথা হি কুরপ্তে রাজা প্রজাস্তমনুবর্তন্তে ॥৩৭

(এমন হলে) আমাদের স্ত্রীদেরও (এই অপরাধ) সহ্য করতে হবে। রাজা যেমন করে প্রজা তারই অনুবর্তন করে।

রাম বললেন, এই পৌরাণবাদ তাঁর অনুবর্তন করে। এই পৌরাণবাদ তাঁর মর্ম ছেদন করছে। লক্ষ্মণকে বললেন, সীতা তাঁর শুচিতার প্রমাণ দিয়েছেন।^{৩৮} তারপরও প্রজারা সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করছে।

অকীর্তিনিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তিলোকেষু পূজ্যতে ॥৩৯

দেবতারা অকীর্তির নিন্দা করে, পৃথিবীতে কীর্তি পূজিত হয়।

প্রজারা সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করছে। অতএব রাম সীতাকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিত্যক্ত সীতা লক্ষ্মণকে দিয়ে রামকে বলে পাঠালেন।

যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদসমুৎথিতঃ।

ময়া চ পরিহৃতব্যং ত্বং হি মে পরমা গতি ॥৪০

এই অপবাদ থেকে তোমার যে নিন্দা রটেছে সেটা পরিহার করাই আমার কর্তব্য, কারণ তুমি আমার পরম গতি।

রাম যখন সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন তখন সীতা সন্তানসম্ভবা। সন্তানের জন্ম দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি। তাই তিনি লক্ষ্মণকে বাল্লীকির আশ্রমে সীতাকে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। লক্ষ্মণ রামের সেই নির্দেশ অমান্য করতে পারেননি। পত্নীকে মিথ্যা সন্দেহে পরিত্যাগ করার আদর্শ ও ঐতিহ্য সৃষ্টি

করে গেলেন রাম। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণধর্মের পুরুষদের কাছে সেটা অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ পুরুষোত্তম রাম হলেন তাদের আদর্শ। শাস্ত্র তাদের শিখিয়েছে রামের মত আচরণ করতে, রাবণের মত নয়। “রামদিবং প্রবর্তিতব্যং রাবণাদিবং।” বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজ সন্তান হল। বাল্মীকি লব ও কুশ নাম রাখলেন।

রাম যখন রাজসূয় যজ্ঞ করলেন তখন ঋষি বাল্মীকি লব ও কুশকে সঙ্গে নিয়ে রামের রাজসভায় প্রবেশ করলেন। ধর্মপত্নী ছাড়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। তাই রাম স্বর্ণের সীতা তৈরী করলেন রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য। যজ্ঞে পত্নীর ভূমিকা শুধু শোভাবর্দ্ধন। স্ত্রী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী এটা বোঝাতেই এত কিছু। “(রাজসভায় সীতার) যমজ পুত্র (লব ও কুশ) বাল্মীকির শেখানো গান গাওয়ার পর সীতাকে রাজসভায় এসে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং সীতা যে নির্দোষ তা বোঝাতে বাল্মীকি তাঁর বহু সহস্র বছর তপস্যা করে যে ফল পেয়েছেন তা ত্যাগ করতে চেয়েছেন এরপরও এমন ঘটনা ঘটে।”^{৪১} বাল্মীকি বললেন,

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃত।
নোপান্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিঙ্কিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্লামি অপাপা যদি মৈথিলী ॥
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।^{৪২}

বহু সহস্র বৎসর আমি তপস্যা করেছি, সীতা যদি দুশ্চরিত্র হন তবে সেই তপস্যার ফল আমি ভোগ করব না। মনে, কাজে, কথায় কখনো অন্যায় করিনি, সীতা যদি নিষ্পাপ হয় তবে আমি তার ফল ভোগ করব। এই (সীতা) শুদ্ধচরিত্রা, নিষ্পাপ, পতিই এর দেবতা।

বাল্মীকির এত বড় শপথ রাম ও তাঁর প্রজাদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। কিন্তু রাম তবুও সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন। সমাজে নারীর স্থান কোথায় নেমে এসেছিল যে বাল্মীকির এত বড় শপথের পরও সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। সীতা বললেন-

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামমভ্যর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্বি রামাং পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥^{৪৩}

রাঘব ছাড়া অন্য কাউকে যদি মনেও না চিন্তা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী (পৃথিবী) আমাকে বিবর (আশ্রয়) দিন। মনে, কাজে কথায় যদি রামকেই অর্চনা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিবর দিন। রাম ছাড়া অন্য কাউকেই জানি না। একথা যদি সত্যি বলে থাকি তবে মাধবী দেবী বিবর দিন। “এবার অবশ্য সীতা কার্যকরভাবে প্রতিবাদ করে অন্তর্ধান করেন। একজন সম্পূর্ণ সতীসাম্বী ও আন্তরিকভাবে অনুগত পত্নীর সঙ্গে রামের এই ব্যবহার মানসিক নিপীড়নের উর্ধ্বসীমা স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই।”^{৪৪}

সীতা দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা না দিয়ে তাঁর মাতা মাধবীর কোলে আশ্রয় নেন। আত্মাহুতি দেন সীতা। তিনি বুঝেছিলেন রামের পুরুষ প্রজারা আবার তাঁকে সন্দেহ করতে পারে আর তখনও রাম সীতার পক্ষ না দিয়ে প্রজাদেরই পক্ষ নিবেন। তাঁকে আবারও পরীক্ষা দিতে হবে শুচিতা প্রমাণের জন্য।

এ প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, “যে সমাজে নারীর এই স্থান, তাকে সন্দেহ করতে গেলে যুক্তি তথ্য কিছুই প্রয়োজন হয় না, বিশ্বাস করতে গেলে সমাজ ক্ষুদ্র হয়, সেখানে নারী রাজসুখ পেলেও সম্মান কোনদিনই পাবে না, মানুষের মর্যাদা কোনদিনই পাবে না। সেইজন্যে, আত্মমর্যাদা রক্ষা করার জন্যে একটি চরম সত্যক্রিয়ার শপথ গ্রহণ করে নিজের শুচিতা প্রমাণ করলেন; কিন্তু রামের কাছে, সমাজের কাছে, জীবনের কাছে আর কোন প্রার্থনা বা প্রত্যাশা নেই তাঁর। সারাজীবন ধরে অনন্যচিন্তে যে রামকেই তিনি চিন্তা করেছেন, ভালবেসেছেন, অনুগমন করেছেন রাম কি মূল্য দিলেন তার?”^{৪৫}

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “ধর্ম বিষকন্যার মত: আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন না তার মার আরামের মার। প্রকৃত সত্য এ কথাই বলে যে গভীরতর মর্মে গেঁথে থাকা ভক্তিশেলের প্রভাবেই আজও পরিচালিত হচ্ছে নর-নারীর সম্পর্ক এবং সমাজ-সংস্কার।”^{৪৬}

সীতার প্রতি অন্যায় আচরণকে সমর্থন করেননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি যথার্থই বলেছেন “সীতার চরমশত্রু ধার্মিক রাবণ নহে, সে শত্রু ধর্মনিষ্ঠ রাম। নির্বাসনে তাঁহার তেমন সংকট ঘটে নাই, যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামীর গৃহে। যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিলামাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল।”^{৪৭} পৃথিবী সীতাকে নিয়ে যাবার পরে রাম ‘ক্রোধশোকসমাবিষ্ট’ হয়ে পৃথিবীকে বললেন,

আনয় তুং হি তাং সীতাং মন্তো’হং মৈথিলীকৃতে।^{৪৮}

অর্থাৎ সেই সীতাকে তুমি নিয়ে এস, মৈথিলীর জন্যে আমি উন্মাদ।

রাম সীতার প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করেছেন তার কোনও তুলনা হয়না। রাম ধর্ম নয় ধর্মতন্ত্রের রক্ষক ছিলেন। রামের ধর্মরক্ষার অহংকার তাঁর সব মানসিক গুণ অপহরণ করে নিয়েছিল। বিশেষত, বাল্মীকির এত গুরুতর শপথবাক্যের পরে তো তিনি অগ্নিপরীক্ষার আজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন। আর তাই সীতা রামের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পৃথিবীর আশ্রয়ে চলে গেলেন।

সীতাকে লক্ষা থেকে উদ্ধারের পর রামই প্রথমে সীতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করেছিল। লোকাপবাদের কথা ওঠার আগেই রাম নিজে সীতাকে অপবাদ দিয়েছিলেন। অসহায় নারীকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে এটাই অমার্জনীয় অপরাধ। দেহের শুচিতা ও মনের শুচিতাকে সমাজ সেদিনও পৃথক করে বিবেচনা করেনি, আজও করে না। তাই অশোকবনে থাকার সময়ে ইন্দ্র এসে সীতাকে দিব্য ক্ষীর খাইয়ে গেলেন যাতে রাবণের অন্ন তাঁকে না গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভবভূতির ভাষায় “যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ” সংসারে লোক বাক্য ও নারীর শুচিতা মানতে চাইনা।

পরিশেষে বলা যায়, রামায়ণে বাল্মীকী পতিপ্রেমের আদর্শ প্রতিমূর্তি হিসাবে নির্মাণ করেছেন তাঁর মানসকন্যা সীতাকে। রামের জন্য সীতা সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সীতার অস্তিত্ব যেন রামে বিলীন। অন্যদিকে রামচন্দ্র একজন আদর্শ রাজা। প্রজারঞ্জন করতে গেলে স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করতে হয় আর স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করতে গেলে প্রজারঞ্জন হয় না। কূলধর্ম ও রাজধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে তিনি পতিধর্মকে বলি দিয়েছেন। এজন্য তাঁর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে সীতা বারবার পরীক্ষা দিতে গিয়ে তীব্র অভিমানবোধে

পাতালে প্রবেশ করেছেন। কারণ সীতার রামের প্রতি ছিল সুস্থির প্রেম। সীতা সারাজীবন ধরে অনন্যচিন্তে রামকেই চিন্তা করেছেন, ভালবেসেছেন।

তথ্যনির্দেশ

- ১ শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, (জয়দুর্গা লাইব্রেরী: কলকাতা), ১৯৯৫, পৃ: ১০০।
- ২ তদেব, পৃ. ১১৯।
- ৩ Maurice Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol. I . Part II. p 542.
- ৪ আচার্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত রামায়ণম্, (কলকাতাঃ নিউলাইট), ১৯৯৬, ১/১৮/২৬, পৃ. ১১৩।
- ৫ তদেব, ৩/৩৪/১৫-২১, পৃ. ৫১৩।
- ৬ তদেব ৩/৩১/৩০, পৃ. ৫৫৩।
- ৭ তদেব, ২/২৭/২১, পৃ. ২৫৬।
- ৮ তদেব, ২/২৯/৫, পৃ. ২৫৮।
- ৯ তদেব, ২/৩০/২০, পৃ. ২৬১।
- ১০ তদেব, ২/৩০/২১, পৃ. ২৬১।
- ১১ সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড), ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০২।
- ১২ প্রগুক্ত, রামায়ণম্, ২/২৯/১৬, পৃ. ২৫৯।
- ১৩ তদেব, ২/২৭/৬, পৃ. ২৫৫।
- ১৪ তদেব, ২/২৭/৯, পৃ. ২৫৫।
- ১৫ তদেব, ২/৩৯/২৯, পৃ. ২৮৬।
- ১৬ তদেব, ২/৬১/২৪, পৃ. ৩৪২।
- ১৭ তদেব, ২/৩০/৪০, পৃ. ২৭০।
- ১৮ তদেব, ৩/৪৭/৩৫, পৃ. ৫৯০।
- ১৯ তদেব, ৩/৪৭/৪৮, পৃ. ৫৯০।
- ২০ তদেব, ৩/৪৭/৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, পৃ. ৫৯০।
- ২১ তদেব, ৩/৪৭/৪৫, ৪৬, ৪৭, পৃ. ৫৯১।
- ২২ তদেব, ৩/৪৮/২৩, পৃ. ৫৯৩।
- ২৩ তদেব, ৬/১১৫/১৫, পৃ. ৯৭০।
- ২৪ তদেব, ৬/১১৫/১৬, পৃ. ৯৭০।
- ২৫ ড. সীতানাথ আচার্য এবং ড. দেবকুমার দাস সম্পাদিত উত্তররামচরিত, (সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-০৭) ১৯৯৮, ১/১২, পৃ. ১৩।
- ২৬ প্রগুক্ত, রামায়ণম্, ৬/১১৫/১৭-২১।
- ২৭ তদেব, ৬/১১৫/২২, পৃ. ৯৭১।
- ২৮ তদেব, ২/৪০/৯, পৃ. ২৮৮।

-
- ৯৯ তদেব, ৩/২৭৫/১০-১৩, পৃ.৬১৫।
- ১০ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *বাঙ্গালীকির রাম ও রামায়ণ*, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স) ১৯৮৯, পৃ. ৭১।
- ১১ তদেব, *বাঙ্গালীকির রাম ও রামায়ণ*, পৃঃ ৭২।
- ১২ প্রাগুক্ত, *রামায়ণম্*, ৫/২৬/৩৮, পৃ.৮১০।
- ১৩ তদেব, *রামায়ণম্*, ৬/১০৬/১৯, পৃ.১০১২।
- ১৪ তদেব, ৬/১১৬/২২, পৃ.১০৭৮।
- ১৫ তদেব, ৬/১১৬/২৫,২৭,২৮, পৃ.১০৭৮।
- ১৬ তদেব, ৭/৪৩/১৭, পৃ.১৩৯০।
- ১৭ তদেব, ৭/৪৩/১৯, পৃ.১৩৯০।
- ১৮ তদেব, ৭/৪৪/৬-১০, পৃ.১৪১০।
- ১৯ তদেব, ৭/৪৪/১৩, পৃ.১৪১০।
- ২০ তদেব, ৭/৪৮/১৩,১৪, পৃ.১৪২৫।
- ২১ সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা ২০০৬), পৃ.১২৬।
- ২২ প্রাগুক্ত, *রামায়ণম্*, ৭/৯৬/২০,২১,২৩, পৃ.১৬২৩।
- ২৩ তদেব, ৭/৯৮/৭,৮,৯, পৃ.১৬২৭।
- ২৪ প্রাগুক্ত, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, পৃ. ১২৬-১২৭।
- ২৫ প্রাগুক্ত, *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, পৃ.১০৯।
- ২৬ rex>`bv_ VvKyর, রvwkqvর wPwV, †mvwf†qZ BDwbqb †_†K Av†gwrKv hvevর c†_ AZjvwšÍK gnvmvMর †_†K †jLv 7bs wPwV, A†±veর, 1390 e½vǎ|
- ২৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রচরিতাবলী* ওয় খন্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৭১।
- ২৮ প্রাগুক্ত, *রামায়ণম্*, ৭/৯৮/৯।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দণ্ড দূত ও চরের ভূমিকা

ড. হোসনে আরা আরজু*

ড. মোহাম্মদ আলী**

Abstract: The Kautiliya Arthashastra is the manual of the science of politics. The use of danḍa, the symbol of the ruler's authority requires great care. Only a just use of danḍa secures the protection of the people, while at the same time it ensures happiness for the ruler in the next world. There is a reference to the appointment of dūta or an envoy when a policy decision has been taken after consultation with ministers. The dūta is not to be thought of as a permanent ambassador stationed at the court of a foreign king but as an envoy sent for placing the case of his state before the foreign king with respect to some specific matter. The organisation of a secret service i.e. the use of secret agents for secret purposes has been described here. Two types of secret service i.e. one, generally stationed in a single headquarter, the other, the rover the members of which move from place to place have to work in foreign countries. In this article the nature and roles of the science of politics, envoys and secret agents have been revealed.

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা অনবদ্য। এই গ্রন্থটি রাষ্ট্রনীতিতে কূটনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কোনো রাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কূটনীতি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টির উষাকাল থেকে সামরিক বা শারীরিক শক্তি ব্যবহার না করে একদল মানুষ অপর একটি দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে নানা প্রকার কূটনীতি ব্যবহার করে আসছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় রাজশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা দণ্ডনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কূটনৈতিক প্রতিনিধির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক দৌত্যের গুরুত্বও ছিল অধিক। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য দূত ও চর বা গূঢ়পুরুষ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কৌটিল্যের মতানুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণে দণ্ডনীতি, দূত ও চরদের গুরুত্ব প্রদর্শনই এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাজ্যশাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি খ্রিস্টজন্মের পূর্ববর্তী সময়ের রচনা বলে মনে করা হয়। প্রাচীন কোনো কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে এই গ্রন্থের উল্লেখ ও সংস্কৃত টীকাপঞ্জিতে এই শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত বচনের উল্লেখ থেকে গ্রন্থটির অস্তিত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতগণ অবহিত ছিলেন মাত্র। ১৯০৯ খ্রি. মহীশূরের পণ্ডিত ড. আর, শ্যামশাস্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে পি.ভি. কানে মহোদয় মন্তব্য করেছেন: "This epoch making work was first published by Dr. Shamasastri in 1909 in the Mysore Sanskrit Series and was translated by him."^১

আবিষ্কৃত হওয়ার পর গ্রন্থটি নিয়ে বিদ্বজ্জনের মধ্যে বিভিন্ন সংশয় দেখা দেয়— প্রথমত, গ্রন্থটি খ্রি.পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মৌর্যবংশীয় প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য (চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত) নিজেই এই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন না তাঁর অনুসারী পরবর্তীকালের কোন শিষ্য বা শিষ্যসঙ্ঘ এটি রচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহ কোনো রাজ্যবিশেষে প্রচলিত অর্থনীতি,

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** প্রফেসর, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজনীতি ও সমাজনীতির চিত্র অথবা যে কোনো কালে যে কোনো স্থানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদর্শস্বরূপ রীতিনীতি। পি.ভি. কানে মহোদয় তাই বলেছেন: "This work has given rise to frequent and furious controversies about its authorship, its authenticity and its age and it cannot be said that we have heard the last of this din of controversy."^২

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির রচয়িতা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। তক্ষশিলার চণকের পুত্র চাণক্য অথবা কুটল গোত্রের কৌটিল্য যিনি বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন তিনিই অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির প্রণেতা। গ্রন্থটিও তাই ‘কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্’ নামে পরিচিত।^৩

কামন্দকীয় নীতিসার শীর্ষক রাজতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থে কামন্দক ঋষি বলেছেন, ‘যিনি ধীশক্তিসম্পন্ন হয়ে অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র থেকে নীতিশাস্ত্ররূপ অমৃত উদ্ধৃত করেছিলেন, আমি সেই বিধাতার তুল্য অতিশক্তিশালী সুধিবর বিষ্ণুগুপ্তকে নমস্কার করি।’^৪

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি পঞ্চদশ অধিকরণে বিভক্ত। গ্রন্থমধ্যে ১৫০টি অধ্যায়, ১৮০টি প্রকরণ রয়েছে। প্রকরণের নামরূপে সংক্ষিপ্ত শব্দনিচয় ‘সূত্র’ অবশিষ্ট গ্রন্থাংশ ভাষ্য নামে পরিচিত। গ্রন্থের শেষে কৌটিল্য স্বয়ং বলেছেন:

“দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্।
স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রং চ ভাষ্যং চ ॥”^৫

অর্থাৎ, শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা বিষয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে বহুপ্রকারের বিপ্রতিপত্তি বা বিবাদ লক্ষ্য করে বিষ্ণুগুপ্ত স্বয়ং সূত্রও রচনা করেছেন এবং এর ভাষ্যও রচনা করেছেন।

গ্রন্থটির প্রথম পাঁচটি অধিকরণ ‘তন্ত্র’ অর্থাৎ রাজার নিজ রাজ্যমধ্যে প্রজাদের যোগক্ষেমের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসন পরিচালনা করা ও অপর নয়টি অধিকরণ ‘আবাপ’ অর্থাৎ বিদেশীয় শত্রু রাজার প্রতি কূটনীতিপ্রয়োগের অভিপ্রায় পোষণ রূপ রীতিনীতি সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধ। গ্রন্থপ্রণেতা সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানে অর্থশাস্ত্রে এই উদ্ধৃতাংশই প্রমাণস্বরূপ বলা যায় :

“যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্ ॥”^৬

অর্থাৎ, যিনি অমর্ষবশত শাস্ত্র, শস্ত্র ও নন্দরাজাদের দ্বারা অধিকৃত ভূমি বা রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন তিনিই অর্থাৎ সেই বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যই এই অর্থশাস্ত্র নামক শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন।

কৌটিল্য, কামন্দক, শুক্রে প্রভৃতির রচিত রাজনীতি বা দণ্ডনীতিশাস্ত্রে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ প্রভৃতি মনীষির রচিত স্মৃতিশাস্ত্রে, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে রাজদণ্ড বিষয়ে আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। রাজাকে দণ্ডধর বলেও অভিহিত করা হয়। রাজা দণ্ডশক্তির বিগ্রহ। লোকযাত্রা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে হলে রাজাকে প্রকৃত দণ্ডধর হয়ে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হতে হবে। লোকসমাজে অরাজকতা প্রতিহত করতে হলে রাজাকে যথার্থদণ্ড হতে হবে। কৌটিল্যের মতে রাজার প্রথম কর্তব্য সমস্ত লোককে স্বধর্ম থেকে দ্রষ্ট হতে না দেওয়া। কারণ ‘স্বধর্মঃ স্বর্গায় আনন্ত্যায় চ’ অর্থাৎ স্বধর্ম স্বর্গ ও অনন্ত সুখদায়ক।

দণ্ডনীতি

প্রাচীন ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। প্রথমাবস্থায় ঋগ্বেদ সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে সাধারণভাবে এটি রাজধর্ম (Duties of the king) বা রাজশাস্ত্র বা রাজবিদ্যা (Science of the kingship) রাজনীতি (Science of statecraft) নামেও পরিচিত ছিল। রাষ্ট্রশাসনের জন্য রাজার যা

কর্তব্য এবং যে সকল নিয়মনীতি অনুসরণীয় বলে মনে করা হতো তাই ছিল রাজধর্ম, রাজশাস্ত্র, রাজবিদ্যা, রাজনীতি। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের যুগে এবং ঠিক তার অনুবর্তী সময়ে রাষ্ট্রনীতির অন্যতম পরিভাষা ছিল দণ্ডনীতি। দণ্ডনীতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে দণ্ড বা শাস্তিপ্রদানের নিয়মাবলী (Rules of punishment) রাষ্ট্রই এক মাত্র বৈধ শাস্তিপ্রদানের অধিকারী। শাস্তিদানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। রাজার সঙ্গে দণ্ড দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। রাজাই একমাত্র দণ্ডদানের অধিকারী। সংক্ষেপে তাই বলা যায় দণ্ডাধিকারী রাজাকে সঠিকভাবে দণ্ডপ্রয়োগে অর্থাৎ যথাযথভাবে রাজ্যশাসনে পরিচালিত করার নীতিই দণ্ডনীতি।

রাষ্ট্রনীতির ভারসাম্য বা ব্যালাপ অব পাওয়ার রক্ষার জন্য প্রাচীন রাজশক্তিকে চতুরুপায় বা উপায়চতুষ্টয় অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ করতে হতো। এই উপায়চতুষ্টয় প্রয়োগ করে শত্রুর অসুবিধা সৃষ্টি করা বা শত্রুনাশের অনেক দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। দণ্ডের ব্যবস্থা অর্থাৎ আক্রমণ করার নীতিই সর্বশেষ উপায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন: ‘উপায়াঃ সামোপদানভেদদণ্ডাঃ’। বিষ্ণুধর্মসূত্রে বলা হয়েছে: ‘শত্রু-মিত্রোদাসীন-মধ্যমেষু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডান্ যথাইং যথাকালং প্রযুক্তীত।’^৭

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতো প্রাচীন ভারতেও অনেক পণ্ডিত মনে করেন রাষ্ট্রের চূড়ান্ত বৈধতা নির্ভর করে বলপ্রয়োগশক্তির উপর। মনু বলেছেন- এই জগতে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধশুচি মানুষ একান্তই দুর্লভ। দণ্ডের মাধ্যমেই সকলকে জয় করতে হয়- “সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচিনরঃ”।^৮

মনু আরও বলেছেন রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ভর করে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা বা শক্তির উপর, এই শক্তির যথাযথ ব্যবহার না হলে সমাজে মাৎস্যন্যায় (Law of jungle) দেখা দেয়।^৯ মনু আরও বলেছেন এই জগতে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধশুচি মানুষ একান্তই দুর্লভ তাই দণ্ডের মাধ্যমেই সকলকে জয় করতে হয়। মনুর ভাষায় :

“দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।

দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদূর্বধাঃ॥”^{১০}

অর্থাৎ, দণ্ড (পার্শ্ব শক্তি) সকল প্রজাকে শাসন করে। দণ্ড সকলকে রক্ষা করে। যখন অন্য সবাই নিদ্রিত থাকে একমাত্র দণ্ডই জাগ্রত থাকে। ধর্ম (অনুশাসন) দণ্ডব্যতীত কিছুই নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির দণ্ডবিধান করার ক্ষমতা থাকায় সাধারণ মানুষ দণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং এর ফলে সমাজে শৃঙ্খলা, স্থিতি এবং উন্নয়ন সূচিত হয়। কৌটিল্য এই দণ্ডনীতির সূত্রকেই সমগ্র অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেননা, রাজার অর্থলাভ সুসম্পন্ন করে তোলার সাধনই হলো রাজার দণ্ডনীতি।

কৌটিল্যের মতে আত্মরক্ষা, ত্রয়ী ও বার্তা এই তিন বিদ্যার যোগক্ষেম সাধন করে দণ্ড। অলব্ধ বস্তুর লাভ, লব্ধ বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণই দণ্ডের মাধ্যমে সম্ভব। লোকযাত্রা দণ্ডনীতির উপরই নির্ভর করে। অতএব, যে রাজা লোকযাত্রার অনুষ্ঠানে আগ্রহী তিনি সর্বদাই উদ্যতদণ্ড হবেন।^{১১}

কৌটিল্যের মতে তীক্ষ্ণদণ্ডপ্রণয়কারী রাজা সকল প্রাণীর উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকেন। রাজা মৃদুদণ্ড প্রণয়ন করলে অন্যের কাছে পরাভবপ্রাপ্ত হন। যে যেমন দণ্ড পাওয়ার যোগ্য তার প্রতি সেরূপ দণ্ড প্রণয়ন করলে তিনি পূজার যোগ্য। উত্তমরূপে প্রযুক্ত দণ্ড প্রয়োগের ফলে রাজা ধর্ম, অর্থ ও কামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। দণ্ড অপ্রণীত বা অপ্রযুক্ত হলে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়।^{১২} P.V Kane বলেছেন: "The creator proceeded to create Daṇḍa (The power of punishment) for the sake of the king and that if the king does not sedulously employ Daṇḍa for punishing those that deserve, if the strong would torment the weak as fish are fried on a pike or as in water fish devour each other... the idea of mātsyanyāya (the maxim of the larger fish devouring

the smaller one or the strong despoiling the weak) is frequently dwelt upon by Kautilyo, the Mahābhārata and other works."^{১৩}

কৌটিল্য এই অরাজক অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন : “মাৎস্যন্যায়্যভিভূতাঃ প্রজা মনুং বৈবস্বতং রাজানং চক্রিরে।”^{১৪} রামায়ণে এই অরাজক অবস্থার উল্লেখ করে বলা হয়েছে : “মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্।”^{১৫} মহাভারতে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে :

“দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ
জলে মৎস্যনিবাভক্ষ্যন্ দুর্বলং বলবন্তরাঃ॥”^{১৬}

দণ্ডসম্পর্কে তাই কানে মহোদয় যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "The conception of danda is therefore this that the state's will and coercive power keep the individual and nation within the bounds of dharma, punish for breaches and effect the good of the whole."^{১৭}

মনু তাই বলেছেন :

“যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি॥”^{১৮}

অর্থাৎ, যেখানে দণ্ডপ্রণেতা রাজা ন্যায়ানুরূপ দণ্ডবিধান করেন এবং শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, পাপনাশক দণ্ড বিরাজ করে সেখানে প্রজাগণ ব্যাকুল হয় না।

রাজ্যের সগুপ্ত তত্ত্বের আলোচনায় দণ্ডের অর্থ সৈন্যবল। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের শিষ্টের পালন তথা দুষ্টির নিগ্রহ, আইনশৃঙ্খলা, অন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান এর সবকিছুই রাজদণ্ডের উপর নির্ভর করে। তাই দণ্ডকে সাধারণভাবে শাস্তি, শাসন বা বলপ্রয়োগের পর্যায় হিসেবে ধরলে সেটিই হবে দণ্ড শব্দের সর্বাঙ্গিক অর্থ। শারীরিক এবং আর্থিক দণ্ডই প্রধানভাবে বলপ্রদর্শনের তাৎপর্য বহন করে (coercive element) সেই দণ্ডই আসলে দণ্ড শব্দের অর্থ।

দণ্ড শব্দ দিয়ে প্রথমে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর সাধন দণ্ডকেই বোঝাতো। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর রচনার সমকালেই দণ্ড শব্দটি আইনের শাসন অর্থেই ব্যবহৃত হতো। দেশশাসক রাজা সাধারণের মতো শাস্তি পাবেন না। রাজা তাই অদণ্ড। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে দণ্ডকে রাজশক্তির প্রতীক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভগবদ্গীতাতেও দণ্ডের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বিভূতিযোগে দুষ্ট শক্তিকে দমন করার মধ্যেই দণ্ডের উপযোগিতা লক্ষিত।^{১৯} কামন্দকীয় নীতিসারেও দণ্ডের সঙ্গে রাজাকে একাত্মক করে দেখানো হয়েছে। দমননীতির মধ্যেই সেখানে দণ্ডের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।^{২০} কৌটিল্য অতি সাধারণ যষ্টি অর্থে দণ্ড শব্দের প্রয়োগ করেছেন আবার শারীরিক দণ্ডের ক্ষেত্রেও দণ্ড শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সমগ্র অর্থশাস্ত্র জুড়ে দণ্ডের শব্দবোধ হয়েছে বলপ্রয়োগ অর্থাৎ Coercion।

মনুর মতে দণ্ডই হলো আসল রাজা। দণ্ডের বলেই রাজা বিভিন্ন বিষয়ে বিধিনিষেধাত্মক আদেশ জারি করেন—‘স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ’। ব্রহ্মার আদেশে বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে বৈবস্বত মনু রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। যে মনু রাজধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি হলেন প্রচেতার পুত্র প্রাচেতস মনু।

বৈদিক যাগযজ্ঞের শুদ্ধাচারগুলোর কথা মনে রেখে মনু মন্তব্য করেছেন রাজা দণ্ডপ্রণয়ন না করলে নিকৃষ্ট কাক যজ্ঞের পুরোডাশ ভক্ষণ করবে, কুকুর চেটে দেবে যজ্ঞের হবি।^{২১} মনুর মতে দণ্ডের উপযুক্ত প্রয়োগ না হলে কোথাও স্বস্বামিভাব থাকবে না। দণ্ডের অভাবে উত্তমাধমের অধিকারের পরিবর্তন ঘটবে। মনু মনে করেন সৃষ্টিকর্তা শাসনের শৃঙ্খলে বিশ্বপ্রকৃতিকে বেঁধে রেখেছেন। দিনের সময় অতিক্রম করে তাই সূর্য তাপ দেন

না। একইভাবে চাঁদের শীতলতা রাত্রির নিয়মাধীন।^{২২} শেয়াল শকুন যে জীবন্ত অবস্থাতে আমাদের খেয়ে ফেলছে না তাও দণ্ডের ভয়ে, রাশি রাশি সাপ দিনের বেলা বেরিয়ে যে মানুষদের দংশন করছেন তাও দণ্ডের ভয়েই। দেব-দানব, বিহঙ্গ ভূজঙ্গেরা যদি দণ্ডের ভয়ে নিজেদের সীমা অতিক্রম না করে সেখানে মানুষও দণ্ডের ভয়েই নিজেদের সীমা অতিক্রম করবে না। প্রধানত চতুর্বর্ণের স্বধর্ম এবং কর্মসীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সে জন্যই দণ্ডের প্রয়োজন। উত্তম অধর্মের মধ্যে যে মর্যাদার সেতু আছে সেটি লঙ্ঘন না করাই মনুর ইচ্ছে।

দণ্ডের একটা মনুষ্যরূপ কল্পনা করে মনু বলেছেন দণ্ড যেন এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তার চোখ দুটো ক্রোধে রক্তিম। পাপহারী দণ্ড যেখানে ঘুরে বেড়ায় দণ্ডপ্রণেতা রাজা যদি সেই দণ্ডের যথার্থ প্রয়োগ করেন তবে সেখানে প্রজাদের পক্ষে অন্যায় কাজ করাটা সম্ভব হবে না। আত্মক্ষিকী ত্রয়ী এবং বার্তার যোগক্ষেপাধন হচ্ছে দণ্ড। দণ্ড যেখানে সুশৃঙ্খল সমাজের প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে শৃঙ্খলাই দণ্ডের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। বিনয় রাজদণ্ডের মৌল উপাদান হিসেবে কাজ করে বলেই দণ্ড আর দণ্ডের মূলে আছে বিনয়। দণ্ড যদি আত্মক্ষিকী, ত্রয়ী বার্তা ইত্যাদি বিদ্যার মূল হয় তবে তা কখনই বলপ্রয়োগের রাষ্ট্রীয় নীতির কথা বলছে না। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা, বিনয়, তথা এক গভীর নৈতিকতার মধ্যেই দণ্ডের প্রতিষ্ঠা। কৌটিল্য বলেছেন, তিন বিদ্যার মূলে আছে দণ্ড আর দণ্ডের মূলে আছে বিনয়। দণ্ড হলো এক শক্তিশালী তেজঃপুঞ্জ। এই তেজোগুণসম্পন্ন দণ্ডের ধারণকর্তা যিনি তাঁর যদি নীতিবোধ, ইন্দ্রিয়বশ্যতা, বিনয় ইত্যাদি না থাকে তবে তাঁর পক্ষে এই দণ্ডধারণ সম্ভব নয়।

দণ্ডের ওপরই সমস্ত লোকযাত্রা নির্ভর করে বলে কৌটিল্য বলেছেন রাজাকে সর্বদা এমনভাবে থাকতে হবে যেন দণ্ডপ্রয়োগ করার জন্য উদ্যত হয়েই আছেন। মনু তাই বলেছেন—“তস্মান্ন্লোকযাত্রার্থী নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যাৎ।” কৌটিল্যের মতে সমস্ত প্রাণীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসার এমন উপকারীসাধন নেই যেমন দণ্ড।

মনু দণ্ডের উপযোগিতা বলার সময় দণ্ডদাতা রাজার অপেক্ষিত গুণগুলোর কথা বলে দিয়েছেন। দণ্ডপ্রণয়নের সময় রাজা মন্ত্রী অমাত্যের পরামর্শ নেবেন। কাম ক্রোধে বিমূঢ় রাজা কখনই দণ্ডবিধানের উপযুক্ত নন। বলবান শত্রুকে অধীনে আনতে গেলে ভেদ এবং দণ্ডের কথা চিন্তা করা উচিত— “সামদানাত্যাং দুর্বলান্ উপনময়েৎ ভেদদণ্ডাত্যাং বলবতঃ।”^{২৩}

মনু বলেছেন রাজা যদি দেশ, কাল এবং দণ্ডজনের অপরাধ ঠিক ঠিক বিচার করে দণ্ডবিধান করেন তবে তা সমস্ত প্রজাদের মন রঞ্জিত করে। আর তা না করলে সেই দণ্ডই সকলের সর্বনাশ করে।

অনেক শাস্ত্রকার দণ্ডের এত সঙ্কীর্ণ নিষেধমূলক (Prohibitive) সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি। প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ মানুষ দণ্ডের ভয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলে। দণ্ড বিধান বা শাস্তিপ্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজপ্রতিষ্ঠানের বিবর্তন ও মাৎস্যন্যায়ের স্বরূপ আলোচনাকালে দণ্ডনীতির বিবর্তন আলোচিত হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দণ্ডনীতির উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনির উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠির শরশয্যায়া শায়িত পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা একজন মনুষ্যধারী জীব হওয়া সত্ত্বেও তাকে সকলে কেন মান্য করে? তার উত্তরে পিতামহ দণ্ডসৃষ্টির কাহিনি বলেন : সৃষ্টির আদিতে কোনো রাজা ছিলেন না। সে সময় ছিল পরম শান্তি ও সুখের সময়। তখন ছিল মানবসভ্যতার সুবর্ণ যুগ। কালক্রমে সমাজে লোভ এবং হিংসার উদ্বেক হলো, বেদ লঙ্ঘিত হতে থাকলো, নীতিহীনতা প্রবল হয়ে উঠলো, অন্যায়কারীরা সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ালো। দেবতারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ভীত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলো। ব্রহ্মা তখন সমাজ শাসনের জন্য প্রায় দশ লক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট দণ্ডনীতি বিষয়ক একটি জ্ঞানকোষ রচনা করলেন যা দিয়ে মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হবে। জ্ঞানকোষ রচনা করে লোকস্থিতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। এই নীতি কার্যকর করার জন্য

প্রয়োজন রাজার। দেবতার তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তাঁর শরীর থেকে রাজার সৃষ্টি করলেন। কয়েক পুরুষ পরে ভগবান বিষ্ণু ঐ বংশের রাজা পৃথুর দেহে প্রবেশ করলেন। এভাবে ঈশ্বরসৃষ্ট হওয়ায় এবং ঈশ্বরের আন্তর হওয়ায় রাজা মনুষ্যদ্রোহী হলেও সকলেই তাঁকে মান্য করে। ভীষ্মকথিত কাহিনিটি থেকেই দণ্ডনীতির উদ্ভব এবং রাজার সঙ্গে দণ্ডনীতির অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক অনুমান করা যায়।

ব্রহ্মপ্রণীত জ্ঞানকোষটিতেই উল্লিখিত ত্রিবর্গফলের মধ্যে ‘ধর্ম’ সম্পর্কিত অংশটি পরে মনু জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। পরবর্তীতে বৃহস্পতি ব্রহ্মপ্রণীত দণ্ডনীতিকোষটিকে সংক্ষিপ্ত আকার দান করেন। এটি ছিল তিন হাজার শ্লোক সমন্বিত। বৃহস্পতি মনুপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেও অর্থ সম্বন্ধীয় অংশে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। একইভাবে বাৎস্যায়ন ‘কাম’ সম্বন্ধীয় আলোচনাকেই প্রাধান্য দেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও দণ্ডনীতির সূচু প্রয়োগে ব্যক্তি ও সমাজে ধর্ম, অর্থ ও কামলাভে এই দণ্ডনীতিই একমাত্র সহায়ক। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের তীক্ষ্ণদী মন্ত্রী চাণক্যের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই দণ্ডের সূচু প্রয়োগের জন্যই সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিল।

দণ্ডনীতি তাই কার্যনির্বাহকের নীতিশাস্ত্র (Ethics of the Executive)। বিশৃঙ্খল, অস্থির ও নীতিবর্জিত রাষ্ট্রে নাগরিকগণের পক্ষে সুস্থ ও নিশ্চিতভাবে দর্শনচর্চা, ধর্মের প্রসার বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্ভবপর হয় না। রাজশক্তি দণ্ডনীতি প্রয়োগ করে সামাজিক স্থিতি রক্ষা করে। শত্রু এবং প্রজাপতি তাঁদের রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থগুলোকে দণ্ডনীতি নামে অভিহিত করেছে।

দণ্ডনীতির তিনটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়-

(ক) দণ্ড বা শাস্তিপ্রদানের নিয়মাবলি (Rules of Punishment)

(খ) রাজ্যশাসনের নিয়মাবলি (Rules of Governance)

(গ) দণ্ডধিকারী রাজাকে পরিচালিত করার নিয়মাবলি (Rules for the king)

অর্থাৎ, যে নীতি প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থে রাষ্ট্রশাসনে প্রযুক্ত হয় এবং রাষ্ট্রনায়ককে এই নীতি প্রয়োগে যোগ্যতা ও বৈধতা দান করে তাই দণ্ডনীতি।

স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের আলোচনায় যখন দণ্ডের প্রসঙ্গ এসেছে তখন দণ্ড রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অঙ্গ হিসেবেই এসেছে, সেই দণ্ডের আলোচনা অনেকটা সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রনীতি তথা যুদ্ধনির্ভর। প্লেটো, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং ন্যায়বিধানের ক্ষেত্রে যে দণ্ডের কথা বলেছেন তাও অনেকটা দার্শনিকতা এবং নৈতিকতার প্রেক্ষাপটেই আলোচিত।

দূত

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক প্রতিনিধির বিচক্ষণতায় অপ্রিয় ও অশুভ ঘটনা সন্তোষজনক প্রিয় ঘটনায় পরিণত হয়। কূটনৈতিক দৌত্যের গুরুত্ব এতই প্রভাবশীল যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবের প্রতিনিধি হিসেবে কৌরবসভায় গমন করেছিলেন। বৈদিকযুগের প্রথম থেকেই কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের দূত বা চর নামে অভিহিত করা হতো। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য ‘দূত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

দূতের গুরুত্ব সম্পর্কে P.V. Kane মহোদয় যথার্থই বলেছেন: "All governments in modern times employ spies, informers and secret agents to keep themselves informed to the activities, views and resources of their opponents. We know also how the Indian police, in order to catch offenders against the prevention of Gambling Act or other

similar Acts, employ agents with marked coins or notes and draw in their net unsuspecting people".^{২৪}

কৌটিল্যের শাসনকার্যে দূতের মর্যাদা রাজকার্যে নিযুক্ত অমাত্যের মতো। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কিভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হবে তা দূতের মাধ্যমেই ঠিক করা হতো। দূতের আচার-আচরণ ও বক্তব্য উপস্থাপন এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই বলা হয়েছে ‘দূতমুখা বৈ রাজানঃ’^{২৫} মনু বলেছেন : ‘দূতের উপর সন্ধি ও বিগ্রহ নির্ভর করে, দূতের কার্যকলাপে রাজায় রাজায় ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়’।^{২৬} সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রতত্ত্বে রাজার পরেই আসেন অমাত্য, অমাত্যের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হলেন দূত। দূতের কার্যকলাপ সবটাই রাজার পররাষ্ট্রনীতির পরিসর। তাই ষাড়গুণ্য, এবং চতুরপায় প্রয়োগের সঙ্গেই দূতকর্ম সংপৃক্ত বা দূতের উপরই নির্ভর। কৌটিল্যের মতে, পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বী দুই রাজার মধ্যে দূতই সংহতি নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে মিত্রভাবাপন্ন দুই রাজার মধ্যে দূতই ভেদ ঘটাতে পারেন।

ঋগ্বেদে অগ্নিদেবতাকে দূত করে পাঠানো হয়েছে দেবতাদের যজ্ঞে নিমন্ত্রণের জন্য।^{২৭} পণিসরমা সূক্তে, সরমা ইন্দ্রের দূত হিসেবে কাজ করেছে। রামায়ণে অশোকবনে সীতার কাছে রামের অঙ্গুরীয়ক নিয়ে দূত হিসেবে যান হনুমান। মেঘদূতে যক্ষের বিরহের বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য মেঘকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করা হয়। এই দূতদের দৌত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দূতকাব্য রচিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত, পবনদূত, কাকদূত এজাতীয় কাব্য।

দূতের গুরুত্ব বিবেচনা করেই কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে দূতপ্রেষণ এবং পররাষ্ট্রে দূতের আচরণ ও কার্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। দূত তিনপ্রকারের হতে পারে। অমাত্যদের সমান গুণসম্পন্ন, সদ্বংশজাত, প্রজ্ঞাবান, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশুদ্ধস্বভাব, মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং রাজার প্রতি শ্রদ্ধাশীল দূত নিসৃষ্টার্থ দূত। যে দূতের মধ্যে এসমস্ত গুণের এক চতুর্থাংশ কম থাকবে তাকে পরিমিতার্থ দূত বলে, এর অর্ধেক গুণ যার থাকবে তাকে শাসনহর দূত বলে।^{২৮}

দূতনিযুক্তির সময় কতগুলো নির্দিষ্ট গুণের কথা ভাবতে হয়। দূতের প্রথম গুণ হচ্ছে তিনি হবেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ। ধর্ম, দর্শন এবং সমস্ত লৌকিক শাস্ত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পররাষ্ট্রের রাজা যতই ভাব গোপন করুক তার স্বাভিপ্রায় প্রকাশক ইঙ্গিত, বচন, স্বরভেদ, মুখের প্রসন্নতা অথবা বিবর্ণতা দেখে তাঁর অন্তর বোঝার সামর্থ্য থাকতে হবে দূতের।

মনু দূতের গুণ হিসেবে সদ্বংশে জন্ম, প্রভুর প্রতি আনুগত্য অথবা তাঁর কর্মকুশলতার কথা বলেছেন। এছাড়া স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, দেশকালবেত্তা হতে হবে দূতকে।^{২৯} পররাষ্ট্রে গিয়ে সেই দেশের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা এবং সময়বোঝা পূর্বনির্ধারিত নির্দেশবাক্য থেকে সরে এসে অবস্থানরূপ এবং কালানুরূপ কথা বলে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রস্তুত করবেন। রামায়ণে বলা হয়েছে : “দূতের চেহারা হবে সন্ত্রমযুক্ত, বক্তৃতা করার ক্ষমতা এবং ভাষার ওপর দখল থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ও দূতকে হতে হবে নির্ভীক। শত্রুরাজার সামনে প্রয়োজনে অপ্রিয় কথা বলতে তিনি পিছপা হবেন না।”^{৩০} মনু, মহাভারত^{৩১} এবং কৌটিল্য-এরা দূতের মর্যাদা এবং গুণাবলি মর্যাদাসহকারে বর্ণনা করেছেন। কামন্দক ঋষিই প্রথম জানিয়েছেন দূত হচ্ছে একপ্রকার ভদ্রচর। প্রকাশ্যে এদের কাজ, আর অন্যেরা হচ্ছেন গুপ্তচর।^{৩২} স্যার হেনরি ওটন নামে ব্রিটিশ দূতের মতে- "An ambassador is an honest man who is sent to tell lie abroad."^{৩৩} ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও একইপ্রকার- "an ambassador is often nothing more than an honourable spy acting under the protection of the law of nations."^{৩৪} শুক্রনীতিসারে বলা হয়েছে রাজা রাত্রিতে^{৩৫}

গুপ্তচরের মাধ্যমে সকল তত্ত্ব জানতে পারেন। দূতের কার্যাবলি সম্পর্কে *কামন্দকীয় নীতিসারে* অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হয়েছে।^{৩৬}

দূতের কার্যাবলি

শত্রুরাজার দেশে যাওয়ার আগে দূত নিজের বক্তব্য ভালো করে সাজিয়ে নেবেন। নিজ প্রভুর বক্তব্য শুনে শত্রুরাজা কি বলতে পারেন এবং এক্ষেত্রে দূতের উত্তর কি হবে এভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর ঠিক করে দূত পররাষ্ট্রে গমন করবেন। শত্রুরাজ্যের প্রত্যন্তবাসী অটবীপাল, রাজ্যের সীমাদিকারী প্রধান পুরুষ, নগরে বসবাসকারী প্রধান পুরুষ এবং রাষ্ট্রের মুখ্যপুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন।

শত্রুপক্ষের সৈন্যনিবেশের স্থান নিজ রাজার সৈন্যনিবেশের স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না অপকৃষ্ট বোঝার চেষ্টা করবেন। রণক্ষেত্র, যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে এসব বিষয়ে নিজ রাজার সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনা বিবেচনা করবেন। শত্রুরাজার দুর্গ, জনপদের আয়তন, তাঁর ঐশ্বর্য, রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা শত্রুরাজার দোষ এগুলো বুঝে নিজের রাজাকে জানানো দূতের কাজ। বিদেশের রাজা তার কথা শুনে সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট হলেন তা শত্রুরাজার ইঙ্গিত, আকার এবং ব্যবহার থেকে বুঝে নেবেন। আপ্যায়ণে সন্তুষ্ট হলেও দূত নিজের দুর্গ, রাজ্য, সৈন্য ইত্যাদি ব্যাপারে অল্পই মুখ খুলবেন। এছাড়াও দূত নিজের রাজ্যের যে সব গুপ্তচর শত্রুরাষ্ট্রে আগে থেকেই নিযুক্ত হয়ে আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। শত্রুরাষ্ট্রের গ্রামে, গঞ্জে, মন্দিরে ঘুরে বেড়াবেন। উন্মাদ, প্রলাপী, ভিক্ষুক এবং নিদ্রিত ব্যক্তির কথা শুনেও তিনি শত্রুরাষ্ট্রের দোষ গুণ বুঝে নেবেন।

দূত শত্রুরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি নেবেন। সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ হলে দেশে ফিরতে চাইলে শত্রু রাজা ফেরার অনুমতি না দিলে তখন দূত শত্রুরাজা কেনো নিজ রাজ্যে ফেরৎ পাঠাতে অনিচ্ছুক সে বিষয়ে চিন্তা করবেন। তখন তিনি নিজ রাজার রাজমণ্ডলে অবস্থিত অন্যান্য শত্রুরাজার সঙ্গে এই রাজার কোনো গোপন যোগসূত্র রয়েছে কিনা অথবা সময়ের সুযোগ নিয়ে শত্রুরাজা নিজের কোশ এবং সেনা বাড়িয়ে তুলে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করছেন কিনা এইসব কূটতর্ক সমাধান করে প্রয়োজন বুঝলে সেই রাষ্ট্রে অবস্থান করবেন। অন্যথায় শত্রুরাজার অনুমতি ছাড়াই পালানোর চেষ্টা করবেন।

দূতকে হত্যা করলে ঋণ হত্যার পাপে পিতৃগণ লিপ্ত হন এবং ও নরকগামী হতে হয়। *মহাভারতে*ও এর নির্দশন মেলে। কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্রে* বলেছেন দূতগণ শত্রু উত্তোলিত হলেও নিজ রাজার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনই জানাবেন। ব্রাহ্মণ দূতের তো কথাই নেই, দোষী চণ্ডাল হলেও দূত অবধ্য।^{৩৭} *রামায়ণে*ও বলা হয়েছে দূত দুষ্ট হলেও অবধ্য। *রামায়ণে* দূতের বিভিন্ন দণ্ডবিধানের নির্দেশও পরিলক্ষিত হয়।^{৩৮}

দূতের অমাত্যোপম ক্ষমতাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন কৌটিল্য। প্রভুর সন্দেশ বহন করা ছাড়া পূর্বকৃত সন্ধি নতুনভাবে সম্পন্ন করা, মিত্র সংগ্রহ করা, শত্রুরাজ্যে ভেদনীতি চালানো, শত্রুর বন্ধুরাষ্ট্রে ভেদব্যবস্থা করা, শত্রুর সেনা এবং গুপ্তচরদের বিতাড়িত করা, এমনকি দরকারে, সময় বুঝে শত্রুরাজাকে মেরে ফেলার ব্যাপারও দূতকর্মের মধ্যে পড়ে।^{৩৯}

চর

দূতেরই অপর একটি শ্রেণি। দূতের কাজ পররাষ্ট্রসংক্রান্ত। গুপ্তচরের ভূমিকা অন্তরাষ্ট্রে ব্যাপ্ত।^{৪০} মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে পররাজ্যে প্রকাশ্য গমনকারী ব্যক্তি দূত, আর পররাজ্যের বৃত্তান্ত জানার জন্য পরিব্রাজকাদি গুপ্তবিশেষ যারা ধারণ করে, তাদের গুপ্তচর বলা হয়।^{৪১} *মহাভারতে* রাজকার্যের সহায়ক হিসেবে চরনিযুক্তির কথা বলা হয়েছে।^{৪২} *মনুসংহিতায়* চরনিযুক্তির কথা বলা হয়েছে।^{৪৩} যে সকল পুরুষ ইচ্ছে করলেই জড়, অন্ধ এবং বধিরের ভাণ করতে পারেন তারাই গুপ্তচর হওয়ার যোগ্য। রাজপুর, জনপদ এবং সমস্ত রাজগণের কাছে

এরূপভাবে চর প্রেরণ করা উচিত যাতে চরেরাও পরস্পর জানতে না পারে।^{৪৪} পাষণ্ড ও তাপসের বেশে চর পাঠানোর রীতি মহাভারতেও পরিলক্ষিত হয়।^{৪৫}

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চরদের বলা হয়েছে গৃঢ় পুরুষ। রাজকার্যে এদের গুরুত্ব এতটা যে মন্ত্রী অমাত্য নিয়োগের পর রাজাকে চর নিযুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। কৌটিল্যের মতে রাজা নিযুক্ত গৃঢ় পুরুষদের যথেষ্ট অর্থ এবং সম্মান দিয়ে সমাদর করে রাজকর্মচারী তথা রাজার ওপর জীবিকা নির্বাহকারী অমাত্য, সেনাপতি এবং অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারীদের শুচিতা পরীক্ষা করার কাজে ব্যবহার করবেন।^{৪৬}

চরের ভূমিকা এতটাই ব্যাপক যে চরকে রাজার চক্ষু বলে নির্দেশ করা হয়েছে। রাজা একা সব কাজ দেখতে পারেন না বলে সব কাজই তিনি চরের মাধ্যমে করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে চরেরা সকলের অজ্ঞাতসারে শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন রাজার রাজ্যের সমস্ত খবর যেমন সংগ্রহ করবে তেমনই অন্তঃরাত্ত্রীয় প্রজাদের খবরও সংগ্রহ করবে।

চরের পাঁচটি প্রকারকে কৌটিল্য সংস্থ নাম দিয়েছেন। নিজ রাজার প্রয়োজনে এরা নিজ রাজ্যে এবং পররাজ্যে এক একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করেই গুপ্তচরেরা কাজ চালায়। এরা কাপটিক অর্থাৎ কপট ছাত্রের বেশে গুপ্তচরের কাজ চালায়। এরা বাগ্মী এবং রেডি উইট। ‘পরমর্মজঃ প্রগল্ভঃ ছাত্রঃ কাপটিকঃ’।^{৪৭} দ্বিতীয় সংস্থ ‘উদাসীত’। এরা উদাসীন সন্ন্যাসী, এরা বিজ্ঞ ব্যক্তি। সন্ন্যাস ধর্ম থেকে এরা বিচ্যুত হয়েছেন। রাজা এই ধরনের লোকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এরা বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের মানুষকে আর্থিক সাহায্য করে এই গোষ্ঠীকে নিজের বেশে আনে।^{৪৮} তৃতীয় গুপ্তচর হচ্ছে ‘গৃহপতিব্যঞ্জন’। কৌটিল্য এখানে রাজ্যের ‘প্রোডিউসিং ম্যাস’ হাতে রাখার জন্য গুপ্তচর ব্যবহার করছেন। কৃষিবৃত্তিতে যারা লোকসান দেয় অথচ সং এমন ব্যক্তিকেই রাজা কৃষক-বেশী মানুষদের নিজের অনুকূলে আনার কাজে লাগাবেন।^{৪৯} চতুর্থ শ্রেণি হচ্ছে ‘বৈদেহকব্যঞ্জন’ বাণিজ্যের কারণে এরা শত্রুর রাজধানী বা দুর্গে যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণি হচ্ছে ‘তাপসব্যঞ্জন’ এরা শাক বা তৃণমাত্র ভোজন করে নিজেদের নিরাহার তপস্বী প্রমাণ করে সাধু সন্তদের রাজার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করবেন। তাপসব্যঞ্জন ব্যক্তিদের ‘সামেধিক’ বলে প্রচার করবেন বৈদেহকব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন অর্থাৎ ছদ্মবেশী। সামেধিকগণ ভবিষ্যৎ সম্পদ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এরা মনস্তত্ত্ব, অঙ্গচিহ্ন, আগত ব্যক্তি রাজদেষী হলে বধ বন্ধনাদির সম্ভাবনার কথা বলবেন। এরপর গৃহদাহ চৌর্যবৃত্তি এসব সম্পন্ন করাবেন। এদের ভালো কাজও দেবেন রাজা।^{৫০} এ পররাত্ত্রীয়ক্ষেত্রে প্রধানত দুর্গসীমায় তাপসব্যঞ্জন গুপ্তচরদের বসবাস করিয়ে সেই রাত্ত্রির গুরুত্বপূর্ণ খবর তাপসব্যঞ্জন গুপ্তচরেরা সংগ্রহ করেন।

সংস্থ নামের গুপ্তচরেরা এক জায়গায় থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন। আর অন্য প্রকার গুপ্তচর সর্বত্র সঞ্চরণ করে রাজার প্রয়োজনীয় গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে তাই এদের নাম সঞ্চর।^{৫১} অষ্টাদশ তীর্থের (রাজকর্মচারী যুবরাজ দৌবারিক, পুরোহিত) উপর নজর রাখা, শত্রুরাজ্যে স্যাবোটাজ করা, মন্ত্রী সেনাপতি প্রজাদের মধ্যে ভেদসাধন করা এই সঞ্চর গুপ্তচরদের কাজ। এদের একাংশ পণ্ডিত এবং শাস্ত্রনিপুণ এদের পরিচয় ‘সত্ৰী’ রূপে। আশ্রমধর্ম, কামশাস্ত্র, গীতবাদ্যাদি, শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয়ে এরা দক্ষ।^{৫২} অপর প্রকার হলো ‘তীক্ষ্ণ’। শক্তিমান এরা হিংস্র পশুর মুখোমুখি হয়। স্বার্থ সাধনে তীক্ষ্ণতার কারণে এদের এই নাম।^{৫৩} একই কাজ করেন ‘রসদ’ নামের গুপ্তচর। ‘রস’ অর্থ বিষ বা প্রাণঘাতী কেমিক্যাল। মানুষকে বিষ দিয়ে মারতে এদের হাত কাঁপে না।^{৫৪} বিশেষ ধরনের কিছু স্ত্রী গুপ্তচর যারা ব্রাহ্মণের বিধবা, পরিব্রাজিকা এরা গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাজারদরবারে অভিজাত ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে যাতায়াত করতো। ‘সঞ্চর’ নামের গুপ্তচরেরা রাজার নির্দেশে দেশ, বেশ, ভাষা সবই পরিবর্তন করবেন। এরা একে অপরকে গোপন সাংকেতিক লিপির মাধ্যমে রাজার কাছে গুপ্ত খবর পৌঁছে দেবে।^{৫৫} গুপ্তচরেরা একে অপরকে চিনতে পারবেন না এটাই সাধারণ নিয়ম। তিনজন গুপ্তচর পরিবেশিত একই প্রকার সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য। বারংবার

গুপ্তচরেরা পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশন করলে রাজা তাদের গোপনে দণ্ড দেবেন বা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেন।^{৫৬} আর এক ধরনের গুপ্তচর হচ্ছেন ‘অপসর্প’। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বিজিগীষু রাজার কাছ থেকেও বেতন পায়, শত্রুর দেশে কাজ করার জন্য শত্রু রাজার কাছ থেকেও বেতন নেয়। তাই এরা ‘উভয়বেতন’ নামেও পরিচিত।

মনুসংহিতায় পাঁচ প্রকার চরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরা রাজা ও অমাত্যের মনোভাব জানতে সমর্থ হয়।^{৫৭} মহাভারতে অমাত্য, মিত্র, এমনকি পুত্রের মনোভাব জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।^{৫৮} প্রজাদের অভিমত জানার জন্যও গুপ্তচর সংগ্রহ প্রয়োজন।^{৫৯} কামন্দকীয় নীতিসারে তাই রাজাদের চক্ষু বলা হয়েছে চার অর্থাৎ গৃঢ়পুরুষদের।^{৬০} বিচার বিভাগ পরিচালনাতেও গুপ্তচরের^{৬১} সাহায্য ছিল অপরিহার্য, এটিই কৌটিল্যের অভিমত। রাজকর আদায়, জরিমানা করা এসব কাজ গুপ্তচরের মাধ্যমে করানো হতো। এই জনকোপসৃষ্টি করাতে গুপ্তচরেরাই। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কারা শত্রুরাজার ওপর ত্রুদ, ভীত, লোভী এবং মানী এদের খুঁজে বের করবে গুপ্তচরেরা। শত্রুরাষ্ট্রের ত্রুদ, ভীত লোভী ও মানী ব্যক্তিদের কাউকে লুন্ড, কাউকে ভীত ও সম্মানের আশ্বাস দিয়ে নিজ রাজার অনুকূলে নিয়ে আসবেন রাজার গুপ্তচরেরা। তারা বিজিগীষু রাজার হয়ে কাজ করছেন কিনা সেটাও লক্ষ্য করবেন গুপ্তচরেরা।^{৬২} কৌটিল্যের চরচক্র ছিল বিশাল এক জালের মতো। গুপ্তচরের অপাঙ্গ দৃষ্টি সর্বত্র নিষ্ফিণ্ড হতো। বিজিগীষু রাজা অর্থবতী ভূমিলাভেই তৃপ্ত হতেন না নিজ সমর্থক বৃদ্ধিতে ও তিনি ছিলেন সদা জাগরুক।

আধুনিক যুগে ও দেশের বিভিন্ন সংগঠন কাজের জন্য দূতপ্রেরণ ও গুপ্তচর নিয়োগের নিদর্শন মেলে। পবনদেব যেমন সর্বভূতে প্রবিষ্ট হয়ে বিচরণ করেন রাজাও তদ্রূপ দূত ও চারপুরুষের মাধ্যমে সর্বত্র প্রবিষ্ট হয়ে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করেন। মনুসংহিতায় মহর্ষি মনুও তাই বলেছেন:

“প্রবিশ্য সর্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যঃ ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্ ॥”^{৬৩}

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা অনেকগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত। এদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আদান প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিজের স্বার্থেই একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এই সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। সেই নীতিকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতি হলো কূটনীতি। কূটনীতির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সমার্থক নয়, কূটনীতি হলো পররাষ্ট্র নীতিকে কার্যকর করার মাধ্যম বা পদ্ধতি। আভিধানিক অর্থে কূটনীতি হলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে পরিচালিত করা। কূটনীতির আসল উদ্দেশ্য হলো নিজের রাষ্ট্রের স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে তোলা বৈদেশিক নীতিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সার্থক এবং কার্যকরী করে তোলা। সুদূর অতীত থেকে কূটনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও চর্চা চলে আসছে। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন কলা। প্রাচীনকালে গ্রিস, রোম, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রে কূটনৈতিক কলাকৌশলের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের মধ্যে দূত হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কৌটিল্যের পররাষ্ট্র নীতির রূপায়ণে কূটনীতির বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্য এই কূটনীতিকে নয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে নয়জ রাজা সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হতে পারেন। দূত, চর, গৃঢ়পুরুষ ও গুপ্তচর প্রভৃতি সূচী প্রয়োগে বিজিগীষু রাজা নিজ পররাষ্ট্রনীতিকে সার্থক করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নিজ রাজ্যের পরিধির বৃদ্ধিসাধন করতে পারেন। কূটনীতিকে উপায় চতুষ্টয়ের প্রয়োগ, রাজপ্রতিনিধি

রূপে দূতের কর্ম, মন্ত্রণা দ্বারা শত্রুজয় এবং গুপ্তচরাদি প্রয়োগের মাধ্যমে গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। পররাষ্ট্রনীতিতে দূতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দূত রাজার রাজমণ্ডলে অবস্থিত অন্যান্য শত্রুরাজাদের পরস্পর যোগসাজশ হয়েছে কিনা অথবা শত্রুরাজা তাঁর স্বামীর সঠিক আক্রমণের সময় ভেস্তে দিতে চাইছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দূতের অমাত্যোপম ক্ষমতাগুলো বর্ণনা করেছেন কৌটিল্য। প্রভুর সন্দেশ বহন করা ছাড়া, পূর্বকৃত সন্ধি নতুনভাবে সম্পন্ন করা, মিত্রসংগ্রহ করা, শত্রুরাজ্যে ভেদনীতি চালানো, শত্রুর বন্ধুরাষ্ট্রে ভেদব্যবস্থা করা, শত্রুর সেনা এবং গুপ্তচরদের বিতাড়িত করা এমনকি প্রয়োজনে সুযোগ বুঝে শত্রুরাজাকে মেরে ফেলার ব্যাপারটিও দূতকর্মের মধ্যে পড়ে বলে দূত রাজ্যশাসনে অপরিহার্য অঙ্গ।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ P.V. Kane, *History of Dharmashastra*, Vol. 1, (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930), P. 85.
- ^২ *Ibid*, P. 86.
- ^৩ এ বিষয়ে পি.ভি. কানে বলেছেন: "From Comparatively ancient times Canakya alias Kautilya or Visnugupta has been Credited with the composition of a work an Arthasasatra" *Ibid*, P. 87.
- ^৪ “একাকী মন্ত্রশক্ত্য যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুণায় মেদিনীম ॥
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্ভূতৈ নমস্তস্মৈ চন্দ্রগুণায় মেদিনীম ॥” কামন্দক, *কামন্দকীয় নীতিসার*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯), পৃ. ১।
- ^৫ কৌটিল্য, ‘কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্’, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ২য় খণ্ড, (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১), ১৫. ১. ১১, পৃ. ৬৪০।
- ^৬ *তদেব*, ১৫. ১. ১০. পৃ. ৬৭২।
- ^৭ *বিষ্ণুধর্মসূত্র*, চিল্লস্বামী শাস্ত্রী সম্পা. (বেনারস: জয়কৃষ্ণদাস হরিদাস গুপ্ত পাবলিকেশনস্, ১৯৩২) ৩. ৩৮, পৃ. ১০৫।
- ^৮ *মনু, মনুস্মৃতি*, গঙ্গানাথ বাঁ সম্পা. ২য় খণ্ড, (কলিকাতা: রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৯), ৭. ২২, পৃ. ৭।
- ^৯ “যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ডেষুতন্ত্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবা পক্ষ্যন্দুর্বলান্ বলবন্তরাঃ ॥” *তদেব*, ৭. ২০, পৃ. ৬।
- ^{১০} *তদেব*, ৭. ১৮, পৃ. ৬।
- ^{১১} “অলঙ্কলাভার্থা, লব্ধপরিরক্ষণী, রক্ষিতবিবর্ধনী, বৃদ্ধস্য তীর্থেষু প্রতিপাদনী চ, তস্যামায়ত্তা, লোকযাত্রা”। কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ১ম খণ্ড (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ) ১. ৪. ১, পৃ. ১৬।
- ^{১২} “তীক্ষ্ণদণ্ডো হি ভূতানামুদ্বেজনীয়ঃ। মৃদুদণ্ডঃ পরিভূয়তে। সুবিজ্ঞাতপ্রণীতো হি দণ্ডঃ প্রজা ধর্মার্থকামৈর্ঘোজয়তি।.... অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি।” *তদেব*, ১. ৪. ২, পৃ. ১৬-১৭।
- ^{১৩} P.V. Kane, *History of Dharmashastra*, Vol. 3, (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1946), P. 21.
- ^{১৪} কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *তদেব*, ১. ১৩, ২. পৃ. ৪৩।

- ১৫ বাল্মীকি, *রামায়ণ*ম্, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা. ১ম খণ্ড (কলিকাতা: নিউ লাইট প্রকাশনী, ১৯৯৬), ২. ৬৭. ৩১. পৃ. ৩৫৯।
- ১৬ ক) বেদব্যাস, *মহাভারত*ম্, পঞ্চনন তর্করত্ন সম্পা. ২য় খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্র, ১৮৩০ শকাব্দ) ১২. ১৫. ৩০. পৃ. ১৩৮৯।
খ) ‘দণ্ডাভাবে পরিধবংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ততে।’ কামন্দক, *কামন্দকীয় নীতিসার*, তদেব, ২. ৪০. পৃ. ৯।
- ১৭ P.V. Kane, *History of Dharmashastra*, Vol. 3, *Ibid.* P. 22.
- ১৮ মনু, *মনুস্মৃতি*, ১ম খণ্ড গঙ্গানাথ বাঁ সম্পা. তদেব, ৭. ২৫, পৃ. ৮।
- ১৯ ‘দণ্ডো দময়তামসি’। বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পা. (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স), ১০. ৩৮. পৃ. ২৫২।
- ২০ “দমো দণ্ড ইতি খ্যাতস্তাছ্যাদণ্ডো মহীপতিঃ”। কামন্দক, *কামন্দকীয় নীতিসার*, তদেব, ২. ১৫, পৃ. ৭।
- ২১ “অদ্যাং কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্বিস্তথা।
স্বাম্যং চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তরম্” ॥
মনু, *মনুস্মৃতি*, ২য় খণ্ড, তদেব, ৭. ২১, পৃ. ৬।
- ২২ “কদাচিৎ ত্বে অহনী ত্রীণি বা নোদিয়াৎ সূর্যঃ, সতি স্বাতন্ত্র্যে। দণ্ডাত্ত্ব বিভ্রান্তিক্রামতি মর্যাদাম্”। তদেব, মেধাতিথি-ভাষ্য ৭.২৩, পৃ. ৭।
- ২৩ “তং দেশকালৌ শক্তিং চ বিদ্যাং চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্থতঃ সংপ্রণয়েন্ন্যায়বর্তিসু ॥”
মনু, *মনুস্মৃতি*, মেধাতিথি-ভাষ্য, ২য় খণ্ড, তদেব, ৭. ১৬. পৃ. ৫।
- ২৪ P. V. Kane, *History of Dharmashastra*, Vol. 3. *Ibid.*, P. 131.
- ২৫ কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, তদেব, ১. ১৬. ১. পৃ. ৫৭।
- ২৬ “দূত এব হি সন্ধিতে ভিনত্যেব চ সংহতান্।
দূতন্তৎ কুরতে কর্ম ভিন্যস্তে যেন মানবাঃ” ॥ মনু, *মনুস্মৃতি*, গঙ্গানাথ বাঁ সম্পা. ২য় খণ্ড, তদেব, ৭. ৬৫-৬৬, পৃ. ২২।
- ২৭ ক) “অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবী আ সাদয়দিহ ॥” ঋগ্বেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন সম্পা. (কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬) ৮.৪৪. ৩. পৃ. ২৭৮।
খ) “অগ্নিং দূতং বৃগীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সূত্রতুম্ ॥” তদেব, ১. ১২. ১. পৃ. ৯২।
- ২৮ ক) “অমাত্যসম্পদোপেতো নিঃসৃষ্টার্থঃ। পাদগুণহীনঃ পরিমিতার্থঃ, অর্ধগুণহীনঃ শাসনহরঃ”। কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, তদেব, ১. ১৬. পৃ. ৫৭।
খ) “দূতাশ্চ যে প্রকটমেব রাজান্তরং প্রতি গতাগতমাচরন্তি, তে চ ত্রিবিধাঃ, নিঃসৃষ্টার্থাঃ সন্দিষ্টার্থাঃ শাসনহরাশ্চেতি। তত্র নিঃসৃষ্টার্থা রাজকার্যানি দেশকালোচিতানি স্বয়মেব কথয়িতুং ক্ষমাঃ। উক্তমাত্রং যে পরস্মৈ নিবেদয়ন্তি তে সন্দিষ্টার্থাঃ’। শাসন হরাস্ত রাজলেখহারিণঃ”। যাজ্ঞবল্ক্য, *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, (বোম্বে: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪৯), মিতাক্ষরাটীকা ১. ৩২৮, পৃ. ১১৩।
- ২৯ ক) “দূতশ্চৈব প্রকুবীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্। ইঙ্গিতাকারচেষ্টজং শুচিং দক্ষং কুলোদ্ভূতম্ ॥” মনু, *মনুস্মৃতি*, তদেব, ৭. ৬৩-৬৪, পৃ. ২১।
খ) “অনুরক্তঃ শুচিষ্কঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ। বপুশ্চান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজঃ প্রশস্যতে ॥”
- ৩০ “কচিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণপ্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ ॥” বাল্মীকি, *রামায়ণ*ম্, তদেব, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০. পৃ. ৩৫।
- ৩১ “অস্ত্রক্লমরীমদীর্ঘসূত্রং সানুক্ৰোশং শ্লগমহার্যমন্যৈঃ।
অরোগজাতীয়মুদারবাক্যং দূতং বদন্ত্যষ্টগুণোপপন্নম্ ॥” বেদব্যাস, *মহাভারত*ম্, তদেব, ৫. ৩৭. ২৭, পৃ. ৬৬৮।
- ৩২ “প্রকাশশ্চাপ্রকাশ চরন্তু দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।

- অপ্রকাশো'য়মুদ্বিষ্টঃ প্রকাশো দূত উচ্যতে ॥" কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, তদেব, ১৩, পৃ. ৩৩।
- ৩৩ Quoted from Harold Nicholson, *Diplomacy*. New York: Oxford University Press, 2nd, 1958)
- ৩৪ দ্রষ্টব্য: Encyclopaedia Britanica, the word 'Espionage'
- ৩৫ “প্রকৃতীনাঞ্চ শত্রুণাং সৈনিকানাং মতং চ যৎ।
সভ্যানাং বাস্তবানাং চ স্ত্রীণামন্তঃপুরে চ যৎ।
শৃণুয়াৎ গৃঢ়চায়েভ্যো নিশি চাত্যয়িকৈ সদা।
সাবধানমনাঃ সিদ্ধশস্ত্রাঃ সংলিখেন চ তৎ ॥” শুক্লাচার্য, শুক্লনীতিসার, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পা. (কলিকাতা: বঙ্গবাসী মুদ্রণালয়, ১৮০৭ শকাব্দ), ১. ৩৩৪-৩৫, পৃ. ৮০।
- ৩৬ “দূতেনৈব নরেন্দ্রস্ত কুবীরিবিবিকরিকর্ষণম্, রাজা চরৈর্জগৎ কৃৎস্নং ব্যাপুয়াল্লোকসম্মতৈঃ॥” কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, তদেব, ১৩. ২২-৩৩, পৃ. ৫৩-৫৪।
- ৩৭ “দূতমুখা বৈ রাজানন্তু চান্যে চ, তস্মাদুদ্বিষ্টেষু শস্ত্রেষু যথোক্তং বক্তারস্তেষামন্তাবসায়িনো'প্যবধ্যাঃ কিমঙ্গ পূর্নব্রাহ্মণঃ। পরস্যৈতদ্বাক্যমেব দূতধর্মঃ।” কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ১ম খণ্ড, তদেব, ১. ১৬. ১. পৃ. ৫৭।
- ৩৮ “অসংশয়ং শত্রুরয়ং প্রবৃদ্ধং কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যং প্রবদন্তি সন্তো দূতস্য দৃষ্টাঃ বহবো হি দণ্ডাঃ ॥
বৈরুপ্যমগ্বেষু কশাভিঘাতো মৌগ্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্ বধন্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতো ॥” বাল্মীকি, রামায়ণম্, ২য় খণ্ড, তদেব, ১৯৯৭, সুন্দরকাণ্ড, ৫২. ১৪-১৫ পৃ. ১৬৫।
- ৩৯ “প্রেষণং সন্ধিপালকৃতং প্রতাপো মিত্রসংগ্রহঃ।
উপজাপঃ সুহৃদেদো দণ্ডগৃঢ়াতিসারণম্ ॥
বন্ধুরত্নাপহরণং চারজ্ঞানং পরাক্রমঃ।
সমাধিমোক্ষো দূতস্য কর্ম যোগস্য চাশ্রয়ঃ ॥
স্বদূতৈঃ কারয়েদেতৎ পরদূতাংশ্চ রক্ষয়েৎ।
প্রতিদূতাপসর্পাভ্যাং দৃশ্যাদৃশৈশ্চ রক্ষিভিঃ ॥” কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ১ম খণ্ড, তদেব, ১. ১৬. ৪. পৃ. ৬১।
- ৪০ “চারস্ত্র অবিদিতকার্য আত্মনো'থ পরস্য চ।” বেদব্যাস, মহাভারতম্, তদেব, ১২. ১৫৯. ৪০. পৃ. ১৫৩০।
- ৪১ “পশ্যেচারাংস্ততো দূতান্ প্রেরয়েন্ন্যস্ত্রিসংগতঃ।” যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, তদেব, ১. ৩২৮. পৃ. ১১২।
- ৪২ “রাজ্যং প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে।” বেদব্যাস, মহাভারতম্, ১২. ৮৩. ৫১. পৃ. ১৪৬১।
- ৪৩ “দূতসম্প্রেষণৈঃব কার্যশেষং তথৈব চ।
অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥” মনু, মনুস্মৃতি, ১ম খণ্ড, তদেব, ৭. ১৫৩, পৃ. ৪৪।
- ৪৪ “পুরে জনপদে চৈব তথা সামন্তরাজসু।
বধো ন বিদ্যুরন্যোনাং প্রনিধেয়াস্তথা হিতে ॥” বেদব্যাস, মহাভারতম্, তদেব, ১২. ৬৯. ১০. পৃ. ১৪৪৫।
- ৪৫ “পাষাণস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রে প্রবেশয়েৎ” তদেব, ১২. ১৪০. ৪০, পৃ. ১৫১৪।
- ৪৬ “পূজিতাশ্চাৰ্থমানাভ্যাং রাজ্ঞা রাজোপজীবিনাম্।
জানীয়ুঃ শৌচমিত্যেতে পঞ্চ সংস্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥” কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ১ম খণ্ড, তদেব, ১. ১১. ৫. পৃ. ৩৬।
- ৪৭ তদেব, ১. ১১. ১. পৃ. ৩৫।
- ৪৮ “প্রব্রজ্যপ্রত্যবসিতঃ প্রজ্ঞাশৌচযুক্ত উদাস্থিতঃ। স বার্তাকর্মপ্রদিস্তায়াং ভূমৌ কর্ম কারয়েৎ। বৃত্তিকামাংশোপজপেৎ- এতেনৈব বেশেন রাজার্থশ্চরিতব্যো ভক্তবেতনকালে চোপস্থাতব্যমিতি।”, তদেব, ১.১১.২. পৃ. ৩৫।
- ৪৯ “কর্মকো বৃত্তিক্ষীণঃ প্রজ্ঞাশৌচযুক্তো গৃহপতিকব্যঞ্জনঃ”, তদেব, ১. ১১. ৩, পৃ. ৩৫।

- ৫০ “মুণ্ডো জটিলো বা বৃত্তিকামস্তাপসব্যঞ্জনঃ। সনগরাভ্যাশে”... তদেব, পৃ. ৩৫।
- ৫১ “চারঃ সঞ্চারণঃ সংস্থাঃ গূঢ়াশাণ্ডসংজ্ঞিতাঃ”, তদেব, ১. ২২. ৫. পৃ. ৪১।
- ৫২ “যে চাস্য সম্বন্ধিনো বশ্যাভর্তব্যস্তে লক্ষণমঙ্গবিদ্যাং জম্বকবিদ্যাং মায়াগতমাশ্রমধর্মং নিমিত্তমন্তরচক্রমিত্যধীয়ানাঃ সত্বিনঃ সংসর্গবিদ্যা বা।” তদেব, ১. ১২. ১. পৃ. ৩৭।
- ৫৩ “যে জনপদে শূরাত্যক্তাত্মানো হস্তিনং ব্যালং বা দ্রব্যাহেতোঃ প্রতিষোধয়েয়ুস্তে তীক্ষ্ণাঃ।” তদেব, ১. ১২. ১. পৃ. ৩৮।
- ৫৪ “যে বন্ধুযু নিঃস্নেহাঃ দ্রুশাচালসাশ্চ তে রসদাঃ।” তদেব, পৃ. ৩৮।
- ৫৫ “তং সত্বিনঃ সংস্থাসু অপ্যেয়ুঃ, সংস্থানামন্তেবাসিনঃ সংজ্ঞালিপিভিঃ চারসঞ্চারণং কুর্যুঃ।” তদেব, ১. ১২. ৩. পৃ. ৪০।
- ৫৬ “ত্রয়ানামেকবাক্যে সম্প্রত্যয়ঃ। তেষামভীষ্মবিনিপাতে তুষ্ণীংদণ্ডঃ প্রতিষেধো বা।” তদেব, ১. ১২. ৪. পৃ. ৪০।
- ৫৭ “কৃৎস্নগুণবিধং কর্ম পঞ্চবর্ণঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ ॥” মনু, মনুস্মৃতি, ২য় খণ্ড, তদেব, ৭.১৫৪, পৃ. ৪৪।
- ৫৮ “অমাত্যেযু চ সর্বেষু মিত্রেষু বিবিধেষু চ।
পুত্রেষু চ মহারাজ প্রতিদধ্যাৎ সমাহিতঃ ॥” বেদব্যাস, মহাভারতম্, ২য় খণ্ড, তদেব, ১২. ৬৯. ৯. পৃ. ১৪৪৫।
- ৫৯ “অতীত দিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ। গুণৈশ্চারৈরনুমতৈঃ পৃথিবীমনুসারয়েৎ ॥” তদেব, ১২. ৮৯. ১৫-১৬, পৃ. ১৪৬৬।
- ৬০ “চারচক্ষুরেন্দ্রঃ স্যাৎ” কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, ১৩. ৩১. পৃ. ৫৪।
- ৬১ “পূর্বোত্তরার্থব্যঘাতে সাক্ষিবক্তব্যকারণে।
চারহস্তাচ্চ নিম্পাতে প্রদেষ্টব্যঃ পরাজয়ঃ ॥” কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, ১ম খণ্ড, তদেব, ৩.১.১০, পৃ. ৩৬৩।
- ৬২ “তুষ্ণানর্থমানাভ্যাং পূজয়েৎ। অতুষ্ণান্ সামদানভেদদণ্ডৈঃ সাধয়েৎ।” তদেব, ১. ১৩. ৫. পৃ. ৪৫।
- ৬৩ মনু, মনুস্মৃতি, ২য় খণ্ড, তদেব, ৯. ৩০৬, পৃ. ৩২২।

জোশ মালিহাবাদীর কাব্যে বিপ্লবী চেতনা

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম*

Abstract: Shabbir Hasan Khan Josh was an illustrious and classical poet of Urdu. He was basically a romantic poet but later on turned to be a rebellious and naturalist though he was not the first but was the first rate naturalist poet and he is rightly called artist of nature. He believed in the Hindu Muslim unity and was against the creation of Pakistan. He voiced against the British rule and wrote a lot of poems in this respect as well as for the alleviation and emancipation and exploitation of the poor. He was conferred the third highest Civilian award PadamBhushan by the Indian Govt. in 1954 but he was compelled to leave his homeland at the bigotry behavior of some of the unscrupulous elements and domiciled in Pakistan in the later years of his age. This paper tends to highlight him as the rebellious poet.

জোশ মালিহাবাদী (১৮৯৮ খ্রী.-১৯৮২ খ্রী.) উর্দু সাহিত্যের একজন কিংবদন্তী বিপ্লবী কবি। তিনি তাঁর অগ্নিবরা কবিতার মাধ্যমে ইংরেজদের জুলুম, নির্যাতন, উৎপীড়ন, শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যকে বিপ্লবী চেতনায় শাণিত করে আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আওয়াজকে পাক ভারত উর্দু ভাষাভাষীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। দুর্নীতিগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, কলুষিত ও ঘুনে ধরা সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে সাম্য-মৈত্রীর শোষণমুক্ত একটি প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন জনতার হৃদয়ে জাগ্রত করেন। এজন্য তিনি ‘বিপ্লবী কবি’ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কৃষক, শ্রমিক, গরীব ও মেহনতী মানুষের অধিকার ও মুক্তি তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি ছিলেন একদিকে বিপ্লবের পতাকাবাহী অন্যদিকে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁর কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসাধারণ, চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাওয়া যায়। এজন্য তাঁকে প্রকৃতির কবিও বলা হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মানবতা। ১৯৫৪ সালে তাঁকে ভারতে ‘পদ্মভূষণ’ ও পাকিস্তানে মৃত্যু পরবর্তী ২০১৩ সালে হিলাল (JL) অর্থাৎ “নবচাঁদ” সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জোশ মালিহাবাদী ১৮৯৮ সালের ৫ ডিসেম্বর ভারতের মালিহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।^১ তাঁর আসল নাম শাব্বির হাসান খান। জোশ তাঁর কাব্য নাম।^২ তিনি আফগান আফরিদী পাখতুন বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁর পিতা বশীর আহমদ খান ও দাদা নওয়াব মুহাম্মদ খান উভয়েই কাব্য গ্রন্থধারী বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর পরদাদা ফকীর মুহাম্মদ খানও ফার্সী ভাষার খ্যাতনামা কবি ছিলেন।^৩ জোশ লঙ্কোঁর সাহসী, সামরিক বাহিনী সম্পৃক্ত, রাজনীতি সচেতন, সুপ্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সাহিত্যপ্রেমী ঘরানার মানুষ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই জোশের কাব্যের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। মাত্র ৯ বছর বয়স থেকেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন।^৪ নিজ গৃহে গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে সিতাপুর স্কুল ও লঙ্কোঁর মিশন হাই স্কুল হতে শিক্ষা লাভ করেন। কিছুদিন আগ্রার সেন্ট পিটার কলেজে আরবী ও ফার্সী বিষয়ে লেখাপড়া করেন কিন্তু ডিগ্রী লাভে সক্ষম হননি।^৫ কেননা ১৯১৬ সালে পিতার মৃত্যুতে তাঁর লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।^৬

* প্রফেসর, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জোশ স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কলহের কারণে তিনি নিজ গৃহ ছেড়ে রুজির অন্বেষণে হায়দ্রাবাদ গমন করেন। সেখানে ১৯২৪ সালে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে “দারুত-তাসনীফ ওয়াত তরজমায়” (গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ প্রতিষ্ঠানে) সাহিত্য বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১০ বছর সাহিত্য সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকেন। সেখানে তিনি আল্লামা এবাদী, আল্লামা তবাতবায়ী, মির্যা হাদী রুসওয়া প্রমুখ মহান সাহিত্যমোদী জ্ঞানী গুণী ও শিক্ষাবিদেব সাহচর্য লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর কাব্য প্রতিভা অধিকতর শাণিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন-

"میری یہ بڑی نمک حرامی ہوگی کہ اگر میں اس امر کا اعتراف نہ کروں کہ شعبۂ دارالترجمہ کی وابستگی نے مجھ کو بے حد علمی فائدہ پہنچایا اور خصوصیت کے ساتھ علامہ عبادی، علامہ طباطبائی اور مرزا محمد ہادی رسوا کے فیضانِ محبت نے مجھ بے سود کو میرے جہل پر مطلع کر کے مجھ کو فوقِ مطالعہ پر مامور کیا۔"

“এটা আমার বড়ই অকৃতজ্ঞতা হবে যদি আমি এ বিষয়টি স্বীকার না করি যে, দারুত তরজমা বিভাগে যুক্ত হওয়ায় আমার যথেষ্ট জ্ঞানগত উপকার হয়েছে। বিশেষভাবে আল্লামা এবাদী, আল্লামা তবাতবায়ী এবং মির্যা হাদী রুসওয়ার সাহচর্য আমার মত উৎসাহহীন ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য করে।”

এ সময় জোশের কাব্য প্রতিভা অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। প্রেম, প্রকৃতি, যৌবন, তারুণ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা সম্বলিত এবং ইংরেজ বিরোধী অগ্নিবরা জাগরণী অধিকাংশ কবিতা এ সময় রচনা করেন। ১৯৩৬ সালে একটি কবিতা লেখাকে কেন্দ্র করে “দারুত-তাসনীফ ওয়াত তরজমা” প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর মতাবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। পরে দিল্লী থেকে “কালীম” নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে গান ও সংলাপ লেখালেখির কাজও করেন।^৮ উত্তর প্রদেশে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে চাকরির প্রস্তাব করা হলে তিনি তা নাকচ করে দেন।^৯ ভারত বিভক্তির পর তিনি সরকারী চাকরি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের “আজকাল” পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে উর্দু ভাষার প্রতি কিছু চরমপন্থী মানুষের অবহেলা, বিদ্বেষ ও নেতিবাচক পদক্ষেপে তিনি ভীষণ মনোকষ্ট পান এবং পাকিস্তানের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের আগ্রহ ও আমন্ত্রণে তিনি ১৯৫৭ সালে ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তান গমন করেন।^{১০} সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় “মজলিসে তরক্কিয়ে উর্দু” (উর্দু উন্নতি বোর্ড) এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলামও লিখতেন যা علم و فکر শিরোনামে প্রকাশিত হতো। তাঁর প্রথম কলাম ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।^{১১} বাবায় উর্দু মৌলভী আবদুল হকের একজন সহযোগী তাঁকে উর্দুর অভিধান তৈরীর দায়িত্ব অর্পণ করলে তিনি উর্দুর অভিধান তৈরীসহ উর্দুর উন্নতি ও বিকাশে অসামান্য অবদান রাখেন। “উর্দু উন্নতি বোর্ড” এর তরফ থেকে তাঁকে মর্যাদাকর বেতন প্রদান করা হলেও জোশ সেটাকে তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে কম মনে করতেন। এক সময় “উর্দু উন্নতি বোর্ড” এর অভ্যন্তরীণ কলহের জের ধরে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উর্দু সাহিত্যের এ স্বনামধন্য বিপ্লবী কবি ১৯৮২ সালে ২২ ফেব্রুয়ারী ইসলামাবাদে মৃত্যুবরণ করেন।^{১২}

জোশের কাব্যে বিপ্লবী চেতনা

জোশ মালিহাবাদী উর্দু সাহিত্যের একজন কিংবদন্তী মহানায়ক। উর্দু সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে কাব্য রচনা করলেও তিনি ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী কবিতা রচনার কারণে বেশি পরিচিতি লাভ করেন এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। অগ্নিবরা, উদ্দীপক, উত্তেজনাধর, বিদ্রোহমূলক বিপ্লবী কবিতা রচনার কারণে তাঁকে ১৯৩৮ সালে বিদ্রোহী কবির উপাধি দেয়া হয়।^{১৩} তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে শুধু উর্দু সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তা নয় বরং তাঁর জীবনমুখী তেজস্বী স্বাধীনতার চেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মের বদৌলতে ভারতীয় জনগণের মধ্যে পরাধীনতার জিজির থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। সাহিত্য জগতে তিনি

کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب
میرا نعرہ ، انقلاب و انقلاب و انقلاب⁵⁸

ইনকিলাব বা বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ একটি পুরাতন শাসন পদ্ধতি ভেঙ্গে নতুন একটি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। জোশের কাব্যে বিদ্রোহের চেতনা থাকলেও তাতে ন্যায় ও আদর্শ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নতুন কোন সমাজ ব্যবস্থার ধারণা ছিল না। মূলত তিনি শত বছরের জুলুম, নির্যাতন শাসন ও শোষণের কারণে মানুষের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। ইংরেজদের নিপীড়ন বিরোধী ক্ষোভ ও জিঘাংসা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কোটি কোটি স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন; তাদের আবেগ-

موت کی آواز ہوتی ہے میری آواز میں ۲۲

চিৎকার দিয়ে ওঠে মৃত্যু আমারই শব্দে

شعلہ و شبنم کے آتش کدہ کی بیشتر نظمیں بغاوت کے جذبے سے سرشار ہونے کے ساتھ ساتھ آزادی کی تڑپ سے بھرپور ہیں۔ جوش کے خیال میں انقلاب ایک جاوداں کردار اور کردار بذاتِ خود جوش ہیں۔^{۵۹}

ہاں بغاوت، آگ، بجلی موت آندهی میرا نام

میرے گرد و پیش، اجل، میری جلو میں قتل عام^{۲۸}

এবং মৃত্যু ও তুফান আমার নাম।

ঘুরে বেড়ায় মৃত্যু আমার আশে পাশে

গণহত্যার লিঙ্গা আছে আমার ধাতে ।

ائے جواں مردو! یہ ذلت کس لئے سہتے ہو تم

مرد ہو کر ٹھوکروں کی زد پہ کیوں سہتے ہو تم ۲۵

হে যুবকরা! কেন এ অপমান সহ্য করো তোমরা?

পুরুষ হয়ে কেন লাথির আঘাত সহ্য করো তোমরা?

ائے جواں مردو! خدارا باندھ لو سر سے کفن

سربرہنہ پھر رہی ہے عزت قوم و وطنؔ

হে যুবকরা! আল্লাহর ওয়াস্তে মাথায় বাঁধো কাফন
দেশ ও জাতির ইজ্জত নাস্তা শিরে ফিরছে যখন

কোন পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় জাগ্রত করার জন্য তার অতীত স্বাধীনতার ইতিহাস ও তার সুফল সম্পর্কে অবহিত করা জরুরী। এজন্য জোশ ভারতবাসিকে টিপু সুলতানসহ তাঁর পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের জেগে ওঠার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দেন। ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলনের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তাতে তিনি ঘি ঢেলে আন্দোলনের দাবানল চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতি হন। اثار انقلاب کبیتا তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভারতের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে মামলা, হামলা, জেল, জুলুমের শিকার মুক্তিকামী মানুষদের প্রতি জোশ সহমর্মী ছিলেন। বিশেষকরে নির্যাতিত নিপীড়িত কয়েদীদের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি কয়েদীদের জেলখানার অভ্যন্তরেও আন্দোলন চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। তাদের উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বার্তা ও সান্তনা দিয়ে বলেন যে, জনগণ তাদেরকে জেল থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করবে। “شکست زندان کا خواب” কবিতায় তিনি অত্যাচারী শাসক ও নিপীড়ক শোষকদের হুঁশিয়ার করে বলেন- অদূর ভবিষ্যতে ভারতের পরাধীন ও অত্যাচারিত জনগণ দাসত্বের শিকল ভেঙ্গে স্বাধীনতার পাতাকা উড্ডয়ন করবে।

کیا بند کا زندان کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں
اکٹانے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں
دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی
سینونیمیں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریںؔ

হিন্দুস্তানের কারাগার কি প্রতম্পিত
প্রতিধ্বনি ওঠছে তাকবীরের ?
শ্রান্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেছে কিছু কয়েদী সম্ভবত
ভেঙ্গে ফেলছে তারা সব শিকল
কিছু কয়েদীরা হয়েছে জমা এসে দেয়ালের পাদদেশে
চোখে বাকঝকে তলোয়ার আর বিদ্যুৎ তরঙ্গ তাদের বুকে

জোশ মালিহাবাদীর পূর্বে উর্দু সাহিত্যে এমন বিপ্লবী ধারা কেউ আনয়ন করেননি। আল্লাম ইকবাল নির্যাতিত নিপীড়িত আত্ম মানবতার কল্যাণে কাব্য রচনা করেন এবং অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে মুসলমানদের পুনরায় জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চালান। কৃষক, শ্রমিক, গরীব ও মেহনতি জনতাকে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। বিপ্লবকে গান্ধীর্যপূর্ণ ও দার্শনিক ভঙ্গিমায় পেশ করে মানুষের মানসিক বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে সরাসরি বিপ্লবের আহ্বান ছিল না। জোশ মালিহাবাদী উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি যিনি উর্দু সাহিত্যে বিপ্লবী ধারা ও সংগ্রামী চেতনা সংযোজন এবং বিপ্লবী সুর ও আওয়াজকে আরো ব্যাপক ও তীব্রতর করেন। আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং পুঁজিবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আওয়াজকে ভারতবাসীর দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে তাদের উত্তেজিত ও খেপিয়ে তোলার প্রয়াস পান। তাঁর এই বিপ্লবী মনোভাব ও চেতনার কারণে ১৯৩৮ সালে কলকাতার “হিন্দ” নামক পত্রিকায় তাঁকে ‘বিপ্লবী কবি’ হিসেবে ভূষিত করা হয়। এরপর থেকে তিনি উর্দু সাহিত্যে বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তাঁর বিপ্লবী চেতনার প্রতিধ্বনি করে বলেন-

خیر اب سوداگرو! اب ہے تو اس بات میں
 وقت کے فرمان کے آگے جھکا دو گردنیں
 کل্যাণ এখন ایتہی نہیت ہہ بنییار دل
 সময়ের ছকুমের سامنے করো আত্মসমর্পন
 اب کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی
 جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہاری خون کی
 সময় এখন लिखवे काहिनी नतून प्रबन्धेर
 मार शिरोनाम लेखाते प्रयोजन शुधु तोमार खने

যুদ্ধের ময়দানে তোমার এখনো ঘুম আসছে
সাবধান হও খোদার তরে, দেখো শত্রুর তলোয়ারী চমকিছে

জোশ ছিলেন প্রগতিশীল চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি ছিলেন উর্দু প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রধান। অন্যান্য কবি সাহিত্যিক ও লেখকদেরকে তিনি উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিতেন এবং তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে জনতাকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানাতেন। কাজেম আলী খান তাঁর জোশ শেনাসী গ্রন্থে লিখেন-

انہوں نے تمام شعراء کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا کہ انہیں اپنے کلام سے عوام کو بیدار کرنا چاہئے^{۳۷}

“তিনি সকল কবিদেরকে তাঁদের দায়িত্বানুভূতি স্বরণ করে দিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক কবির তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে জনতাকে জাগিয়ে তোলা উচিত”

তাঁর আহ্বানে অনেক প্রগতিশীল ও বিপ্লবী মানসিকতা সম্পন্ন লেখক সাড়া দেন। তাঁরা জোশের বিপ্লবী চেতনা সুর ও আওয়াজে প্রভাবিত হন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লেখনীকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মানুষ, মানবতা, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োগ করে। জোশ তাঁর বিপ্লবী চেতনা ও আওয়াজকে তলোয়ারের সাথে তুলনা করে বলেন-

اٹھو، چونکو، بڑھو، منہ ہاتھ دھو، آنکھوں کو مل ڈالو

ہوائے انقلاب آنے کو ہے ہندوستان والو^{۳۸}

ওঠো, সাবধান হও সামনে বাড়ো

চোখ মেলে দেখো ধুয়ে হাত মুখ

হে হিন্দুস্তানবাসী, দেখো

বিপ্লবের বাড় প্রবাহের তরে হয়ে আছে উন্মুখ

خواب کو جذبہ بیدار دیئے دیتا

ہوں

قوم کے ہاتھ میں تلوار دیئے دیتا

ہوں^{۳۹}

স্বপ্নকে আমি দেই জেগে ওঠার উদ্দীপনা

জাতির হাতে তুলে দেই আমি নাসা তলোয়ার

জোশের সংগ্রামী ও বিপ্লবী চেতনায় ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত কৃষক, শ্রমিক, মজদুর, মেহনতি মানুষ ও ছাত্র জনতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁর পূর্বে অনেকেই জনগণকে বিপ্লবী ও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাতে সফল হননি বা জনপ্রিয়তা পাননি। জোশ তাঁর কাব্যকে হ্যামেলিয়নের বাঁশি বানিয়ে এবং দ্বীপ্ত স্বরে সেই বাঁশি বাজিয়ে জনতাকে স্বাধীনতার কক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর জ্বালাময়ী বাঁশির সুরে গোলামীর জিজিরে আবদ্ধ মুক্তিকামী মজলুম জনতা গগণ বিদারী হুংকার তুলে ময়দানে নেমে আসে। আস্তে আস্তে ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমরভূমি।

জোশ দুর্নীতিগ্রস্ত জরাজীর্ণ কলুষিত ও ঘুনে ধরা সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য কখনো নেতিবাচক কিংবা ধ্বংসাত্মক ছিল না বরং তিনি সে সময়ে অরাজকতাময় সমাজব্যবস্থা ও কাঠামোকে পরিবর্তন করে সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও প্রগতিশীল এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চাইতেন, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকলেই তাদের নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করবে। ইংরেজ আধিপত্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদভিত্তিক

جنگ کی صورت میں گو ہنگامہ کرنی ہوں شروع
امن کی صبحیں میرے خنجرے سے ہوتی ہیں طلوع
یুদ্ধের অবয়বে যদিও আমি হাস্যমা সৃষ্টি করি
শান্তির উষা খঞ্জরের আঘাতে আমিই উদিত করি

سلطان کی سمت پھر بڑھتی ہوں بل کھاتی ہوئی
قید اور قانون کو ذلت سے ٹھکراتی ہوئی ۷۹

جوش کے یہاں آزادی کا جذبہ ہے افکار حریت ہیں ، بغاوت کی لہریں ہیں جو عوام کو آزادی کے لئے اکساتی ہیں۔ آزادی کی تحریک میں جن شیدائے وطن کا نام لیا جا تاہے ان میں جوش کے ان عملی اقدام کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی شبیر حسن خاں جوش نہ صرف اردو ادب بلکہ جنگ آزادی کے اہم ترین رکن ہیں اور رہینگے۔

“জোশের কাব্যে আছে স্বাধীনতার জয়বা, আছে স্বাধীনতার চেতনা, আছে বিদ্রোহের উদ্দামতা, যা জনতাকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বেলিত করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল দেশ প্রেমিকের নাম স্বরণ করা হয় তাঁদের

মধ্যে বাস্তববাদী ভূমিকার কারণে ঐতিহাসিক ভাবে জোশের নাম অন্যতম। জোশ শুধু উর্দু সাহিত্য নয় বরং স্বাধীনতা যুদ্ধেরও একজন অন্যতম সিংহ পুরুষ ছিলেন।”

তথ্যনির্দেশ

- ১ ড. আকিল আহমদ, জোশ কী শায়েরী কা তানকীদি জায়েযা (নয়া দিল্লী: মডার্ন পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩) পৃষ্ঠা-১৩।
মুহলেকা ইজায়, নুরুশে আদব (লক্ষ্ণৌ: খুরশীদ বুক ডিপো, ১৯৯৮) পৃষ্ঠা-১৪১।
- ২ আবু বকর রেজবী, এমকান (দিল্লী: এদারায়ে ফিকর ও জাদীদ, ১৯৯৯) পৃষ্ঠা-৯৮।
- ৩ ড.লতিফ আহমেদ, “জোশ কা আহাঙ্গে শায়েরী” (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ উর্দু, ভলিয়াম-১, ২০০৮) পৃষ্ঠা- ১৬০।
- ৪ <https://www.punjnud.com/Articlesdetail.aspx?ArticleID=8065&ArticleTitle= Josh% 20 Malihabadi%20Hayat%20o%20Khidmaat>
- ৫ মুহলেকা ইজায়, নুরুশে আদব, পৃষ্ঠা-১৪১।
- ৬ <https://www.punjnud.com/Articlesdetail.aspx?ArticleID=8065&ArticleTitle= Josh% 20 Malihabadi%20Hayat%20o%20Khidmaat>
- ৭ জোশ মালিহাবাদী, ইয়াদৌ কী বরাত (স্মরণিত) (লক্ষ্ণৌ: আয়েনায়ে আদব, তারিখ বিহীন) পৃষ্ঠা-১৭৫।
- ৮ <https://aalmiakhbar.com/archives/29794>
- ৯ জোশ মালিহাবাদী, ইয়াদৌ কী বরাত (স্মরণিত) পৃষ্ঠা-১৭৩।
- ১০ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০) পৃষ্ঠা-৫১৩;
<https://www.express.pk/story/329755/>
- ১১ <https://aalmiakhbar.com/archives/29794>
- ১২ ড. আকিল আহমদ, জোশ কী শায়েরী কা তানকীদি জায়েযা, পৃষ্ঠা-১৩।
- ১৩ <https://www.punjnud.com/Articlesdetail.aspx?ArticleID=8065&ArticleTitle= Josh % 20 Mali habadi%2 0Hayat%20o%20Khidmaat>
- ১৪ জোশ মালিহাবাদী, শোঁলা ও শবনম, (লাহোর: মাকতুবায়ে উর্দু, জুন-১৯৪৩ খ্রি:) পৃষ্ঠা-৮।
- ১৫ তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬।
- ১৬ তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮।
- ১৭ <https://aalmiakhbar.com/archives/29794>
- ১৮ শোঁলা ও শবনম, পৃষ্ঠা-৪২।
- ১৯ তদেব, পৃষ্ঠা-৪১।
- ২০ তদেব।
- ২১ তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯।
- ২২ তদেব।
- ২৩ <http://www.urdulinks.com/urj/?p=2609>
- ২৪ শোঁলা ও শবনম, পৃষ্ঠা-৩৯

২৫ তদেব, পৃষ্ঠা-৪২

২৬ তদেব।

২৭ ড. ইসমত মালিহাবাদী সংকলিত, *এন্তেখাবে জোশ* (লঙ্কো: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১০৯৭ খ্রি:) পৃষ্ঠা-৪৩

২৮ <http://www.urdulinks.com/urj/?p=2609>

২৯ তদেব,

৩০ তদেব,

৩১ শো'লা ও শবনম, পৃষ্ঠা-১০

৩২ তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭

৩৩ কাজেম আলী খান সম্পাদিত *জোশ শানাসী* (লঙ্কো: শিয়া কলেজ, ১৯৭৬) পৃষ্ঠা-১০১

৩৪ শো'লা ও শবনম, পৃষ্ঠা-১৯

৩৫ তদেব, পৃষ্ঠা-৭

৩৬ তদেব, পৃষ্ঠা-৪০

৩৭ তদেব, পৃষ্ঠা-৪১

৩৮ <http://www.urdulinks.com/urj/?p=2609>

উর্দু গদ্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল*

Abstract: Urdu Prose literature is one of the branches of Urdu literature. In ancient times it was based entirely on love, poetic consciousness and fiction. But now Urdu Prose literature has emerged as a mouthpiece for solving the problems of human life and society instead of poetry and fiction. Proof of which is the simple expression of today's ultra-modern ideology. However, this qualification was not achieved in one day. For this, Urdu prose has had to go through several steps. For example, ancient Urdu prose was fictional, rigid, and moral in its religious connotations. But with the establishment of Fort William College [1800 AD], the development of Urdu prose began. Then a sepoy revolt [1857 AD] took place in India. This revolt led to a renaissance in the subcontinent. Due to this renaissance, Urdu prose literature was greatly influenced. At this time, a group of young writers led by Sir Syed Ahmed Khan liberated Urdu prose literature from ancient ideas and presented it as a mouthpiece of life and society in simple language and modern ideology. This research explores the steps of this movement and nature of Urdu prose literature.

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ভাষার সাহিত্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। আর তা হলো-পদ্যের পরে গদ্যের আবির্ভাব। উর্দু সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কবি আমির খসরু'র (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) মাধ্যমে উর্দু পদ্যের সূচনা হয়। আর চতুর্দশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয় উর্দু গদ্যের প্রাথমিক নমুনা। প্রাথমিক যুগের উর্দু গদ্য প্রেম-প্রীতি, কাঠিন্যতা এবং রূপকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এযুগে ধর্মীয় ভাবধারায় শিক্ষামূলক কিছু পুস্তিকাও পরিলক্ষিত হয়। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন এবং 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রি.) উর্দু গদ্যের জন্য এক যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা, এযুগেই উর্দু গদ্য পরিপক্বতা লাভ করে এবং ভাষা হিসেবে 'উর্দু' উপমহাদেশের একমাত্র সরকারী ভাষার (১৮৩৭ খ্রি.) স্বীকৃতি পায়। অতঃপর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে নবচেতনার উন্মেষ ঘটায়। ফলে উপমহাদেশে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। উর্দু গদ্যসাহিত্যেও এই আধুনিকতার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ফলে উর্দু গদ্য সকল প্রকার কাঠিন্যতা ও কল্পকাহিনির বেড়াছিন্ন করে মানবজীবন ও বাস্তব সমাজের সমস্যা সমাধানের মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উর্দু গদ্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি মোটামুটি কয়েকটি ধাপে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান গ্রহণযোগ্য মানে উপনীত হয়েছে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত উর্দু গদ্যসাহিত্যকে কয়েকটি যুগের মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যেমন:

- ১ম যুগ : প্রাচীন বা দক্ষিণ ভারতীয় যুগ (১৩৪৭ থেকে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- ২য় যুগ : উত্তর ভারতীয় যুগ (১৭৩১ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- ৩য় যুগ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ (১৮০০ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- ৪র্থ যুগ : কলেজের বাইরের যুগ (১৮৩১ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।

* সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫ম যুগ : আধুনিক বা স্বর্ণযুগ (১৮৫৭ থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত)।^১

নিম্নে উল্লিখিত যুগভিত্তিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

প্রথম যুগ: প্রাচীন বা দক্ষিণ ভারতীয় যুগ (১৩৪৭ থেকে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উর্দু ভাষার জন্ম হয় উত্তর ভারতে (দিল্লী)। আর উর্দু গদ্যসাহিত্যের চর্চা শুরু হয় সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে (লক্ষ্ণৌ)। কেননা, যে সময় উত্তর ভারতের সাধারণ জনগণের ভাষা ছিল উর্দু, সে সময় সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ছিল ফারসি। তাই ফারসি ভাষার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অত্যধিক। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতের শাসকগোষ্ঠী ও ধর্মপ্রচারকগণ ফারসি ভাষার চেয়ে উর্দু ভাষার চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বেশি। উপরন্তু ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক [১২৩৫-১৩৫১ খ্রি.] দিল্লীর পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতকে হিন্দুস্থানের রাজধানী ঘোষণা করলে উত্তর ভারতের সাধারণ জনগণের পাশাপাশি কবি-সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, সূফী-দরবেশ সরকারি কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন। ফলে উত্তর ভারতে সৃষ্ট উর্দু ভাষাটি দক্ষিণ ভারতের শাসকগোষ্ঠীর [১৩৫০-১৬৮৭ খ্রি.] প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও সূফী-দরবেশদের প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে সাহিত্য জগতে স্থান করে নিতে থাকে। ফলে উর্দু গদ্যসাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতেই চিহ্নিত হয়।^২

প্রাথমিক অবস্থায় দক্ষিণ ভারতে উর্দু গদ্যের যে চিহ্নসমূহ পরিলক্ষিত হয়, তা মূলত সূফীতত্ত্ববিষয়ক উপদেশাবলী মাত্র। কেননা, সেখানকার তৎকালীন সূফী-দরবেশগণ তাঁদের দৈনন্দিন কথাবার্তা, শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মীয় প্রচারণার কাজে উর্দু ভাষা ব্যবহার করতেন, তাই সে সমস্ত সূফী-দরবেশদের মাধ্যমে ভারতের প্রত্যেকটি অঞ্চলে এ ভাষার দ্রুত প্রসার ঘটে থাকে। এছাড়া তাঁরা এ ভাষায় ধর্মীয় মৌলিক নীতিমালাসহ ইসলামী বীরত্বাঙ্গক কাহিনি ও সূফীতত্ত্বের ওপর বিভিন্ন শিক্ষামূলক পুস্তিকা রচনা শুরু করেন। মূলত এসব কারণে উর্দু গদ্যের প্রাথমিক নমুনা এসমস্ত সূফীদের লেখায় সর্বপ্রথম ধরা পড়ে।^৩ তৎকালীন সূফীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে খাজা আশরাফ জাহাঙ্গীর সমনানী সূফীবাদের ওপর একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ পুস্তিকাকে উর্দু গদ্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নমুনা মনে করা হয়।^৪ তবে এ সময় উর্দু গদ্যের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক নমুনা পাওয়া যায় ‘বহ্মনী যুগ’ [১৩৫০-১৫২৫ খ্রি.]-এর সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ হোসাইনী খাজা বান্দা নোয়াজ গেসু দরায় [১৩২০-১৪২২ খ্রি.]-এর রচনায়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার ওপর লিখিত *মে'রাজুল আ'শেক্বীন* [১৪১৫ খ্রি.], *তেলাওয়াতুল অজুদ*, *দারুল আসরার*, *শিকার নামা*, *তাছলীম নামা*, *হাসত্-এ মাসায়েল*সহ তাঁর বেশক'টি পুস্তিকা রয়েছে।^৫ এছাড়া সমসাময়িককালে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর *নিশাতুল ইশক* গ্রন্থের অনুবাদসহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন বিশিষ্ট সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ হোসাইনী।^৬ আবার বীজাপুরের প্রসিদ্ধ সূফী শাহ মীরাজী শামসুল উশশাকও [১৪৯৭-১৫৬২ খ্রি.] ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি *জলতরঙ্গ*, *গুলবাস*, *শরহে মরগুবুল কুলুব* প্রভৃতি সূফীতত্ত্বমূলক গদ্য রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলোর মধ্যে *শরহে মরগুবুল কুলুব* দশটি অধ্যায়ের এমন একটি গ্রন্থ, যার প্রতিটি অধ্যায় কোরআনের আয়াত বা হাদিস দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে সেগুলোর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।^৭ শাহ সূফী মীরাজী'র পুত্র শাহ বোরহানুদ্দীন জানমও [১৫৪৩-১৫৯১ খ্রি.] সে যুগের একজন বিখ্যাত সূফী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার ওপর *মুয়াল্লেফাত ও কালেমাতুল হাক্বায়েক* নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।^৮ আবার শাহ বোরহানুদ্দীন জানমের সুযোগ্য পুত্র সৈয়দ শাহ আমিনউদ্দীন আলা [১৫৮২-১৬৭৫ খ্রি.] ‘আদিলশাহী যুগ’-এর [১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.] একজন বিশিষ্ট সূফী ছিলেন। তিনিও তাঁর পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করে ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি সূফীতত্ত্বের ওপর কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যে গ্রন্থগুলোর মধ্যে *গুফতার-এ শাহ-এ আমীন*, *গঞ্জ-এ মুখাফফা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^৯ এছাড়া সৈয়দ

শাহ আমীনউদ্দীন আলার বহু শিষ্য ছিলেন। যাঁদের মাধ্যমে তাঁর দাদা শাহ মীরাঁ জীর সিলসিলা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ মীরান হোসাইনী ছিলেন অন্যতম। তিনিও বেশকিছু ধর্মীয় ও সৃষ্টিতত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যে গ্রন্থগুলোর মধ্যে *শরহ-এ তামহীদ-এ হামদানী* [১৬৫৭ খ্রি.]-এর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, সাহিত্যবিচারে প্রাচীন উর্দু গদ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে মোল্লা ওয়াজহীর *সব রস* [১৬৩৫ খ্রি.]-এর পরই এ গ্রন্থের অবস্থান।^{১০}

বলা বাহুল্য যে, উপর্যুক্ত উর্দু গ্রন্থগুলো ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ও প্রচারণামূলক এবং প্রাথমিক যুগের হওয়ার কারণে এতে সাহিত্যিক মূল্যমান কম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে, উর্দু গদ্যের আদি নমুনা হিসেবে এ গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রাচীন উর্দু গদ্যের সবচেয়ে সফল প্রয়াস হলো ‘কুতুবশাহী যুগ’-এর [১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.] বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক মোল্লা ওয়াজহীর [১৫৫০-১৬৮১ খ্রি.] *সব রস* (سب رس) [১৬৩৫ খ্রি.] গ্রন্থ। ইহা মূলত ফারসি ভাষার কবি মুহাম্মদ ইয়াহ ইয়া ইবনে শেবাক ফাত্তাহী’র গদ্য কাহিনি *হুসন ওয়া দিল* এবং মছনবী *দস্তুর-এ উশশাকু* থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এ গ্রন্থকে উর্দু ভাষার প্রথম সফল ও স্বার্থক গদ্যসাহিত্য মনে করা হয়।^{১১} মোল্লা ওয়াজহী নিজেও তাঁর এই রচনাকে হিন্দুস্তানের প্রথম হিন্দি (উর্দু) গদ্য বলে গর্ববোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন,

آج لگن کوئی اس جہاں میں ہندوستان میں ہندی زبان سوں اس لطافت اس
چہنداں سوں نظم ہور نثر ملاکر کلاکر نیں بولیا۔^{১২}

সব রস মূলত একটি রূপক কাহিনিনির্ভর সাহিত্য। যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাব্যিক ছন্দ ও অলংকারপূর্ণ শব্দ ও বাংকারে মুখরিত। এর কাহিনি প্রেম, সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। গ্রন্থটিকে দক্ষিণ ভারতের উর্দু গদ্যসাহিত্যের অমর কীর্তি মনে করা হয়। কেননা, পরবর্তী সময়েও সেখানে গ্রন্থের ন্যায় দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি।^{১৩} এ প্রসঙ্গে মৌলভি আব্দুল হক এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “সাহিত্যিক মর্যাদার দিক থেকে প্রাচীন উর্দু সাহিত্যে এ গ্রন্থ সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। কাহিনি এবং বর্ণনা স্টাইল দুটোই আশ্চর্যজনক।”^{১৪}

এযুগে হায়দারাবাদেও সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর কিছু প্রাচীন গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলোর মধ্যে মোলানা আব্দুল্লাহ’র *আহকামুচ্ছালাত*, মীরান জী হাসান খোদাবন্দ খোদানুমা’র *অজুদীয়া*, *শরহ-এ তামহীদাত-এ আইনুল কুজাত*, *শরহ-এ মারগুবুল কুলুব*, হযরত শাহ মীরান ইয়াকুব-এর *শামায়েলুল অনকিয়া ওয়া দালায়েলুল অতকিয়া* [১৬৬৮ খ্রি.] গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইউসুফ খানের *কুচ্ছা-এ মহর-এ আফরোজ ওয়া দিলবর* [১৭২১ খ্রি.] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{১৫} মূলত এখানেই উর্দু গদ্যের প্রাচীন যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর শুরু হয় উর্দু গদ্যসাহিত্যের দ্বিতীয় বা উত্তর ভারতীয় যুগ।

দ্বিতীয় যুগ: উত্তর ভারতীয় যুগ (১৭৩১ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব [১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.] কর্তৃক দক্ষিণ ভারতে বিজয় অর্জিত হলে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের সামনে উভয় অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়টি পুরোপুরি উন্মোচন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উত্তর ভারতের কবি-সাহিত্যিকগণ সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা দক্ষিণ ভারতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কেননা, ঐসময় উত্তর ভারতে ফারসি ভাষা ছাড়া কেউ স্বদেশীয় ভাষায় (উর্দু) সাহিত্যচর্চা করতো না। আর যদিও সেখানে দু’একটি উর্দুর নমুনা পরিলক্ষিত হতো, সে গুলোও শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের জন্য চুটকী মাত্র। পক্ষান্তরে, দীর্ঘদিন থেকে দক্ষিণ ভারতের কবি-সাহিত্যিকগণ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে

উর্দু ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচনা করে আসছেন। এমন পরিস্থিতিতে উত্তর ভারতের কবি-সাহিত্যিকগণ দক্ষিণ ভারতের উর্দু সাহিত্য দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হন। তাঁরা দক্ষিণ ভারতের কবি-সাহিত্যিকদের মনে-প্রাণে অনুসরণ করতে থাকেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের গয়লের ন্যায় গয়ল লেখা আরম্ভ করেন। এভাবেই ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ ভারতে সৃষ্ট উর্দু সাহিত্য উত্তর ভারতেও নিজের স্থান মজবুত করে নিতে থাকে এবং একসময় মীর [১৭২২-১৮১০ খ্রি.], সওদা [১৭১২-১৭৮১ খ্রি.], দরদ [১৭২১-১৭৮৫ খ্রি.], মাছহাফী [১৭৪৮-১৮২৪ খ্রি.], যওক [১৭৮৯-১৮৫৪ খ্রি.], গালিব [১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.] প্রমুখের ন্যায় বিশ্বনন্দিত কবি উর্দু সাহিত্যকে উপহার দেয়।^{১৬}

বলা বাহুল্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় উত্তর ভারতের সাহিত্যিকগণও কাব্যচর্চার প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে গদ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এখানে প্রাথমিক অবস্থায় গদ্যসাহিত্যের যে নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তা ছিল মূলত দক্ষিণ ভারতের ন্যায় ক্লেচ্ছা-কাহিনি, ধর্মীয় ভাবধারা এবং ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত কিছু গ্রন্থ। উত্তর ভারতে গদ্যসাহিত্যের চর্চা শুরু হয় দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিক মোল্লা ওয়াজহীর *সব রস* [১৬৩৫ খ্রি.] রচনার প্রায় একশত বছর পর। এখানকার প্রথম গদ্য নিদর্শন হলো *দহ মজলিস* (ده مجلس) [১৭৩৫ খ্রি.]। গ্রন্থটি মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে [১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.] মোলানা ফজলী ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি মোল্লা হোসাইন ওয়ায়েজ কাশেফীর *রওজাতুশ শুহাদা* গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেন। ধর্মীয় ভাবধারায় লিখিত এ গ্রন্থে সাহিত্যিক কোনো নিদর্শন না থাকলেও উত্তর ভারতের প্রথম উর্দু গদ্যের নমুনা বিচারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।^{১৭} এছাড়াও সাওদার (১৭১২-১৭৮১ খ্রি.) *কুল্লিয়াতের ভূমিকা ও মছনবী শুলা-এ ইশকু-এর সারাংশ*, হযরত শাহ আব্দুল কাদের সাহেবের [১৭৫৭-১৮২০ খ্রি.] *তরজমাতুল কোরআন* [১৭৯৫ খ্রি.] সৈয়দ হায়দার বখশ হায়দারীর *মহর চান্দ নও আইন হিন্দি* [১৭৯৪ খ্রি.] ও *ক্লেচ্ছা-এ মহর ওয়া মাহ* [১৭৯৯ খ্রি.] প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।^{১৮} তবে উত্তর ভারতের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গদ্য হলো মীর মুহাম্মদ আতা হোসাইন খান তাহসীনের *নও তরয-এ মুরাচ্ছা* (১৭৮৯ খ্রি.)। গ্রন্থটি তিনি বিখ্যাত কবি আমির খসরুর [১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.] ফারসি ভাষায় লিখিত *ক্লেচ্ছা-এ চাহার দরবেশ* থেকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। ধর্মীয় উপদেশ এবং কাহিনিনির্ভর এ গ্রন্থ উত্তর ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।^{১৯} তবে গ্রন্থটি উত্তর ভারতের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উর্দু গ্রন্থ হলেও এরদ্বারা উর্দু গদ্য তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি। কেননা, গ্রন্থটির রচনারীতি অত্যন্ত দূরাবস্থা ও জটিল। এছাড়া অত্যন্ত আলংকারিক ও দুর্বোধ্য আরবি-ফারসি শব্দে সমাদৃত। ফলে সহজে কেউ এ গ্রন্থের ভাষা বুঝে উঠতে পারে না। তথাপি উত্তর ভারতে উর্দু গদ্যের প্রতিপত্তিতে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এখানেই উর্দু গদ্যের উত্তর ভারতীয় তথা দ্বিতীয় যুগের সমাপ্তি ঘটে। এরপর উর্দু গদ্যসাহিত্য ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছত্রছায়ায় একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে পরিণতি লাভ করে।

তৃতীয় যুগ: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ (১৮০০ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা, তাঁদের আগমনের ফলেই মূলত ভারতবর্ষে নব চেতনার দ্বার উন্মোচন হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ঘটে। অতঃপর ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” নামক ইংরেজদের একটি বাণিজ্যিক দল ভারতীয়দের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেন।^{২০} পরবর্তীকালে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সামরিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে উক্ত কোম্পানী কলিকাতায় ‘ফোর্ট উইলিয়াম’ নামে একটি দুর্গ স্থাপন করে। কিন্তু স্বদেশি ভাষা না জানার কারণে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনসহ ইংরেজদের ব্যবসা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এবং ভারতবর্ষ শাসন করার সুপ্ত পরিকল্পনা বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। তাই তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী [১৭৬০-

১৮৪২ খ্রি.] ইংল্যান্ড থেকে আগত ইংরেজদেরকে স্বদেশি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদেরকে শাসনকার্য পরিচালনা করার যোগ্য করে তোলা, বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং হিন্দুস্থানে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় “ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ” [১৮০০ খ্রি.] প্রতিষ্ঠা করেন।^{২১} তবে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীত হলেও পরোক্ষভাবে এরদ্বারা উর্দু গদ্যসাহিত্য যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। কেননা, এ কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে উর্দু গদ্যের যে নমুনা বিদ্যমান ছিল, তার কোনো সুসুজ্ঞল ধারা ছিল না। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে উর্দু ভাষা ও গদ্য একটা সুনির্দিষ্ট ধারা লাভ করে। সত্যকথা বলতে, উর্দু গদ্যের বর্তমান রূপরেখা এ কলেজেরই অবদান। এছাড়া এ কলেজের বদৌলতেই ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার স্থানে ‘উর্দু’ রাষ্ট্রীয় ভাষার [১৮৩৭ খ্রি.] মর্যাদা লাভ করে।^{২২} এ বিষয়ে ২০ নভেম্বর, ১৮৩৭ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি ফরমান জারি করেন, ফরমানটি ছিল নিম্নরূপ:

1. It is hereby enacted, that from the first Day of December 1837, it shall be lawful for the Governor-General of India in Council, by an Order in Council, to dispense, either generally, or within such local limits as may to him seem meet, with any provision of any Regulation of the Bengal Code which enjoins the use of the Persian language in any Judicial proceeding, or in any proceeding relating to the Revenue and, to prescribe the language and character to be used in such proceedings.

11. And it is hereby enacted, that from the said day it will be lawful for the said Governor-General for India in Council, by an Order in Council, to delegate all or any of the powers given to him by this Act, to any Subordinate Authority. under such restrictions as may to the said Governor-General of India in Council seem meet.

(Act No. XXIX of 1837 Passed by the Hon'ble the President of the Council of India in Council, on the 20th November 1837)^{২৩}

এই কলেজের প্রচেষ্টায় উর্দু ভাষা থেকে আরবি-ফারসি ভাষার কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ বাদ দিয়ে সহজ-সরল উর্দু শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়। শুধু তাই নয়, কল্পকাহিনি ও ছন্দময় কাব্যকলার পরিবর্তে দর্শন, ইতিহাস, আত্মজীবনী, অভিধান, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সহজ-সরল ও সর্বজনবোধ্য উর্দু ভাষায় গদ্য গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। আর এই গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম এই কলেজেই উর্দু ছাপাখানাও স্থাপন করা হয়। ফলে উর্দু গদ্য একটা সুস্পষ্ট ধারা লাভ করে।^{২৪}

কলেজটির হিন্দুস্তানি ভাষা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট প্রাচ্য ও ভারততত্ত্ববিদ জন বোর্খউইক গীলক্রীস্ট [১৭৫৯-১৮৪১ খ্রি.]। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, উর্দুসহ প্রাচ্যের বেশকিছু ভাষার ওপর তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইংরেজ অফিসারদের স্বদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি নিজেই ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের ওপর উর্দু ভাষায় ১৬টি বই রচনা করেন। গ্রন্থগুলোর মধ্যে আংরেজী হিন্দুস্তানী লুগাত [১৭৯৮ খ্রি.] (এটি উর্দু-ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান), হিন্দুস্তানী ইলমুল লিসান [১৭৯৬ খ্রি.], উর্দু কী হরফ ওয়া নাহ [১৭৯৬ খ্রি.], মাশরিকী যবান দাঁ [১৭৯৮ খ্রি.], উর্দু যবান পর মুখাতহর মুকদ্দমা [১৮০০ খ্রি.], আজনবীয়ে কে লিয়ে রাহনুমায়-এ উর্দু [১৮০২ খ্রি.], মাশরিকী ক্বিচ্ছে [১৮০৩ খ্রি.] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।^{২৫} এছাড়া তাঁর উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে এ কাজে দেশি-বিদেশি বেশকিছু প্রাচ্য ভাষা পণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিদেশি প্রাচ্য ভাষা পণ্ডিতদের মধ্যে লুগাত-এ জাহাজ রানী [১৮১১ খ্রি.] ও তরজুমান হিন্দুস্তানী [১৮২৪ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক ক্যাপ্টেন টমাস রোবাক, হিন্দুস্তানী আংরেজি ডিকশনারী [১৮০৮ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক ক্যাপ্টেন টেলর, হিন্দুস্তানী গ্রামার [১৮১৩ খ্রি.] ও মুস্তাখাবাত-এ হিন্দি [১৮১৮ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক জন শেক্সপিয়ার,

মুকাদ্দামা-এ যবান-এ হিন্দুস্তানী [১৮২৭ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক উইলিয়াম টেট, খোদ আমুয ফাওয়ায়েদ-এ যবান-এ হিন্দুস্তানী গ্রন্থের লেখক এস ডব্লিউ বার্টিন এবং ডাক্তার হান্টার ও গার্সন ডিতাসী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{২৬} আর দেশি পণ্ডিতদের লিখিত গ্রন্থের মধ্যে ইনশাআল্লাহ খান ইনশার [১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.] দরীয়া-এ লত্‌ফৎ [১৮০২ খ্রি.], আমানতউল্লাহ খানের হরফ-এ উর্দু [১৮১০ খ্রি.], মুহাম্মদ হোসাইন আযাদের জামেউল কাওয়ায়েদ [১৮৪৫ খ্রি.], মুনশি করিমুদ্দীনের কাওয়ায়েদুল মুবতাদা [১৮৪৯ খ্রি.], মৌলভি ইমাম বখশ সাহাবায়ীর হেদায়েকুল বালাগাত [১৮৪৯ খ্রি.]—এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত দেশি-বিদেশি পণ্ডিতগণ এ সমস্ত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছেন।^{২৭}

এ ছাড়া উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজে একটি অনুবাদ শাখা খোলা হয়। যে শাখায় বিভিন্ন ভাষার উপদেশ ও কাহিনিমূলক গ্রন্থসমূহ সহজ-সরল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হতো। আর এ কাজের জন্য উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হিন্দু-মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সমস্ত দেশীয় লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী লেখক হলেন বাগ ওয়া বাহার [১৮০২ খ্রি.] ও গঞ্জ-এ খুবী [১৮০২ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক মীর আম্মান দেহলভী [১৭৩২-১৮০৩ খ্রি.]। বাগ ওয়া বাহার আজও উর্দু গদ্যসাহিত্যের মহা মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।^{২৮} গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর উর্দু গদ্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা লাভ করে। তিনি গ্রন্থটি বিখ্যাত কবি আমির খসরুর ফারসি গ্রন্থ ক্বেচ্ছা-এ চাহার দরবেশ থেকে অনুবাদ করেন। তবে মৌলভি আব্দুল হকের মতে, গ্রন্থটি ক্বেচ্ছা-এ চাহার দরবেশ থেকে নয়, বরং ক্বেচ্ছা-এ চাহার দরবেশ-এর প্রথম অনুবাদক মীর আতা হোসাইন তাহসীনের নও তরয-এ মুরাচ্ছা থেকে সহজ-সরল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। লেখনী স্টাইল, বর্ণনাভঙ্গি ও গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ভাষার সহজ-সরলতার দিক থেকে ঐ যুগে এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না, যা বাগ ও বাহারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।^{২৯} এ গ্রন্থ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যথার্থই বলেছেন:

جو مرتبه مير تقی میر کو نظم میں حاصل ہے وہی میر امن کو نثر میں ہے۔^{৩০}

মীর আম্মান দেহলভী ছাড়া কলেজের অনুবাদ শাখায় সংযুক্ত থেকে আরও যে সমস্ত লেখক অনুবাদের মাধ্যমে উর্দু গদ্যসাহিত্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে তোতা কাহিনি [১৮০১ খ্রি.], আরায়েশ-এ মাহফিল [১৮০১ খ্রি.], ক্বেচ্ছা-এ লায়লা মজনু [১৮০৪ খ্রি.], গুলশান-এ হিন্দ [১৮০৪ খ্রি.], গুলদস্তা-এ হায়দরী [১৮০৭ খ্রি.], তারীখ-এ নাদেরী [১৮১৪ খ্রি.], গুলজার-এ দাশেশ [১৮১৪ খ্রি.], গুল-এ মাগফিরাত [১৮২২ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক হায়দার বখশ হায়দারী [১৭৬৮-১৮২২ খ্রি.]; বাগ-এ উর্দু [১৮০২ খ্রি.], আরায়েশ-এ মাহফিল [১৮০৫ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক মীর শের আলী আফসোস [১৭৩৫-১৮২২ খ্রি.]; আখলাখ-এ হিন্দ [১৮০১ খ্রি.], নছরে বে-নজীর [১৮০২ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক মীর বাহাদুর আলী হোসাইনী; শকুন্তলা [১৮০১ খ্রি.], বারামাসা [১৮০২ খ্রি.], তারীখ-এ ফেরেশতা [১৮০৯ খ্রি.], তাফসীরুল কোরআন [অসমাপ্ত-১৮০৪ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক মির্জা কায়েম আলী জোয়ান; তরজমাতুল কারীমা [১৮০২ খ্রি.], ক্বেচ্ছা-এ মাধুনাল ওয়া কামকুণ্ডলা [১৮০২ খ্রি.], আতালীকে হিন্দ [১৮০৩ খ্রি.], বৈতাল পচিসি [১৮০৩ খ্রি.], হাফতে গুলশান [১৮০৬ খ্রি.], তারীখ-এ শের শাহী [১৮২০ খ্রি.], জাহাঙ্গীর নামাহ গ্রন্থের লেখক মাজহার আলী খান; মাজহার-এ ইশক [১৮০২ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক নেহাল চান্দ লাহোরী; হেদায়েতুল ইসলাম [১৮০৪ খ্রি.], জামেউল আখলাক [১৮০৫ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক মৌলভি আমানতুল্লাহ; খিরদ-এ আফরোজ [১৮০২ খ্রি.], প্রেম সাগর [১৮০৩ খ্রি.], রাজনীতি [১৮০৯ খ্রি.], সিংহাসন বতিসী [১৮০৪ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক শ্রী লাল্লুলালজী; মারেকা-এ ইনসান ওয়া হাইওয়ান [১৮১০ খ্রি.] গ্রন্থের লেখক মৌলভি একরাম আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মির্জা জান তাপস, খলিল আলী খান, মুনশি বীন নারায়ণ জাহাঁ, মীর আব্দুল্লাহ মিসকীন, মির্জা মুহাম্মদ ফিতরাত, সৈয়দ হামিদুদ্দীন বিহারী, হাফিজউদ্দীন আহমদ, মৌলভি

একরাম আলী, ইফতেখার উদ্দিন গুহরত, আব্দুল করীম খান দেহলভী, মির্যা হাশেম আলী, মির্যা কাশেম আলী মমতাজ, সৈয়দ মনসুর আলী, মীর মঈনুদ্দীন ফায়েয, শেখ আমানতুল্লাহ শায়দ, কুনদান আলী, তোতারাম, শেখ হাফীজউদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ বখশ, বাসেত খান বাসেত, হাজী মির্যা মুগল নাশাঁ, মীর আবুল কাশেম, মুহাম্মদ আলী, নূর খান, মির্যা বেগ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ কলেজের অনুবাদ শাখায় কাজ করে উর্দু গদ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছেন।^{৩৬}

এ সমস্ত লেখকদের গ্রন্থসমূহ আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ব্রজ প্রভৃতি ভাষা থেকে অনূদিত হলেও উর্দু গদ্যের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ গুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এ গ্রন্থগুলোর মাধ্যমেই মূলত বিশ্বসাহিত্যের সাথে উর্দু গদ্যের পরিচয় ঘটে এবং আধুনিক গদ্যের বিভিন্ন শাখার সূত্রপাত হয়। এ সমস্ত অনূদিত গদ্যের দ্বারা ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, ধর্মসহ বিভিন্ন কাহিনি, উপদেশ, বিজ্ঞান, দর্শন, তাজকিরা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। মোটামুটি এ পর্যায়ে এসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর আমরা কলেজের বাইরে উর্দু গদ্যের কর্মযজ্ঞ লক্ষ্য করি। যাকে উর্দু গদ্যের চতুর্থ যুগ বা কলেজের বাইরের যুগ মনে করা হয়।

চতুর্থ যুগ: কলেজের বাইরের যুগ (১৮৩১ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে উর্দু গদ্যচর্চার যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তা খুব দ্রুতই উর্দু সাহিত্যের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত লক্ষ্মী ও দিল্লী স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এ কাজে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন লক্ষ্মীর সাহিত্যিকগণ। তবে তাঁরা কলেজের সাথে পাল্লা দিয়ে গদ্যচর্চা আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তাঁরা পুরাতন অভ্যাস দুর্বোধ্য আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার ছাড়তে পারেননি। তথাপি তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করে উর্দু গদ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছেন। সে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শায়খ ইলাহী বখশের *কুচ্ছা-এ তালওয়া দমান* [১৮০২ খ্রি.], সৈয়দ ইনশাউল্লাহ খানের *রানী কেতকী* [১৮০৩ খ্রি.], মুহাম্মদ বখশ মাহযুবের *ইনশা-এ গুলশানে নও বিহার* [১৮০৫ খ্রি.], *ইনশা-এ নও রতন* [১৮১৪ খ্রি.], হাকীকত বেরলভীর *হশত-এ গুলজার* [১৮১০-১৮১১ খ্রি.], তারনী চিরণ মিতরার *হেকায়েত-এ নসীহত-এ আমুজ* [১৮১৯ খ্রি.], রজব আলী বেগ সুরুরের *ফাসানা-এ আজায়েব* [১৮২৪ খ্রি.], *ফাসানা-এ ইবরত*, *ইনশা-এ সুরুর*, *গুলজার-এ সুরুর*, *শেণ্ডফা-এ মহব্বত* [১৮৫৬ খ্রি.]; সালেহ মুহাম্মদ ওসমানীর *সায়রে ইশরত* [১৮২৫ খ্রি.], সৈয়দ গোলাম আলী আযাদের *বিল্লী নামা* [১৮৩৪ খ্রি.], গোলাম আজম আফজালের *নিগারিস্তান-এ ইশক* [১৮৩৬ খ্রি.], নীম চান্দ খেতরীর *গুল-এ সানোবার* [১৮৩৭ খ্রি.], আলিম আলী ভাগুলপুরীর *যিদাতুল খেয়াল* [১৮৪০ খ্রি.], ফরখন্দ আলী রিজভীর *কুচ্ছা-এ বহরামপুর* [১৮৪৫ খ্রি.], আসী লক্ষ্মীভীর *কুচ্ছা-এ আগর ওয়া গুল* [১৮৪৬ খ্রি.], মকবুল আহমদের *কুচ্ছা-এ হিরু রাজা* [১৮৪৮ খ্রি.], নওয়াব আমজাদ আলীর *আফসানা-এ রঙ্গীন* [১৮৪৯ খ্রি.], বেলায়েত আলীর *গুলশান-এ দানেশ* [১৮৫১ খ্রি.], বদরুদ্দীন আমানের *বুস্তানে খেয়াল*, *দাস্তানে আমির হামজা* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{৩৭}

স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে লক্ষ্মীর উপর্যুক্ত লেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন রজব আলী বেগ সুরুর [১৭৮৭-১৮৬৭ খ্রি.]। *ফাসানা-এ আজায়েব* তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গ্রন্থটিতে সৌন্দর্য ও প্রেমের কাহিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সে সময় এ গ্রন্থ সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরবি-ফারসি ভাষার দুর্বোধ্য শব্দের বহুল উপস্থিতি থাকায় গ্রন্থটিতে অনেক ক্ষেত্রে শিল্প সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি এই স্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গদ্য শিল্পী।^{৩৮} কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে, তাঁর প্রভাব তাঁর সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, সে সময় হৃন্দময় অলংকৃত গদ্যের যুগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আবার রোমান্সধর্মী

স্বপ্নময় জীবনের ভিত্তি ভূমিও কেঁপে ওঠেছিল। তাই গদ্যের চাহিদা যুগোপযোগী বাস্তবজীবনের রূপকার ও ভাষ্য হওয়া। যুগের এ প্রয়োজনকে মিটানোর জন্য আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন দিল্লীর বিখ্যাত কবি মির্যা আসাদুল্লাহ খান গালিব [১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.]। তাঁরই স্নেহস্পর্শী হাত ধরে আধুনিক উর্দু গদ্য সাহিত্যের আগমন ঘটে।^{৬৪}

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্যদের নিকট যে সব চিঠি-পত্র এবং চুটকী লিখেছেন, সে গুলোই মূলত আধুনিক উর্দু গদ্যের অনন্য দলীল হিসেবে পরিগণিত। বলা হয় যে, তাঁর এ সব পত্রের মাধ্যমেই আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফারসি ভাষায় চিঠি-পত্র লিখেছেন। অতঃপর উর্দু ভাষায় চিঠি লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর চিঠির সংকলন হলো *অওদ-এ হিন্দ* [১৮৬৮ খ্রি.], *উর্দু-এ মুয়াল্লা* [১৮৬৯ খ্রি.] এবং *মাকাতীব-এ গালিব*।^{৬৫} তাঁর কাব্যে কঠিন ও অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার থাকলেও গদ্যের ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁর এ সব চিঠি পড়লে মনে হয় যেন এগুলো চিঠি নয়, এক একটা আত্মজীবনী। তাঁর লেখার স্টাইল দেখে মনে হয় যেন পত্র-প্রাপকের সামনে বসে তিনি কথাবার্তা বলছেন। তাই ভাব প্রকাশের মধ্যে শব্দের কোনো আড়ম্বর বা ভাষার কোনো জটিলতা নেই।^{৬৬} যদিও তিনি উর্দু গদ্যের স্রষ্টা নন এবং তাঁর পূর্বে উর্দু গদ্য বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। তথাপি তাঁর চিঠির মাধ্যমে যে গদ্যের সূচনা হয়েছিল, তাতে মনে হয় তাঁর মাধ্যমে উর্দু গদ্যের পরিণত রূপ জন্মাভ করেছিল।^{৬৭} তাঁর পত্রের ভাষা বর্তমান যুগের ভাষার মতোই বাহুল্যবর্জিত ও জীবন-রসের আঁধার হিসেবে পরিগণিত। তাঁর বাক্যের সংক্ষিপ্ততা, শক্তিমত্তা ও অর্থবহতা আধুনিক যুগের যে কোনো কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারকে অবাক ও বিস্মিত করে দেয়। এ বিস্ময় গালিবের অসাধারণ শিল্পী-সত্তারই স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি। যদিও তাঁর চিঠিগুলো ছিল মূলত বন্ধুকে বন্ধুর স্মরণমাত্র। কিন্তু সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই, যা সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়নি। অতীত সুখের স্মৃতির রোমন্থন, বর্তমানের বিজনতা, একাকিত্বের বেদনা, পরিবেশের প্রভাবে মনে প্রতিক্রিয়া, পরিহাস, সংলাপ, কৌতুক ও অনুভূতির গভীরতম রূপায়ন সবই রয়েছে। উর্দু গদ্যসাহিত্যের পরবর্তী সকল শাখাই গালিবের এ চিঠি-পত্র দ্বারা সজীব ও প্রাণবন্ত হয়েছিল। প্রবন্ধ লেখক তাঁর থেকে নিয়েছেন চিন্তার উপকরণ, ঐতিহাসিক অতীতের স্বপ্নরূপ, কথাসাহিত্যিক বর্ণনা ও সংলাপের রীতি এবং মাধুর্য। গালিব যেন উর্দু সাহিত্যের এমন এক ক্লাসিক সত্তা, যাঁর মধ্যে শুধু হোমার নয়, গোটাই গ্রিসই বিদ্যমান।^{৬৮}

মির্যা গালিব ছাড়াও দিল্লীর আরও বেশকিছু লেখক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দেখাদেখি গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁরা কলেজের ন্যায় সহজ-সরলতা ধারণ করতে সক্ষম হননি। আবার মির্যা গালিব গদ্যসাহিত্যে যে নতুন ধারা ও চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটান, তাও তাঁদের লেখনীতে ফুটে ওঠেনি। তথাপি আমরা তাঁদের রচনাবলীকে উর্দু গদ্যের উন্নতিতে সহায়ক হিসেবে গণ্য করতে পারি। সে সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে মৌলভি হাফেজ আহম্মদের *সিরাজুল ঈমান* [১৮০১ খ্রি.], মৌলভি মুহাম্মদ সফা'র *যাদ-এ আখেরাত* [১৮০২ খ্রি.], মৌলভি মুহাম্মদ হায়াতের *সিরাজুল হায়াত* [১৮০৬ খ্রি.], মৌলভি খলীল আলী আশকের *ওয়াকেরাত-এ আকবরী* [১৮০৮ খ্রি.], মৌলভি আব্দুল কাদেরের *গুলশান-এ দ্বীন* [১৮১২ খ্রি.], মুহাম্মদ খালেদ আকবরী'র *মাখযানুল কাওয়ায়েদ* [১৮১৩ খ্রি.] প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{৬৯} এ ছাড়া সে সময় উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে দিল্লী কলেজের [১৮২৭ খ্রি.] তত্ত্বাবধানে 'লিটেরারী সোসাইটি' [১৮৪২ খ্রি.] প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সমিতিতে মাস্টার রামচন্দ্র [১৮২১-১৮৮০ খ্রি.], ইমাম বখশ ছাহাবায়া'সহ [১৭৮৯-১৮৫৯ খ্রি.] যুগের খ্যাতমান পণ্ডিতগণ গ্রন্থ রচনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যাঁদের তত্ত্বাবধানে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা, সংকলন এবং বিভিন্ন ভাষার বহু গ্রন্থ সহজ-সরল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ ছাড়া সমিতির তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের জন্য সিলেবাসভুক্ত গ্রন্থসমূহও রচনা হতে থাকে। ফলে উর্দু গদ্যসাহিত্য কাঠিন্যতা থেকে বের হয়ে আসে এবং দিন দিন তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।^{৭০}

এপর্যায়ের ধর্মীয় ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রেও উর্দু গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িককালে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়ে আসলে উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (র.) [১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.]-সহ অন্যান্য ধর্মীয় মনীষীগণ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষকরে শহীদ ব্রেলভী (র.) মুসলিম সমাজের সামনে ইসলামি সভ্যতার তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য ‘ওয়াহাবী আন্দোলন’ গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষায় বেশকিছু পুস্তক রচনা করেন। পরবর্তীতে এসব পুস্তক সহজ-সরল উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়। সে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে *তাসবীহুল গাফেলীন*, *হেদায়াতুল মুমেনীন*, *নছীহাতুল মুমেনীন*, *মওযেহুল কাবায়ের ওয়াল বিদআত* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অন্যান্য মনীষীগণও সহজ-সরল উর্দু ভাষায় চরিত্র সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতামূলক অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শাহ ওলীউল্লাহ’র [১৭০২-১৭৬৩ খ্রি.] *হুজ্জাতুল বুলাগা*, *আনা সিরাতুল খোলাফা*; শাহ আব্দুল আযীযের [মৃত্যু ১৮১৯ খ্রি.] *তাকসীর-এ আযীযী*; শাহ রফী উদ্দিনের [১৭৫৩-১৮২৩ খ্রি.] *তরজমাতুল কোরআন*; শাহ আব্দুল কাদেরের [১৭৫৭-১৮২০ খ্রি.] *তরজমাতুল কোরআন* [১৭৯৫ খ্রি.], *মওযেহুল কোরআন*; মৌলানা আব্দুল্লাহ’র *তাসবীহুল গাফেলীন* [১৮৩০ খ্রি.] মৌলভি মুহাম্মদ ইসমাইল দেহলভী’র *রিসালা-এ তাওহীদ*, *সিরাতুল মুস্তাকীম* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষভাবে এসব গ্রন্থের মৌল আবেদন ধর্মীয় হলেও পরোক্ষভাবে উর্দু ধর্মীয় গদ্যের বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।^{৪১} বলা বাহুল্য যে, ধর্মীয় ভাবধারায় উর্দু গদ্য রচনার এই দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান যুগের ধর্মীয় ভাবধারার লেখকগণের মধ্যে শিবলী নো’মানী, সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মৌলানা আবুল কালাম আযাদ, মৌলানা আশরাফ আলী খানভী, আব্দুস সালাম নদভী, খাজা হাসান নিজামী, মৌলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, এহতেশামুল হক খানভী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{৪২} খ্রিস্টান ধর্মীয় ভাবধারা প্রকাশেও উর্দু গদ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, খ্রিস্টান পাদরীগণ ধর্মীয় কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের জন্য সংবাদপত্রে ধর্মীয় কাহিনি, সংগীতসহ বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়াবলীর ওপর ফিচার লিখতো। তাঁদের এ সমস্ত গ্রন্থ ও ফিচারসমূহ ভারতের অন্যান্য ভাষার তুলনায় উর্দু ভাষায় বেশি প্রকাশিত হত। কেননা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকায় উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল বেশি। এজন্য নিজেদের স্বার্থেই তাঁদেরকে উর্দু ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের সহযোগিতা নিতে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উর্দু ভাষা ও গদ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে।^{৪৩}

এছাড়া এযুগে ছাপাখানা সম্প্রসারণের ফলে উর্দু গদ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, ছাপাখানা ছাড়া আধুনিক সাহিত্য চিন্তাও করা যায় না। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উর্দু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে উর্দু গদ্য একটা সুস্পষ্ট ধারা লাভ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লী ও লক্ষ্মৌতে প্রায় ১২টি লিখো প্রেস চালু হয়।^{৪৪} যেগুলো প্রকাশনার কাজকে অত্যন্ত সহজ ও ত্বরান্বিত করে তোলে। এসমস্ত ছাপাখানার প্রচলনের সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থসমূহ উর্দু ভাষায় অনূদিত হওয়ার পাশাপাশি মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ ও সমাচার প্রকাশ হতে থাকে। এতে শুধুমাত্র উর্দু গদ্যের বিকাশকেই ত্বরান্বিত করেনি বরং পৃথিবীর উন্নত দেশ ও জাতিসমূহের খবরাখবরও উর্দু ভাষাভাষী সাধারণ জনগণের নিকট সহজেই পৌঁছাতে আরম্ভ করে। ফলে সাধারণ ভারতীয়দের সামনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। ফলে তারা তাদের সার্বিক উন্নতির কথা ভাবতে শুরু করে। পত্র-পত্রিকাগুলো কেবল যে জনগণেরই উপকারে আসে তা নয়, বরং উর্দু ভাষা ও সাহিত্য একটা সুস্পষ্ট গতিপথ লাভ করে। যার কারণে লেখকরা নব উদ্দীপনায় লেখার অনুপ্রেরণা এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর যথাযথ পথ লাভ করেন। ফলে বিভিন্ন লেখকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকে। শুধু তাই নয়,

উর্দু ভাষার এত উন্নতি হয় যে, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষার স্থলে উর্দু ভাষাকে ভারতবর্ষের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে খুব দ্রুত ফারসি ভাষার অত্যধিক প্রভাব ও কাঠিন্যতার বেড়া জাল থেকে মুক্ত হয়ে উর্দু ভাষা বিশেষকরে গদ্যসাহিত্য সহজ-সরল আধুনিক ভাষার রূপ ধারণ করে।^{৪৫} মোটামুটি এখানেই উর্দু গদ্যসাহিত্যের চতুর্থ যুগের অবসান ঘটে। এরপর শুরু হয় উর্দু গদ্যের পঞ্চম তথা আধুনিক যুগ।

পঞ্চম যুগ: আধুনিক বা স্বর্ণযুগ (১৮৫৭ থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত)

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আধুনিক ইউরোপের ‘রেনেসাঁ’ (Renaissance) আন্দোলনের [১৫০০-১৬৬০ খ্রি.] প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। ফলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যসহ ভারতীয় অন্যান্য ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।^{৪৬} উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের পরই মূলত আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি ঘটে। কেননা, এ বিদ্রোহের কারণে ভারতবর্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিকসহ নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রেনেসাঁ বা নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। যা ভারতীয়দের নতুন এক পরিবেশের সাথে পরিচিত করে তোলে।^{৪৭} ফলে বিদেশি শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় সৈনিকদের পরাজয়, জমিদারদের অত্যাচার-নিষ্পেষণ, মুসলিম শাসনব্যবস্থার অবসান, পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচার ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে তৎকালীন উর্দু লেখকগণ প্রাচীন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারমূলক আন্দোলন এবং সাহিত্যবিষয়ক লেখালেখি আরম্ভ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সমাজসংস্কারের পাশাপাশি ভারতীয় জনসাধারণকে আলস্য জীবন থেকে মুক্ত ও আত্মসচেতন করার চেষ্টা করেন এবং তাঁদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে যুগের চাহিদা অনুসারে চিন্তা করা ও তদানুযায়ী কার্যে পরিণত করার স্পৃহা সৃষ্টিও প্রয়াস চালান। ফলে এ যুগের উর্দু গদ্যসাহিত্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রাচীন ভাবধারার [১৮৫৭ সালের পূর্ব] তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এবং প্রগতিশীল ও দর্শনভাবাপূর্ণ। আবার কতক লেখকের লেখায় নতুন নতুন চিন্তাধারা ও নবচেতনার আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে যথাযথ শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার, সহজ-সরল বর্ণনাপদ্ধতি এবং ভাষার পরিবর্তন সাধিত হয়। পশ্চিমা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবের তেজোদীপ্ত আলোকরশ্মি উপমহাদেশে বিশেষকরে উর্দু গদ্যসাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনে প্রাণবন্ত্য বইয়ে দেয়। ফলে এখানে পাশ্চাত্য ভাবধারায় নতুন নতুন সংগঠন, সাহিত্যপত্রিকাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।^{৪৮} এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মুসলিম জাগরণের মহানায়ক ও আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের জনক স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ‘আলীগড় আন্দোলন’ [১৮৭৬ খ্রি.]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত মির্যা গালিব পত্র লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের যে শুভ সূচনা করেছিলেন, সেই ধারাকে পরিপূর্ণ রূপ দেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান [১৮১৭-১৮৯৮ খ্রী.]। তিনি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে দেশে ফিরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।^{৪৯} তাঁর নেতৃত্বেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতিপয় নবীন ও প্রাণচঞ্চল উর্দু গদ্যসাহিত্যিকদের একটি স্কুল গড়ে ওঠেছিল। এই সব্যসাচী লেখকগণ তাঁদের অসাধারণ লেখনী ও সাহিত্যচর্চার দ্বারা ভারতবর্ষে উর্দু গদ্যসাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনকে বেগবান করে তোলেন। এ সমস্ত সাহিত্যিক হলেন ডেপুটি নজীর আহমদ [১৮৩৬-১৯৭২ খ্রি.], আলতাফ হোসাইন হালী [১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.], আল্লামা শিবলী নো‘মানী [১৮৫৭-১৯১৪ খ্রি.] ও মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ [১৮৩২-১৯১০ খ্রি.] প্রমুখ। তাঁদেরকে আধুনিক উর্দু সাহিত্যের ‘পঞ্চ স্তম্ভ’ বা *عناصر خمس* বলা হয়। মূলত তাঁদের নেতৃত্বে সাহিত্যের যে যুগ শুরু হয়, তাকে উর্দু সাহিত্যের ‘আধুনিক যুগ’ বলা হয়।^{৫০} তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভা ও স্বকীয়তার মাধ্যমে উর্দু গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে উন্নতির চরমপর্যায়ে উপনীত করেছেন। বিশেষকরে

স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি, যিনি শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের পাশাপাশি উর্দু গদ্যসাহিত্য সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এজন্য অনেকেই তাঁর যুগের উর্দু সাহিত্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, তিনি সর্বপ্রথম উর্দু সাহিত্যকে প্রেম-প্রীতি, কল্প-কাহিনি ও কাব্যচেতনার বেড়াঝাল থেকে মুক্ত করে সৃজনশীল সাহিত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। এককথায়, স্যার সৈয়দ ও তাঁর সহযোগীরা আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের যতগুলো দিক রয়েছে, সবগুলোকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ফলে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের সাহিত্যসেবার অধ্যায়কে খুবই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, পত্র, সংবাদ, প্রবন্ধ, জীবনী, সমালোচনা, রম্য, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাসসহ সকল বিষয়েই তাঁরা নিজেদের দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মূলত তাঁদের হাত ধরেই আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ের উর্দু লেখকগণ মূলত তাঁদেরকেই অনুসরণ করে উর্দু সাহিত্যকে সামনের দিকে নিয়ে গেছেন। বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখা উর্দু সাহিত্যে স্বমহিমায় বিদ্যমান।^{৫১}

বলা বাহুল্য যে, প্রাচীনকালে উপমহাদেশীয়দের চিত্তবিনোদনের উপকরণ ছিল মূলত ক্লেচ্ছা-কাহিনি ও অবাস্তব কিছু ঘটনাপ্রবাহ। যার কারণে প্রাচীন উর্দু গদ্যসাহিত্যে এসব কল্প-কাহিনির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সভ্য জাতি হিসেবে ভারতীয়দের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে তাঁদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্র ও সমালোচনামূলক সাহিত্য পত্রিকা। চিত্তবিনোদনের জন্য নির্মিত হয় রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার। আর একে কেন্দ্র করে লেখা হয় উপন্যাস ও নাটক। অতঃপর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সাহিত্যে ‘প্রগতিশীল আন্দোলন’ শুরু হলে উর্দু সাহিত্য অন্যদিকে মোড় নেয়। ফলে শুরু হয় জীবনের গভীরে পৌঁছে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ও ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করা। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই গদ্যসাহিত্যের অতি আধুনিক ও সর্বকনিষ্ঠ শাখা ছোটগল্পে। সাহিত্যের এ আন্দোলনে বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক কার্ল মার্ক্স [১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.]-এর ‘সাম্যবাদী আন্দোলন’ ও সিগমণ্ড ফ্রয়েডের [১৮৫৬-১৯৩৯ খ্রি.] ‘মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন’ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূলত এ সময় থেকেই হিন্দুস্থানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরম্ভ হয়।^{৫২} ফলে অধুনা সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে সাথে জীবন ও সমাজের নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে নব উদ্যমে সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন। এমনকি মনস্তত্ত্বমূলক বিষয়ের মতো স্পর্শকাতর ব্যাপারগুলোও তাঁদের সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। যার কারণে উর্দু গদ্যসাহিত্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিত্তাকর্ষক বিষয়াবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। যা ইতঃপূর্বে উপমহাদেশীয়দের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার মূল বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় জনসাধারণদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম, জাতীয় চেতনাবোধ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশিদের গোলামী ও জমিদারশ্রেণির শোষণনীতির বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সচেতন করে তোলা।^{৫৩} এ ছাড়া এ সমস্ত সাহিত্যিকদের লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলন আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে ভারতীয়দের জীবনসংগ্রাম, নিত্যনৈমিত্তিক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে এবং আভিজাত্যের অবক্ষয় ও জীবনদর্শনের জটিলতা নিরসনে মানুষের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যতা ও ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে পেছনে পড়ে থাকা ভারতীয় জনগণ বিশেষকরে ধ্বংসপ্রায় মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্ম সচেতন হয়ে ওঠে। অধুনা যুগের এ সমস্ত উর্দু গদ্য লেখকদের মধ্যে রতন নাথ সরশার [১৮৪৭-১৯০২ খ্রি.], পণ্ডিত বদরী নাথ সুদর্শন [১৮৯৫-১৯৪৭ খ্রি.], আব্দুল হালিম শরর [১৮৬০-১৯২৬ খ্রি.], মির্যা হাদী রুসওয়া [১৮৫৮-১৯৩১ খ্রি.], রাশেদুল খায়েরী [১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রি.], ইমতিয়াজ আলী তাজ [১৯০০-১৯৭০ খ্রি.], আগা হাশর কাশ্মিরী [১৮৭৯-১৯৩৫ খ্রি.], মুনিশ প্রেমচাঁদ [১৮৮০-১৯৩৬ খ্রি.], কুশন চন্দ্র [১৯১২-১৯৭৭ খ্রি.], সাআদত হাসান মান্টু [১৯১৩-১৯৫৫ খ্রি.], আলী আব্বাস হোসাইনী [১৮৯৭-১৯৬৯ খ্রি.], সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারম [১৮৮০-১৯৪৩ খ্রি.], কুরাতুল আইন হায়দার [১৯২৭-২০০৭ খ্রি.], মজনু

গৌরখপুরী [১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.], রাজেন্দর সিং বেদী [১৯১৫-১৯৮৪ খ্রি.], নয়াজ ফতেহপুরী [১৮৪৭-১৯৬৬ খ্রি.], ইসমত চুগতাই [১৯১৫-১৯৯১ খ্রি.], খাজা হাসান নিজামী [১৮৭৯-১৯৫৭ খ্রি.], পাতরাস বুখারী [১৮৯৮-১৯৫৮ খ্রি.], শওকত থানভী [১৯০৯-১৯৫২ খ্রি.], আযিম বেগ চুগতাই [১৮৯৫-১৯৪১ খ্রি.] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{৫৪}

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে উর্দু গদ্যসাহিত্য কাব্যচেতনা, প্রেম-প্রীতি, কল্পকাহিনি, কাঠিন্যতা ও ধর্মীয় ভাবধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা মানবজীবন ও বাস্তব সমাজের সমস্যা সমাধানের মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক যুগের উর্দু সাহিত্যে সহজ-সরল ও সর্বজনবোধ্য ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। তবে এ কথা সত্য যে, উর্দু ভাষা ও গদ্যসাহিত্যের এই অর্জন এতো সহজে আসেনি, এর জন্য মোটামুটি কয়েকটি স্তর ও বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রতিটি স্তরে যুগের সূর্য সন্তান ও বিভিন্ন মনীষীর ছোঁয়া পেয়ে উর্দু গদ্য একটু একটু করে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। বর্তমানে গদ্যসাহিত্যের এমন কোনো দর্শন নেই, যা উর্দু গদ্যে অনুপস্থিত।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নহর* (লাহোর: লাহোর একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ১০৩-১০৯।
২. নাছিরুদ্দীন হাশেমী, *দক্ষিণ মে উর্দু* (নয়ী দেহলী: কুওমী কাউন্সিল বরা-এ ফুরুগ-এ উর্দু যব্বা, ১৯৮৫), পৃ. ৩৬-৩৭; আল্লামা সৈয়দ মুনির আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত* (করাচী: বুকল্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ১৮।
৩. মৌলভি আব্দুল হক, *উর্দু কী এবতেদায়ী নস্তুমা মে সূফীয়া-এ কেরাম কা কাম* (নয়ী দেহলী: আজ্জমান-এ তারাক্কী-এ উর্দু, ১৯৮৮), পৃ. ২-৪; মির্যা আদীব, 'দক্ষিণ মে নহর কে আসালীব-এ বয়ান' *তানক্বীদী মাক্বালাত*, গদ্যাংশ (লাহোর: লাহোর একাডেমী, ১৯৬৫), পৃ. ১০৩-১০৬।
৪. ড. আবুল লাইছ ছিদ্দীকী, *আদবীয়াত-এ উর্দু* (করাচী: উর্দু একাডেমী, তা.বি), পৃ. ১২।
৫. ড. মহী উদ্দীন কাদেরী জোর, *দক্ষিণী আদব কী তারীখ*, (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৯), পৃ. ১১-১২; মৌলভি আব্দুল হক, *উর্দু কী এবতেদায়ী নস্তুমা মে সূফীয়া-এ কেরাম কা কাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।
৬. ড. মহীউদ্দীন কাদেরী জোর, *দক্ষিণী আদব কী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।
৭. মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নহর* (হায়দারাবাদ: মাকতাবা-এ ইবরাহীমীয়াহ স্টেশন রোড দক্ষিণ, ১৯৩৭), পৃ. ৩।
৮. মৌলভি আব্দুল হক, *উর্দু কী এবতেদায়ী নস্তুমা মে সূফীয়া-এ কেরাম কা কাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৯. ড. মহীউদ্দীন কাদেরী জোর, *দক্ষিণী আদব কী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
১০. মৌলভি আব্দুল হক, *উর্দু কী এবতেদায়ী নস্তুমা মে সূফীয়া-এ কেরাম কা কাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।
১১. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নহর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; আল্লামা সৈয়দ মুনির আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; মির্যা আদীব, 'দক্ষিণ মে নহর কে আসালীব-এ বয়ান' *তানক্বীদী মাক্বালাত*, গদ্যাংশ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
১২. মোল্লা ওয়াজহী (সম্পাদক-নূরুল হাসান হাশেমী), *সব রস* (লক্ষ্ণৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ০৯।
১৩. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নহর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।
১৪. ড. সৈয়দ এজায হোসাইন, *মুখতছর তারীখ-এ আদব-এ উর্দু* (দেহলী: উর্দু কিতাব ঘর, ১৯৬৪), পৃ. ২০২।

১৫. ড. মহীউদ্দীন কাদেরী জোর, *দক্ষিণী আদব কী তারীখ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৯; ড. হুগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ২৬।
১৬. ড. মহীউদ্দীন কাদেরী জোর, *দক্ষিণী আদব কী তারীখ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৬-১৩১।
১৭. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ (লক্ষ্ণৌ: মাতবা-এ মুনশি তেজকুমার প্রা.লি., ১৯৮৬), পৃ. ৩; ড. সৈয়দ এজায হোসাইন, *মুখতছর তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০৩।
১৮. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩।
১৯. মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫-৬।
২০. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি প্রা.লি., ১৯৯৪), পৃ. ৪৫, ৪৪৮; কে আলী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬), পৃ. ৩-৭।
২১. হাসান আলী চৌধুরী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৯৩), পৃ. ৪৫৯; ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৮।
২২. মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০-১১; ড. সৈয়দ এজায হোসাইন, *মুখতছর তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০৪।
২৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৬৫।
২৪. আবেদ আলী আবেদ, *ইনতিকাদ* (লাহোর: এদারা-এ ফুরুগ-এ উর্দু, ১৯৫৬), পৃ. ১৩৯-১৪২। ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩১; রশীদ আল ফারুকী, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭১), পৃ. ৬৫।
২৫. মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৬-৩১; আলী আব্বাস হোসাইনী, *উর্দু নভেল কী তারীখ আওর তানক্বীদ* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৭), পৃ. ০৫; ড. হুগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭।
২৬. মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩-৩৬; আযীমুল হক জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯০), পৃ. ২০১-২০২।
২৭. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭-১৯; শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: বিপীন গাঙ্গুলী রোড, ১৯৬২), পৃ. ২২০।
২৮. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯; মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৮-৪০।
২৯. ড. হুগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭; মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭; হামিদ হাসান কাদেরী, *দাস্তান-এ তারীখ-এ উর্দু* (করাচী: উর্দু একাডেমী সিন্ধ, ১৯৬৬), পৃ. ১০১।
৩০. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ০৭।
৩১. ড. হুগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯-২৯; মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহেব, *আরবাব-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯১-২৭৬; হামিদ হাসান কাদেরী, *দাস্তান-এ তারীখ-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১০; ড. গিয়ান চান্দ, *উর্দু কী নছরী দাস্তানী* (লক্ষ্ণৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১৬৪, ৪৯২-৪৯৯।
৩২. ড. হুগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯-৩০।
৩৩. ড. সৈয়দ ওয়াকার আজীম, *হামারী দাস্তানী* (নয়ী দেহলী: এতেকাদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮০), পৃ. ৩৫৯; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২।
৩৪. শেখ মুহাম্মদ একরাম, *গালিব নামা* (বোম্বে: তাজ অফিস, তাবি), পৃ. ৭।
৩৫. মুহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবী শাখছীয়াতী* (ঢাকা: পাক কিতাব ঘর, ১৯৭০), পৃ. ৩৪, ১৪২; শেখ মুহাম্মদ একরাম, *গালিব নামা*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৪৩; ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭২।
৩৬. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯।
৩৭. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৪-৭৭।

-
৩৮. তদেব, পৃ. ৭১-৭২; মুহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবী শাখছীয়াত্বী*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৫।
৩৯. আযীমুল হক জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।
৪০. তদেব, পৃ. ২০৩-২০৪; ড. সৈয়দ এজায হোসাইন, *মুখতছর তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫।
৪১. রশীদ আল ফারুকী, *উর্দু সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৩-৬৫; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৬-১৭।
৪২. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৬।
৪৩. আযীমুল হক জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০০-২০১; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯-২০।
৪৪. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; রশীদ আল ফারুকী, *উর্দু সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৫।
৪৫. রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৭; শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২৪।
৪৬. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোমিনউল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস* (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৮৩), পৃ. ১৭২-১৮৫।
৪৭. কে আলী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩০।
৪৮. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫; অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস* (কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৯৯) প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯১।
৪৯. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৫।
৫০. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯-২৩।
৫১. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৬-১২০; আযীমুল হক জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৪-২৫।
৫২. খুরশীদ আহমদ, *উর্দু আফসানে পর মাগরিবী আছরাত* (আলীগড়: শুবা-এ উর্দু আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ২০০২), পৃ. ১৪।
৫৩. ড. হুগীর আফরাহীম, *উর্দু আফসানা তারাক্কী পসন্দ তাহরীক সে ক্বাবল* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯১), পৃ. ২০১-২০৭।
৫৪. ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতাছরতেরীন তারীখ* (লাহোর: সংগ-এ মাইল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ১৯১-১৯২; রামবাবু সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৮-৪০; ড. নজীর আহমদ ও ড. এবাদুল্লাহ, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, তা.বি.), পৃ. ৯২-৯৪।

উর্দু নাটকের উন্নয়নে হোসেনী মিয়া জরীফ : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. রশিদুল আলম*

Abstract: Hosseini Mia Zarif was born in 1813 and died in 1867. Hosseini Mia Zarif is one of the few playwrights involved in the development of Urdu drama. His plays were full of entertainment or laughter. By combining poetry and prose, he started a new chapter in Urdu drama. His books include Natija-e-Ismat (نتیجہ عصمت), Gulzar-e-Ismat (گلزار عصمت), Zulam-e-Imran (ظلم عمران), Khun-e-Aashiq (خون عاشق), Zulam-e-Azlam (ظلم اظلم), Fetna-e-Khanam (فتنة خانم), Sharif wa Kamina (شریف و کمینہ), Tamasha-e-Gulistan (تماشائے گلستان), Saif-e-Sulaimani (سیف سلیمانی), Khoda Dost (خدا دوست) and Tamasha-e-Zahura-e-Khurshid (تماشائے زہرا خورشید) is particularly noteworthy.

হোসেনী মিয়া জরীফের প্রকৃত নাম গোলাম হোসেন। সাহিত্যজগতে তিনি হোসেনী মিয়া জরীফ নামে পরিচিত। তিনি ১৮১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার নাটকগুলোর মধ্যে চিত্তবিনোদন বা হাসি-তামাশাই ভরপুর ছিল। তার নাটকের মধ্যে নাটকের কোন নিয়মনীতি ছিলনা। তিনি তার নিজের ইচ্ছেমত জনসাধারণকে কিভাবে আনন্দ দেওয়া যায় ঠিক সেভাবেই নাটক রচনা করতেন। তিনি নাটকের মধ্যে কবিতা এবং গদ্যকে একত্রিত করে এক ব্যতিক্রমধর্মী নাটকের সৃষ্টি করেন। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন তার নাটকে ঠাট্টা-তামাশার উপস্থাপনার।^১ তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল:

১. নতীজা-এ ইসমত (نتیجہ عصمت) ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
২. গুলজার-এ ইসমত (گلزار عصمت) ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ
৩. যুলম-এ ইমরান (ظلم عمران) ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ
৪. খুন-এ আশিক (خون عاشق) ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ
৫. যুলম-এ আযলাম (ظلم اظلم) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
৬. ফেতনা-এ খানম (فتنة خانم) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
৭. শরীফ ওয়া কামিনা (شریف و کمینہ) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
৮. তামাশা-এ গুলিস্তান (تماشائے گلستان) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
৯. সাইফ-এ সুলায়মানী (سیف سلیمانی) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
১০. মকর-এ তাল্বীস (مکر تلبیس) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
১১. নাসের ওয়া হুমায়ুন (ناصر و ہمایون) ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
১২. শিরি-এ ফরহাদ (شیریں فرہاد) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৩. তামাশা-এ নাদের (تماشائے نادر) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

* সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

۱۸. بادشا خواداد (بادشاه خداداد) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۱۹. پورن-এ ভগত (پورن بهگت) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۱۶. একসীরা-এ আয্ম (اکسیرا عظم) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۱۷. ফেতনা-এ গানিম (فتنه غانم) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۱۸. জলসা-এ নওরোজ (جلسه نوروز) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۱۹. আয়না-এ সেকেন্দারী (آئینه سکندری) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۲۰. নয়া যনকবারী ইন্দরসভা (نئی زنکباری اندرسبها) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۲۱. খোদা دوست (خدا دوست) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ
۲۲. তামাশা-এ জহুরা-এ খুরশীদ (تماشائے زہرا خورشید) ۱۸۸۹ খ্রিষ্টাব্দ^২

নতীজা-এ ইসমত (نتیجہ عصمت)

নতীজা-এ ইসমত (نتیجہ عصمت) নাটকটি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাটকের কাহিনি: নিশানপুরের সওদাগর ইয়াকুব এর তিন সন্তান ছিল। বড় ছেলে আদম জুয়ারী, মেজ ছেলে আকবর মদখোর এবং ছোট ছেলে আসিফ পরহেজগার ও নামাজি ছিল। আদম ও আকবর পিতার মৃত্যুর পর সকল সম্পদ ভাগ করে নিতে চাইলো। আসিফ কোন সম্পদই নিল না। বড় দু'ভাই আসিফকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আসিফ তার স্ত্রীকে নিয়ে সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। অন্যদিকে আদম জুয়া এবং আকবর মদে আসক্ত হয়ে সমস্ত সম্পদ পানির মত খরচ করতে শুরু করে দিল। অল্পদিনের মধ্যে তারা ভিখারী হয়ে গেল। ধারের অর্থ পরিশোধ করতে না পারার কারণে তাদেরকে জেলে যেতে হল। আসিফ এ খবর শুনে তাদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে নিয়ে এল এবং বড় দুই ভাইকে পঞ্চাশ হাজার রুপিয়া দিল। কিন্তু তারা সে অর্থ কোন কাজে না লাগিয়ে আবার জুয়া ও মদ খেয়ে সব অর্থ খরচ করে ফেলল। তারা পুনরায় আসিফের কাছে ফিরে এলো। আসিফ তাদেরকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিল। আদম ও আকবর দু'জনেই আসিফের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু সে তাদের প্রস্তাবে রাজি হলনা। ফলে তারা তাকে নষ্ট মেয়ে হিসেবে প্রমাণিত করল এবং বাড়ি থেকে বের করে দিল। আসিফ ব্যবসার উদ্দেশ্যে চীন দেশে সফর করতে বের হলেন, সঙ্গে তার দুই ভাইকেও নিলেন। কিন্তু পথে আদম ও আকবর তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। আল্লাহর রহমতে সে বেঁচে গেল এবং তাদেরকে জেলে দিল। স্ত্রীকে ফিরে নিয়ে এসে আবার তারা সংসার করতে শুরু করল। এভাবেই নাটকটির কাহিনি শেষ হয়।^৩

নাট্যকার হোসনী মিয়া জরীফ তার নতীজা-এ ইসমত নাটকের মধ্যে কবিতা ও গদ্যকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন। নিম্নে নাটকের একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হল:

اکبر: دیکھو دیکھو وہ جو آتا ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ شاید ہماری خرابی کی خبر پایا ہے۔ ضرور ہمارے لینے کو آیا ہے۔ بھائی اب کیا کریں چلو کہیں چھپ جائیں۔

آصف: غزل۔۔۔ کوئی کہو کیا مرے یار کو پہچانتے ہو۔

ہیں کہاں بھائی مرے کوئی سنادو مجھ کو
میرے بھائیوں کا پتہ بہر خدادو مجھ کو

ڈھونڈھتا پھرتا ہوں ملتا نہیں بھائیوں کا پتہ
جانتے ہو کوئی اللہ بتادو مجھ کو
کیا کروں آہ نہیں تاب خدائی اے ظریف
مر جاؤں گا جلد ملا دو مجھ کو^۶

গুলজার-এ ইসমত (گلزار عصمت)

গুলজার-এ ইসমত (گلزار عصمت) নাটকটি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। গুহার বেগের মৃত্যুর পর তার সন্তান মাহে রুহ এবং মাহ তালাব কান্নাকাটি করছিল। মাহে রুহ ও মাহ তালাবের সৎ মা গুলনার তাদেরকে পছন্দ করত না। এমতবস্থায় মাহে রুহ চাকুরির খোজে বেড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে গুলনার, মাহ তালাবের সাথে তার পুত্রের বিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ভাই বোন কেউই এ বিয়েতে রাজি হল না। তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে চাইল, কিন্তু জল্লাদের দয়া হল। মাহে রুহ তার বোনকে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। বোনের পানি পিপাসা লাগলে পানি আনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে লাগল। আমির নামে এক দুষ্ট লোক পানিতে বেহুশের ঔষধ মিশিয়ে দিল। উক্ত পানি পান করে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আমির মাহ তালাবকে তার সঙ্গে নিয়ে গেল। আমির মাহ তালাবকে নষ্ট করতে চাইল, কিন্তু তার বাধার মুখে সে বিরত রইল। মাহ তালাবকে খারাপ মেয়ের কাছে পাঁচশত রুপিয়া দিয়ে বিক্রি করে দিল। খারাপ মেয়েটি মাহ তালাবকে একটি বালা খানায় নিয়ে এল কিন্তু সে খদ্দেরকে খুশি করার বদলে তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দিতে লাগল। উজির পুত্র মাহ মনির তার প্রেমে পড়ে গেল এবং তাকে বিয়ে করল। কিন্তু উজির তাদেরকে বের করে দিল। মাহ মনির, মাহ তালাবকে নিয়ে ইয়ামেন চলে গেল এবং সেখানকার উজির হল।

একদিন বাদশাহ তার উজিরকে বলল, যে মেয়ে গান গায় সে কিভাবে একজন পবিত্র নারি হতে পারে। ফলে তিনি মাহ মনিরকে প্রেফর করে। রাজ দরবারে মাহ তালাব এসে গান গাইতে শুরু করে এবং গানের মাধ্যমে তার জীবনের সমস্ত কাহিনি বলে। মাহে রুহ সেই দরবারে উপস্থিত হয়ে তার বোনকে ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। বাদশা ভাই বোনের মিল দেখে খুশি হন এবং সবাইকে মুক্ত করে দেন।^৭

বাদশা খোদাদাদ (بادشاہ خداداد)

বাদশা খোদাদাদ (بادشاہ خداداد) নাটকটি তিন অঙ্ক এবং পাঁচটি দৃশ্যে লিখা। নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। শাহজাদা খোদাদাদ উজিরের কথা শুনে তার পিতাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ভ্রমনের ব্যবস্থা করে। পথে তাদের জাহাজ পানিতে নিমজ্জিত হয়। ইয়ামিন উপকূলের এক মাঝি শাহজাদাকে প্রাণে বাঁচায়। সেই সময় ইয়ামিন রাজ্যের রাজকন্যার জন্য পাত্র খোজা হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে শাহজাদি আরজুর সাথে শাহজাদার বিবাহ হয়। ইতোমধ্যে শাহজাদা তার বাবার মৃত্যুর খবর পায়। শাহজাদা নিজ রাজ্যে শাহজাদীকে নিয়ে রওনা হয়, পথিমধ্যে শাহজাদীর একটি মেয়ে সন্তান হয়। কিন্তু সবাই মনে করে শাহজাদী আরজু মারা গেছে। সবাই তাকে একটি সিন্দুকের ভিতর রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। আর শাহজাদা খোদাদাদ তার কন্যা আয়দানকে ইরানের বাদশা কায়কোবাদের নিকট দিয়ে দেয়। কিন্তু বাদশাহর বেগম তাকে ভালভাবে গ্রহণ করেনা এবং তাকে হত্যার হুকুম দেয়। কিন্তু জল্লাদ তাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দেয়। এক হাকিমের নিকট আয়দান এবং আরজুর দেখা হয়। ঠিক সে সময় সেখানে ইরানের বাদশাহ উপস্থিত হয়। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর তারা আবার মিলিত হয়। এভাবেই নাটকটি শেষ হয়।^৮

পূরণ-এ ভগত (پورن بھگت)

পূরণ-এ ভগত (پورن بھگت) নাটকটি দুই অঙ্ক ও চৌদ্দ দৃশ্যে রচিত। নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। কাহিনি: শিয়ালকোটের রাজা সালিউন এর একটি পুত্র সন্তান হল। তার নাম রাখা হল পূরণ।

জ্যোতিষী তার ভাগ্য গণনা করে বলল, সে খুবই খোদা ভীরু হবে। পূরণ যখন যুবক হল, তখন সৎ মা লোনার দৃষ্টি তার উপর পড়ল। লোনা মনে প্রাণে তাকে চাইতে লাগল, কিন্তু পূরণ তার এই মনোবাসনায় রাজি হলনা। ফলে লোনা অপমানিত বোধ করল। রাজার কাছে সে পূরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে পূরণ কে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করল, কিন্তু এক সাধু তাকে কূপ থেকে বাঁচালেন। পূরণ খোদার শুকরিয়া আদায় করে তিন বছর তাঁর ইবাদতে লিপ্ত হল।

অন্যদিকে রাজা সালিউন অন্ধ হয়ে যায়। স্বপ্নে তিনি পূরণকে দেখলেন। সে তাকে বলল যদি তুমি লোনার রক্তে তোমার চোখ ধৌত কর, তবেই তুমি আবার চোখে দেখতে পাবে। তিনি লোনাকে হত্যা করতে চাইলেন, কিন্তু পূরণের অনুরোধে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। আল্লাহর রহমতে রাজা সালিউন এর চোখ ভাল হয়ে যায়। পূরণের মা যে পাগলী হয়ে গিয়েছিল, সে আবার সুস্থ হয়ে যায়। রাজা পূরণ কে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং তার প্রেমিকা সুন্দরীর সাথে বিবাহ দেন। নাটকটি এভাবে শেষ হয়।^৭

একসীরা-এ আয়্ম (اكسيرا عظم)

একসীরা-এ আয়্ম (اكسيرا عظم) নাটকটি দুই অঙ্ক ও চব্বিশ দৃশ্যে রচিত। নাটকটি এক চতুতাংশ গদ্যাকারে রচিত। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কাহিনি: খাতুন এর বিখ্যাত ব্যবসায়ী আব্দুল আজিজ পুত্র ফিরোজ এবং কন্যা দিল আরামকে নিয়ে বানিজ্য করতে বের হলেন। জাহাজ পানিতে ডুবে গেল। কাজী রফিক উদ্দিন তাদের বাঁচালেন এবং তাদেরকে আশ্রয় দিলেন। আজিজ কিছু অর্থ কাজীর কাছে ধার নিয়ে পুত্র ফিরোজকে সাথে নিয়ে আবার ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কাজীর খাস চাকর দিল আরামকে একা পেয়ে তাকে নিজের করে পেতে চাইল কিন্তু সে সময় কাজী এসে তাকে রক্ষা করল। কাজী নিজেই দিল আরামকে ভালবেসে ফেলে এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু সে এ বিয়েতে রাজি হয়নি। কাজী রাগ করে আজিজের কাছে পত্র পাঠায় যে, তার কন্যা খারাপ হয়ে গেছে। পত্র পেয়ে আজিজ ফিরোজকে পাঠায় দিল আরামকে হত্যা করার জন্য। ফিরোজ হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে জঙ্গলে নিয়ে যায় কিন্তু সেখানে জোয়ান বখত শাহ তাকে রক্ষা করে বিবাহ করেন।

জোয়ান বখত শাহ এর উজির আওরাস দিল আরামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে গেল। বিভিন্নভাবে সুযোগ খুঁজতে লাগল। কয়েক বছর পর দিল আরাম তার পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উজির আওরাসের সাথে রওনা হলেন। পথে আওরাস দিল আরামকে পেতে চাইল কিন্তু সে সেখান থেকে নিজেকে রক্ষা করে পালিয়ে গেল। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর এক পরীর সাথে তার সাক্ষাত হল। পরী তাকে একসীরা-এ আয়্ম এর শিশি দিলেন এবং এর দ্বারা তিনি জোহার শাহ এর কন্যা নূর জাহানকে সুস্থ করলেন। চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সাবাই তার কাছে চিকিৎসা করার জন্যে আসতে লাগল। তিনি শিশির ঔষধের দ্বারা সবাইকে সুস্থ করতে লাগলেন। সবাই নিজেদের গুনাহর কথা স্বীকার করে মাফ চাইলেন। এভাবেই নাটকটি শেষ হয়।^৮

যুলম-এ আযলাম (ظلم اظلم)

যুলম-এ আযলাম (ظلم اظلم) নাটকটি তিন অঙ্কে রচিত এবং এখানে ১৬টি দৃশ্য রয়েছে। নাটকটি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মত মঞ্চস্থ হয়। যদিও নাটকটি রওনক বেনারসীর কিন্তু জরীফ নিজের মত করে নাটকটি লিখেছেন।

কাহিনি: তাওরান উপদ্বীপে শামশ্ রহ ও নুরন নেসা নামে দুই ভাই-বোন বসবাস করত। সেখানে তারা শান্তি ও সচ্ছলতার সাথে জীবন অতিবাহিত করছিল। একদিন উপদ্বীপের শাসক আযলাম নুরন নেসাকে দেখে তাকে বিয়ে করতে চাইল। শামশ্ রহ ও নুরন নেসা নিজেদের মান-সম্মান বাঁচানো জন্য বসরা

নগরের উদ্দেশ্যে পলায়ন করল। কিন্তু জাহাজ বসরা যাওয়ার পূর্বেই পানিতে ডুবে গেল। আমির বসরা নামে একজন নুরুন নেসাকে বাঁচিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমির তাকে ইজ্জতের সাথে তার বাড়িতে রাখল। কিন্তু তার গাড়ি চালক নুরুন নেসার প্রেমে পড়ে গেল এবং তাকে প্রস্তাব দিল। নুরুন নেসা সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাকে তিরস্কার করল।

আমির তাওরান এর কথা শুনে নুরুন নেসাকে আমির বসরা বাড়ি থেকে বসরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রাস্তায় তাদের জাহাজ ডুবে গেল কিন্তু কোনভাবে তারা বসরাতে পৌঁছে গেল। পুনরায় আযলাম নুরুন নেসাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, এবারও সে রাজি হলনা। আমির বসরা এ কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হল এবং তাদেরকে নিলামে বিক্রি করে দিল। শামশ্ রুহ ঠিক সে সময়ে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ক্রয় করে নিলেন। তিনি আযলামকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু নুরুন নেসাকে ভুল বুঝে তাকে হত্যা করতে গেলেন। সেই মুহূর্তে শাম দেশের অধিকর্তা মনোয়ার নুরুন নেসাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল। মনোয়ার এবং শামশ্ রুহ এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে তারা অনেক দূর চলে গেল। এ সময় আবার আযলাম এসে নুরুন নেসাকে তার ভালবাসার কথা জানালো। ঠিক সেই সময় আমির বসরা দু'জনকে ধ্রুত করে তার সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। নাটকটি এভাবেই শেষ হয়।^৯

মকর-এ তাল্বীস (مکر تلبیس)

মকর-এ তাল্বীস (مکر تلبیس) নাটকটি দুই অঙ্কে রচিত। এটি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। কাহিনি: ইবলিসের দরবারে সব শয়তান একত্রিত হয়ে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছিল। ইবলিসের পুত্র তাল্বীস এক মন্তবে যাওয়া বাচ্চাকে খেলায় মশগুল করে। এ কথা শুনে ইবলিস খুবই খুশি হয় এবং তাকে পুরস্কৃত করে। যে শয়তান বড় বড় কাজ অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলে, সে খুবই অসম্ভব হয়। তখন ইবলিস বলে উপযুক্ত সময়ে এর জবাব দেওয়া যাবে।

তাকওয়াহ দেশের শাহজাদা সবার শাহ কে বিপথে নিয়ে আসার জন্য তাল্বীস রওনা হয়। কিশাণ রাজ্যের অধিকারী কোকাল কে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে সবার শাহের উপর হামলা করার কথা বলে। তাল্বীস অভিশপ্ত দেবতাদের হাজির করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। যুদ্ধে সবার শাহ পরাজিত হয়ে ধ্রুত হয়। তার স্ত্রী ইসমত নিগার, আর কন্যা নূর জাহানকে নজর বন্দি করে। তাল্বীস মানুষের প্রতিকৃতি ধারণ করে তাকে দশ আশরাফি দিয়ে কিনে নেন। তাকে মিথ্যা বলার জন্য বাধ্য করে, কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলেনা। তাল্বীস অগ্নি ক্রোধ হয়ে বাঘের রূপ ধারণ করে, ঠিক সে সময় জঙ্গলে এক শিকারি এসে ইসমত নিগার কে রক্ষা করে। কিন্তু তিনি ইসমত নিগারকে তার পুত্রের হত্যাকারি হিসেবে দোষী মনে করে পুলিশের নিকট ধরে দেয়। অন্যদিকে ডাকাতরা চুরিকৃত মাল জঙ্গলে নিয়ে আসে, নিজেদের মধ্যে ভাগ করার উদ্দেশ্যে। যেখানে তারা চুরির মাল রেখেছিল, সেখানে একটি জায়গায় সবার ঘুমিয়ে ছিল। পুলিশ ডাকাতদের ধরতে এসে সবার শাহকে ধ্রুত করে নিয়ে যায়।

বিলকিস পরীর পুত্র নূর জামান, নূর জাহান কে ভালোবেসে ফেলে। সে তাকে পরীস্তান নিয়ে যায় এবং বিয়ে করে। নূর জাহান বয়ম সোলাইমানের ভিতর নিজের পিতা-মাতাকে ডাকে এবং তারা এসে উপস্থিত হয়। এভাবে তারা আবার সবাই একত্রিত হয়। তাল্বীস নিজের পরাজয় স্বীকার করে। এভাবেই নাটকটি শেষ হয়।^{১০}

নাসের ওয়া হুমায়ুন (ناصر و ہمایون)

নাসের ওয়া হুমায়ুন (ناصر و ہمایون) নাটকটি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে বাদশাহ পুত্র হুমায়ুন এবং উজির পুত্র নাসের এর বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনি: নাটকের প্রথমার্ধে উজির

কন্যাকে অর্থাৎ নেহের আফরোজকে হুমায়ুন বিয়ে করার আশ্রয় প্রকাশ করে। প্রথমে বাদশাহর মত ছিলনা। পরবর্তীতে অনেক ধুমধাম করে হুমায়ুনের সাথে উজির কন্যার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের রাতে মহলে যাওয়ার আগে পথে ডাকাতরা উজির কন্যাকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাকে কতোয়ালের কাছে দশ হাজার রুপিয়া নিয়ে বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীতে শাহজাদা হুমায়ুন ও নাসের উজির কন্যাকে খোজার জন্য বের হয়। কিন্তু তারাও ডাকাতের হাতে ধৃত হয়। সেই একই কতোয়ালের কাছে তাদেরকে নয় হাজার রুপিয়াতে বিক্রি করে দেয়। হুমায়ুন, উজির কন্যা নেহের আফরোজ এবং নাসের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কতোয়ালের কাছ থেকে পালিয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন পর হুমায়ুন ও নাসের জঙ্গলে শিকার করতে যায়। হুমায়ুন সেখানে তিনি এক অপরূপ সুন্দরিকে দেখে তাকে নিজের করে নিতে চায়, কিন্তু সে নিজের বুকে ছুঁড়ি মেরে হুমায়ুনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। পরবর্তীতে হুমায়ুন জানতে পারে তাঁর প্রাণের বন্ধু নাসেরের স্ত্রী ও বাদশাহর কন্যা অর্থাৎ তার বোন ছিল সেই অপরূপ সুন্দরি। নিজের ভুল বুঝতে পেরে হুমায়ুন আত্মহত্যা করে। এরও কিছুদিন পর নাসের জানতে পারে তার বন্ধু কেন আত্মহত্যা করেছিল, তখন তিনিও আত্মহত্যা করেন। এভাবেই নাটকটি শেষ হয়।^{১১}

তামাশা-এ নাদের (تماشائے نادر)

তামাশা-এ নাদের (تماشائے نادر) নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। কাহিনি: শাহজাদা লাল এর সৌন্দর্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল। সবাই বলতে লাগল পরীস্থানেও এত সুন্দর কেউ নেই। একদিন পরীরা এসে শাহজাদাকে উঠিয়ে নিয়ে নাগিনা রাজ্যে নিয়ে গেল। গোহার এবং লাল একে অপরকে দেখে প্রেমে পড়ে গেল। পুনরায় পরীরা লালকে তার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

শাহজাদা লালের চিন্তায় তার পিতা জমরুদ শাহ চিন্তিত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে শাহজাদী গোহার পিতা জহুর শাহও তার কন্যাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। একদিন হেয়রা পরী শাহজাদাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন এবং তার ভালবাসার কথা জানালেন। কিন্তু শাহজাদা তাকে গ্রহণ করলেন না। হেয়রা পরী রেগে তাকে হরিণ বানিয়ে দিল। সে সময় দুই সাধু তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। শাহজাদা তার দুঃখের কথা তাদেরকে বলল। শাহজাদার কথা শুনে তাদের দয়া হলে তাকে আবার মানুষ বানিয়ে দেয়। শাহজাদা গোহারের নিকট যায় এবং সকল যাদু নষ্ট করে তাকে মুক্ত করে। এভাবে তাদের মিলন ঘটে, আর এভাবেই নাটকটি শেষ হয়।^{১২}

আয়না-এ সেকেন্দারী (آئینه سکندری)

আয়না-এ সেকেন্দারী (آئینه سکندری) নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। কাহিনি: শাহজাদা শাম্শ বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। ঠিক সে সময় মরজান পরী ভ্রমণে বের হয়েছিল। শাহজাদাকে দেখে তিনি প্রেমে পড়ে গেলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

উজির জান-এ নিশার শাহজাদী মাহে রুহ, শাহজাদী গুলরাখ ও ফিলফিলকে সাথে করে নিয়ে শাহজাদা শাম্শ এর খোজে বের হলেন। বিখ্যাত শিকারী ওলী হিন্দুস্থানী শিকার করতে এসে শাহজাদী গুলবাখকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। উজির ও মাহে রুহ দু'জনই অস্তির হয়ে গেল। তারা সমুদ্র পার হতে চাইল কিন্তু ফিলফিল যেতে চাইল না। উজির ও মাহে রুহ নৌকাতে সমুদ্র অতিক্রম করার জন্যে রওনা হলেন কিন্তু মাঝ পথে নৌকা ভেঙ্গে গেল। দু'জন আলাদা হয়ে গেল। ফিলফিল

শাহজাদী গুলরাখের সন্ধান পেল এবং তাকে মুক্ত করে নিয়ে এল। সে সময় জান-এ নিশারও তাদের খুঁজে পেল।

শাহ জানে আলম শাহজাদী মাহে রুহ কে বাঁচিয়ে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মাহে রুহকে তার পছন্দ হল কিন্তু শাহজাদী তাকে গ্রহণ করল না। যখন শাহ জানে আলম জানতে পারলেন মাহে রুহ শাহজাদা শামশ এর স্ত্রী, তখন তিনি লজ্জিত হলেন। শাহ জানে আলম এর কন্যা পিতার সাথে দেখা করতে এসে মাহে রুহকে দেখে খুব খুশী হলেন।

উজির জান-এ নিশার আয়না-এ সেকেন্দারীর সাহায্যে মরজান পরীর রাজ্যে প্রবেশ করল। দৈত্যদের সাথে তাদের যুদ্ধ করে তারা শাহজাদা শামশকে উদ্ধার করল। আয়না-এ সেকেন্দারীর সাহায্যে তারা মাহে রুহকেও দেখতে পেল এবং সবাই আবার একত্রিত হল। এভাবে নাটকটি শেষ হল।^{১৩}

নয়ী যনকবারী ইন্দরসভা (نئی زنکاری اندرسبھا)

নয়ী যনকবারী ইন্দরসভা (نئی زنکاری اندرسبھا) নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। নাটকে দেখা যায় গুরজার শাহ পুত্র গুলফাম গান শোনার জন্য বাগানে যায়। গান শুনে তার খুব ভাল লাগে। এরপর সে অন্দর মহলে চলে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। সবুজ পরী গুলফামকে দেখে ভালবেসে ফেলে এবং তাকে পরীস্থান নিয়ে যায়। এর পরে ইন্দরসভার কাহিনির সাথে মিলে যায়।^{১৪} এই নাটকটি একটি কবিতার মাধ্যমে শেষ হয়।

شادی جلوئہ گلفام مبارک بودے
عیش و عشرت کا سر انجام مبارک
بودے^{১৫}

খোদা দোস্ত (خدا دوست)

খোদা দোস্ত (خدا دوست) নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। এটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। খোদা দোস্ত আল্লাহর গুররিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি মিলাদের আয়োজন করে। সেখানে তিনি ফকিরকে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে, স্ত্রী-বাচ্চাদের নিয়ে ফকিরি পোশাক পরে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। পথে এক সওদাগর মিথ্যে কথা বলে খোদা দোস্ত এর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যায়। অনেক অপেক্ষার পর স্ত্রী ফিরে না আসায় দুই সন্তানকে নিয়ে তাকে খুঁজতে বের হন। পথে একটি নদী দেখতে পান। একটি সন্তানকে কাঁধে নিয়ে নদী পার হতে যান কিন্তু কাঁধ থেকে বাচ্চাটি পড়ে যায়। অপরদিকে একটি বাঘ এসে নদীর কাছে বসে থাকা অপর সন্তানকে নিয়ে যায়। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর খোদা দোস্ত তাতার রাজ্যের বাদশাহ হয়ে যান এবং তার স্ত্রী-বাচ্চাকে ফিরে পান।

একদিন এক ফকির তার কাছে আসে এবং প্রশ্ন করেন ক্ষমতা ও রাজ্য সম্পর্কে। খোদা দোস্ত সেই ফকির কে আবার তার রাজ্য দিয়ে দেয়। ফকির এবার অনেক বেশী খুশি হন এবং তাকে দুটি রাজ্যেরই দায়িত্ব দিয়ে দেন। এভাবে নাটকটি শেষ হয়।^{১৬}

তামাশা-এ জহুরা-এ খুরশীদ (تماشاۓ زبرا خورشید)

তামাশা-এ জহুরা-এ খুরশীদ (تماشاۓ زبرا خورشید) নাটকটি চার অঙ্কে রচিত। এই নাটকের এক চতুর্থাংশ গদ্যাকারে লেখা। নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। কাহিনি: আখতার শাহর কোন সন্তান ছিলনা। এ কারণে সে সবসময় উদাস হয়ে থাকত। কোন কাজে তার মনযোগ ছিলনা। অনেক চেষ্টার পর তার একটি পুত্র সন্তান হল। রাজ জ্যোতিষী শাহজাদার ভাগ্য গণনা করতে এসে বলল, তার বয়স যখন ছয় বছর পূর্ণ হবে তখন আপনি একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধ্বংস হবেন। আবার ঠিক ছয় বছর পর জহুরা

নামে একটি মেয়ের সাথে খুরশীদের বিবাহ হবে। এ কারণে তার নাম খুরশীদ রাখা উচিত। ঠিক ছয় বছর পর বাদশাহ সিতমগর যুদ্ধে আখতার শাহ কে হারিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। শাহজাদা খুরশীদকে নিয়ে তার দুধমাতা পালিয়ে যায়। আবার ছয় বছর পর উজিরের মেয়ে জহুরার সাথে খুরশীদের বিয়ে হয়। খুরশীদ উজিরের সাহায্যে তার পিতার রাজ্য উদ্ধার করে এবং পিতাকে মুক্ত করে। এ ভাবেই নাটকটি শেষ হয়।^{১৭}

পরিশেষে হোসনী মিয়া জরীফের নাটকগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সে সময়ের প্রচলিত নিয়মের মধ্যে না থেকে এক নতুন নিয়মে নাটক লেখা শুরু করেন। যেখানে তিনি গদ্য ও পদ্যকে একত্রিত করে নাটক লিখতেন। তার নাটকগুলোর মধ্যে হাসি-তামাশা ও চিত্তবিনোদন দেখতে পাওয়া যায়। তার নাটকের শিল্পরূপ অত্যন্ত সার্থকতার দাবীদার। প্লট নির্মাণ, ঘটনার বর্ণনা ও চরিত্র বিন্যাসে হোসনী মিয়া জরীফের নাটকগুলো ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ হোসনী মিয়া জরীফ, *আজ কাল* (দিল্লী: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭২), পৃ. ১১২।
- ^২ আযমী শাহীন শোয়াইব, *আদবী তাআ'রুফ* (করাচী: ইউনাইটেড বুকস, ২০০৮), পৃ. ৫৭।
- ^৩ ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারীখ* (লাহোর: সংগ-এ মাইল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৬৪-২৬৫।
- ^৪ মির্যা আদীব, *তানকিদী মাকালাত* (লাহোর: লাহোর একাডেমি, ১৯৬৫), পৃ. ৪৯৯।
- ^৫ তদেব, পৃ. ৪৯৯।
- ^৬ তদেব, পৃ. ৫০০।
- ^৭ ড. সালাম সাদেলভী, *আদব কা তানকিদী মুতালেআ* (লক্ষ্মী: নাসীম বুক ডিপো লাটুশ রোড, ১৯৮৬), পৃ. ২৪৮।
- ^৮ তদেব, পৃ. ২৪৯।
- ^৯ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)* (করাচী: পাকিস্তান আঞ্জুমাণে তারিক্কি উর্দু, ১৯৬২), পৃ. ৯৫।
- ^{১০} তদেব, পৃ. ৯৫।
- ^{১১} তদেব, পৃ. ৯৫।
- ^{১২} তদেব, পৃ. ৯৬।
- ^{১৩} তদেব, পৃ. ৯৬।
- ^{১৪} তদেব, পৃ. ৯৭।
- ^{১৫} তদেব, পৃ. ৯৭।
- ^{১৬} তদেব, পৃ. ৯৭।
- ^{১৭} তদেব, পৃ. ৯৭।

আলতাফ হুসাইন হালীর কাব্যসাহিত্য : একটি পর্যালোচনা

ড. মো: নাসির উদ্দিন*

Abstract: Altaf Hossain Hali (1837-1914) was a great poet and human being. He was the pioneer of modern Urdu poetry. He was master of composing both Urdu prose and poetry. Before him, Urdu poetry was puzzle lock and mere playing of words. There was no subject matter. The subject matter of Urdu poetry was love and just coquetry of women. Hali changed the land scrape of Urdu poetry through his write up. He put the Urdu poetry on a way of modernism and legalistic. He made Urdu poetry subjective and purposeful. His diction and style is so simple and lucid that everybody becomes enamoured of him. He has given a new style to Urdu poetry. This paper intends to assess the poetic work of Altaf Hossain Hali.

ভূমিকা

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে আলতাফ হুসাইন হালী (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.) একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি উর্দু সাহিত্যের প্রথম জাতীয় কবি এবং আধুনিক উর্দু কাব্যের অন্যতম পথিকৃত। তাঁর পূর্বে উর্দু কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম আর সৌন্দর্য। তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি করে তোলেন। স্বীয় কল্পনা ও অনুভূতিকে কাব্যশৈলীর গাঁথুনীতে চিত্রিত করেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। সুনিপুণ শব্দচয়ন ও অলঙ্কারপূর্ণ বাচনভঙ্গী তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনিই সর্বপ্রথম উর্দু কাব্যে আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তন করেন এবং বিশ্বপ্রকৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা, মানব-প্রীতি ও দেশপ্রেমের উপর কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।^১ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁর কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দীওয়ানে হালী (دیوان حالی)

আলতাফ হুসাইন হালীর দীওয়ান উর্দু কাব্যসাহিত্যের এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার। এতে হালীর প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির নানাপ্রকার কবিতা সংযোজিত হয়েছে।^২ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।^৩ এতে গয়ল বা গীতিকবিতা, কাসীদা বা প্রশংসামূলক কবিতা, কেতআ বা টুকরো কবিতা, রুবাঈ বা দুই পংক্তির কবিতা, মরসিয়া বা শোকগাঁথা কবিতা, তারকীবান্দ, মাসনবী ও অন্যান্য কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসাদাসে হালী (مسدس حالی)

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে যে কয়টি গ্রন্থ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম “মুসাদাসে হালী”। ‘মুসাদাস’ আলতাফ হুসাইন হালীর সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে হালী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের উৎসাহ-উদ্দীপনায় যুগসৃষ্টিকারী জগৎ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মদ্দ-ওয়া-জায়র-ই-ইসলাম (مدوجز اسلام) অর্থাৎ ইসলামের জোয়ার-ভাটা রচনা করেন।^৪ এ গ্রন্থটি ‘মুসাদাস’ অর্থাৎ ষষ্ঠপদী কবিতাকারে লিখিত। তাই এটি ‘মুসাদাসে হালী’ নামে সুপরিচিত। এটি জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ও দীপ্ত দেশপ্রেমমূলক একটি কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি হালীকে জাতীয় কবিরূপে ভূষিত করে।^৫ হালী এতে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ও গৌরবের চিত্র অত্যন্ত কার্যকর পন্থায় উপস্থাপন করেন। বর্ণনার সরলতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং কবির আন্তরিকতা ও সততার জন্য এ কাব্যগ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বীকৃতি লাভ করে

* প্রফেসর, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

“Musaddas Hali or the Ebb and Flow of Islam is one of the epoch-making books of the age. Its popularity is still unabated and it still finds thousands of readers. It was a revelation, a landmark in the literary history of Urdu language. A new star swam into the ken of Urdu poets. It is a poem of national regeneration, describing the past glories of Islam, the triumphs and achievements of its worthy leaders, the ideals and the culture of

the bygone past, the lethargy and the decadence of the present age, the degradation of the Mohammadans in the living present”^{৯০}

পরিশেষে বলা যায় ‘মুসাদ্দাসে হালী’ একটি কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে এর প্রভাব অপরিসীম। অনেকেই এর নকল করতে চেয়েছে কিন্তু কেউ এর সমান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের কাছে এটি সমান জনপ্রিয় ছিল। ভাষার উৎকর্ষতা, কাব্যের অলঙ্করণ, সাবলীলতা ও সহজবোধ্যতায় এই গ্রন্থ একটি জ্বলজ্বলে তারকা।

মাসনুবিয়াতে হালী (مثنویات حالی)

উর্দু কাব্য সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে মাসনবী। আলতাফ হুসাইন হালী মাসনবী কাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চাকুরীর সুবাদে লাহোরে আসেন। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণেল হলরয়েডের পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ (১৮৩০-১৯১০ খ্রি.) লাহোরে ‘আজ্জুমান-ই-পাঞ্জাব’ গঠন করলে হালী এর সদস্য হন এবং এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত কবি সম্মেলনসমূহে পূর্ণোদ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর আধুনিক উর্দু কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। এ সময় তিনি আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে চারটি মাসনবী কাব্য রচনা করেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাব্যগুলি সংখ্যা বিবেচনায় মাত্র চারটি হলেও প্রত্যেকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও সবগুলিতে আধুনিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এগুলি উর্দু কাব্য সাহিত্যকে একটি নতুন পথে পরিচালিত করে নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচয় করে দেয়। যার ফলে উর্দু কাব্যসাহিত্যে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। নিম্নে কাব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বরখারাত (برکھارت)

برکھارت বা বর্ষাকাল আলতাফ হুসাইন হালীর লেখা প্রথম মাসনবী কাব্য। এই কবিতায় কবি বর্ষাকালের প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেছেন। কবিতার শুরুতে বর্ষা পূর্ববর্তী অসহনীয় গরমের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং সাথে সাথে গরমকালের বিভিন্ন পরিস্থিতিরও উল্লেখ করেছেন। প্রাণীকুলে অস্থিরতা, পার্বত্য অঞ্চলের উত্তাপ, সমুদ্রের পানির উষ্ণতা, বনাঞ্চলে গরমের তীব্রতা, উজাড় বাগানের চিত্র, চতুষ্পদ জন্তুর ছটপটানী, কর্মব্যস্ত মানুষের কষ্ট, উষ্ণ হাওয়ার তাপদাহ, সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা, নগরীর চিত্র, শিশু কিশোরদের দুর্দশা এ সকল চিত্র অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এ কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল অবস্থার বর্ণনা যেমন কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি মূল বিষয়বস্তুর স্বার্থক উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। গ্রীষ্মের বর্ণনা ব্যতীত বর্ষার স্বার্থক চিত্র অংকন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কবি এই কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন নিম্নোক্ত পংক্তিতে পরিলক্ষিত হয়:

گر می سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تپ رہے تھے کہسار
بھوبل سے سواتھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا
تھی لوٹ سی پڑ رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں
سانڈ ے تھے بلوں میں منہ چھپائے اور ہانپ رہے تھے چارپائے^{۹۰}

উপরোক্ত পংক্তিগুলোতে বর্ণনা প্রকরণের সাথে সাথে চাক্ষুষ বর্ণনা ও কবির অসাধারণ ভাবাবেগের চিত্র অংকিত হয়েছে। এই কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি বর্ষার আসন্ন বার্তার বর্ণনা দিয়েছেন। পুবালা বাতাসের আগমন, মেঘের আনাগোনা, বজ্রের আলোক উৎসব, শ্যামল উদ্যান, সবুজ বৃক্ষ, কোকিলের কুহতান, ময়ূরের ডাক, মানুষের আনন্দ উৎসব এবং সেই উৎসবের আনন্দে তাদের হারিয়ে যাওয়া এসব দৃশ্য হালী

برسات کا بج رہا ہے ڈنگا
اک شور ہے آسمان پہ برپا
ہے ابر کی فوج آگے آگے
اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے
ہیں رنگ برنگ کے رسالے
گورے ہیں کہیں میں کالے
ہے چرخ پہ چھاؤنی سی چھاتی
ایک آتی ہے فوج ایک جاتی د

کھم باغوں میں جا جاگڑے ہیں جھولے ہیں کہ سو سو پڑے ہیں
کچھ لڑکیاں بالیاں ہیں کم سن جن کے ہیں یہ کھیل کود کے دن
اک جھولے سے وہ گری ہے جاکر سب بنستی ہیں قہقہے لگا کر

নিশাতে উম্মীদ (نشاط امید)

ہوتا ہے نومیدیوں کا جب ہجوم آتی ہے حسرت کی گھٹا جھوم جھوم

গযলিয়াতে হালী (غزلیات حالی)

উর্দু কাব্যসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে গযল। আর উর্দু গযলের উন্নতিতে আলতাফ হুসাইন হালী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর সূদীর্ঘ জীবনে অসংখ্য গযল কবিতা রচনা করে উর্দু সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। হালীর গযলসমূহে প্রেমঘটিত বিষয়াবলীর বর্ণনার সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার বিষয়গুলো পাওয়া যায়। তাঁর গযলের ভাষা ও বর্ণনামূল্যে অত্যন্ত নান্দনিক, সহজ, সরল ও মনোমুগ্ধকর। নতুনত্ব, উন্নত চিন্তাধারা, আবেগপ্রবণতা এবং রসিকতা ও কৌতুক তাঁর গযলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রথমে প্রাচীন ধ্যানধারণা ও প্রচলিত রীতিনীতির অনুসরণে গযল রচনা করেছিলেন বলে তাঁর প্রথম যুগের গযলসমূহে পূর্ববর্তী গযল কবিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি পশ্চিমা সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আধুনিক কবিতা রচনার সাথে সাথে আধুনিক রীতিনীতির অনুসরণে গযল রচনা করে উর্দু গযলকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেন। নিম্নে তাঁর গযলের কয়েকটি পংক্তি বিবৃত হলো:

۱۹۵

কাসায়েদে হালী (قصائدحالی)

গযলের ন্যায় উর্দু কাব্য সাহিত্যের অপর একটি জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে কাসীদা। উর্দু কাব্যের পরিভাষায় কারো প্রশংসায় রচিত কবিতাকে কাসীদা বলা হয়।^{১৮} মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী কাসীদা কবিতাও রচনা করেছিলেন। কিন্তু কাসীদায় তিনি খুব বেশী সফলতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁর রচিত কাসীদাসমূহের মধ্যে নবী করীম (সা.), নওয়াব কুলুব আলী খাঁ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং নওয়াব স্যার আসমাঁ জাহের প্রশংসায় রচিত কাসীদাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দীওয়ানে এ সমস্ত কাসীদা বিদ্যমান। কাসীদাসমূহের উদাহরণ নিম্নরূপ:

নবী করীম (সা.) এর প্রশংসায় রচিত কাসীদা

بنے ہیں مدحت سلطان دوجہاں کے لئے
وہاں کے لئے
وہ شاہ جس کا عدد جیتے جی جہنم میں
کے لئے

سخن زباں کے لئے اور زباں
عداوت اس کی عذاب الیم جان

دراس کا کعبہ مقصود انس و حان کے

گھراس کامورد قرآن مہبط جبرئیل

لئے ۱۵

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রশংসায় রচিত কাসীদা

یاروں پہ جس نے کچھ قربان کر دیاہے
ملکوں میں جسکا چرچا ہر سمت ہو رہاہے
سید نے کام آکر جو قوم میں کیا ہے^{۲۰}

وقت اپنا کام اپنا جان اپنی مال اپنا
تعلیم کی تمہاری بنیاد اس نے ڈالی
بعد از قرون اولیٰ کس نے کیا بتاؤ

مراسیہ ہالی (مراثی حالی)

উর্দু কাব্যসাহিত্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে মরসিয়া। মরসিয়া (مرثیہ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিলাপ, শোকগাঁথা, বিষাদ সঙ্গীত ইত্যাদি। কাব্যের পরিভাষায় যে কবিতায় কোন মৃত ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করা হয় তাকে মরসিয়া বলে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় রচিত কবিতাকে মরসিয়া বলা হয়। কিন্তু উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া বলতে সাধারণতঃ ঐ কবিতাকে বুঝানো হয় যে কবিতায় হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এবং তাঁর সাথীদের ঐতিহাসিক কারবালার প্রান্তরে শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করা হয়।^{২১}

হালীর পূর্বে মরসিয়া কারবালার শহীদানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। হালী মরসিয়াকে কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি মনে করতেন সমগ্র জীবন একই বিষয় নিয়ে লেখা কবিতাকে সংকুচিত করে রাখার শামিল।^{২২} তাঁর মতে একজন কবি জাতির মুখপাত্র। জাতির মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে সকলের মাঝে ব্যথার সঞ্চার হয়। তখন একজন কবির নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে কাব্যের মাঝে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিকে জাগরিত করে রাখা।^{২৩}

হালী তাঁর এই মতাদর্শকে নিজেই বাস্তবে রূপ দান করেছিলেন। তিনি নিজেও কারবালার ঘটনা কিংবা হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) কে নিয়ে কোন মরসিয়া রচনা করেননি। তিনি তাঁর প্রতিটি রচনায় জাতির দুর্দশা এবং মাতৃভূমির বিনাশ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাঁকে জাতির মরসিয়া (শোকগাঁথা) কবি বলা হয়।^{২৪} গয়ল, মাসনবী, কেতআ, মরসিয়া, রুবাঈ, তারকীববান্দ তথা কাব্যসাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তিনি দেশ ও জাতির দুর্দশার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেননি। ‘মুসাদাসে হালী’ মুসলিম জাতির মরসিয়া। এছাড়া তিনি যেসব মরসিয়া লিখেছেন তাতে তাঁর হৃদয় আবেগ, আত্মার অনুভূতি, ভালবাসা ও স্বচ্ছতা এবং হৃদয়স্পর্শী প্রভাব প্রতিটি শব্দের মাঝেই অনুভূত হয়।

আলতাফ হুসাইন হালীর দীওয়ানে নিম্নলিখিত তিনটি মরসিয়া বিদ্যমান। যথা:

১. মরসিয়ায়ে গালিব (مرثیہ غالب)

এই মরসিয়া কবিতাটি তিনি ১২৮৫ হিজরী মৃতাবেক ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর কাব্যগুরু মিরখা আসাদুল্লাহ খান গালিবের মৃত্যুর বছর রচনা করেন।^{২৫} এ মরসিয়াটি উর্দু সাহিত্যের এক অসাধারণ কীর্তি। এর প্রতিটি শব্দ স্থায়ী মহান শিক্ষকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সিক্ত।

মিরখা গালিবের উপর মরসিয়া রচনার মাধ্যমে হালী উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া রচনায় একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। ব্যক্তিগত শোকের চেয়ে জাতীয় চেতনা হালীকে অনেক বেশী নাড়া দিয়েছিল। কারণ গালিবের মৃত্যু শুধুমাত্র গালিবের অন্তর্ধান ছিল না, সেটা ছিল শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি যুগবসান। সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এ মরসিয়াটি ভাষার সরলতা এবং সুনিপুণ বর্ণনামূল্যের দিক দিয়ে উর্দু কাব্যসাহিত্যে একটি উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।^{২৬}

২. বড়ে ভাই কা মরসিয়া (بڑے بھائی کا مرثیہ)

বড় ভাই খাজা ইমদাদ হুসাইনের মৃত্যু শোককে স্মরণীয় করে রাখতে আলতাফ হুসাইন হালী ১৩০৩ হিজরী মৃতাবেক ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এ মরসিয়া কবিতাটি রচনা করেন।^{২৭} যে ভাই তাঁকে সন্তানের মত লালন-পালন করেছিলেন তাঁকে হারিয়ে হালী অসহায়ত্ববোধ করেন এবং এ অসহায়ত্ববোধই পরবর্তীতে তাঁকে এ মরসিয়া কবিতাটি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একথা সত্য যে, মির্যা গালিবের উপর রচিত মরসিয়ার তুলনায় সাহিত্যিক মানে এটি তেমন উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি। এর কারণ এটা হতে পারে যে, এটা ছিল হালীর ব্যক্তিগত শোক। ভাইয়ের মৃত্যুতে দেশ ও জাতির কোন ক্ষতি হয়নি। ব্যক্তিগত শোক সেটা যতই প্রবল হোক না কেন, জাতীয় জীবনে এর তেমন কোন প্রভাব নেই, জাতীয় ক্ষতির তুলনায় তা নিতান্তই তুচ্ছ। তবে হালী এ মরসিয়াতেও তাঁর অন্তরের ব্যথা ও বেদনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

کل سوگ میں بھائی کے اسے دیکھ کے چپ چپ
حالی سے کہا ہمنے کہ اے
بحرمعانی

خاموش کبھی ہمنے تجھے یوں نہیں دیکھا
کیابوگئی وہ تری طبیعت کی
روانی

باقی رہے گا داغ سدابھائی کادل پر
برچند کہ فانی تھوہ اور ہم بھی ہیں
فانی^{۲۸}

৩. মরসিয়ায় হাকিম মাহমুদ খান (مرثیہ حکیم محمودخان)

আলতাফ হুসাইন হালী এ মরসিয়াটি ১৩১০ হিজরী মৃতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন।^{২৯} হাকিম মাহমুদ খানের মরসিয়া শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির মরসিয়া ছিল না, বরং গালিবের ন্যায় তা ছিল সমগ্র মুসলিম জাতির মরসিয়া। ব্যক্তি শোক প্রকাশের পাশাপাশি এতে দিল্লীর শ্রেষ্ঠত্ব, ধনসম্পদ, উত্থান, শিল্প ও সংস্কৃতির ধ্বংসলীলার জন্য বিলাপ করা হয়েছে। এ মরসিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাম বাবু সাকসিনা বলেন:

”اس میں دلی کی تیابی اور مسلمانوں کی پستی کا ذکر نہایت اثر کے ساتھ عبرت انگیز
طریقہ سے کیا ہے۔“^{۳۰}

মোটকথা বর্ণনার সরলতা এবং ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতার দিক দিয়ে হালীর মরসিয়া কবিতাগুলি উর্দু কাব্যসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রতিটি মরসিয়ায় দেশ ও জাতির প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালবাসার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

রুবাইয়াতে হালী (رباعیات حالی)

উর্দু কাব্যসাহিত্যের বিশেষ একটি শাখা হচ্ছে রুবাই (رباعی)। দুই পংক্তি অর্থাৎ চার লাইন বিশিষ্ট কবিতাকে কাব্যের পরিভাষায় রুবাই বলা হয়।^{৩১} সাধারণতঃ নীতিকথা, দার্শনিকতা, ধর্ম ও চরিত্রগঠন, সূফীবাদ এবং উপদেশ হচ্ছে রুবাই-র বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে রুবাই অত্যন্ত কার্যকর কিন্তু কিছুটা কঠিন প্রকৃতির কবিতা।

রুবাই কবিতা রচনাও আলতাফ হুসাইন হালী অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর দীওয়ানে ১০৭টি রুবাই রয়েছে। এছাড়া তিনি আরো রুবাই রচনা করেছিলেন। তাঁর রুবাই সমগ্র রুবাইয়াতে হালী (رباعیات حالی) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।^{৩২} তাঁর রুবাইয়াতের ইংরেজী অনুবাদও হয়েছে।^{৩৩} হালী তাঁর রুবাইয়াতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী উপস্থাপন করেছেন।

তعليم (تعليم) শিক্ষা ও প্রতিপালন (فلسفه و حکمت) জ্ঞান ও দর্শন (مذهب و اخلاق) ধর্ম ও চরিত্র (تمدن و معاشرت) উদ্যোগ ও উন্নয়ন (ادب و سياست) রাজনীতি ও সাহিত্য (پند و موعظت) নৈতিকতা (کردار و عمل) এবং কর্ম ও নৈপুণ্য (ملک و ملت) দেশ ও জাতি (بنده و مغال) এবং কাম ও নৈপুণ্য (بنده و مغال)।

হালীর রবাবীর বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্ম ও চারিত্রিক বিষয়াবলী। ধর্মীয় রবাবীয়াতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার পেয়েছে আল্লাহর একত্ববাদ। তিনি মনে করতেন সকল মানুষ নিজ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে অর্থাৎ সকলেই একত্ববাদে বিশ্বাসী। কেউ মূর্তির মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে সন্ধান করে, আবার কেউ অগ্নিপূজার মাঝে প্রস্তার গান গায়। এমনকি নাস্তিকরাও জড় বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞান করে সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নেয়। যেমন হালী বলেন:

ہندونے صنم میں جلوہ پایا تیرا آتش پہ مغال نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا^{۵۸}

পরিশেষে বলা যায় হালীর রবাবীয়াতের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সহজে বোধগম্য। কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও সামগ্রিকভাবে উর্দু সাহিত্যে হালীর রবাবীয়াতের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম।

কেতআতে হালী (قطعات حالی)

উর্দু কাব্য সাহিত্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে কেতআ। কেতআ (قطعه) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কবিতা বা বিচ্ছিন্ন অংশ, টুকরা ইত্যাদি। উর্দু কাব্যের পরিভাষায় দুই বা দুইয়ের অধিক পংক্তি বিশিষ্ট কবিতাকে কেতআ বা টুকরো কবিতা বলা হয়।^{৫৯} রবাবীর ন্যায় কেতআর বিষয়বস্তুও সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ সমাজ সংস্কার, নৈতিকতা ও চরিত্রগঠনমূলক বিষয়াবলী এতে আলোচনা করা হয়।

উর্দু সাহিত্যে কেতআ রচনা করে যারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে আলতাফ হুসাইন হালী অন্যতম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য কেতআ রচনা করেছেন। তাঁর দীওয়ানে ৬৭টি কেতআ বিদ্যমান।^{৬০} এছাড়া তিনি আরো অনেক কেতআ লিখেছেন। তাঁর কেতআ সমগ্র কেতআতে হালী (قطعات حالی) নামে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।^{৬১} ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, চরিত্রগঠন, সাহিত্য, রাজনীতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা তাঁর কেতআয় স্থান পেয়েছে।

আলতাফ হুসাইন হালীর অধিকাংশ কেতআ শিক্ষণীয় গল্পের অনুবাদ। যার মাধ্যমে তিনি জাতিকে পরিশ্রমী, চিন্তাশীল ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কেতআ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার, মানব কল্যাণ ও জাতির উন্নতি সাধন করা। হালী তাঁর কেতআর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাও তাঁর কেতআর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি পাশ্চাত্য এবং পশ্চিমা শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের প্রতিও আলোকপাত করেছেন। সাহিত্য ও জীবনের সম্পর্ক স্থাপনে, জীবনের জটিলতা নিরসনে এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর কেতআসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এগুলোকে যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার বলা হয় তাহলে অযৌক্তিক হবে না। উর্দু সাহিত্যে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

বিবিধ বিষয়ে রচিত কবিতামালা

আলতাফ হুসাইন হালী শুধুমাত্র মুসাদ্দাস, মাসনবী, গয়ল, কাসীদা, মরসিয়া, রবাবী ও কেতআ রচনা করেননি, বরং বিবিধ বিষয়ে তিনি অসংখ্য কবিতামালা রচনা করেন। মুসাদ্দাস রচনার পর তিনি জাতীয়

جىونەر بىڭنن بىشئ نىئە لىئا شۇرۇ كىرەن . جۇان-بىجۇان ئىكە شۇرۇ كىرە ساماجىك ۋ ارئىئەتىك كىون بىشئىئ تائۇر دۇشئى اءىڭىئە يائىنن .

مۇسادداس ىرربائى سامئە جاتىئ سامسئابلى نىئە ئە سامسئ كبىئا رىئاا كىرەئەن تانئائە نارىئەئ سامسئابلى سامسئىر كىرىئا كبىئامالائ بىشئىئابە ئىللەئىئىاى . ارىرپۇرئە انئ كىئ ا بىشئە كبىئا رىئاا كىرەننن . نارىئە ئىرۇ كابئە شۇماتر ىرئىكا هىسابئە بىبەئاا كىرأ هئە . تارأ كىبىل ئىاىبىلأسەر ئىپكىرئىل هىل . تاءەر ساماجىك مرىاا نىئە كىئ اباىنن . ار اىكئ بىڭ كارىئ ائى ئە , ساماىئ تاءەر كىون مرىاا هىلنا . سئار سىئىد آاهمىد ئان سىرپئام نارىئەئ ابههلاء ىرئى دۇشئى دىن اباى تاءەر ساماجىك مرىاا ىرئىئائىر كىئىا كىرەن .⁷⁷ فىلە ساماجىك جىابنە نارىئەئ سامسئابلى بىشئىئ شئان ائىكار كىرە نىئ اباى تائ اىرۇ كابئەر بىشئىبىكئە ىرئىئ هئى . سئار سىئىد آاهمىد ئانەر سائە هالىئ نارىئەئ مرىاا ىرئىئائى اىرئى بئىكا ىالان كىرەن . نارىئ ائىكار اباى نارىئەئ سامسئابلى نىئە ئىنن دۇئ بىپسئبىك كبىئا رىئاا كىرەن . ئاا:

(1) مۇناىائە بىوئاه (مناجات بىوہ) (2) كۇپئى داء (چپ كى داء) . كبىئا دۇئ سامسئىر نىللە آالىئاا كىرأ هلىا:

مۇناىائە بىوئاه (مناجات بىوہ)

اىئ 889 ىرئى بىشئى هالىئ اىكئ دىرئ ماسنبى كابى . 1888 ىرئىئائە اىئ ىرئاشىئ هئى .⁷⁸ ائە ئارئبىرئەر بىئبا نارىئەئ ساماجىك سامسئابلى ائىئىئ هدىاكىرك بىسئامى ئىللە ىرأ هئىئە . ئارئبىرئەر مئە كىرأ هئ نارىئ جىابن تار سئامىئ جئى نىبىدئ . ارئائ تار جئى تار سئامىئ جئى اباى تار جىابئ ئاكائا ۋ تار سئامىئ جئى . ا كارىئ سئامى بىئىاىر سائە سائە سە ساماجىك بىاىائ ىرئىئ هئى . سە ئال بئابار ئىكە بىشئىئ هئى . كۇسئسكارەر بىبىرئى هئى تاكە اشئب آاىئا دىئا هئى . مانوش تار آاىا ىرئىئ دىئئە آاىنا . هالى ئارئىئ بىئبا نارىئەئ ائى ساماجىك سامسئابلى ائىرئابە انوشب كىرەن اباى تائ ا كبىئار مائىمە كىمئكارئابە ئىللە ىرەئەن . ئىمئ ئىنن بىلەن:

بى كس كاىم آوار بى ئوبى برى نىئ كاىاربى ئوبى
دكها، دكهى، ىئىم اور بىوہ ئىرە بى بائھ ان سب كابى كهىوا
ئوبى ئبىئى، ئوبى ئرائى ئوبى ىہ بىرئە ىارلىكائى
ىباركە ئىرە ىوچئنا كىابى
مارمىن بىئ اىك ئىرە مزابى⁸⁰

هالى تائ ساماجىك سىئەئنا ۋ ائىر مئىابىب ئىكە 'مۇناىائە بىوئاه' كبىئااى رىئاا كىرەئىلەن . ئارئبىرئەر ساماجىك سامسئابلى سامسئىر ئىنن سامىك ابىاا هئىلەن . ساماىئ نارىئ ابىئان سامسئىر ۋ سئآ ىارئا راءئەن . اپسئسئى رىبە ۋ سىااار هئىلەن . ساماجىك ىرئىبىكئا تائ نئىرئىنە هئىل . آار ا سبكىئور باسئب ىرئىاا كىرە ئىنن 'مۇناىائە بىوئاه' كبىئااىكە جئىرئى ۋ سئارئك كىرە ئىللە سئىم هئىئەن .

كۇپ كى داء (چپ كى داء)

উর্দু কবিতায় নারীদের শুধুমাত্র প্রেমিকা হিসাবে উপস্থাপন করা হতো। তাদেরকে কেবলমাত্র মনোরঞ্জন উপকরণ বিবেচনা করা হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নর্তকীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। হালীই প্রথম এই কবিতায় নারীদের মা, বোন ও মেয়ে সম্বোধন করে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তিনি তাদের সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান করেছেন। তিনি সমাজকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নারী মা, বোন ও কন্যা এবং তাদের বাদ দিলে জীবন অসম্পূর্ণ। তারা তাদের সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা ও মায়ামমতা দিয়ে পরিবারের শোভা বর্ধন করে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সহচর্য অপরিহার্য। যেমন হালী বলেন:

گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے⁸⁵

এছাড়া হালী অনেক তারকীবান্দ জাতীয় কবিতা রচনা করেছেন। এ জাতীয় কবিতার মাধ্যমে তিনি উর্দু সাহিত্যে জীবন সমস্যার সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর তারকীবান্দ জাতীয় কবিতার মধ্যে একটি বিখ্যাত কবিতা শেকওয়ানে হিন্দ (شکوہ ہند)। নিম্নে কবিতাটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এই তারকীবান্দ জাতীয় কবিতাটি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।^{৪৩} এতে তেরটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদে এগারটি করে পংক্তি অর্থাৎ সর্বমোট ১৪৩টি পংক্তি রয়েছে। এই কবিতায় হালী ভারতীয় মুসলমানদের দুরবস্থার চিত্র অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ভঙ্গিমায তুলে ধরেছেন।

نقش ہیں دل پر ہمارے سب مدارتیں تری

ہم نہ بھولیں گے دن ترے اور راتیں تری⁸⁸

ہم کو ہر جوہر سے یوں بالکل معرا کر دیا تو نے اے آب و ہوائے ہند یہ کیا

হালীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজ সংস্কার। আর সংস্কারের চেতনায় তিনি পুরো সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। সমাজের সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রাণের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক জীবনের যে বিষয়গুলি বর্ণনা ও হতাশার বেড়া জালে আবদ্ধ তিনি সেগুলির মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় নবউদ্যমের কথা বলেছেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে দিন বদলের দোলা দেখতে চেয়েছেন। তাদের রীতিনীতি ও আচার আচরণের পরিবর্তন চেয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন নি, বরং জীবন যাপনের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন।

উর্দু কাব্যসাহিত্যে হালীর কবিতাসমূহ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর কবিতাসমূহ উর্দু কাব্যজগতে একটি বিশেষ বিপ্লব ও মাইলফলকের দাবীদার। তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যকে নতুন পথ ও নতুন গন্তব্যস্থলের সাথে পরিচিত করেছেন। তিনি এক নতুন যুগের সূচনাকারী, একটি পরিবর্তনের দ্রষ্টা। তিনি একটি জাতিকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। আর সে জাতি তাঁকে চিরঞ্জীব করে রেখেছে। যতদিন এ জাতির অস্তিত্ব থাকবে তাঁর কবিতাসমূহও জীবিত থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১২১।
২. শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা: সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২৩৪।
৩. ইসমত জাহান, হালী আওর উনকি আদবি খেদমাত (পাটনা: দি আর্ট প্রেস, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৯৯।
৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা দেশ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫১৭।
৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
৬. আলতাফ হুসাইন হালী, মুসাদ্দাসে হালী (লাহোর: পাকিস্তান টাইমস প্রেস, তা.বি.), পৃ. ১৭-১৮।
৭. সালেহা আবেদ হুসাইন, ইয়াদগারে হালী (নয়াদিল্লী: আঞ্জুমানে তরাক্কীয়ে উর্দু, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৫৯-১৬০।
৮. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়েতে শায়ের (লাহোর: সরফরাজ প্রেস, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ২৬১।
৯. Ram Babu Saksena, A History of Urdu Literature (Allahabad: U.P., 1940 AD), p. 215.
১০. আলতাফ হুসাইন হালী, মাসনুবিয়াতে হালী (লাহোর: মুযাফফর প্রিন্টার্স, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১০৯।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
১৬. সিরাজ রব্বানী, ফরহাঙ্গে রব্বানী (ঢাকা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৬০৫; শফি আহমদ সিদ্দিকী, উর্দু যবান ওয়া কওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড (নয়াদিল্লী: মাকতাবায়ে জামেয়া লিমিটেড, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৪২।
১৭. আলতাফ হুসাইন হালী, দীওয়ানে হালী (দিল্লী: উর্দু একাডেমী, ১৯৯২ খ্রি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১৮. শফি আহমদ সিদ্দিকী, উর্দু যবান ওয়া কওয়ায়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
১৯. আলতাফ হুসাইন হালী, দীওয়ানে হালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।
২১. সিরাজ রব্বানী, ফরহাঙ্গে রব্বানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬; শফি আহমদ সিদ্দিকী, উর্দু যবান ওয়া কওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
২২. আলতাফ হুসাইন হালী, মুকাদ্দমায়ে শের ও শায়েরী (লাহোর: মাকতাবায়ে জাদীদ, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ২৭৩।

-
২৩. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭৪।
২৪. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২৬।
২৫. আলতাফ হুসাইন হালী, দীওয়ানে হালী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫৬।
২৬. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৩০।
২৭. আলতাফ হুসাইন হালী, দীওয়ানে হালী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭১।
২৮. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২।
২৯. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯০।
৩০. রামবাবু সাকসিনা (মির্যা মুহাম্মদ আসকরী অনূদিত), তারিখে আদবে উর্দু (লাহোর: এলমি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৪১৩।
৩১. সিরাজ রব্বানী, ফরহাঙ্গে রব্বানী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩৮; শফি আহমদ সিদ্দিকী, উর্দু যবান ওয়া কওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৭।
৩২. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯২।
৩৩. হালীর রুবায়্যাত ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন মি: জি আই ওয়াবেদ। ড. রামবাবু সাকসিনা, তারিখে আদবে উর্দু, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪১৪।
৩৪. আলতাফ হুসাইন হালী, দীওয়ানে হালী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৪।
৩৫. সিরাজ রব্বানী, ফরহাঙ্গে রব্বানী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৩৭; শফি আহমদ সিদ্দিকী, উর্দু যবান ওয়া কওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।
৩৬. আলতাফ হুসাইন হালী, দীওয়ানে হালী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭-৫২।
৩৭. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯২।
৩৮. ড. ইবাদত বেরিলবী, রোয়াইয়ত কি আহমিয়াত (করাচি: আঞ্জুমানে তরাক্কীয়ে উর্দু, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ২১৩।
৩৯. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৬।
৪০. আলতাফ হুসাইন হালী, মুনাজাতে বেওয়া (লাহোর: মোস্তফায়ী প্রেস, ১৯৩০ খ্রি.), পৃ. ৫।
৪১. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯১।
৪২. আলতাফ হুসাইন হালী, চুপ কি দাদ (লাহোর: করিমী প্রেস, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ৩।
৪৩. ড. শুজায়াত আলী সন্দিলুবি, হালী বাহায়ছিয়তে শায়ের, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৭।
৪৪. আলতাফ হুসাইন হালী, শেকওয়ায়ে হিন্দ (লাহোর: মশহুর আলেম প্রেস, ১৯৪০ খ্রি.), পৃ. ৪।
৪৫. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭।

ইকবালের দৃষ্টিতে নারী : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আতাউর রহমান*

Abstract: The scion of an ancient and respectable family of Kashmiri Pandits. Iqbal was born at Sialkot in 1877. His forefathers embraced Islam about 200 years ago. In his boy hood this genius found many opportunities to cultivate his poetic fancy. It was the time of Mushairs (meeting of the poets) when everyone who had something worth expression in the form of poetry had an opportunity to give to the public the product of his imagination, Iqbal availed his self of this opportunity. This is not all. The main characteristics of Iqbal's poetic works are Width, warmth and sincerity, wisdom and commonsense, large humanity, shrewd, lofty, idealism and purity and far sweeping philosophy-these are the essential traits of his poetical works. Iqbal's poems can be classified into five groups; National, communal, philosophical, natural and humorous.

Iqbal thought women an integral and inseparable part of the society. He was optimistic about women that they have a very significant role to play in nation building and protecting the age old customs and traditions of a nation. He says, "The women is the prettiest creature among the creation of Allah". He further argues, "The women who is beautiful and at the same time she is free from haughtiness, is the prettiest creation of Allah on the earth".

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল্লামা ইকবাল। তাঁর জন্ম ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে। আল্লামা ইকবালের প্রকৃত নাম শেখ মুহাম্মদ ইকবাল। তাঁর বাবার নাম শেখ নূর মোহাম্মদ এবং মাতার নাম ইমাম বিবি।

আল্লামা ইকবালের কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় শৈশবেই। তিনি তাঁর কবিতা লিখে তৎকালীন বিখ্যাত উর্দু কবি দাগের নিকট পাঠাতেন। ইকবাল স্কুল জীবন থেকেই লেখা-পড়ায় ছিলেন খুব ভাল। ১৮৯৭-এ লাহোর কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পাস করেন। ১৮৯৮-এ লাহোর 'ল' কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু আইনের মূলনীতি বিষয়ে অকৃতকার্য হন। দু'বছর পর পরীক্ষা দিয়ে 'ল' পাস করেন। ১৮৯৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।^১

তাঁর ছিল অদম্য জ্ঞানপিপাসা। এ পিপাসা মিটাতে তিনি ১৯০৫ সালে ইউরোপ যান। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯০৮-এ তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন, ১৯০৭-এ তিনি জার্মানির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে- The Development of Metaphysics in Persia – A Contribution to History of Muslim Philosophy বা জ্ঞান চর্চায় ইরান অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ফ্রিডরিচ হোমেল। ১৯০৮ সালে আল্লামা ইকবাল ইংল্যান্ডের লিংকন ইন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যারিস্টারি পাস করেন।^২

আল্লামা ইকবালের কর্মজীবন বর্ণাঢ্য। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৯৯ সালে লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। ১৯০১ সালে তিনি সরকারী কলেজে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি লেখা-পড়ার পাশাপাশি লন্ডনের একটি কলেজে ৬ মাস আরবির অধ্যাপনা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ব্রিটিশ শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।^৩

* প্রফেসর, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউরোপ থেকে ফেরার পর ১৯২০ সালে তিনি লাহোর থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।^৪ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে।^৫ তাঁকে ডি.লিট (ডক্টরেট অব লিটারেচার) ডিগ্রি প্রদান করে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আল্লামা ইকবাল আনজুমাতে মুসলমানে কাশ্মীরী লাহোর শাখার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লাহোর কোর্টে আইনজীবী হিসেবে আইন ব্যবসা করেন। মুসলিম লীগের রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সামাজিক সংগঠন আনজুমাতে হেমায়েতে ইসলামের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৩৫ সালে তিনি পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।^৬

আল্লামা ইকবাল সর্বপ্রথম ১৬ বছর বয়সে গুজরাটের সিভিল সার্জন খানবাহাদুর আতা মুহাম্মদের ১৯ বছর বয়স্কা কন্যা করিম বিবিকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রীর গর্ভে কন্যা মিরাজ কোস ও পুত্র আফতাব ইকবালের জন্ম হয়। পরে এক কাশ্মীরি তরুণীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তার গর্ভে জাভেদ ইকবাল নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে আল্লামা ইকবাল মোখতার বিবি নামে লুধিয়ানাবাসী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর এ স্ত্রী ১৯২৪ সালে সন্তান প্রসবের সময় ইন্তেকাল করেন।^৭

আল্লামা ইকবাল যে আধুনিকতার নামে, নারী মুক্তির নামে প্রগতি, প্রেম, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার নামে যৌনগন্ধী কোন ভ্রম-বিভ্রমের শিকার হন-নি, পরিণত হন-নি একজন লঘুচিত্ত নারী-উপাসকে। তার প্রকৃত কারণ, তাঁর পুরো অন্তর্জগৎ ছিল আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের (সা:) প্রতি অনিশ্চেষ্ট মুহাব্বতে পরিপূর্ণ, ইসলামের নির্ভুল হেদায়েত দ্বারা আলোকিত।

আল্লামা ইকবালের রাসুল (সা:)-দৃষ্টি সাধারণ মানুষের সমতুল্য ছিল না; একজন পূর্ণ পরিণত, বুদ্ধিবৃত্তিতে অগ্রসর, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মুসলমানের অন্তঃপ্রসারী ভক্তি ও ভালবাসার মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। বিশ্বসভ্যতায় রাসুল (সা:) এর অসামান্য অবদান এবং তাঁর বাণী ও কর্মের বিপুল প্রভাব ইকবাল চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল। তাঁর নবুয়তির মধ্য দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব সমাজে যে নবজাগতির আলোকরশ্মি আগমনের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল ইকবাল তা অনুভব করেছেন তাঁর বিপুল প্রসারী মানবিক হৃদয় দিয়ে। আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে জাগরণের এ উনমুখর দিনগুলিতে। তিনি তাঁর কবিতা ও নিবন্ধাবলীতে রাসুল (সা:) এর প্রতি নিবেদন করেন অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের উর্দু কবিতালী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় ফুটে উঠেছে রাসুল (সা:) এর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যয়। একজন ভক্তের হৃদয়ের ভালবাসা অনুরণিত হয়ে উঠেছে এভাবে বিশ্বের ইতিহাসে রাসুল (সা:)-ই হলেন একমাত্র আদর্শ মানুষ যার দেখানো পথ মানবতাকে নিয়ে যেতে পারে মুক্তি ও কল্যাণের রক্তিম ভোরের দিকে। কওমী জিন্দেগি নামে এক প্রবন্ধে তিনি এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন-

The prophet of Arabia was the first to preach man's natural right to freedom and issued injunctions that the rights and privileges of masters and slaves were the same. This was a social revolution. Whose impact is being felt even, in the world of today, what was the result of this auspicious teaching of the prophets in Muslim history. Slaves became kings and prime ministers.^৮

আল্লামা ইকবালের পিতা-মাতা দু'জনেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ন। শুধু ধর্মপরায়ন বললে কম বলা হয়, ইসলামের দাবী অনুযায়ী তাঁরা উভয়েই ছিলেন সকল পার্থিবতা থেকে মুক্ত, ইসলামি বিশ্বাস ও চৈতন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তাঁরা কেউই প্রচলিত ধারাগামত শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা আল্লাহকে বুঝতেন, আল্লাহর রাসুলকে (সা:) বুঝতেন এবং রাসুল (সা:) আনিত দীন ও দ্বীনের দাবিকে বুঝতেন। শুধু বোঝা নয়, এই দ্বীনের প্রতি মুহাব্বত ও পূর্ণ আনুগত্যের প্রণে তাঁরা উভয়েই ছিলেন নিখাদ মুমিন, ছিলেন সদা-সর্বদা সতর্ক

ইসলামের পাবন্দ এবং এ জন্যই আল্লামা ইকবালের মহীয়সী মাতা তাঁর সন্তানকে সর্বপ্রকার নিষিদ্ধের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন; আর পিতা তাঁর পিতৃ ঋণ পরিশোধের শর্ত হিসাবে শুধু এটুকু নিশ্চয়তা দাবী করেন যে, বিত্ত-বৈভব-খ্যাতি ইত্যাদি থেকে অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে আল্লামা ইকবাল তাঁর সমগ্র জীবনের সকল ধর্ম ও সাধনাকে নিয়োজিত রাখবেন একমাত্র ইসলামের খেদমতে।^৯

বোঝা যায়, কী শুদ্ধতম, কী পবিত্রতম ভিত্তির উপর আল্লামা ইকবালের জীবনসৌধ প্রতিষ্ঠিত। আর এতদসঙ্গে ছিল পরম অনুরাগে আল-কোরআনের অধ্যয়ন এবং এই মহাগ্রন্থে বিধৃত শাস্ত্র হেদায়াতের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

আল্লামা ইকবাল যে নিজেকে কোন দিকেই এতটুকু ন্যূন বা পার্শ্ব পরিবর্তন না করে, কাব্যে ও জীবনে উভয়ত, নারী-রোমাঞ্চ থেকে মুক্ত এক শ্রীল ও চিত্তবিক্ষেপহীন সাধকে পরিণত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লামা ইকবাল নারীদের নিয়ে যা-ভাবতেন, যে রূপে ও যে-দৃশ্যে অবলোকন করতে চাইতেন, সেই প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল তাঁর আপন জননী ইমাম বিবি। স্বামী-সন্তান-আত্মীয় পরিবৃত একটি সুখী গৃহী জীবনের মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করাই যে নারীর জন্য সর্বাধিক জরুরী, সমগ্র মানব বংশের জন্য জরুরী। এই অতীত কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় বিশ্বাস ছিল আল্লামা ইকবালের একান্ত বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষিতা রূপে তথাকথিত প্রগতি ও নারীমুক্তির বাহানায় বহির্জগতে বেপরোয়া বিচরণশীল আধুনিকারূপে আল্লামা ইকবাল নারীকে দেখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এটাকে মানব-সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক একটি বড় ধরনের পান্না, একটি অতিশয় গর্হিত ও নিকৃষ্ট জীবনদর্শন বলে বিশ্বাস করতেন।^{১০}

আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় কী-ভাবে নারী ও নারীর মূল্যকে উপস্থাপন করেছেন, তা আলোচনা করাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা মেনে নিতে দ্বিধা করবো না যে, কবিতা একটি অতিশয় জটিল ও রহস্যময় শিল্প। কবিতায় কবির অন্তর্দেশকে যেমন এক ধরনের আলোয় চিনে নেয়া সম্ভব হয়; কবিতার কারণে আবার কবিতার মধ্যেই অনেক ছায়াচ্ছন্ন গোপনতা ও সৃষ্টি হয়। এ জন্য এই রহস্যময়তার কারণে কবিতার মত কবিও একটু একটু অধরাই থেকে যান; একটি অংশে আলো পড়লে আরেকটি অংশ অন্ধকার হয়ে ওঠে। এই ধরনের আলো-ছায়ায় আনাগোনা বা সহাবস্থান কবি ও কবিতার পরিচয়, সেটা এক মহা-বিতর্কের বিষয়। তবে একটি কথা সত্য যে, এমন অসংখ্য ছোট-বড় কবির কথা আমরা জানি, যাঁরা কল্পনার সঙ্গে প্রবৃত্তির কাঁচা গন্ধকে মিলিয়ে একটা নান্দনিকতার বিদ্রম সৃষ্টি করেন। এই ধরনের কবিদের কথা ভাবলে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে আল-কোরআনে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আল্লাহ পাকের কথা,

“শয়তান এদের উপর প্রভাব রচনা করে; এবং কল্পনার নানা উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘূর্ণায়মান এই কবিদের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই এদের অনুগামী।”^{১১}

অর্থাৎ আল্লাহপাকের ঘোষণা মতে এই কবিরা নান্দনিক-নারীপূজারী রূপে যতই খ্যাত ও ব্রত হোন, প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যভ্রষ্ট ও কপট, প্রেমিকের ছদ্মবেশে প্রগলভ মুনাফিক। কিন্তু আল্লামা ইকবাল ছিলেন এই ভাবালুতা ও প্রগলভতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যাঁর কবিতার অন্তঃপ্রেরণা একান্তভাবেই আল্লাহপাকের ইলহাম। অবশ্যই ইলহাম, কারণ আল্লামা ইকবাল নিজেই বলেন,

لهویندباز اداگر صاصبالهام
 ہے اسکینگہ فکر و عمل کے ہے صہیز!
 اسکے نفسگر عکینا تیر ہے الیسی
 لهو جاتی ہے خاکچمننا نثر آمیز!
 شابینکیادالہو نی ہے بلبلمینمودار۔

অর্থ:

‘স্বাধীন মানুষ যদি ইলহাম লাভ করে,
দৃষ্টি তার চালক হয় চিন্তা ও কর্মের,
উষ্ণ প্রশাসের প্রভাবে তার বাগিচার মৃত্তিকা হয়ে ওঠে অগ্নিময়,
শাহীনের প্রকৃতি লাভ করে বুলবুল।’^{১২}

এই ইলহামের কারণেই এক অসাধারণ অন্তঃপ্রেরণার অধিকারী আল্লামা ইকবাল ছিলেন একেবারেই অন্য মানুষ। তাঁকে অন্য অনেকের মত জীবনধর্মিতার নামে চুটল বাহানা সৃষ্টি করতে হয় না, প্রবৃত্তির ও খেদমত করতে হয় না। আর এ জন্যই তাঁর কবিতায় অন্য অনেক বিষয়ের মতো নারীদের সম্পর্কেও যা বাঙময় হয়ে ওঠে, তা-সবই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের (সা:) কথারই অকপট প্রতিধ্বনি।

পৃথিবীর মায়াবী কোলে যুগে যুগে এসেছে কোমল কোমল হৃদয় নিয়ে, মধুর অধর নিয়ে, আঁখিতে সাগর সাগর সৌন্দর্যের তৃষ্ণা নিয়ে অসাধারণ মানব শিশুর দল। তারা ধরণীর রূপ-রস-সুধার খোঁজ পেয়েছেন, উপভোগ করেছেন আর সাধারণ মানবকুলকে তার বার্তা শুনিয়েছেন। তারা দেখেছেন, এ ধরাতলের সৌন্দর্য শুধুমাত্র বাইরের আঁখি দিয়েই নয়, দেখেছেন অন্তরের চোখ দিয়ে, কল্পনার শক্তি দিয়ে। তারা খুঁজে পেয়েছেন প্রতিটি বস্তুর মাঝে গোপন রহস্যের সন্ধান, শুনতে পেয়েছেন প্রতিটি হৃদয়ের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বেজে ওঠা ভালবাসার আহ্বান। এ সব বুলীর ধরণীর দুলালরাই মনের মাধুরী মিশিয়ে শব্দের প্রসূন দিয়ে গিয়েছেন। কথার মালা, সৃষ্টি হয়েছে কবিতা ও গান। এরা কবি ও সৌন্দর্যের সন্তান, মানবতার অলংকার ও গৌরব। এ শতদলের নিকুঞ্জের ফোটা ফুল মহাকবি আল্লামা ইকবাল-বিশ্ব-মানবতার সম্পদ মুসলমানের অহংকার। তিনি এলেন কাব্য জগতের বুক হেনার রোশনী নিয়ে। যখন পৃথিবী বস্তুবাদের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, গণতন্ত্রের জগদল নিষ্পেষিত, সমাজবাদে মোহাচ্ছন্ন, নাস্তিক্যবাদের শোতে বিশ্ব প্লাবিত তখন এলেন ইকবাল বুক উত্তুঙ্গ পর্বতের দৃঢ়তা নিয়ে, অন্তরে এক সাগর ওহি নিষিক্ত জ্ঞানের বার্তা নিয়ে, চোখে অনন্ত মালকুতি জ্যোতি নিয়ে সমস্ত বিশ্বের গৌরব রূপে। এ কারণেই মহীশুর টাউন হলে কবির সংবর্ধনা সভায় বলা হয়েছিল-

"The Muslim may claim Dr. Md. Iqbal a million times their property, but he belongs to us all".^{১৩}

হ্যাঁ, আল্লামা ইকবাল সবার কবি, সাধারণের কবি, অসাধারণের কবি, মুটে-মজুর-চাষীর কবি, রূপা-রূপভাবের কবি, তিনি নর-নারী সব মানুষের কবি, তিনি সাম্য-শান্তি ও মানবতার কবি। তিনি রসিক, দার্শনিক কবি। তাঁর কবিতাবিধি অতলান্ত। এমন ডুবুরি কমই আছেন যারা তাঁর কবিতা পারাপারের অতল তল থেকে মুক্তা কুড়িয়ে শেষ করতে পারেন। এমন সাঁতারু কমই আছেন, যারা তাঁর কুলহীন সিঁকু পাড়ি দিয়ে তীরে পৌঁছতে পারেন। কবির কবিতা সাগরের অতল গভীরের একটি মুক্তা মাত্র নারী যা লুকিয়ে আছে কবির পবিত্র কাব্য ঝিনুকের বুক, পরিতৃপ্ত হয়েছে ওহি বিন্দু আকর্ষণ পানে।

মানব হৃদয়ে প্রেম-প্রীতির মঞ্জুসা দিয়েই স্রষ্টা পাঠিয়েছেন এ সুন্দর ধরাতলে তাঁর সুন্দরতম সৃষ্টিকে নর ও নারীর সৃষ্টি জগতের স্থল ও প্রেরণার উৎস। যুগ যুগ ধরে নর-নারীকে দেখেছে নানা রং-এ নানা ঢং-এ। নারীকে ঘিরে তার সুন্দর ভাবনা কল্পনা প্রকাশ করেছে গুহার পায়ে, পাথরের বুক। নারীর বিরহ জ্বালা হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার সুর ও ছবি ঐক্যে তুলিতে, বাজিয়েছে বাঁশিতে। কবিদের হৃদয় সরোবরে নারীর প্রেম কমল ফুটেছে যুগে যুগে। পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ-বেদনার তরঙ্গাঘাতে ও কমলে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। সৃষ্টি হয়েছে কাব্য-গান। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন:

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি প্রাণ, ১৪

যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান জাতীয় কবির এ কথাগুলো যথার্থ। কবি আরো বলেন:

সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই!

বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, চির-কল্যাণকর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। ১৫

আমরা দেখি ইংরেজ কবি কিটস ফ্যানি ব্রনকে নিয়ে লিখেছেন তার প্রেম ও বিষাদপূর্ণ কবিতা, বায়রন রচনা করেছেন ডন জুয়ান কাব্য, যাতে রয়েছে কাম ও তৎকালীন জীবন প্রসঙ্গ। ইতালির কবি এরিয়াত্রিকে উদ্দেশ্য করে Vita Nuova কবিতা রচনা করেছেন আল উয়রী প্রিয়া বুসায়নাকে নিয়ে তার কবিতা রচনা করেন। ১৬ নারী সৌন্দর্যের উপাসক উমর ইবনে আবি রাহিয়াহ রূপসী মহিলা দেখলেই তার নিকট কবিতায় প্রেম নিবেদন করতেন। ফারসি কবি দাকিকী নিসর্গ-প্রীতি, প্রেম-বিরহ নিয়ে কাব্য রচনা করেন। নিয়ামী রচনা করেন খসরু-শিরীন ও লায়লী মজনু রোমান্স কাব্য। ১৭ এভাবে সাহিত্য জগতের অনেকে নারীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কেউবা নারী হৃদয়ের প্রেম ও দেহকান্তির সৌন্দর্য রসে আপ্ত হয়ে রচনা করেছেন যুগে যুগে কাব্য-সাহিত্য। কালিদাসের মেঘদূতে ফুটে উঠেছে নারীর দেহ-সৌন্দর্য ও অন্তরের আকৃতি, বাল্মীকির মহাকাব্য রামায়নে ফুটে উঠেছে এক নারীকে ঘিরে সত্যের বিজয়াভিযানের গৌরব দীপ্ত। ১৮

আপামর কবির কবিতা নারীর প্রেম, সৌন্দর্য উদ্ভূত একথা ঠিক নয়। ধরণীর কাব্য মেলায় অনেক কবি-সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছে, যাদের কাব্য সম্ভার উজ্জ্বল ভাস্কর সম আনন্দ জ্যোতি বিকিরণ করে চলছে যা সৃষ্ট নয় নর-নারীর আপাতঃ মধুর দেহজ প্রেমের ফসল হিসেবে। এ দলেরই একজন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। ইকবাল তাঁর কাব্যে শ্রুতির প্রেম নির্ভরতা, বিশ্ব প্রেমের অতলান্ত প্রাণস্পর্শী-অনুভূতিগুলোকে পবিত্র ভাবরসে স্নাত করে উজ্জ্বল আসমানি নুরালোকে আলোকিত করেছেন। কবির কাব্যে নারী এসেছে, দেহজ প্রেমের বেসাতী হিসেবে নয়-আত্মজ প্রেমের ফসল ও ধরিত্রীর কল্যাণী রূপে শুধুমাত্র শিল্প রসে পাঠককুলকে রসসিক্ত করার মানষে হাজির করেননি নারীকে তার কবিতাজগৎ, যেমন কবি নিয়ামী লায়লাকে ঘিরে মজনু-এর আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

বাতাসে যদি বা তোমার শ্বাস না থাকে,

নিবনা এ শ্বাস, বলগো এ কথা তাকে।

তোমার শ্বাসেই আমার জীবন বাঁচে

আমার জীবন তোমার মাঝেই আছে। ১৯

কিন্তু আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্যে লায়লাকে হাজির করেছেন ব্যক্তি লায়লা-রূপসী লায়লা বা প্রেমিকা লায়লা হিসেবে নয়; বরং লায়লা এসেছে সমগ্র নারী জাতির প্রতীক হিসেবে। কত সুন্দর এই প্রতীক চয়ন, যে প্রতীকের মাঝে দিয়ে গর্জে উঠেছে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার, আহ্বান এসেছে সত্য প্রতিষ্ঠার। যখন পশ্চিমা নগ্ন সভ্যতা নারীর ইজ্জত-অবরণকে নিয়ে খেলছে, পর্দার বিরুদ্ধে উল্লাসিকতার সয়লাব বয়ে চলেছে, তখন কবি সোচ্চার হলেন প্রতীকী লায়লাকে ঘিরে। কবি গেয়ে উঠলেন—

وہنودیوانہ ہے بستیمینر ہے یانہر ہے

یہ ضرور ہے حجاب روکھے لیلیٰ نہر ہے۔

অর্থ:

পশ্চিমা নগ্নতাবাদীরা পাগল হয়ে উঠেছে,
‘লায়লা-কে অন্দর থেকে বন্দরে বের করার জন্য;
চক্রান্ত চলছে পর্দার সৌন্দর্য ও নিরাপত্তাকে মুছে ফেলার।’^{২০}

কিন্তু বাস্তবে এ লায়লা কায়েসের লায়লা নয়, এ লায়লা সমস্ত নারী জাতির প্রতীক।

আল্লামা ইকবাল নারীদের নিয়ে খুব বেশী লেখেননি। তবে যেটুকু লিখেছেন, অল্প হলেও তার মধ্য দিয়ে সমগ্র নারী সমাজের, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের জন্য, একটি শাস্ত্রত হেদায়াতকে মেলে ধরেছেন। এই জন্যই কোন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বা মাদামকুরি, রাণী ভিক্টোরিয়া বা সন্ত-বালিকা জোয়ান অব আর্ক নন, আল্লামা ইকবালের আদর্শ হলো হযরত ফাতিমা (রা:)। এই ফাতিমার (রা:) চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে আল্লামা ইকবাল বিশ্ব নারী সম্প্রদায়ের কাছে গভীর অনুরাগে এ পরম সওগাতরূপে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, “জ্যোতির্ময় ও অগ্নিময় (ফেরেশতা ও জিন) সবই ছিল তাঁর (ফাতিমা) আঙুরাবহ; তাঁর পরিপূর্ণ লুকানো ছিল তাঁর স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যে। ধৈর্য ও সন্তোষের শিক্ষায় তিনি প্রতিপালিতা; তিনি যাঁতা পেষণ এবং মুখে তাঁর কুরআনের আয়াত। উপাধানে মাথা রেখে তাঁর কান্না নয়, তাঁর অশ্রুর মুক্তোগুলো বারে পড়ে জায়নামাজে।”^{২১} যেমন তিনি বলেন—

سرور و شروسیاست، کتابودینولہز
گہر بینانکیگر ہمینتمامکیادانہ!
ضمیر بندہ خاک ہے نمودانکی
بلنوتر ہے ستارونے انکا کائناتہ!

অর্থ:

কাব্য, সংগীত ও রাজনীতি, বিদ্যা, ধর্ম ও শিল্প
গ্রন্থিত সবাই তারা একটি মোতির মালায়,
মাটির মানুষের দিলে তাদের প্রকাশ
আকাশ ছাড়িয়ে গেছে সিতারার জাহান।^{২২}

প্রকৃতপক্ষে আল্লামা ইকবাল স্বপ্ন দেখেছেন এমন নারীর, যে নারী গৃহের অলংকার ও আলোকবর্তিকা; প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, যে নারী পুরুষের সার্বক্ষণিক শক্তি ও প্রেরণাস্বরূপ। খুবই দুঃখজনক কিন্তু খুবই সত্য যে, পৃথিবী, বিশেষ করে আধুনিক পৃথিবী, নারীকে নিয়ে এক আশ্চর্য ধরণের কুৎসিত জুয়াখেলায় নেমেছে; যার পশ্চাতে সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে ইবলিসের প্রবল প্ররোচনা। নারীকে ধর্মহীন ও গৃহবিমুখ ও প্রকৃতিভ্রষ্ট করার যে ইবলিসী প্ররোচনা দিনে দিনে পৃথিবীব্যাপি অপ্রতিহত রূপ ধারণ করছে, আল্লামা ইকবাল বুঝে ছিলেন, এটা এক অশনি সংকেত, এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের নির্ভুল ইশারা। আর এই জন্যই আল্লামা ইকবাল অনেকটা শ্লেষ ও কৌতুক মিশিয়ে বলতে বাধ্য হন—

لڑکیاں پھر پیہے انگریزی
پیڈر امداد عکھا ے گاسین۔

অর্থ:

মেয়েরা সব ইংরেজি পড়ছে

দেখা যাক, এই নাটক শেষ পর্যন্ত কী-দৃশ্য মেলে ধরে! ২৩

আল্লামা ইকবাল লায়লাকে তাঁর বিভিন্ন লেখায় হাজির করেছেন নারী জাতির প্রতিনিধিত্বশীলা নেত্রী হিসেবে।
চেতনাহীনদেরকে চেতনা যোগাতে নারী পক্ষের জয়গান গেছে লিখেন—

در دلیلیہیو بقبسکیہلو یوبی
نجدکی دستجبلمینر بیہ ابونہیوبی۔

অর্থ:

তিনিই লায়লার প্রেম, তিনিই কয়েসের বাহুশক্তি

তিনি নজদের মরুদ্যানের পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান হরিণীর চোখের সৌন্দর্য। ২৪

আল্লামা ইকবালের ‘লায়লার’ এ উপমায় পাঠকের চিত্ত চির সুন্দরের অনুসন্ধান।

আল্লামা ইকবাল ‘লায়লা’ তথা নারীর প্রেমের আকর্ষণ রসে ডুবে ডুবে জীবনের গতি হারিয়ে ফেলার দলে নন। তিনি ব্যক্তি-প্রেমকে অতিক্রম করে মানব প্রেমের আকর্ষণে সামনে এগিয়ে যাওয়া দলের নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। নারীর পরশে প্রেমের আবেগে নিশ্চুপ নিখর না হয়ে অন্তরে গতির আবেগ নিয়ে জোর কদমে সামনে, আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার গান শুনিয়েছেন। যে মানব প্রেম-জাতির গতিকে থামিয়ে দেয় তা কবির অপছন্দনীয়। তাই আল্লামা ইকবাল বলেছেন—

تور بیہ نہدر دشوفہی منزلنہکر قبول
لیلہیہیہمنشہیہوتومحفلنہکر قبول۔

অর্থ:

প্রেমের পথের পথিক তুমি, কোনো মনযিলে নিওনা বিশ্রাম

লায়লা তোমার পার্শ্বচরী হলেও উটের, হাওদায় করনা আরাম। ২৫

আল্লামা ইকবাল বলেছেন—

دفسادکابیہ فرنگیمعاشرتمینظہور
کہمردسادہیہیہلچارہزنشہناسننہیں۔

অর্থ:

বিপর্যয়ের প্রকাশ হলো ফিরিংগী সামাজিকতায়

কেননা সরল পুরুষ তারা, নারী মানসের সাথে নেই পরিচয়। ২৬

প্রেমের প্রতীক লায়লাকে সমস্ত নারী জাতির প্রতিনিধি রূপে বাংলার বুলবুল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর কাব্যে বলেছেন—

সাপিনীর মত বেঁধেছে লায়লী কায়েসে গো,

বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বধু আয়েসে গো। ২৭

নারী রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন জনে, বিভিন্নভাবে। ফারসি কবি দাকিকী তাঁর কাব্যে নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

তোমার চুলের মতো কালো এ রাত
তোমার মুখের মতো দীপ্ত এই দিন।
তোমার ঠোঁটের ওই সুদৃশ্য চতুরে
শিল্পীর সৌন্দর্য ভরা মুক্তোর বিস্ময়।^{২৮}

কবি দাকিকী নারীর বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর বস্তুর সাথে তুলনা করে। কবি ইকবাল নারী-সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন স্বর্গীয় ভাষায়। যেমন বলেছেন—

وجود نے بے تصویر کا اپنا تمیزنگ
اسی کے سازے ہے زندگی کا سوزدروں
شر فمینہ پر ہے نرتیاں مشتخاکا کی
کہہر نثر ہے اُسیدر جکاڈر مکنوں!

অর্থ:

নারীর অস্তিত্বেই রঙ্গিন বিশ্ব জাহানের ছবি,
তারি সুরে উদ্ভূত জীবনের হৃৎপিণ্ড
তার এক মুঠো মাটি সন্মানিত সপ্তর্ষির চেয়েও
কেননা সব সন্মান ঐ মূল্যবান মোতির।^{২৯}

আল্লামা ইকবাল নারীর ব্যাপারে তাঁর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন মার্জিত ও আদর্শ রূচিবোধসম্পন্ন স্টাইলে। এ লেখার মধ্য দিয়েই ইসলামে নারীর প্রতি আন্তরিকতা ও মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন:

اکز ندن حقیقت مرے شینے میں ہے مشنور
کیا مجھے گاؤں جنکیر گونمیں ہے لہو سرو
نہ پرده، نہ تعلیم، نہ ہو کہترانی
نسوانیتز نکانگہ بانہے فقط مرد
جنقو منے اسز ندن حقیقت کونہ پایا
اسقو مکاخو ر شید بہ تجلد لہو ازو

অর্থ:

একটি জীবিত সত্য নিহিত আমার বুকে,
যার শিরায় প্রবহমান শীতল রক্ত সে
তা বুঝবে কেমন করে!

পর্দা অথবা শিক্ষা
নতুন হোক বা পুরাতন
অক্ষম সবাই,
নারীত্বের সংরক্ষণ ও লালন
সম্ভব একমাত্র পুরুষের হাতেই।
যে জাতি পায়নি এ জীবন্ত সত্যের সন্ধান।
তার সূর্য শিক্ষা স্নান হয়ে যাবে অচিরেই।^{৩০}

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন—

جوہر مردعہیانہو ابے منتحیر
غیر کے لہاتہمیں ہے جوہر عورت کی خوردا!
راز ہے اس کے تیغ مکاں بینکتہ شوق
آتشینا لذتتخلیفے ہے اس کا وجود!
کھلتے جاتے ہیںا سیانگے اسرار حبات
گر ماسیاگے ہے معرکہ بودونبود!
مینبہیمضکالو مینوانے لہو بنحمناکبہت
نہینمحکمگر اسعضدہ شکال کی کشود!

অর্থ:

পুরুষ-সত্তার বিকাশ ঘটে অন্যের সাহায্য ছাড়া
নারীর সত্তা উন্মুক্ত হয় অন্যের হাতে
এ প্রেম কথাই রহস্য তার দুঃখ-উত্তাপের
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তার অস্তিত্ব হয় অগ্নিময়।
জীবনতত্ত্ব উন্মুক্ত হয় এ অগ্নিতেই
এ অগ্নিতে উত্তপ্ত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রাণ।
নারীর মজলুমী দেখে শোকাহত আমার ও হৃদয়
কিন্তু এ জটিল গ্রন্থি উন্মোচন সম্ভব নয়।^{৩১}

বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে নারীকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে নারীর রূপ-সৌন্দর্য মেয়েদের গুণাগুণ গেয়েছেন বিভিন্নভাবে। এতে নারীর মর্যাদা বাড়েনি, বরং কমেছে। এসব লেখা পড়ে মনে জাগে বিভিন্ন কিছু কিন্তু আল্লামা ইকবালের কবিতা এসব নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইকবাল তাঁর রচনায় নারীর সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন আকাশ ছোঁয়া। যেমন তিনি বলেন—

مریم از اینک نیست عیسیٰ حیز
از چہ نیستحضدتضلہرا عزیز

نور چشم صحتا للعین

آنماما و لنینوا ضرین

অর্থ:

কেবল মাত্র ঈসার কারণে মরিয়ম খ্যাতি ত্রিবিধ কারণে মহামান্বিতা ফাতেমা খ্যাতি, বিশ্ব আশীষ পয়গম্বরের নয়ন মনি, নবীন প্রাচীন নবী ওলীদের ইমাম যিনি।^{৩২}

আল্লামা ইকবালের শিল্প সুন্দরের জন্য, জীবনের জন্য, আদর্শের জন্য। তাঁর উপলব্ধির গভীরতা অধিক, যে কারণেই তাঁর কবিতার ভাষাক্ত ছন্দও ছাড়িয়ে গেছে দেশ ও কালের সীমানা। যেমন তিনি বলেছেন—

شفقتو بشفتتیضمیرست

سیرتاقوامیهصور تیگرست

অর্থ:

মমতা মাতার, নবীর স্নেহ পূণ্যময়

জাতির স্বভাব গঠন কৃতি সে অক্ষম।^{৩৩}

উপরোক্ত কারণে নারী সত্তা পূণ্যময়ী হিসেবে শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয় না। এ কারণেই আল্লামা ইকবালের নারী ও অন্য কবিদের নারীর মাঝে তফাৎ রয়েছে। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় ব্যক্তিসত্তার সীমাতিক্রম্য এক আন্তর্জাতিক সুর। যে সুরের মাঝ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঐশী সঞ্জত প্রজ্ঞার শিক্ষা। তাই তিনি বলেন—

بهترنگبولے پیربرینے

خدایا بددنیا جہانتھیو پیہے

تغاولتقہدیکھانوشومینمینے

وہخلوتنشیںہے! یہخلوتنشیںہے!

ابھیتکہے پردےمیناولادادم

کسیکیخودیآشکارانہیںہے!

অর্থ:

উর্ধ্ব গগন বহু রং বদলালো

এ দুনিয়া হে খোদা সেখানেই আছে যেখানে ছিল

নর ও নারীর মাঝে প্রভেদ দেখিনি

সেও নির্জন বাসী এও নির্জন বাসিনী

এখনো সৃষ্টির ঢাকা আদমের আওলাদ

কালের খুদীর প্রকাশ হয়নি অবাধ।^{৩৪}

আল্লামা ইকবাল যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—

যে অবরোধ নারীত্বের সম্মান, সম্মম ও পূর্ণ বিকাশের নির্ভুল নিশ্চয়তা দান করে, সে অবরোধ শুধু উপকারী নয়, সর্বতোভাবে অপরিহার্যও বটে। আর যে-মুক্তি পুরুষের হাতে হাতে লাটিমের মত নারীকে অসহায়ভাবে আবর্তিত হতে বাধ্য করে, সেই মুক্তি উদ্দাম উন্মত্ত ঘোটকীয় অপমুক্তি। কিছু মতলবী প্রগতিবাদী নফসের তাড়নায় যতই প্রলাপ বকুক, পৃথিবীব্যাপি বেরোয়া নারী সমাজের দিকে চেয়ে যে-কোন সুস্থ মানুষ আজ বলতে বাধ্য যে, তথাকথিত সম অধিকারের নামে নারীরা যা পেয়েছে, তা বস্তুত সর্বস্ব হারানোরই নামান্তর। আল্লামা ইকবালের মতে এই সমস্ত নারী শুধু পথভ্রষ্ট নয়, আত্মভ্রষ্ট এবং প্রকৃতিভ্রষ্টও বটে।^{৩৫}

অবশ্য নারীর জীবনে এক ধরনের দুঃখ ও প্রতিবন্ধকতা যে নেই তা নয়, আছে; এবং ইকবাল তা অকপটে স্বীকারও করেন। কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণ ও বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে তাঁকে অবশ্যই বলতে হয়, ‘যে শিক্ষার অভাবে নারী তার নারীত্ব হারায়, মৃত্যু হলে তাকে প্রাজ্ঞ মানুষেরা।’ নারীর মজলুম দেখে শোকাহত আমার ও হৃদয়’। কিন্তু এই সহমর্মিতার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে অপর একটি শাস্ত্রত সত্য। নারীর দুঃখ ও উত্তাপকে সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী প্রতিদিন নতুন হয়ে ওঠে, আকাশ ছাড়িয়ে সপ্তর্ষির মর্যাদা লাভ করে এই মাটির পৃথিবী। অবশ্য এই সকল কথা সত্য কি-না, সত্য হলে কতখানি সত্য, সেই বিতর্ক আল্লামা ইকবাল পরিহার করতে চান। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, ‘নিশ্চিত আমি : একটি বিষ অন্যটি মধু’।^{৩৬} প্রশ্ন উত্থাপন করেন, ‘মূল্যমান ও সৌন্দর্যের নিরিখে গুরুত্ব বেশী কার, নারী স্বাধীনতার অথবা মুক্তামালার?’ তিনি বলেন—

اسبحتكاجهفيلهمينكر نهينسكتا
گوخوبحببتابونكهيهزبرےوبقند
کیافاندبکچھکھکے بنوناور بهيمعتوب
پہلے بيخفامجھے بينتمہديکے فرزند
اسرازکومہورتکييصيرتہیکرے فاش
مجبور ہیں، معذور ہیں، مردانخرومند
کیاچیز ہے ادانشوقیحتمینز بادہ
ازارننسورنکھزمزوالوبنر؟

অর্থ:

এ বিতর্কের সুরাহ নেই আমার কাছে তবুও
নিশ্চিত আমি এটি বিষ ওটি মধু,
প্রয়োজন কি মন্তব্যে, আমি হই আরো বিরাগভাজন,
সত্যতার বরপুত্ররা ইতিপূর্বেই বিস্কুল আমার প্রতি,
নারীর অন্তর দৃষ্টিই এ রহস্য ভেদ করুক,
অক্ষম বিজ্ঞজনেরা, নিঃশ্বেষ তাদের শক্তি।
মূল্যমান ও সৌন্দর্যের নিরিখে গুরুত্ব বেশী কার,
নারী স্বাধীনতার অথবা মুক্তামালার?^{৩৭}

নারীর পূর্ণত্ব প্রেম-শূন্য হৃদয় নয়, সন্তান-শূন্য কোল নয়, যখন আধুনিক সভ্যতা সম-অধিকার ও নারী স্বাধীনতা নামে প্রেম-শূন্য হৃদয়, সন্তান-শূন্য কোল দাবী জানাচ্ছে, তখন কবি তাদের এই দাবীর অসারতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন জাতির সামনে। তিনি বলেন-

کوئیوچھے حکیم یورپے
ہندو یونان اینجنکے صلے ہبگوش!
کہا یہی ہے معائنہ کا کمال؟
مرد بیچارہ روز نہ تھیا نحوش!

অর্থ:

কে জিজ্ঞেস করবে ইউরোপের দার্শনিককে
গ্রিক ও হিন্দুস্তান দলভুক্ত যার,
পুরুষ নিকর্ম আর নারীর হৃদয় শূন্য
এই পূর্ণতা সমাজ সভ্য তার? ৩৮

আল্লামা ইকবালের কবিতায় নারী হাজির হয়েছে জীবনের গতি শক্তির উৎস হিসেবে। তিনি বলেন-

از امو متگر مبحثار حیات
از امو متکشفاسرار حیات۔

অর্থ:

মাতৃত্ব সে তত্ত্বরাখে জীবন গতি
মুক্ত করে জীবন পথের গুপ্ত নীতি। ৩৯

উপসংহার

উপরোক্ত আলোকপাতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ইকবাল তাঁর আপন জীবনের বাস্তবতা ও কাব্যের সুবাসিত সৌরভ নিয়ে নারীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোন কথাই বলতে বাকি রাখেননি। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছেন, “বিজ্ঞানদের সহশ্রমুখী চেষ্টা ও সমাধানের পরেও ‘নারী সমস্যা যেখানে ছিল আছে সেখানেই; কারণ; ‘একটি জীবন্ত সত্য নিহিত আমার বুকে’, শিরায় যাদের শীতল রক্তশ্রোত’ তারা বুঝতে অক্ষম, ‘নারীত্বের সংরক্ষণ ও লালন সম্ভব একমাত্র পুরুষের হাতেই। এটা নারীর অবমাননা নয়, এটাই নারী জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা, শ্রেষ্ঠতম সন্মান ও বৈভব। ইসলামের শাস্ত্র শিক্ষা থেকে দূরবর্তী এই দুর্ভাগ্য মানুষেরা জানেই না যে, নারীর প্রকৃত মূল্য ও মহিমা কি মমন্ত। আল্লাহর রাসুল (সা:) বলেন, ‘পৃথিবীতে আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো নারী। আল্লামা ইকবালও নারীদের প্রতি তাঁর হৃদয় মথিত শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ অনুরাগ নিয়ে এই একই কথা বলেন-

بیگانہ رہے دینے اگر مور بزن
بے عشق و محبت کے لیے علم و بزر موت!

অর্থ:

নারী শিক্ষায়তন যদি দীন থেকে দূরে থাকে
শিল্প ও শিক্ষা মৃত্যুর পয়গাম আনে প্রেম ও প্রীতির জন্য।^{৪০}

তথ্যনির্দেশ

- ১ মুহাম্মদ তাহের ফারুকী, *সিরাতে ইকবাল* (লাহোর: কওমি কুতুবখানা, ১৯৪৯), পৃ. ১৮
- ২ তদেব, পৃ. ১৯।
- ৩ তদেব, পৃ. ২০-২১।
- ৪ মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, *ইকবালে কামেল* (আজমগড়: ১৯৮৭), পৃ. ৭।
- ৫ ফকীর সায়েদ ওয়াহীদুদ্দীন, রোয়েগার ফকীর, ২য় খণ্ড (করাচি : লাইন আর্ট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৪), পৃ. ৩৭।
- ৬ তদেব, পৃ. ৫৪।
- ৭ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম খান, *ইফকারে ইকবাল* (নয়া দিল্লি : মাকতবায়ে জামিয়া, ১৯৯১), পৃ. ৪৪।
- ৮ Dr. Javid Iqbal, Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Kashmiri Bazar : Lahore, 1954), p. 135.
- ৯ রফীউদ্দীন হাশেমী, *তাসানিফ ইকবাল* (লাহোর : ইকবাল একাডেমি, ১৯৪৮), পৃ. ৬৩।
- ১০ তদেব, পৃ. ৬৪-৬৬।
- ১১ কুরআনুল কারিম, সূরা শুয়ারা।
- ১২ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *যরবে কালিম* (দিল্লি : ই'তেফাদ পাবলিকেশন্স হাউস, ১৯৮১), পৃ. ৫৪।
- ১৩ Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India*, (Kashmiri Bazar, Lahore, Pakistan, 1961), p. 59.
- ১৪ নজরুল, *নজরুল রচনা-সম্ভার*, আব্দুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৭।
- ১৫ নজরুল, *নজরুল-রচনাবলি 'নারী'* আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৬৩।
- ১৬ Thoughts and Reflections of Iqbal, Edited by Syed Abdul Vahed! Muhammad Ashraf Publication, Lahore, p. 45.
- ১৭ Ibid, p. 48.
- ১৮ Ibid, p. 49-50.
- ১৯ সৈয়দ গোলাম রেজা সায়ীদী, *ইকবালের শিল্প ও চিন্তাধারা*, (তেহরান, ইকবাল প্রকাশনী, ১৯৫৯), পৃ. ৬৭।
- ২০ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু) *যরবে কালীম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।
- ২১ কাজী আখতার আহমদ শিয়া, *ইকবালিয়াত কা তানফিকিদি জায়েয়া* (লাহোর : ইকবাল একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ৮৪।
- ২২ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *যরবে কালিম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।
- ২৩ তদেব, পৃ. ১১৭।
- ২৪ তদেব, পৃ. ১০৭।
- ২৫ তদেব, পৃ. ১২১।

-
- ২৬ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু) যরবে কালিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।
- ২৭ নজরুল রচনাবলী, ঈম মোবারক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯।
- ২৮ সৈয়দ গোলাম রেজা সায়ীদী, ইকবালের শিল্প ও চিন্তাধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।
- ২৯ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু) যরবে কালিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।
- ৩০ তদেব, পৃ. ৯৫।
- ৩১ তদেব, পৃ. ৯৭।
- ৩২ তদেব, পৃ. ৮৩।
- ৩৩ তদেব, পৃ. ৫৬।
- ৩৪ তদেব, পৃ. ৯৩।
- ৩৫ রইস আহমদ জাফরী, ইকবাল আওর সিয়াসতি-এ-মিল্লি (করাচি : ইকবাল একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭), পৃ. ৬৬।
- ৩৬ তদেব, পৃ. ৬৯।
- ৩৭ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), যরবে কালিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।
- ৩৮ তদেব, পৃ. ৯২।
- ৩৯ কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফারসি), যবুরে আজম, পৃ. ৪৬।
- ৪০ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), যরবে কালিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।